# সেরা ক্রাইম

সম্পাদনা

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
সৌরেন দত্ত

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক : অজিত জানা
অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৬৩

মুদ্রক : স্টারলাইন
১৯ এইচ/এইচ/১২, গোযাবাগান স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬

# সূচি

# সেরা ক্রাইম

# ঈশ্বরের অভিসন্ধি

## সমরেশ বসু

অপরাধ কতরকম ভাবে সংঘটিত হয়, কী হিমশীতল সরীসৃপের মতো মাটিতে বুক চেপে চলা সর্পিল তার গতি হতে পারে, তা সব সময়, তথাকথিত হত্যা, তদন্ত বা রহস্য উদ্ঘাটনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বস্তুতব তার গতিবিধি, এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার চেহারাও বিভিন্ন।

আমি তথাকথিত কোনো কাল্পনিক অপরাধের কাহিনী লিখছি না। একটি সত্যি অপরাধের ঘটনা বলছি, এবং ঘটনা থেকে পাঠকরা অনুমান করতে পারবেন। অপরাধীরা, সমাজে এবং দেশে, নিজেদের স্বার্থের জন্য, কিভাবে আরো অনেক বড় অপরাধ যখন খুশি করতে পারে! আমি যে অপরাধের কথা বলছি, এ বছরের গোড়ার দিকেই তা ঘটে। বাঙলাদেশের বাইরে এক পাহাড়ি শহরে, অবশ্যই ভারতবর্ষের মধ্যে। জায়গার নামটা আমি প্রকাশ করছি না, কারণ সেখানকার সংবাদপত্রের যত সংবাদদাতা ছিলেন বা নানা সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিরা ছিলেন, তাঁরা আসল ঘটনাটা জেনেও, তা প্রকাশ করতে পারেন নি। না পারার কারণ, দেশের মঙ্গলের জন্য না, সম্ভবতঃ অন্য কোনো গূঢ় কারণ আছে, যা আমি অনুমান করলেও, প্রকাশ করতে পারি না।

আমি সেই হিল টাউনে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ভারতবর্ষের অন্যতম সুন্দর জায়গা। পৃথিবীর সব দেশের লোকই সেখানে ভ্রমণে যান। ভারতবর্ষের বিভিন্ন পাহাড়ি অঞ্চলের, বিভিন্ন রূপ, কোনোটার সঙ্গে কোনোটাকে মেলানো যায় না। প্রত্যেক জায়গার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এই পাহাড়ি অঞ্চলেও তা আছে। গাছপালা ফুল ফল ঝর্ণার বর্ণাঢ্য সমারোহের মধ্যে, এখানকার অধিবাসীরাও সুন্দর, যদিও ভারতীয় রাজনীতি আজ আর কোথাও মানুষকে সরল রাখতে দেয় না। সেই হিসাবে পার্বত্য এবং আরণ্যক সারল্যে এদেরও অনেক হারিয়ে গিয়েছে। নানান জটিলতা দেখা দিয়েছে, সন্দেহ আর অবিশ্বাস বেড়েছে।

কয়েকটা দিন বেড়িয়ে ঘুরে বেশ ভালোই কাটছিল। হঠাৎ একদিন সকালবেলা উঠে শুনলাম, শহরে দাঙ্গা লেগে গিয়েছে। এখনো কারফিউ জারি করা হয় নি, কিন্তু একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি করা হয়েছে। চারদিকে পুলিশ টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। স্থানীয় অধিবাসীরা ভীষণ উত্তেজিত।

দাঙ্গার কারণ কী, কাদের সঙ্গে দাঙ্গা? অন্য এক পাহাড়ের অধিবাসীদের সঙ্গে দাঙ্গা যারা এ শহরে বাস করে না, থাকেও না, কিন্তু সাময়িকভাবে প্রায় পঞ্চাশ জন এ শহরে কয়েকদিন আগে প্রবেশ করেছে। উদ্দেশ্য, নিজেদের হাতে তৈরি পশমের নানারকম জামা বিক্রয় করা। তারা কোনোরকম বে-আইনী প্রবেশ করেনি, এবং শহরে মহল্লায় বস্তিতে ঘুরে, পশমের

জামা বিক্রিতেও তাদের প্রতি কোনো নিষেধ ছিল না। ছিল না বলেই, তারা মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে, প্রায় জনা পঞ্চাশ সারা শহরে কয়েক দিন ধরেই ব্যবসা করছিল, কোনোরকম গোলমালই ছিল না। অন্য পাহাড় ডিঙিয়ে, অনেক পথ ভেঙে ওরা এসেছে। দেখলেই বোঝা যায়, তাঁরা অত্যন্ত দরিদ্র। এবং বলতে গেলে, এই আগত পাহাড়িদের সঙ্গে স্থানীয় পাহাড়ি অধিবাসীদের চেহারার অনেক মিল, মনে হয় একই নরগোষ্ঠীভুক্ত। এই বহিরাগত পাহাড়িদের স্থানীয় পাহাড়িরা যেখানে পাচ্ছে, মারধোর করছে। কোথাও কোথাও দল বেঁধে পাথর ছুঁড়ে আহত করছে। নিহতের সংবাদ এখনো নেই। একে ঠিক দাঙ্গা বলে না। এক পক্ষ থেকে আর এক দুর্বল পক্ষকে মার দেওয়া বলে।

মারের কারণ অত্যন্ত মারাত্মক। অভিযোগ, পশমের জামা বিক্রেতা আগত পাহাড়িয়া, স্থানীয় পাহাড়ি শিশুদের গলা কেটে, থলি ভর্তি করে নিয়ে যাচ্ছে। কয়েকজন নাকি শিশু মুণ্ডসহ ধরাও পড়েছে। শোনা গেল সেই সব শিশু মুণ্ড নাগ পুজার বলি হিসাবে সংগৃহীত হচ্ছে। এবং হিসাব করে দেখা গেল, সে সময়ে, পাহাড়ের কোনো কোনো অঞ্চলে, নাগ পুজা আসন্ন।

আমি যে অঞ্চলে ছিলাম, ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, রাস্তায় একটিও শিশু নেই। দু-একজন যা ও ছিল, তাদের মায়েরা ছুটে এসে, দু চার ঘা দিয়ে আঁচলের আড়াল করে দ্রুত ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে। তাদের চোখে মুখে রীতিমতো আতঙ্ক।

ব্যাপারটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য, কিছুই বুঝতে পারলাম না। গরম পোশাক পরে, শহরের চেহারাটা-দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। দেখলাম একদিকে আতঙ্ক, আর এক দিকে উত্তেজনা। শহরের কেন্দ্রস্থলের কাছেই, বিরাট এক জনতাকে দেখলাম, রাস্তার নিচে খাদের জঙ্গলে ওরা পাথর ছুঁড়ছে আর নিজেদের ভাষায় চিৎকার করছে। ব্যাপার বুঝে ওঠার আগেই পুলিশ ভ্যান এসে পড়ল। লাঠি নিয়ে হৈ হৈ করে জনতাকে তেড়ে গেল। এরা ঠিক কলকাতার জনতা না। সবাই ধীরে ধীরে স্থান ত্যাগ করল, তার মধ্যে কয়েকজন উত্তেজিত লোককে পুলিশ গ্রেপ্তার করল।

আমি রাস্তার ধারে রেলিং-এর কাছে গিয়ে দেখলাম, একজন বহিরাগত পাহাড়ি, প্রায় কুড়ি ফুট নিচে, আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। পুলিশ অন্য দিক দিয়ে নেমে, তাকে তুলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল। পাথরের গায়ে লোকটির রক্তাক্ত অবস্থা, বাঁচবে কি না, কে জানে।

শহরের সর্বত্র উত্তেজনা, অনেক দোকানপাট বন্ধ, অফিস আদালতে কাজের থেকে, এসব নিয়ে কথাবার্তাই বেশি বলছে, এবং একটি শিশুর মুখ কোথাও দেখা যায় না।

এবার আপনাদের গল্পের মতো করে, একটি গল্প শোনাই।

এ শহরের সব থেকে বড় জামাকাপড়ের দোকানটি, শহরের কেন্দ্রস্থলেই। বিরাট গারমেন্ট শপ, যেমন তার সাজসজ্জা, তেমনি লোভনীয় হাল-ফ্যাসানের পোশাক শো কেসে সাজানো। শহরের তিন জায়গায়, এদের তিনটি বিরাট বড় বড় দোকান। লোকে যেখানেই পোশাক কিনতে যাক, এদের দোকান সকলের আগে চোখে পড়ে।

প্রধান দোকানের পিছনে, ছোট অফিসঘরের মধ্যে, দুই ব্যক্তি মুখোমুখি বসে। দোকানের এরা প্রোপ্রাইটর। ভারতবর্ষের অন্য অঞ্চলের অধিবাসী, যাদের দীর্ঘ শরীর, গৌরবর্ণ, খড়্গ নাসিকা দেখলেই বোঝা যায়, ভারতের কোনও অংশের অধিবাসী এরা।

# ঈশ্বরের অভিসন্ধি

মুখোমুখি দুজনকে দেখলেই বোঝা যায়, তাদের দৃষ্টিতে গভীর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। অনেকক্ষণ থেকেই তারা একটি বিশেষ সমস্যার সমাধানের বিষয়ে আলোচনা করছে।

যে বেশি বয়স্ক, তার বয়স সত্তর হতে পারে। বলল, এদেশের মানুষকে আমি চিনি, কীভাবে এদের কাজে লাগাতে হয় তাও জানি। কিন্তু এখন যেটা করতে হবে, সেটা দু'বোতল মদ আর দশটা টাকা দিয়ে, হাসিল হবে না, অন্য কিছু ভাবতে হবে।

অন্যজন, যার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, সে বলল, রাস্তাঘাটে কোথাও একটা হামলা করিয়ে দিলে হয় না?

কী রকম? বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলো।

অন্যজন বলল, এমনি, আপোষে লড়িয়ে দেওয়া। তারপরে একটা হাতাহাতি মারামারি লাগলেই কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ হাসল। বলল, শুধু শুধু ওরা লড়বে না। আমরা যদি দু-একজনকে দিয়ে লড়াই লাগিয়ে দিই, সেই আপোষের লড়াই, অন্যান্য পাহাড়িয়া এসে মিটিয়ে দেবে। মনে করবে, ওরা খুবই শান্তিপ্রিয়। সহজে মারামারি করতে চায় না। তাছাড়া, এরাও পাহাড়ি, ওরাও পাহাড়ি। কেউ সমতলবাসী না। এদের মধ্যে মারামারি লাগানো খুব কঠিন।

অল্পবয়স্ক অধৈর্যভাবে বলল, তাহলে কী করা যায়?

বৃদ্ধের মুখে বলিরেখা গাঢ় ও সর্পিল হ'ল। বলল, ভাবতে হবে। আর মনে রাখতে হবে, এমন একটা কিছু করতে হবে, যেন সেটা চিরস্থায়ী হয়। একটা মরশুমেই যেন সব শেষ না হয়ে যায়। যা করা হবে, একবার, আর তার ক্রিয়া হবে বরাবরের জন্য। এমন একটা কিছু করতে হবে। আচ্ছা, তুমি যাও, ইন্দরকে পাঠিয়ে দাও।

অল্পবয়স্ক চলে গেল। বৃদ্ধ গালে হাত দিয়ে, ভ্রূকুটি চোখে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হ'ল। ইন্দর যার নাম, সে এসে দাঁড়ালো, কিন্তু বৃদ্ধ তা দেখতে পেল না। ইন্দরও কিছু না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ফর্সা রোগা লম্বা ইন্দর, সরু গোঁফ। ছোট ছোট তীক্ষ্ণ ধূর্ত চঞ্চল দৃষ্টি। দেখলেই মনে হয়, লোকটা নিঃশব্দে অনেক কিছু করতে পারে, এবং ছায়ার মতো অদৃশ্যেও চলতে পারে।

বৃদ্ধের চোখ দুটো হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। বৃদ্ধের চোখে এ ঝিলিক যৌবনের না, ক্রূরতার। চোখের ঝিলিকের সঙ্গেই বৃদ্ধ যেন চঞ্চল আর উত্তেজিত হয়ে উঠল, এবং মুখ ফিরিয়ে ইন্দরকে দেখতে পেল। গম্ভীর আর নিচু স্বরে বলল, বসো। যা বলব, প্রত্যেকটি কাজ ঠিক মতো করতে হবে, ভাল পুরস্কার পাবে।

অনুমতি করুন। ইন্দর বলল।

এর এক ঘণ্টা পরে, ইন্দরকে দেখা গেল বাইরের একদিকে, একটা নিরালা বস্তি অঞ্চলে। ঘোরাঘুরি করতে করতে যার সঙ্গেই দেখা হ'ল, তাকেই স্থানীয় ভাষায় জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি শুনেছ, বাইরের একদল পাহাড়ি যারা এসেছে, তারা এখানকার বাচ্চাদের মুণ্ডু কেটে থলিতে ভরে নিয়ে যাচ্ছে?

যাকে বলে, সে-ই অবাক ভয়ে মাথা নাড়ে। শোনে নি। কিন্তু আতঙ্কিত হয়, বাচ্চা সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইন্দর আরো বলে, কী নাকি নাগপূজা হচ্ছে, সেখানে শিশু মুণ্ডু পূজা দেওয়া হবে। যত শোনে, ততই লোকে ভয়ে কেঁপে ওঠে। বাবা-মায়েরা ছেলেকে কোলে চেপে ধরে। দুটো বস্তি ঘুরে ইন্দর দোকানে ফিরে গেল।

আধ ঘণ্টা বাদে আবার তাকে দেখা গেল শহরের অন্য এক অঞ্চলে। গাড়ি চলবার রাস্তা ছেড়ে, নিচের দিকে বস্তির পথে কয়েক পা নেমে, বাঁ দিকে গেল। সেখানে গাছপালা একটু ঘন; একটা সরু ঝর্ণা নেমে এসে, এক জায়গায় ছোট একটি জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে। সেখান থেকে কয়েকটি ছোট ছোট কাঠের বাড়ি দেখা যায়। ইন্দর তীক্ষ্ণ চোখে সেদিকে একবার দেখল, যেন গৃহস্থের দরজার কাছে শৃগাল এসেছে। লোকজন এবং শিশুর গলার স্বর মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে।

ইন্দর কাঠের বাড়িগুলোর দিকে কিছুটা এগোতেই, দেখতে পেল, একটি ছ-সাত বছরের ছেলে, একটা ছোট বালতি নিয়ে, জলাশয়ের দিকে আসছে। ইন্দর একবার আকাশের দিকে তাকাল। বেলা প্রায় চারটে। বাড়িগুলোর দিকে দেখল, আজ কারোকে দেখা যাচ্ছে না। ইন্দরের চেহারা যেন মুহূর্তে বদলে গেল। কোমর থেকে বের করলো একটা ধারালো কুক্‌রি জাতীয় অস্ত্র। ছেলেটা ওর সামনেই। ঝটিতি শেয়ালের মতো যেন মুরগী ছোঁ মেরে তুলে নিল। পাশের ঝোপে সরে গেল, অল্প একটু দাপাদাপি, দু' মিনিটের মধ্যেই সে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো, তার হাতে একটি থলি। থলির মধ্যে কিছু একটা আছে। হাতে রক্ত, জামায়ও লেগেছে। সে দৌড় দিল। খানিকটা গিয়ে, বাঁ দিকে পাহাড়ি রাস্তার ওপর থলিটা ফেলে দিয়ে ঝর্ণার পাশ দিয়ে ঘন বনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

সন্ধে সাতটা। সেই বৃদ্ধ তার ঘরে বসে, টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল। টেলিফোন করল পুলিশ হেড কোয়ার্টারে। নিজের পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কে বলছেন, জানতে পারি?

ওপার থেকে জবাব এলো, এ. ডি. সি—।

বৃদ্ধ উত্তেজিতভাবে বলল, শুভ সন্ধ্যা স্যার, আমি—শপের প্রোপ্রাইটর বলছি। শহরে শুনছি ভীষণ গোলমাল লেগেছে। দোকান কি খোলা রাখব?

জবাব এলো, আপনাদের দোকান খোলা রাখতে কোনো অসুবিধা নেই। বৃদ্ধ অনুনয়ের স্বরে জিজ্ঞেস করলো, স্যার ব্যাপারটা কি হয়েছে জানতে পারি?

ওপার থেকে জবাব এলো, শোনা যাচ্ছে বহিরাগত কিছু পাহাড়ি লোক উলেন গারমেন্টস বিক্রি করতে এসে, স্থানীয় শিশুদের মুণ্ডু কেটে নিয়ে যাচ্ছে।

আশ্চর্য! বৃদ্ধ বলল, তা কি সম্ভব? সত্যি সেরকম কিছু ঘটেছে নাকি স্যার?

জবাব এলো, এখন পর্যন্ত একটি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু কারোকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। রাস্তায় পড়ে থাকা থলির মধ্যে একটি শিশুর মুণ্ডু পাওয়া গেছে।

হা ঈশ্বর! বৃদ্ধ বলে উঠল, তাহলে স্যার এখন কী হবে?

জবাব এলো, স্থানীয় জনতা ক্ষেপে উঠেছে। যেখানেই সেই বহিরাগত পাহাড়িদের পাচ্ছে, ভীষণ মারধোর করছে। অথচ পুলিশের হাতে কোনো প্রমাণই নেই। আমরা ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখছি, আসলে কী ঘটেছে। যতক্ষণ তা না জানতে পারছি, কিছুই বলতে পারছি না।

বৃদ্ধ বললে, কিন্তু স্যার, বহিরাগত পাহাড়িদের তো নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়।

একটু রুক্ষ স্বরে জবাব এলো, সেটা আমরা জানি। তারা অনেকেই ইতিমধ্যে এ পাহাড় থেকে নেমে পালাতে আরম্ভ করেছে।

ওপার থেকে লাইন কেটে দিল। বৃদ্ধ রিসিভার রেখে সৌম্যভাব ধারণ করলো। বিজলি বেলের বোতাম পুশ করলো। একটি স্থানীয় পাহাড়ি ছেলে দরজা ঠেলে ঢুকল। বৃদ্ধ বলল, ছোটা সাবকো বোলাও।

ছেলেটি চলে গেল। একটু পরে পঞ্চাশ বছর বয়সের সেই লোকটি এসে চেয়ারে বসল। বৃদ্ধ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলো, ইন্দর কী কবছে?

পঞ্চাশ বছর বলল, অত্যধিক মদ্য পান করে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে।

বৃদ্ধ বলল, ঠিক আছে। বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিও। এখন যেন কয়েকদিন বাইরে না বেরোয়।

ঠিক আছে।

বৃদ্ধ বলল, আচ্ছা, বহিরাগত পাহাড়ি সবশুদ্ধ কতজন এসেছিল?

মেয়ে পুরুষ মিলিয়ে পঞ্চান্ন জন।

তার মানে, প্রত্যেকে গড়ে প্রায় পঞ্চাশ পিস করে উলেন গারমেন্টস নিয়ে এসেছিল?

তা হবে নিশ্চয়।

তাহলে হিসাব করো, পঞ্চান্ন ইনটু পঞ্চাশ—দু'হাজার সাতশো পঞ্চাশ পিস গারমেন্টস ওরা নিয়ে এসেছিল। যা আমাদের আমদানি করা মালের থেকে ওদের মালের দাম অনেক সস্তা। মালেব কোয়ালিটি একটু খারাপ হতে পারে। কিন্তু মজুরিটা ওরা প্রায় ধরেই না, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ধরো, ওদের পিস যদি পঁচিশ টাকায় বিক্রি করে, সেই মাল আমরা মিনিমাম পঞ্চাশ, ম্যাক্শিমাম্ পঁচাত্তরে বিক্রি করি।

ঠিক তাই।

এবার হিসাব করো, ওবা এই ক'দিনে প্রায় হাজার খানেক পিস বিক্রি করেছে। আর আমরা শো কেস ঝেড়েছি। কাউন্টারে বসে মাছি মেরেছি। এবার তার সাঙ্গ হ'ল।

পঞ্চাশ বছর বলল, কিন্তু আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী, শপওনার চেয়েছিল, ওদের উলেন গারমেন্টস সব সস্তা দামে কিনে নিয়ে, নষ্ট করে ফেলবে।

বৃদ্ধ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ, সেটাও করা যেত, কিন্তু সেটা হ'ত সাময়িক সমাধান, ওরা আবার ঘাড়ে মাল নিয়ে আসত। কিন্তু যা ঘটল, এর পরে ওরা আর বহুকাল এমুখো হতে সাহস পাবে না, তাই নয় কী?

পঞ্চাশ বছর মুগ্ধ শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে বলল, এব কোনো তুলনা হয় না।

বৃদ্ধ বলল, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, একটি শিশুর প্রাণহানি আর কিছু লোকের মার খাওয়ার জন্য। কিন্তু আমি মনে করি, এটা ঈশ্বরেরই অভিসন্ধি। আমি নিমিত্ত মাত্র। ক'দিন ধরে খেতে আর ঘুমোতে পারি নি, চলি। বাজাব কেমন?

এইমাত্র একটু ভাল হতে আরম্ভ কবেছে।

কাল থেকে স্বাভাবিক অবস্থা দেখা দেবে।

বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালো, ব্রাকেট থেকে টুপি নিয়ে মাথায় চাপিয়ে, ছড়ি পেড়ে নিয়ে, দরজার দিকে এগোলো।

# স্বর্ণমৃগ

## নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কিরীটির গড়িয়াহাটার বাড়িতে তার বসবার ঘরে বসে ইদানীং কলকাতা শহরে যে সোনার চোরাকারবার চলেছে তাই নিয়েই কথা হচ্ছিল।

কিরীটি বলছিল, সারা পৃথিবী জুড়েই সোনার মাধ্যমেই আসল লেনদেনটা চলে, কাজেই সোনার অত চোরা কারবার দেশে দেশে, এবং সেই কারবারে নতুন নতুন উপায় চোরা কারবারীরা মাথা খাটিয়ে বের করেছে। কলকাতা থেকে কায়রো, সেখান থেকে লন্ডন, সেখান থেকে আমেরিকা, মাঝখানে নেপাল ও কাবুলও আছে, বিরাট একটা চেইন স্মাগলারদের, একজন দু'জনকে কদাচিৎ হাতে নাতে ধরা গেলেও চেইনটা ধরা সম্ভব নয়, কেউ তা পারবে না।

হঠাৎ ঐ সময় ঘরের কোণে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

কৃষ্ণাই উঠে গিয়ে ফোনটা ধরলো, কে সুদর্শন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আছে তোমার দাদা, তোমার ফোন, সুদর্শন ডাকছে, কৃষ্ণা কিরীটির দিকে তাকিয়ে বলল।

আমি বললাম, আমাদের সুদর্শন মল্লিক?

কৃষ্ণা বললে, হ্যাঁ, ও তো এখন লাল বাজারে।

কিরীটি ততক্ষণে উঠে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়েছে, কি খবর সুদর্শন, য়্যাঁ তাই নাকি, ওয়াংচুকে তো আমি ভাল করেই জানি, দিন কুড়ি আগেও তো তার ওখানে গিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই, হ্যাঁ, আসছি কিরীটি ফোনটা রেখে দিল।

আমি শুধালাম, কি ব্যাপার রে?

সু-মেকার ওয়াংচুকে তোর মনে আছে সুব্রত?

হ্যাঁ, কি হয়েছে তার?

লোকটাকে তার বেন্টিক স্ট্রীটের দোকানের মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, নৃশংসভাবে কেউ হত্যা করে গিয়েছে লোকটাকে।

বলিস কি? লোকটা চীনাম্যান হলেও ভাল ছিল।

আসলে ও তো ঠিক পুরোপুরি চাইনিজ নয়, তুই বোধহয় জানিস না, ওর মা ছিল চাইনিজ মেয়ে, আর বাপ, পাঞ্জাবী এক মুসলমান। ওর মা'র প্রথম স্বামী মারা যাবার পর ঐ পাঞ্জাবী মুসলমানকে ওর মা বিয়ে করে। লোকটার শুনেছি লাহোরে জন্ম, তাদেরও জুতোর দোকান ছিল—বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে কলকাতায় চলে আসে, ভাল কারিগর; ওয়াংচুর মা'র সঙ্গে

পরিচয় হয়—তার স্বামী তখন মারা গিয়েছে, সে একাই দোকান চালাচ্ছে পরে ওদের 'প্রেম' হয়।

কৃষ্ণা বললে, তারপর সাদী নিশ্চয়।

হ্যাঁ, সাদীকে বাদ, ওয়াংচু খান। মা'র চীনা রক্ত ও বাপের পাঞ্জাবী রক্ত দুটোকেই স্বীকৃতি—

আমি বললাম অভিনব, ব্যাপারটাও জানতাম না এতদিন।

আমার কিন্তু প্রথম থেকেই সন্দেহ হয়েছিল, কিরীটি বলতে থাকে, ওকে দেখে, ওর চেহারায়, গায়ের রং চীনের মতো চ্যাপটা মুখ মঙ্গোলিয়ান টাইপ, অথচ বেঁটে নয় লম্বা, সুঠাম দেহ। তাই একদিন তাকে কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করায় ওয়াংচু খান তার জন্মবৃত্তান্ত আমাকে বলেছিল—চলি আমি।

আমিও যাব তোর সঙ্গে। বললাম আমি।

কিরীটি বললে, চল।

ওয়াংচু খান সত্যিই ভাল জুতোর কারিগর ছিল। খরিদ্দারের পছন্দ মাফিক জুতো তৈরী করতে পারত বলে তার কিছু বড় বড় বাঁধা খরিদ্দার ছিল।

লোকটাও ভাল, মিষ্টভাষী আর একটু খেয়ালী এবং বিয়ে করেছিল আবার এক বাঙালী মুসলমান মেয়েকে।

ছেলে পিলে হয় নি, স্বামী স্ত্রীর সংসার। কোনো ঝামেলা ছিল না।

বেন্টিক স্ট্রীটে ওর মায়ের দোকানটা একসময় খুব জমজমাট ছিল, কিন্তু ইদানীং কয়েক বছর ধরে দোকানের কোনো জৌলুসই যেন ছিল না।

কতকগুলো ভাঙা পুরানো আলমারি, শো-কেসগুলোও ভাঙা ধুলি মলিন এবং বলতে গেলে প্রায় শূন্য সবগুলোই।

একদিন কিরীটি বলেছিল, ওয়াংচু সাহেব, তোমার দোকানের এ হাল হচ্ছে কেন?

চমৎকার বাংলা বলতো ওয়াংচু। বললে, ভাল লাগে না আর জুতো সেলাই করতে।

সেকি হে জাত ব্যবসা তোমার—

না বাবুজী, মেসিনের দৌলতে আর হাতে তৈরি জুতোর চাহিদা আজকাল আর তেমন নেই, খরিদ্দারই পাওয়া যায় না! ঐ আপনারা যা দু'চারজন আসেন দু'চারজন পুরোনো খদ্দের।

সপ্তাহে হয়ত এক জোড়া বা দু'জোড়া জুতো তৈরি করতো ইদানীং ওয়াংচু, যার দোকানে এক সময় শো-কেস ভর্তি থাকতো নানা ধরনের জুতো সাজানো, তিনজন কারিগর কাজ করতো দিনরাত, সেখানে এখন একা কারিগর ওয়াংচু।

কিরীটির গাড়িতে বসে বেন্টিক স্ট্রীটের দিকে যেতে যেতে ঐ কথাগুলোই ভাবছিলাম আর কিরীটি নিঃশব্দে বসে পাইপ টানছিল।

লোকটা যতদূর জানি নিরীহ টাইপের, আপন মনে দোকানে বসে একা একা ঠুকঠাক কাজ করতো, অভাবও বড় একটা ছিল বলে মনে হয় না, হয়ত মায়ের জমানো কিছু অর্থ ছিল।

ওর পরিবার রুকন্নেশাও শান্ত-শিষ্ট প্রকৃতির।

কালো গায়ের বর্ণ, পাতলা দোহারা চেহারা, হাসিখুশি এবং একটু যেন চনমনে।

স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ভাবও ছিল যথেষ্ট।

তবে হঠাৎ তাকে কে খুন করতে গেল!

কিরীটি গাড়িতে উঠেই বলেছিল, একটা ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে কে যেন ওর গলাটা একেবারে চিবে দিয়ে গিয়েছে।

ওর স্ত্রী ভিতরের ঘরে ঘুমিয়েছিল, ও বাইরে দোকানে বসে রাত্রে কাজ করছিল, এক সঙ্গে নাকি চারজোড়া জুতোর অর্ডার পেয়েছিল, দিন পনেরোর মধ্যে দিতে হবে, তাই রাতদিন প্রত্যহ কাজ কবছিল।

বেন্টিক স্ট্রীটের উপরেই, লালবাজারের একেবারে কাছাকাছি লিংফু সু শপ।

সামনে দিয়ে ট্রাম লাইন চলে গেছে।

দোকানের সামনে কয়েকজন লাল পাগড়ি মোতায়েন ছিল।

তাদেরই একজনকে প্রশ্ন করল কিরীটি, মল্লিক সাহেব কাহা?

যাইয়ে হুজুর ভিতর মে।

কিরীটিকে যে বললে ভিতরে যেতে সে চিনত ওকে।

ভিতরে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালাম।

বেশ বড় দোবান ঘরটা, চারিদিকে ভাঙা আলমারি, ও শো-কেস প্রায় শূন্যই সবগুলো।

মেঝেতে পড়ে আছে রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহটা ওয়াংচুর।

লম্বা গভীর একটা ক্ষত গলায়, ডানদিক ঠিক চোয়ালের নিচে থেকে একেবারে বাঁ দিককার কণ্ঠা পর্যন্ত।

গেপিং উণ্ড এবং মারাত্মক।

বোঝা যায় ঐতেই তার মৃত্যু হয়েছে।

সুদর্শন কিরীটিকে দেখে বলল, এই যে আসুন দাদা, দেখুন কি বীভৎস।

বীভৎস সন্দেহ নেই।

মৃতদেহের সামনে কিছু যন্ত্রপাতি ছড়ানো, কিছু চামড়া আর পাঁচ সাত জোড়া জুতো ছত্রাকার হয়ে পড়ে আছে, প্রত্যেকটাব সোল এবং হিল এলোমেলোভাবে কাটা।

সবগুলোই নতুন জুতো দেখলেই বোঝা যায়।

কিরীটি নিঃশব্দে একটা জুতো তুলে নিয়ে দেখতে লাগল। কোনো ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে জুতোর হিল ও সোলের সেলাই কেটে ফেলা হয়েছে যেন মনে হয়।

জুতোটা মাটিতে রেখে দিয়ে কিরীটি এবারে ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো, হঠাৎ নিচু হয়ে মেঝে থেকে তুলে নিল একটা পোড়া সিগারেটের শেষাংশ।

চোখের সামনে ধরে সেটা দেখতে লাগল।

সুদর্শন!

কিছু বলছিলেন দাদা?

হ্যাঁ, দেখ তো এটা।

সিগারেটেব শেষাংশ।

হ্যাঁ, বিলিতী সিগারেট ৫৫৫ ব্র্যাণ্ডের—

তাই নাকি?

হ্যাঁ আরো আছে, গোড়াটা এর দেখ, একটা লালচে ছোপ রয়েছে, সম্ভবতঃ যে এই সিগারেটটা টানছিল তার মুখে পান ছিল।

পান।

হ্যাঁ, পানের রস লেগে আছে। ভাল কথা রুকন্নেশা কোথায়?

ভিতরের ঘরে।

তাকে ডাক তো।

সুদর্শন গিয়ে রুকন্নেশাকে দোকান ঘরে ডেকে নিয়ে এলো। পরনে একটা মলিন পায়জামা আর কামিজ, মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো, দুচোখ লাল ও ফোলা ফোলা। বেচারি বোধহয় কাঁদছিল।

রুকন্নেশা!

জী?

তুমি কিছুই জান না?

নেহি।

কাল কখন তুমি শুতে যাও?

রাত দশটার পর। ও বললে, রাতে ও কাজ করবে, তাই আমি শুতে চলে গিয়েছিলাম, তারপর ঘুমিয়ে পড়েছি।

কখন জানতে পারলে ব্যাপারটা?

ভোর রাতে উঠে দেখি ও বিছানায় নেই। ভাবলাম, বোধহয় এখনো কাজ করছে। এক কাপ চা তৈরি করে ঘরে ঢুকে দেখি, রুকন্নেশা আর বলতে পারল না।

কান্নায় ওর গলার স্বরটা বুজে এলো।

তুমি মল্লিক সাহেবকে বলেছ, ওয়াংচু কতকগুলো নতুন জুতোর অর্ডার পেয়েছিল?

জী, পাঁচ জোড়া নতুন জুতোর সব একই সাইজের এবং কালো চামড়ার।

কে অর্ডার দিয়েছিল জুতোর, জান কিছু? কিরীটির প্রশ্ন।

না। তবে—

তবে।

দিন কুড়িক আগে একজন একটা দামী গাড়িতে চেপে ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমার মনে হয় সেই অর্ডার দিয়ে গিয়েছিল, কারণ আর তো কাউকে ইতিমধ্যে আসতে দেখি নি দোকানে।

লোকটা দেখতে কেমন?

বেঁটে, ফর্সা, পরনে দামী সুট ছিল।

মুখটা কিরকম দেখতে ছিল?

এদেশের লোক নয় বলেই মনে হয়—কোনো বিদেশী।

ঐ একবারই এসেছিল?

না, বোধহয় পরশু সন্ধ্যায় সে এসেছিল—

দেখেছিলে তুমি তাকে?

না।

তবে জানলে কি করে সে এসেছিল?

আমি বাজারে গিয়েছিলাম। দোকানের কাছাকাছি যখন এসেছি, দেখলাম সেই গাড়িটা আমাদের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আর ওয়াংচু গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। আমি দোকানের দরজায় পৌঁছোবার আগেই গাড়িটা ছেড়ে চলে যায়।

রুকন্নেশা। আবার কিরীটি প্রশ্ন শুরু করে।

জী।

তোমার স্বামী সিগারেট খেত?

না তো! তবে মাঝে মাঝে—

চণ্ডু খেত, তাই না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা ইদানীং তো ওয়াংচু বিশেষ কাজ কারবার করতো না, তোমাদের চলত কি করে?

বোধহয় ওর কাছে কিছু জমানো টাকা ছিল।

কি করে বুঝলে।

ওর একটা স্টীলের ক্যাশ বাক্স আছে, তা থেকেই মাঝে মাঝে টাকা বের করে নিত।

বাক্সটা আনতে পার একবার?

রুকন্নেশা চলে গেল ভিতরে এবং একটু পরেই একটা রং চটা পুরাতন ছোট ক্যাশ বাক্স হাতে ঘরে এসে ঢুকল।

বাক্সটার চাবি কোথায়? কিরীটি শুধালো।

চাবি তো ওর কাছেই থাকত।

সুদর্শন ঐ সময় পকেট থেকে একটা চাবির রিং বের করে কিরীটির দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, দাদা, এটা ওয়াংচুর জামার পকেটে ছিল দেখ তো এটা হতে পারে।

দেখ তো ওই চাবির কোনোটা দিয়ে বাক্সটা খোলা যায় কিনা সুদর্শন, কিরীটি বললে।

কয়েকটা চাবি ট্রাই করতেই একটা চাবিতে খুলে গেল বাক্সটা।

উপরের ডালাটা খুলতেই আমাদের সকলের নজর পড়ল।

কয়েকটা কারেন্সী নোটের বাণ্ডিল।

অনেক টাকা আছে বলে মনে হচ্ছে দাদা, সুদর্শন বললে।

দেখ তো গুণে কত।

গোনা হ'ল, পাঁচ হাজার টাকার একশ টাকার সব নম্বরী নোট, পাঁচটা বাণ্ডিল হাজার করে। সব নোটগুলোই নতুন।

সুদর্শন!

দাদা?

কিছু বুঝতে পারছো—কোনো অনুমান।

না দাদা।

বুঝতে পারছো না, ঐ কারেন্সী নোট, এই সোল, আর হিল কাটা নতুন জুতোগুলো, আর ঐ ৫৫৫ পোড়া সিগারেটের টুকরো।

কোনো চোরাই জিনিস কি?

মনে হয় তাই, সুদর্শনের কথার জবাবে কিরীটি বললে, ঐ নতুন তৈরি জুতোগুলোর কাটা হিল ও সোলের মধ্যে কোনো মূল্যবান চোরাই বস্তু ছিল। কিন্তু কি, কি থাকতে পারে?

কোনো দামী জুয়েলস নয় তো দাদা?

মনে হয় না।

হঠাৎ একটা কথা আমার মনে হয় বলি, কিরীটি, সোনার পাত হতে পারে হয়ত।

ঠিক বলেছিস সুব্রত, সম্ভবতঃ ঐরকমই কিছু, কিন্তু আততায়ী জানল কি করে ব্যাপারটা যে, জুতোর সোলটার বা হিলের মধ্যে মূল্যবান কোনো বস্তু আছে। কিরীটিকে যেন কেমন অন্যমনস্ক চিন্তিত মনে হয়।

সুদর্শন, কিরীটি সুদর্শনকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিস্ ফিস্ করে ইংরাজীতে বলে—

দাদা!

এই দোকানটার ওপরে অলক্ষ্যে তোমাকে ক'টা দিন constant watch রাখতে হবে। কারণ আমার মনে হয়—

কি দাদা?

যে জুতোর অর্ডার দিয়েছিল সে হয়ত এখনো কিছু জানে না। কাজেই জুতোর delivery নিতে সে হয়ত আসবে। সেই গাড়ির আরোহী—

সেই মতোই ব্যবস্থা করে মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করে, আমরা ফিরে এলাম। তারপর তিন দিন.কোনো সংবাদ নেই—

হঠাৎ চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় কিরীটির ঘরের ফোনটা ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল।

কিরীটি দ্রুত উঠে গিয়ে ফোনটা ধরল।

হ্যালো। কে—বিনয়, কি ব্যাপার? কি বললে, ইন্টার ন্যাশন্যাল এয়ারপোর্ট—হ্যাঁ এখুনি আসছি—You follow the car—don't miss it for a moment.

আমি ঐ দিন রোজকার মতো বিকেলেই কিরীটির ওখানে এসেছিলাম—এবং বার তিনেক চা পর্বের পরে আমি কিরীটি ও কৃষ্ণা তিন জনে বসে গল্প করছিলাম।

সুদর্শন ফোন করছিল?

না তার ম্যাসেজ—সুব্রত—যাবি তো চল, ইন্টারন্যাশন্যাল এয়ারপোর্ট।

রাত নয়টা।

ইন্টারন্যাশন্যাল এয়ারপোর্ট দমদম।

লাউঞ্জেই সুদর্শনের সঙ্গে দেখা হ'ল। চোখের ইশারায় আমাদের সে একপাশে যেতে বলল।

এগিয়ে গেলাম আমরা।

গাড়িটা গিয়েছিল ওয়াংচুর জুতোর দোকানে সামনে।

তারপর—

ঠিক সেই রকম একটি লোক রুকন্নেশার বর্ণনা মতো—

তার পর কি হ'ল বলো।

প্রায় মিনিট পনেরো বাদে সে বের হয়ে এয়ারপোর্টের দিকে যেতেই গাড়ি নিয়ে আমি ওয়্যারলেস ভ্যান থেকে লালবাজার কন্ট্রোল রুমে সংবাদ দিয়ে আপনাকে ফোনে ম্যাসেজটা দিতে বলি।

গাড়ির আরোহীটি কই?

কাস্টমসের কাউন্টারে এই মাত্র ঢুকেছে।

ঐ কাউন্টারে যাবার ভিতর দিক দিয়ে কোনো পথ নেই? কিরীটি শুধালো।

আছে, দোতলা থেকে সিঁড়ি আছে।

চল, quick ভাল কথা foreign flight ক'টায়? কোথায় যাচ্ছে?

নয়টা চল্লিশে একটা ফ্লাইট আছে, এখান থেকে বম্বে, তারপর বেইরুট, সেখান থেকে ফ্রাংফুর্ট—লন্ডন—নিউইয়র্ক।

সিঁড়ি দিয়ে সুদর্শনের সঙ্গে আমরা কাস্টমস কাউন্টারে নেমে এলাম।

কয়েকজন অফিসার মালপত্র চেক করছেন।

কিছু যাত্রী মেয়ে-পুরুষ তাদের সামনে মাল খুলে খুলে তাদেব নির্দেশমতো চেক করাচ্ছে—

কোথায় সেই ভদ্রলোক? কিরীটি ফিস ফিস করে শুধায়।

ঐ যে, ঐ যে বারখা পরা মহিলাটি সামনে দাঁড়িয়ে।

দেখলাম, টিপটপ সুট পরিহিত একজন লোক, হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ, মুখে সিগারেট—

চল।

আমরা এগিয়ে গিয়ে চেকিং অফিসারের পিছনে দাঁড়ালাম একটু আড়ালে।

যে ভদ্রলোকের মালপত্র চেকিং হচ্ছিল তার পরই সেই লোকটি এগিয়ে এলো। একটি ছোট সুটকেস ও একটা বড় চামড়ার ব্যাগ।

সব খুলে পরীক্ষা করা হ'ল।

কিছু সন্দেহজনক নেই—

কিরীটির পরামর্শ মতো সুদর্শন চেকিং অফিসারের কানে কি যেন বললে।

চেকিং অফিসারটি তখন সেই লোকটিকে বললে, উনি আপনার সঙ্গেই যাচ্ছেন তো।

My wife, না, আমাকে সি-অফ করতে এসেছেন।

ওর হ্যাণ্ড ব্যাগটা দেখব।

লেডিজ ব্যাগে কি পাবেন, বললে।

তবু দেখান।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই বোরখা পরা মহিলাটি ছুটে যায় গেটের দিকে, কিন্তু পালাতে পারে না। হৈ চৈ করে তাকে ধরে ফেলা হয়।

এবং তাকে সার্চ করতেই তার হ্যাণ্ড ব্যাগ থেকে দশটা সোনার পাত পাওয়া গেল। দাম অন্ততঃ যার কম করে দুই লক্ষ টাকার হবেই।

সুদর্শন, চিনতে পারছো বোরখা পরিহিতাকে?

কে?

উন্মোচন কর বোরখা, ওয়াংচু গৃহিণী, আমাদের রুকন্নেশা বিবি।

বিস্ময়ের সঙ্গে বোরখা উন্মচিত হতেই দেখা গেল সত্যিই রুকন্নেশা।

বাড়ি ফেরার পথে।

কিরীটি বলছিল, দুটো ব্যাপারে প্রথম থেকে আমার খটকা লাগে সুব্রত।

কি?

প্রথমতঃ অমন একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড পাশের ঘরে রাত্রে ঘটে গেল, অথচ রুকন্নেশা তার বিন্দু বিসর্গও জানতে পারল না তাই বা কেমন করে সম্ভব। মানুষের ঘুম যতই গভীর হোক, ঠিক একেবারেই পাশের ঘরে ঘুমিয়ে ছিল, যদি অবিশ্যি তার কথাই সত্য বলে মেনে নিই, কোনো শব্দ বা কোনো চিৎকার শুনতে পাবে না, ব্যাপারটা সর্বপ্রথম আমার মনে সন্দেহ জাগায় ঐ দিনই সব দেখে শুনে।

আরো একটা ব্যাপারে তোর খটকা লেগেছে বলছিলি। বললাম আমি।

হ্যাঁ, একবার ভাল করে ভেবে দেখ অতগুলো সোনার পাত জুতোর সোলের মধ্যে সেলাই করেছে ওয়াংচু টাকার বিনিময়ে, অথচ রুকন্নেশা সেটা ঘুণাক্ষরেও নাকি জানতে পারে নি, সেটা অবিশ্যি নতুন জুতোর সোলগুলো এবড়ো খেবড়ো ভাবে কাটা হয়েছে দেখেই ওই সোলের মধ্যে কিছু ছিল আমার বদ্ধ ধারণা হয় এবং সেটা রুকন্নেশা না জানতে পারে যদি অত্যন্ত গোপনে ব্যাপারটা ওয়াংচু করে থাকে, কিন্তু তখুনি আমার মন যেন বলেছিল, সত্যিই যদি তাই হয়ে থাকে তো রুকন্নেশা সর্বক্ষণ ঐ বাড়িতে আছে এবং যে তার স্ত্রী তার পক্ষে ব্যাপারটা হঠাৎ কোনো এক সময় দেখে ফেলাটা কি খুবই কিছু আশ্চর্য একটা, তাই মনে হয়েছিল রুকন্নেশা ব্যাপারটা যে ভাবেই হোক জেনেছিল। পরে ওয়াংচুকে হত্যা করবার পর এবড়ো খেবড়ো ভাবে সোলগুলো কেটে সোনার পাতগুলো বের করে নিয়েছে এবং সেই লোভেই জুতোর হিলগুলোও কেটেছিল। আর সিগারেটের টুকরোটা সম্ভবতঃ রুকন্নেশাই মেঝেতে রেখেছিল পুলিশকে misliad করতে। ওয়াংচু হিল ও সোলগুলে কাটে নি এবং যে তাকে ঐ কাজ করতে দিয়েছিল সেই যদি শেষ পর্যন্ত ওয়াংচুকে হত্যা করে থাকে, তার পক্ষেও ঐখানে বসেই জুতোর হিল ও সোলগুলো কাটা সম্ভব নয়। সে তো জুতোগুলো নিয়ে অনায়াসেই সরে পড়তে পারত, যদি সে ওয়াংচুকে হত্যা করেই থাকে, তাই, আমার মনে হয়েছিল there must be some third person. ফলে সঙ্গে সঙ্গে সর্বপ্রথম যার উপর আমার সন্দেহ হয় সে ঐ রুকন্নেশা। আর তাই সুদর্শনকে সেইদিনই বলছিল ওই বাড়িটা ও রুকন্নেশার উপরে নজর রাখতে। কারণ তৃতীয় ব্যক্তি ঐ ব্যাপারে যদি কেউ লিপ্ত থেকে থাকেও বাইরের তার রুকন্নেশার সঙ্গে নিশ্চয়ই যোগসাজস ছিল। তাছাড়া—

যদি সে তৃতীয় জন ঐ ঘটনার মধ্যে জড়িত কেউ থাকে সে যেমন নিশ্চয়ই আবার শীঘ্রই কখনো রুকন্নেশার কাছে আসবে, তেমনি যে ও কাজ ওয়াংচুকে করতে দিয়েছিস সেও জুতোগুলোর ডেলিভারী নিতে আসবেই আর দেখলি তো তাই হ'ল শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু রুকন্নেশা অমন নৃশংসভাবে হত্যা করল কি করে ওয়াংচুকে?

সম্ভবতঃ অর্তকিতে পিছন থেকে এসে যখন ওয়াংচু কাজের মধ্যে ডুবে ছিল তার অজ্ঞাতে।

ধরা পড়লেও হঠাৎ কোনো ক্ষতি ছিল না। ওয়াংচু তো ভাবতে পারত না তার স্ত্রী তাকে হত্যা করতে পারে। তাহলেই বুঝে দেখ, রুকন্নেশার পক্ষে ওয়াংচুকে হত্যা করা যত সহজ ছিল, অন্যের পক্ষে হয়ত ততটা সহজ সাধ্য ছিল না। কারণ তাকে আসতে হলে সদর দরজা দিয়েই আসতে হ'ত এবং সদর দরজাটা দোকানের নিশ্চয়ই ওয়াংচু অত রাত্রে খুলে রাখে নি, পুলিশের কাছে রুকন্নেশা বলেছিল। সদর দরজাটা নাকি বন্ধই ছিল। যখন সে ওয়াংচুকে মৃত্যু আবিষ্কার করে কথাটা বলে সে নিজের ছিদ্র নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছিল ভাবতে পারে নি।

কিন্তু কি দিয়ে হত্যা করেছে বলে তোর মনে হয়?

লক্ষ্য করেছিলি কিনা কখনো জানি না, চামড়া কাটার জন্য এক ধরনের ধারালো অস্ত্র অনেকটা কাস্তের মতো ব্যবহৃত হয়, সম্ভবতঃ সেই রকম কোনো অস্ত্রের সাহায্যেই ওয়াংচুকে রুকন্নেশা হত্যা করেছিল সে রাত্রে। তারপর সেটা সরিয়ে ফেলে। আমার বিশ্বাস রুকন্নেশার রক্তমাখা জামা কাপড়ও ঐ বাড়িতে কোথাও পাওয়া যাবে। সুদর্শনকে বলে এসেছি সার্চ করে দেখতে।

বুঝলাম সবই কিন্তু একটা ব্যাপারে আমার কেমন খটকা লাগছে এখনো।

কি?

রুকন্নেশা শেষ পর্যন্ত ঐ স্মাগলারটার সঙ্গে পালাচ্ছিল কেন।

সম্ভবতঃ লোকটা যখন মালের delivery নিতে আসে রুকন্নেশার কথা সে বিশ্বাস করতে পারে নি এবং তখনি হয়ত চাপে পড়ে রুকন্নেশাকে সব স্বীকার করতে হয়।

তা যেন হ'ল কিন্তু ওর সঙ্গে পালাচ্ছিল কেন?

পালাতে পারবে কেন? Air ticket হলেই হবে না, pass port পাবে কোথায়? স্ত্রী পরিচয়ে রুকন্নেশা কাস্টমস কাউন্টারে ঢুকতে পেরেছিল, এবং হয়ত লোকটাকে বলেছিল প্লেনে উঠবার আগে টাকা পেলে তাকে সে মাল ফিরিয়ে দেবে কিন্তু তার—

কি?

কিন্তু হয়ত রুকন্নেশা বুঝতে পারে নি, যে লোকটা প্রথম থেকেই ওকে কলা দেখাবার চেষ্টা করেছে আর আমার ধারণাও তাই। আর সেই জন্যই হয়ত সে বলেছিল payment করবে সে airport-এ। যে কারণ সেখানে যদি সে রুকন্নেশাকে কলা দেখায়ই রুকন্নেশার চুপ করে কিল খেয়ে কিল হজম করা ছাড়া তার গত্যান্তর ছিল না।

আশ্চর্য। টাকার জন্য মেয়েটা তার স্বামীকে হত্যা করল?

কিরীটি মৃদু হেসে বললে, স্বর্ণমৃগ বড় বিচিত্র বস্তু বন্ধু। ভেবে দেখ রামায়ণে সুর্পণখার নাক কান কাটা গেল। মারীচ নিধন হ'ল—রাবণ বংশ নিধন হ'ল, আপনি মজিল মজাল লঙ্কায়, রামচন্দ্র জানতেন তাই সীতাকে ঐ মৃগর ব্যাপার নিষেধ করেছিলেন কিন্তু স্ত্রী বুদ্ধি মানল না। সে নিষেধ এখানেও তাই হ'ল, ওয়াংচু নিহত হ'ল লোকটা ধরা পড়ল। রুকন্নেশারও হত্যাপরাধে হয় ফাঁসি না হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে। কিরীটি থামল।

আমাদের গাড়ি তখন সি. আই. টি রোড ছাড়িয়ে পার্কসার্কাস ময়দানকে বাঁয়ে রেখে ঘুরে আমীর আলি এভিনিউর দিকে ছুটেছে।

রাত তখন প্রায় এগারোটা বাজতে চলেছে।

# গণ-গল্প

## পঞ্চানন ঘোষাল

মানুষ যখন ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের কোনো ব্যবহার অপছন্দ করে, কিন্তু তাদের অসহায় অবস্থার জন্য তার কোনো প্রতিকার করতে অপারক হয়, তখনই তারা তাদেরকে উপহাস করে বহু বিদ্রূপাত্মক গণ-গল্প রচনা করে ও ঐগুলি মুখে মুখে রাজ্যের দূর দূরান্তরে গ্রামে-গঞ্জে ও নগরে প্রচার করে। প্রতিটি দেশে বিশেষ বিশেষ যুগে সমাজে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় ও জনগণকে উত্যক্ত করে। প্রতিকারে অক্ষম জনগণ ঐ সকল সমস্যা সম্পর্কীত বহু বিদ্রূপাত্মক গণ-গল্প মুখে মুখে রচনা করে তা জনসমাজে প্রচারিত করেছে। ঐ সকল গণ-গল্পের রচয়িতা একজন নয়। বহুজন দ্বারা ঐগুলি রচিত হয়েছে। এ জন্য রচয়িতার নাম কেহ জানে না। কিন্তু স্রষ্টার নাম অজ্ঞাত থাকলেও সৃষ্টির শক্তি অক্ষুন্ন থাকে। এই গণ-গল্পগুলি রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের পক্ষে সাবধান বাণী রূপে গৃহীত হওয়া উচিৎ। কারণ—উহা হতে বুঝা যাবে যে জনমানস বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পছন্দ করছে না। যে কোনো সময় উহা জন বিক্ষোভে পরিণত হবে। ঐ গুলি তাদের পক্ষে সাবধান-বাণী রূপে বিবেচিত হওয়া উচিৎ এবং জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ার পূর্বে তার প্রতিকার করা উচিৎ। ঐ সকল গণ-গল্পের স্বরূপ হতে ঐগুলি কোন্ যুগে ও কি জন্য রচিত হয়েছে তা অবগত হওয়া যায়।

যুদ্ধ প্রকৃত পক্ষে কেহ পছন্দ করে না। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নেতাদের ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিকারও সম্ভব নয়। এমন কি বহু সৈনিকরা পর্যন্ত যুদ্ধ এড়াতে চায়। কিন্তু কঠোর নিয়মতান্ত্রীকতার নিষ্পেষণে তারা অসহায়। এজন্য প্রতিবাদে তারা যুদ্ধক্ষেত্রেই বহু গণ-গল্প রচনা করেছে। উদাহরণ স্বরূপ উহাঁদের রচিত একটি গণ-গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল। গল্পটি বিগত মহাযুদ্ধ কালে আমি ব্রিটিশ সৈনিকদের ক্লাবে জনৈক সৈনিকের মুখে শুনেছিলাম।

এক ব্যক্তি ডাক্তারের নিকট এসে জানাল, স্যার। আমার ব্রেনটা বিকল হয়েছে। ওটা মেরামত করতেই হবে। তাই নাকি! ডাক্তারবাবু বললেন ঠিক আছে, ব্যবস্থা করছি। এর পর ডাক্তারবাবু অপারেট করে তার মস্তকের খুলি হাতে ব্রেন বার করে স্প্রিট ভরা কাঁচের জারে ভর্তি করে লোকটিকে বললেন, আমি তোমার ব্রেনটা মেরামত করে রাখব। তুমি সাত দিন পরে ওটা নিয়ে যেও। লোকটা চলে গেল। এরপর প্রায় একমাস পার হয়ে গেল। কিন্তু লোকটা ভুলেও আর ডাক্তারখানাতে আসে না। একদিন ঐ ডাক্তারবাবুর সঙ্গে লোকটির শহরের বাজারে দেখা হ'ল। ডাক্তারবাবু তাঁকে বললেন, কৈ হে, তোমার ব্রেনটা তো আমি মেরামত করে রেখেছি, তুমি ওটা নিয়ে গেলে না কেন? ঐ লোকটা তখন নির্লিপ্তভাবে উত্তর

দিল, আজ্ঞে ওটা আমার আব দরকার নেই। কারণ, আমি ইতিমধ্যে সামরিক (আর্মীতে) বিভাগে ঢুকে পড়েছি।

অধীন দেশগুলিতে বিদেশী শাসকরা জনগণ প্রেরিত পত্রাদি প্রায় সেন্সার করার জন্যে গোপনে খুলে পড়ে থাকেন। এই ব্যাপারে ডাকঘরগুলির সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পুলিশের যোগ-সাজস থাকে। কিন্তু এইরূপ অন্যায় আচরণ ও ব্যবস্থা অধীন জনগণ কোনো দিনই পছন্দ করেননি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে ভারত ও আয়ারল্যাণ্ড সমভাকে পরাধীন ও তৎসমেত বিদ্রোহম্মুখ ছিল। কিন্তু তা সত্বেও তৎ তৎ দেশীয় বহু ব্যক্তি ব্রিটিশ প্রভুদের পক্ষে ঐ মহাযুদ্ধে যোগদানও করেছে। ঐ সময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট স্বপক্ষীয় আইরীশ সৈন্যদের উপর নজর রাখার জন্য অদের পত্রাদি সেন্সর করা সমীচিন মনে করতেন। ফলে, অসহায় আইরীশ সৈন্যরা বহু গণ-গল্প প্রচাব কবে ঐ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে। এইরূপ একটি গণ-গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল।

জনৈক আইরীশ অফিসার ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে আয়ারল্যাণ্ড হতে একদিন একটি পত্র পেলেন। তাতে তাঁর স্ত্রী অনুযোগ করে লিখেছেন—ওগো এ তো বড় মুশকিল হ'ল। দেশে শক্ত সামর্থ্য যুবকের দল ও কৃষককুল তো সকলেই যুদ্ধের কাজে ব্যস্ত। এবার বোধহয় আর আলু চাষ হ'ল না, আমরা মেয়েরা না হয় আলু বুনে দিতে পারি। কিন্তু পুরুষরা না হলে জমিটা চষবে কারা? ঐ সৈনিক তাঁর স্ত্রীর নিকট হতে পাওয়া পত্রটি পাঠ করতে করতে মাত্র একটুকু সময় ভাবলেন, উত্তর লিখলেন—খবরদার! ঐ জমিতে এবার যেন কোনো চাষ-আবাদ না করা হয়! কারণ, আমার বিপ্লবী বন্ধুরা ঐ জমির বিবিধ স্থানে বহু মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র পুঁতে রেখেছে। ওর পরের সপ্তাহে ঐ সৈনিক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীর নিকট হতে অপর আর একটি পত্র পেয়েছিলেন। তাতে উনি লিখেছিলেন—ওগো! কাল থেকে পুলিশ ট্যাক্টারের সাহায্যে আমাদের সব জমিটা খোঁড়া-খুঁড়ি শুরু করেছে। আমি তো এই ব্যাপারে কিছুই বুঝতে পারছি না। এর পর ঐ সৈনিক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে এইরূপ একটি উত্তর পাঠালেন—তোমার বুঝবার কিছু দরকার নেই। ওরা চলে গেলেই তোমবা আলু বুনে দিও।

প্রথম মহাযুদ্ধে একটি বাঙালি পল্টন গঠন করা হয়েছিল। তাঁদের কেউ কেউ তর্কবহুল ছিলেন। বহুক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের ইংরাজ অফিসারদের অপেক্ষা নিজেদেরকে অধিক বুদ্ধিমান মনে করতেন ও তদনুরূপ কার্য করে প্রায়ই বিভ্রাট ঘটাতেন। তাঁদের ইংরাজ অফিসারগণ উহা পছন্দ করতেন না। বাঙালি পল্টন সম্পর্কে আজও বহু গণ-গল্প ইংরাজ অফিসারদের মধ্যে প্রচলিত আছে। নিম্নে এরূপ একটি গণ-গল্প উদ্ধৃত করা হ'ল।

মেসপটিয়মার রণক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধ চলছে। ওটা ছিল প্রথম মহাযুদ্ধ। তুর্কীরা ভীষণভাবে আক্রমণ শুরু করেছে। আমি বাঙালী সৈন্যদের হুকুম দিলাম পঞ্চাশ গজ এগিয়ে যাও। তারপর গুলি ছোঁড়ো। ওরা নির্বিচারে আমাব হুকুম তামিল না করে বলল, স্যার পঞ্চাশ গজ এগোবার কি দরকার? বাইফেল-এর রেঞ্জ অ্যাডজাস্ট করে পঞ্চাশ গজ বাড়িয়ে নিই না। এতে র‍্যাপিড ফায়ারীং-এর সুবিধা হবে। অবশ্য তারা ঠিকই বুঝেছিল ও বলেছিল আমারই জাজমেন্টটা ভুল হয়েছিল। কিন্তু ওরা ঐ দুঃসময়ে এরূপ তর্ক শুরু করাতে আমাদের অ্যাকশন নিতে দেরী হয়ে যায়। ফলে, তুর্কীরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় পায়। ওদের অনেকে মৃত্যুরমুখে ঢলে পড়ে। আমি নিজেও আহত হই। না মাশাই! আপনাদের বাঙালি রেজিমেন্টের ক্যাম্যাণ্ডে আমি আর নেই।

বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে কলকাতা শহরে বাড়ি ভাড়া পাওয়া অনায়াস সাধ্য ছিল না। ফ্ল্যাটের অভাবে তরুণ তরুণীরা বিবাহ পর্য্যন্ত করতে পারেন নি। একটি ফ্ল্যাট ভাড়া যোগাড় করে দিতে পারলে পাত্রপক্ষ বিনা পণে বিবাহ করতেন। বলাবাহুল্য এই অসুবিধা ও সমস্যা নাগরিকগণ পছন্দ করতেন না। প্রতিবাদ স্বরূপ তাঁরা বহু গণ-গল্প ঐ সময় সৃষ্টি করেছিলেন। ঐ সম্পর্কিত একটি গণ-গল্প নিম্নে উদ্ধৃত করা হ'ল।

জনৈক ভদ্রলোক গড়ের মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে চলেছিলেন। এমন সময় তিনি একটি কাতর আর্তনাদ শুনে পিছনে ফিরলেন ও দেখলেন একজন একটা পুকুরে ডুবে যাচ্ছেন। ঐ প্রায় ডুবে-যাওয়া ভদ্রলোক ওকে দেখে অনুযোগ করে বললেন, মশাই শীঘ্র আমাকে তুলুন আমি ডুবে গেলাম। প্রত্যুত্তরে ডাঙ্গায় দাঁড়ানো ভদ্রলোক বললেন, আজ্ঞে, আপনাকে এখুনি আমি তোলার ব্যবস্থা করছি, কিন্তু তার আগে আপনার বাড়ির ঠিকানা বলুন। ডুবন্ত ভদ্রলোক চীৎকার করে বললেন, অত নম্বর লেক টেম্পল। প্রত্যুত্তরে ডাঙ্গায় দাঁড়ানো ভদ্রলোক বললেন, এইবার নিশ্চিন্ত মনে আপনি ডুবুন। আমি আপনার বাড়িটা এখন ভাড়া নিতে চললাম। এইরূপ বলে ভদ্রলোক কাল বিলম্ব না করে ডুবে যাওয়া লোকটির বাড়িতে এসে অবাক হয়ে দেখলেন, অপর এক ভদ্রলোক লাগেজ ও স্ত্রী-পুত্র সমেত ঐ বাড়িতে ঢুকছেন। উনি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আরে মশাই, বাড়িটা তো এইমাত্র খালি হ'ল; আপনি এত শীঘ্র খবর পেলেন কি করে? ঐ ভদ্রলোক তখন স্মিতহাস্যে তার ঐ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন, আমার আগে আপনি এই খবর পাবেন কি করে? কারণ আমিই তো তাকে ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছিলাম।

ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের উৎকোচ গ্রহণের রীতিনীতি স্বভাবতঃই সাধারণ মানুষ পছন্দ করে না। ঐ সকল অসহায় জনগণ উহার প্রতিবাদে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকার গণ-গল্পের সৃষ্টি করে তা প্রচার করেছেন। ঐগুলি তো অবতারণ করার পূর্বে এই উৎকোচ প্রথা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। এতে বক্তব্য বিষয়টি সম্যকরূপে বোঝা যাবে।

পৃথিবীতে অনাবিল অমঙ্গলের জন্য কোনো কিছুরই সৃষ্টি হয় নি। বিষধর সর্পের বিষ হতেই অমৃত সৃষ্টির সম্ভাবনা। ছত্রপতি শিবাজী ভারতের পূর্ব খণ্ডে পলায়নের কালে স্থানীয় সুবেদার কর্তৃক ধৃত হন। ঐ সময় তিনি বহু মূল্যবান রত্ন তাঁকে উৎকোচ প্রদান করে মুক্তি ক্রয় করেন। অন্যথায় ভারতে মারাঠা সম্রাজ্য স্থাপন সম্ভব হ'ত না। ইতিহাসের বহু গৌরবময় অধ্যায় এইভাবেই রচিত হয়েছে। বহু দুর্বল রাষ্ট্র উৎকোচ দ্বারা শত্রু-রাষ্ট্রের মতিগতি সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সময়ে সাবধান হন।

উৎকোচ মানুষ বহুক্ষেত্রে ন্যায্য কার্য উদ্ধারের জন্যও প্রদান করেছে। নচেৎ তাঁদের বহুভাবে হায়রানি হতে হ'ত। সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাদের বহু অর্থ বেঁচে যায়। কিন্তু, বহু ক্ষেত্রে অসৎ কার্য করার ও করানোর জন্য উৎকোচ দেওয়া হয়েছে। এইখানেই সমাজের অধিকাংশ মানুষের আপত্তি। কিন্তু আজও এই বিষয়ে সমাজের প্রতিটি মানুষ অসহায়। ক্ষমতাসীন ব্যক্তি দুর্নীতিপূর্ণ হলে কিছুকাল মানুষ বহু দুর্ভোগ নীরবে ভোগ করে। অন্যান্য সরকারী বিভাগের দুর্নীতি জনগণ সমবেতভাবে প্রতিরোধ করতে পারে। কিন্তু বিচার বিভাগের দুর্নীতি ঢুকলে তারা তা প্রতিরোধে অক্ষম। বিচার বিভাগের বিশেষ ক্ষমতা তাদের অসহায় করে তুলে। রাষ্ট্রীয় সরকারও ঐ বিষয়ে অসহায়। কারণ কলম ঐ সকল ব্যক্তির হাতে। বিচার বিভাগের উপর আস্থা হারানোর পরই ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। একমাত্র পথও।

উৎকোচের বহু প্রকার উপাদান আছে, নগদ অর্থ, মূল্যবান ও সৌখিন দ্রব্যাদি, নারী, যানবাহনের ব্যবহারের সাময়িক ব্যবস্থা, ফাইফরমাস খাটা, চাটুকারীতা, মদ্য, সুলভে কোনো কিছুর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। এইগুলির মধ্যে নারী ও মদ্য সাংঘাতিক ও অবর্থ্য অস্ত্র।

এই উৎকোচ প্রথা কিন্তু সাধারণ মানুষের একটুকুও পছন্দ নয়। কারণ অর্থের অভাবে দরিদ্র মানুষরা উৎকোচ প্রদানে অক্ষম। এজন্য তাদের যথেষ্ট দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে।

উৎকোচ সম্পর্কিত জনগণেরও মধ্যে বহু সত্য কাহিনী থাকে। জনগণ ঐ ঘটনা সম্পর্কিত কাহিনীটা মুখে মুখে জনসমাজে প্রচার করতে শুরু করে দেয়।

একজন পাহারাদার পুলিশ কনস্টেবল রাজপথে দণ্ডায়মান এক গরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল আরে, এ গাড়োয়ান। একপাশে কালা বয়েল, আউর একপাশমে সাদা বয়েল। এত না কালি, জলদি আট আনা পয়সা নিকালো। জনৈক ইংরাজ প্রধান হাকিম ঠিক করলেন, যে তিনি তাঁর আদালতের পেশকারদের ঘুষ নেওয়া বন্ধ করবেনই। তিনি আদালতে একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল ঃ অদ্য হইতে এক টাকা পেশকারকে দেওয়া চলিবে না। পরদিন পেশকার বাবুরা বিবাদীদের জনালেন, আর এক টাকা নয়। ঐ দেখুন নোটিশে হাকিমের হুকুম। টাকার রেট বেড়ে গেছে। এবার দুটো টাকা করে আমাদেরকে দিতে হবে।

দারোগা বাপের কাছে হতে ঘুষ নেয়। আর স্যাকরা মায়ের কানের সোনা চুরি করে। আরে মশাই! পুলিশ ঘুষ খায় না। আর ছাগল ঘাস খায় না। এও কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? জনগণ সৃষ্ট এই সকল প্রবাদ ও উক্তও সমকালীন রক্ষীকুল সম্পর্কে জনগনের ধ্যান-ধারণার পরিচায়ক। অবশ্য এই যুগে অবস্থার বহুল পরিবর্তন ঘটেছে।

উৎকোচ গ্রহণ সম্পর্কে বহু কল্পিত ঘটনার সহিত বহু সত্য ঘটনাও গণ গল্পের রূপ নিয়েছে। নদীতে ঢেউ গোনার গল্প অনেকেই শুনেছেন। একজন উৎকোচ গ্রহণ বন্ধ করার জন্য তাকে নদীতে ঢেউ গুনতে দেওয়া হয়। তখন সেই ব্যক্তি নদীর মাঝিদের ঢেউ ভাঙার অপরাধে নৌকা পিছু টাকা নিতে শুরু করেন। নিম্নে পুলিশের উৎকোচ গ্রহণের একটি বিদ্রূপাত্মক কাহিনী উদ্ধৃত করা হ'ল।

সুন্দরবনের বাদা অঞ্চলে দুইজন জোতাদারদের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও তারপর মারপিট। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে একজন অন্যজনকে হেঁসুলির ঘা বসালো। ঐ অঞ্চলে আশু চিকিৎসকের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, ফলে রক্তক্ষরণে ওদের আহত জনের মৃত্যু হয়। ক্রোধের কারণে উন্মত্ত হয়ে ঐ হত্যা কার্য সমাপ্ত হওয়াতে বিচারে ঐ লোকটির ফাঁসি হয় নি। জজ সাহেব তাকে মাত্র দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। কিন্তু লোকটি চার বছর জেল খাটার পর জেলখানাতেই তার মৃত্যু ঘটে। জেলার মহোদয় তখন স্থানীয় থানাতে ঐ সম্পর্কে একটি পত্র পাঠালেন। ঐ পত্রে মৃত কয়েদীর পুত্রদের তাদের পিতার মৃত্যুর সংবাদ জানাবার জন্য জেলার সাহেব অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। পত্রটি দূরবর্তী ওই পুলিশ থানাতে পৌঁছনোর জন্য, থানায় সোরগোল পড়ে গেল। বড়বাবু, মেজ বাবু, বেট বাবু, মুন্সী বাবু ছোট বড় সকল দারোগা বাবু পত্রটি কাড়াকাড়ি করতে থাকেন, ওদের প্রত্যেকেই স্বয়ং ওই পত্রটি মৃত ব্যক্তির গ্রামে পৌঁছতে চান। অথচ ওই গ্রামের দূরত্ব থানা হতে ত্রিশ মাইল। হাঁটা ও জলপথে বহু কষ্টে

সেখানে পৌঁছুতে হয়। যাই হউক—পত্রটি ওদের মধ্যে আপোষ বফাতে ছোট দারোগা বাবুই গ্রহণ করলেন।

ওই ছোটবাবু ওই পত্র নিয়ে অগ্রসর হন ও হাঁক ডাক করে স্থানীয় চৌকিদারদের দলে নেন। এইভাবে ত্রিশ মাইল হেঁটে দশ বারো জন চৌকিদার সমেত মৃত ব্যক্তির গ্রামে পৌঁছুলেন। তারপর সেখানকার মোড়লদের একত্রে জড় করে তিনি হাঁকডাক শুরু করলেন, আরে, কোথায় সেই অমুক লোকের বাড়ি। ওই লোকের ওয়ারিশ কে আছে? একজন সন্ত্রস্থ হয়ে গলায় কাপড়ের খুট জড়িয়ে দারোগাবাবুকে প্রণাম করে হাতজোড় কবে বললে, হুজুর ওনার তো খুনের দায়ে দশ বছর মেয়াদ হইয়াছে। এ্যাঁ! সে কি আর আমার জানা নেই, দারোগাবাবু বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলেন। আমাকে তোমরা নতুন কিছু শিখাইছ? এ্যাঁ! তার পোলা পান এখানে কে কে আছে? আজ্ঞে! ওনার সাত জোয়ান বেটা ওইখানে আছে। প্রত্যুত্তরে ওদের একজন জানালো, ওরা চাষ আবাদ ও কাঠের ব্যবসা করে। হ্যা হ্যা বুঝসি তা ওরা কাঠ থেকে বেশ দু' পয়সা কামাছেই। ক্রোধমত্ত দারোগাবাবু চিৎকার করে বললেন, ধরে নিয়ে এসো সব বেটাকে এখানে।

ওদেরকে ধরে আনার প্রয়োজন হয়নি। সোরগোল শুনে মৃত লোকটিব সাতজন পুত্রই সেখানে এসে গেল। ওদের একজন নম্রভাবে দারোগাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের অপরাধ কি হুজুর। আমরা তো কোনো কসুর করি নাই। কি কও। তোমরা কোনো কসুর করো নাই। চালাকি পাইস তোমরা, দারোগা তার গলার স্বর দ্বিগুণ করে বললেন, জানছস তোদের বাপ জেলখানাতে মরসে।

পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনামাত্র তার সাত পুত্র সমস্বরে শোকাগ্রস্ত হযে কেঁদে উঠল। এতে দারোগাবাবুর ক্রোধ বরং বাড়ল, কমল না! তিনি এইবার শ্লেষের স্বরে তাদেরকে বললেন, কাঁদবে পরে এখন ঠেলা সামলাও। মৃত ব্যক্তির পুত্রদের মধ্যে সর্বশেষ সাহসীজন দারোগা বাবুকে বলল, তা হুজুর। আমাদের অপরাধ! আমরা তো কিছু করিনি। দারোগাবাবু এইবার হাতের মুঠি পাকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, মানে? তোর বাপ দশ বছর জেলের চার বছর মাত্র খেটে মারা গেল, বাকি ছয় বছর মেয়াদ খাটবে কে রে! বল। তোদের এক বেটা বাকি মেয়াদটুকু খেটে আসবি। কেন কেন হুজুর, মৃত ব্যক্তির পুত্রদের একজন জিজ্ঞাসা করলো, আমার বাবা খুন করেছিল, ওইজন্য তাঁর মেয়াদ হয়েছিল। তাঁর জেলের ভাগ আমরা নেব কেন? আরে আরে। কও কি তোমরা!, দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, বাপের সম্পত্তির ভাগ লইস, আর জেলের ভাগ লইবে না? এ তো হইতে পারে না। মহারানীর আইন খুবই কড়া। হয় তোমাদের সম্পত্তি ছাডতে হবে, নয় তোমাদেরকে তাঁর জেলের ভাগ নিতে হবে। কারণ সম্পত্তি যার জেলও তো তারই। এই তো তোমাদের মোড়লরা সব এখানে রইছে। বিচার করে কউক না তারা সব।

দারোগাবাবুর উক্তির মধ্যে যুক্তি ছিল। তাহলে এখানে উপায়। পরিশেষে ঠিক হ'ল ওই পত্রটি দারোগাবাবু চেপে দিবেন। বিনিময়ে পাঁচশ' মুদ্রা তেনাকে দিলেই সবকিছু ফয়সালা হয়ে যাবে। দারোগাবাবু ওই পাঁচশ' মুদ্রা সমেত হৃষ্ট চিত্তে সেদিন থানাতে ফিরেছিলেন।

উৎকোচ গ্রাহকরা সাধারণত বুদ্ধিমান হয়ে থাকে। তাদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধেও বহু গণ-গল্প প্রদেশে প্রদেশে প্রচলিত আছে। নিম্নে পুলিশ উৎকোচ গ্রাহক সম্পর্কিত একটি গণ-গল্প উদ্ধৃত করা হ'ল।

অমুক উৎকোচগ্রাহক দারোগাবাবুর সম্পর্কে স্থানীয় জমিদারবাবু জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট গোপনে সংবাদ পাঠানেল। ওই জমিদারবাবু জেলা হাকিমের বন্ধু ও স্থানীয় হাটের একটি মালিকও ছিলেন। দাবোগাবাবু এতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে ওই হাটেতেই ঘুষ গ্রহণ করতে শুরু করলেন।

বৈশাখ মাসে প্রখর রৌদ্রে হাটের মধ্যস্থলে একটা টুলে বসে উনি শত ব্যক্তির সমক্ষে প্রতিটি রজত মুদ্রা বাজিয়ে বাজিয়ে ওই উৎকোচ স্বরূপ ওইগুলি গ্রহণ করেছিলেন। ওই প্রখর গ্রীষ্মকালে তাঁব পবনে গ্রীষ্মকালীন কোট প্যান্ট ও একটি মোটা ওভার কোট ছিল। তাঁর গলদেশে একটি গরম মোটা মাফলারও বাঁধা ছিল। যথাকালে দারোগাবাবুর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ সম্পর্কিত মামলা দায়ের করা হয়েছিল। ওই ইংরাজ হাকিমই বিচারে বসেছিল আসামী দারোগাবাবুর মুখে এতটুকুও দুঃশ্চিন্তার চিহ্ন নেই। সরলমনা গ্রাম্য সাক্ষীবা সকলেই জেরার মুখে সত্য কথাই বলল। হাকিম বললেন। এ্যা বল কি? গ্রীষ্মকালে দারোগা বাবুর পরনে গরম ওভারকোট ছিল। বটে! হাটের মাঝে টাকা বাজিয়ে বাজিয়ে ঘুষ কেউ নেয় না কি! না না এ অসম্ভব। বস্তুত পক্ষে ওই মামলাতে সত্য কথা বললেও সাক্ষীরা প্রত্যেকেই মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল।

মামলা অর্থে মিথ্যা মামলা। বহু ব্যক্তির এইরূপ ধারণা আছে। উকিলদের বাড়িতে সাক্ষীদের রিহার্সেল দেওয়া হয়। কেউ কেউ এইরূপও ধারণা মনেতে পোষণ করেন। এইজন্য পুলিশ তদন্ত দ্বারা সত্য মিথ্যা যাচাই করার বিভাগ আছে। কিন্তু বহু মামলা সরাসরি হাকিমরা গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে সকল আসামী অর্থভাবে স্বপক্ষে মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করতে পারেনি। কিন্তু বিচারক ঘটনা স্থলে স্বয়ং তদন্ত করলে সহজে সত্য মিথ্যা অবগত হতে পারতেন। এই জনগণ নিঃখরচায় সহজে সুবিচার পাওয়ার জন্য পঞ্চায়েতের বিচার আজও পছন্দ করেন। পাঁচজন বিচারক পরস্পরকে সংযত রাখে ও স্বভাবত উৎকোচ গ্রহণে অপারক। কারণ এইরূপ কিছু ঘটলে স্থানীয় লোক বিচার তখুনি তা জনগণের নিকট জানাজানি হয়ে যায়। জনগণের মধ্যেই তাদের বসবাস করতে হয় বলে ওদিকে তাঁরা সাধারণত চিন্তা করে না। অধিকন্তু তাঁরা মামলা আপোষে মিটমাট করিয়ে দিয়ে জনগণের অর্থ ও সময় রক্ষা করেছেন। জনগণও মানসিক অশান্তি ও অর্থনাশ হতে অব্যাহতি পেয়েছেন।

উপরোক্ত কারণে মধ্যযুগে কাজীর বিচার বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। কারণ ওই কাজীরা ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত করতেন। নিজেই উদ্যোগী হয়ে পল্লীর বহু ব্যক্তির নিকট গোপনে অনুসন্ধান করতেন। এইভাবে বহু তথ্য নিজেরাই সংগ্রহ করে তবে বিচারাসনে বসে বিবাদীদের মামলা বিচার করতেন। ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে তাঁরা সতর্ক ছিলেন। কিন্তু তাঁরাও মধ্যে মধ্যে ওই বিষয়ে কিছুটা বাড়াবাড়ি করতেন। তাঁদের ওই বিষয় মাত্রাধিক্য বহু ব্যক্তি পছন্দ করেননি। এইজন্য তৎকালে ওঁদের সম্বন্ধে বহু বিদ্রূপাত্মক গণ-গল্প মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য এই যে গ্রাম্য পঞ্চায়েত সম্পর্কে একটিমাত্রও গল্প বিদ্রূপাত্মক গণ-গল্পের প্রচার হয়নি এইরূপ একটি কাহিনী নিয়ে উদ্ধৃত করা হ'ল।

কাজী সাহেবের কাছে জনৈক জাহাজের সারেহ অভিযোগ করলে—হুজুর! আমাকে প্রায় জাহাজে এখানে ওখানে রাতে ঘুরতে হয়। আমাব অবর্তমানে পল্লীর এক ব্যক্তি গোপনে

আমার বাড়িতে আমার বিবির সাথে রাত্রিবাস করে। ওই বিষয়ে আমি আমার চারজন প্রতিবেশীকে সন্দেহ করি। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এই অপকার্যের জন্য দায়ী তা আমি বুঝতে পারছি না।

এ্যাঁ! তাই নাকি! কাজী সাহেব তাঁর দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন—তাহলে নিয়ে এসো তোমার বিবিকে আমার এজলাসে। এরপর ওই স্ত্রীলোকটাকে কাজী সাহেবের নিকট আনা হলে উনি তাকে দেখে লজ্জিতভাবে বললেন, এ্যাঁ, একি! মা! তোমাকে এখানে এনেছে। আমি অভিজ্ঞ একজন কাজী। তোমার চেহারা দেবীর মতো। তুমি এ জঘন্য কার্য কখনই করবে না। সত্য মিথ্যা আমরা বুঝতে পারি। তোমার স্বামীর অভিযোগ বিলকুল ঝুট। তোমাকে এজলাসে অন্যায়ভাবে এনে অপমান কবার জন্যে আমি পূরণ দেব। এই নাও মা। তোমাকে এক শিশি বাদশাহী মহা সুগন্ধী মূল্যবান আতর দিলাম। এই আতর কিন্তু তুমি নিজে ছাড়া অন্য কেউ যেন ব্যবহার না করে। এই আতর শুধু ভুরুর উপর লেপন করার নিয়ম। নচেৎ উহার সুবাস ভালভাবে প্রকাশ পায় না।

এইভাবে স্তোত বাকো স্ত্রীলোকটিকে খুশি করে বিদায় দিতে কাজী সাহেব খেঁকরে উঠে সিপাহিদের হুকুম দিলেন—এই কৈ হ্যায়! এই পল্লীর আদমি কো রাতভর কয়েদখানাতে রাখ। কাল উনকো হামার পাশ তোমারা পেশ করবে। কাজী সাহেবের এই বিচারে আদালতে উপস্থিত সকলে আশ্চর্যান্বিত হ'ল। কেউ কেউ মনে মনে নিশ্চয়ই ক্ষুব্ধ হয়ে ছিল। কিন্তু ওরাই পরদিন ওইরূপ সুন্দর বিচারের জন্য কাজী সাহেবের প্রশংসায় বিভোর হয়ে উঠেছিল।

পরদিন সকালে উঠে কাজী সাহেব আসামীকে হাজত থেকে তাঁর নিকট আনলেন। ভাল করে তাঁর নিকট হতে তার স্ত্রীর উপপতি সন্দেহমাণ চার ব্যক্তিদের নাম জেনে নিলেন। আসামীর ওই একহ অভিযোগ—ওদেরই একজন গোপনে আমার স্ত্রীর ঘরে রাত্রে যায়। তবে ওদের মধ্যে কোনজন তা আমি ঠিক বলতে পারি না। এরপর কাজী সাহেব কয়েদীর ওই চার প্রতিবেশী ছোকরাদের সামনে আনার জন্য হুকুম দিলেন। পেয়াদারা তখুনি ছুটে গিয়ে ওই চারজনকে পাকড়াও করে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করলে উনি ওই চারজনের ভ্রূ শুঁকতে শুরু করলেন। এদের একজনের ভ্রূতে ওই আতরের গন্ধ পেলেন ও তাঁকে তখুনি হাজতে পাঠাবার হুকুম দিলেন। এরপর তিনি ফরিয়াদিকে সসম্মানে মুক্তিদান করে তার স্ত্রীকে পাকড়াও করে আনবার জন্যে হুকুম দিলেন। কাজী সাহেব বুঝতে পেরেছিলেন যে ফরিয়াদীর হাজতবাস দরুন রাত্রিকালীন আটক অবস্থার সুযোগে তার দুঃশ্চচিত্রা স্ত্রী ওই রাত্রেই গ্রহণ করে তার উপপতিকে শয়নকক্ষে আনবে এরপর সে প্রথমেই সোহাগ করে তার ওই উপপতির ভ্রূ যুগলে ওই খোসবাই আতর মাখাতে ভুলবে না।

একবার চারজন সন্দেহমান ব্যক্তিকে ওই কাজী সাহেবের নিকট আনা হ'ল। অভিযোগ—ওই ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ফরিয়াদীর দ্রব্য চুরি করেছে। কাজী সাহেব ওদের চারজনকে চারটি কাঠি দিয়ে বললেন, এগুলো মন্ত্রপূতঃ কাঠি। বাড়িতে রাত্রে বালিশের তলাতে বা অন্য কোথাও রাখবে। পরদিন সকালে ওই কাঠিগুলো আমার নিকট আনা চাই। নচেৎ তোমাদের গর্দান যাবে। তোমাদের মধ্যে যে চোর তার কাঠিটা এক ইঞ্চি বেড়ে যাবে বুঝলে। পরদিন সকলে তাদের কাঠিগুলি কাজী সাহেবের নিকট পেশ করলে দেখা গেল যে ওদের একজনের কাঠির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে এক ইঞ্চি কম। কাজী তখনি তাকে গ্রেপ্তার করে

হাজতবাসের হুকুম দিলেন। এদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রকৃত চোর সে আগেই তার কাঠির এক ইঞ্চি কেটে বাদ দিয়ে রেখেছিল, যাতে রাত্রি শেষে বাড়লেও তার কোনো ক্ষতি হবে না। বলাবাহুল্য—মানুষের শিক্ষা ও সংস্কার অনুযায়ী কাজীরা বিভিন্ন রূপ ছল চাতুরির সাহায্য নিতেন।

বহু ব্যবসায়ীদের মধ্যে অর্থগধ্নুতা দেখা যায়। জন গণ উহাদের ওইরূপ মনোবৃত্তি পছন্দ করে না। প্রতিবাদ স্বরূপ তারা মুখে মুখে বহু গণ-গল্প রচনা করে প্রচার করেছে। নিম্নে ওইরূপ একটি গণ-গল্প উদ্ধৃত করা হ'ল।

সোহনলালের বেটা মদনলালের প্রসবা উন্মুখ বহুকে (বউ) নার্সিংহোমে আনা হ'ল। ওদিকে জঠরে বাচ্চা উল্টে গিয়েছে। অপারেশন করে বাচ্চা নিকলাতে হোবে। ডাক্তারবাবু বললেন—ঠিক করুন। আপনারা বাচ্চা চান, না তার মা'কে চান। পরিস্থিতি এমন একত্রে দু'জনাকে বাঁচানো সম্ভব নয়। এমন সময় সেখানে ওই বাচ্চার ঠাকুর দাদা সোহনলাল এসে গেলেন ও বললেন—ক্যা? হামাদের বাচ্চা নিকলাতে মাঙছে না। উনে কার লেড়কা হোবে তো এখুনি নিকলে আসবে। হামি আভি উসকো নিকাল লিবে। সোহনলালজী তখন একটা রূপোর টাকা আঙুলে তুলে টঙ করে বাজালেন। ওই টাকার টঙ শব্দ বাচ্চার কানে গিয়েছিল। উহা শুনা মাত্র সে দুই হাত বাড়িয়ে ওটা ধরবার জন্য সড়াৎ করে বার হয়ে এলো তবে টাকাটা কালো টাকা কিনা তা জানা যায়নি।

ব্যবসায়ীদের অধিবেদনা প্রসূত ব্যবহারে সম্পর্কিত বহু সত্য মিথ্যা কাহিনী প্রচলিত আছে। আরে! ল' [আইন] কি হাতি ঘোড়া আছে, শিখ লেও—আইন জানি বলাতে জনৈক ধনকুবের তার ক্লার্কের প্রতি এইরূপ এক উক্তি করেছিল, 'মশাই' ওরা চারটি মাত্র বাক্যের দ্বারা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি চালায়। যথা। কোহী বাত নেহী। নকি কর দেও। হিসাব লে' লেও। দুটি এইরূপ অভিমত আমি জনৈক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কর্মীকে বলতে শুনেছিলাম। কেউ কেউ বলেন যে উদ্দপদী সরকারি কর্মীরাও অনুরূপ কথাটি বাক্য তথা নোট লিখে কর্তব্য সম্পাদন করেন, যথা— আই এগ্রী। নো অবজেকশন। ডিসকাস। ডিসকাসড। ফাইলড। অ্যাজ প্রপোসড অমুক মে লাইক টু সি, ইত্যাদি।

বহু জনপ্রিয় শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিদের সম্পর্কেও বহু গণ-গল্প প্রচলিত আছে। ওই গুলির সব কয়টি নিশ্চয়ই সত্য নয়! জনগণ ওইগুলি তাঁদের জীবনে ঘটেছে এমন ঘটনা কবে মেনে নেয়। ওইগুলি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ভক্তির পরিকারক। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু ও নেহরু পরিবার সম্বন্ধে বহু অলীক গণ-গল্প প্রচলিত আছে। যথা, উনি ইংলন্ডে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের সহপাঠি ছিলেন। পোশাক পরিচ্ছদ বিলাত হতে কাটিয়ে আনা হয়। নেহরু পরিবার হতে ওই সকল প্রবাদের বিরুদ্ধে বহুবার প্রতিবাদ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওই সকল প্রবাদ আজও জনগণের কেউ কেউ বিশ্বাস করেন।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধেও বহু প্রকার গণ-গল্প ও প্রবাদ প্রচলিত আছে। যথা, ট্রেনেতে ডেপুটি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি জনৈক যুবক তাকালে উনি বলেছিলেন—আমি প্রতি মাসে ৮০০ টাকা ওর পায়ে নিবেদন করেও ওর মন পাই না। ওই সময় মহিলারা ঘোমটা দ্বারা আবৃত থাকতেন। ওই ঘটনা কোনো দিনই ঘটেনি। উনি ডাকাতদের দ্বারা আক্রান্ত হলে পিস্তলের মতো করে একটা ফাউন্টেন পেন উঁচিয়ে ধরে তাদেবকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য ওই যুগে ফাউন্টেন

পেনই সৃষ্টি হয়নি। স্যার আশুতোষ সম্পর্কেও ওইরূপ বহু গণ-গল্প প্রচলিত আছে যথা, তোমার জুতো আমার জুতোকে খুঁজতে গিয়েছে। ট্রেনে ভ্রমণকারী এক ইংরাজ ওর জুতো বাইরে নিক্ষেপ করলে উনিও সুযোগ মতো সাহেবের জুতোও বাইরে ফেলে দেন। ওই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে স্যার আশুতোষ উত্তরে তাঁকে ওইরূপ বলেছিলেন।

ঋষি বঙ্কিমের বিবেক পদ্ধতি সম্বন্ধে জনগণে উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁর নির্ভুল বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত একটি গণ-গল্প প্রায়ই শোনা যায়।

জনৈক গৃহস্থের বাটীতে এসে জনৈক পথচারী রাত্রিবাস করতে চাইলেন। অজ্ঞাত ওই ব্যক্তিকে আশ্রয় দিতে গৃহস্থ শঙ্কিত হন। কিন্তু তার অনুযোগে পরে তিনি তাকে বাইরের চণ্ডী মণ্ডপে শয়নের অনুমতি দিলেন। ওই গ্রামে একজন তস্কর বাস করত। গভীর রাত্রে সে বাড়ি বাড়ি চুরি করত। কিন্তু গ্রামের লোক তাকে কোনোদিনই সন্দেহ করেনি। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে জেগে উঠে ওই অতিথি ভদ্রলোক দেখলেন যে ওই তস্কর লোকটি এক টিপটিকা সমেত গৃহস্থ বাটির পাঁচিল টপকে পথের উপর এলেন। ওই অতিথি ভদ্রলোক ভাবলেন ওই চোর বামাল সমেত পালাতে পারলে প্রত্যুষে উঠে সকলে তাঁকেই সন্দেহ করবে। উনি তখুনি ছুটে গিয়ে তাঁকে জাপটে ধরে চেঁচাতে শুরু করলেন—চোর! চোর! ওই তস্কর তখন প্রমাদ বুঝে বললে, 'ঠাকুব' চুপ করুন। বরং আসুন এই দ্রব্যাদি দু'জনে ভাগাভাগি করে নিই ও এখান হতে সরে পড়ি! কিন্তু ওই ব্রাহ্মণ অতিথি এই ঘৃণ্য প্রস্তাবেই স্বভাবতই রাজি হলেন না। অগত্যা ওই তস্কর তখন ওই ব্রাহ্মণ অতিথিকে জাপটে ধরে চেঁচাতে শুরু করলেন। ও অমুক মশাই। শীঘ্র বাব হয়ে আসুন। আমি চোর ধরেছি। ও রায় বাবু। ও গাঙ্গুলি মশাই। চোর! চোর! ওই সময়ে ওই গ্রামে কুঠির হিড়িক পড়াতে অর্দালির দল বেরিয়ে ছিলেন। চিৎকার শুনে অন্যদের মতে তিনিও ঘটনাস্থলে এলেন ও ওই ব্রাহ্মণ অতিথিকে পাকড়াও করলেন। হাকিম বঙ্কিমবাবুর এজলাসে ওঁদের বিচার শুরু হ'ল। উভয়ের পরস্পর বিরোধী উক্তিতে সকলেই বিভ্রান্ত। হাকিম বঙ্কিমবাবু হুকুম দিলেন—হুম, আমার বাঙলোতে আমার এক ভৃত্য এইমাত্র মারা গেল। ওই মৃতদেহ শুদ্ধ একটি খাট তোমরা দুজনে মাথাতে তুলে মৃতের বাড়ি অমুক গ্রামে পৌঁছিয়ে দিয়ে এসো। কাল সকালে তোমাদের মামলাব শুনানির দিন ধার্য করলাম। আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত ওই শবাধার মস্তকে তুলে উভয়েই মাঠের পথ ধরে চলছিল। ওই ব্রাহ্মণ স্বাগত করলেন—হায় ভগবান। মিথ্যা মামলাতে জড়িয়ে পড়লাম। তার উপর অজাত কুজাতের মড়াও বইতে হ'ল। ব্রাহ্মণের ওই খেদোক্তি তাকে উপহাস করে ওই তস্কর বললে, আমি তখন আপনাকে বলেছিলাম যে আসুন আজ ওই সব দ্রব্য নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিন, মশাই, আপনি তা শুনলেন না এখন ভুগুণ। আমি স্থানীয় লোক। আমার পক্ষে সাফাই মিথ্যা সাক্ষাৎ অভাব হবে না। এই মামলাতে আপনি দোষী সাব্যস্ত হবেন এবং মেয়াদ আপনারই হবে। পরদিন মামলার শুনানি শুরু হলে জনৈক শুভ্র দেহী যুবক সাক্ষীর কাঠগড়াতে উঠে সাক্ষ্য দিতে শুরু করলেন। ওই যুবকটি হাকিম বঙ্কিমবাবুর নির্দেশে মৃত ব্যক্তির অভিনয় করেছিলেন। নিরপেক্ষ সাক্ষী রূপে ওই শবাধারে শুয়ে তিনি যা শুনেছিলেন এজলাসে অকপটে জানালেন।

*১৩৭৯ সাল*

# মিনির চিঠি

## বনফুল

সেদিন ভয়ানক গরম। গাছের পাতাটি নড়ছে না। ভনভন করছে মশা চতুর্দিকে। বিছানায় খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ ক'রে নগেনবাবু শেষে ছাদে বেরিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। তখন রাত্রি একটা।

নগেনবাবু মার্চেন্ট আপিসে চাকুরি করেন। বিবাহ করেন নি। একাই একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করে থাকেন। একটি কমবাইন্ড-হ্যান্ড চাকর আছে। সে সকাল সন্ধ্যা এসে তাঁর কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। রাত্রে নগেনবাবু একাই থাকেন।

নগেনবাবু ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়তে হ'ল তাঁকে। তাঁর বাড়ির সামনে বেশ বড় একটা ডাকবাক্স ছিল। হঠাৎ তিনি দেখলেন ডাকবাক্সটা খুব নড়ছে। যেখান দিয়ে চিঠি ফেলা হয় সেখানকার ঢাকনিটা খটখট করে শব্দ করছে। তারপর সেটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল। ডাক বাক্সের ভিতর থেকে সোঁ সোঁ ক'রে আওয়াজ হতে লাগল একটা। মিনিট খানিক পরে থেমে গেল সব। নগেনবাবু দেখলেন একটা লম্বা শীর্ণ লোক ডাক বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ আবির্ভূত হ'ল যেন শূন্য থেকে। অবাক হয়ে গেলেন নগেনবাবু।

আলসের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে বললেন—কে তুমি? লম্বা শীর্ণ লোকটা মুখ তুলে চাইল। কাছেই একটা ল্যাম্প-পোস্টও ছিল। তার আলোয় নগেনবাবুর মনে হ'ল একটা মনুষ্যরূপী কঙ্কাল যেন তাঁর দিকে চেয়ে আছে। 'ওখানে কি করছ এত রাতে—'

লোকটা অন্তর্ধান করল। নগেনবাবু অবাক হবার অবসর পেলেন না, ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ পরমুহূর্তেই লোকটা এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

'আমাকে কিছু বলছেন।'

'ওখানে কি করছিলেন এত রাত্রে।'

'দেখছিলুম ওই ডাকবাক্সের ভিতর মিনির চিঠি আছে কি না।'

'ডাকবাক্সের ভিতর চিঠি আছে কি না দেখবে কি করে?'

'আমি ওর ভিতর ঢুকেছিলাম যে—'

'ঢুকেছিলে? কি করে?'

'বাতাস হয়ে!'

নগেনবাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন তার দিকে।

লোকটি বলল—'আমি দিন পনেরো আগে মারা গেছি। মাসখানেক আগে মিনিকে একটা চিঠি লিখেছিলাম। রোজই আশা করতুম উত্তর আসার। কিন্তু হঠাৎ মরে গেলাম, উত্তর পেলাম না। যে বাসায় আমি থাকতুম সেখানে রোজই গিয়ে দেখি আমি একবার। আমার লেটার বক্সে কোনো চিঠি নেই। এখন রাস্তার ডাকবাক্সগুলো খুঁজে খুঁজে দেখি মিনির চিঠি কোথায় আছে কিনা—'

অবাক হয়ে শুনছিলেন নগেনবাবু। 'কাছাকাছি আর কোথায় ডাকবাক্স আছে বলতে পারেন?'

নগেনবাবু একথার উত্তর দিলেন না।

প্রশ্ন করলেন—'আপনি মারা গেছেন?'

'হ্যাঁ, পনেরো দিন আগে। হঠাৎ হার্ট ফেল'করে।' সেজন্য আমার দুঃখ নেই। এ বাজারে বেঁচে থেকে সুখ কি বলুন। কিন্তু আমার দুঃখ মিনির উত্তরটা আমি জানতে পারলাম না। মিনির বাড়িতেও আমি গিয়েছিলাম। কাউকে দেখতে পেলাম না। কলমা গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় মিনি আর তার মা থাকত। গিয়ে দেখি বাড়িতে কেউ নেই! হয়তো কোথাও বেড়াতে গেছে। দানাপুরে তার মামা থাকে শুনেছিলাম—'

'আপনি মরে গিয়েও এই দেহ ধারণ করতে পেরেছেন?'

'পেরেছি। সবাই পারে না। মনের খুব জোর চাই। যতক্ষণ দেহ ধারণ করে থাকি, খুব কষ্ট হয়। অধিকাংশ সময়ই হাওয়া হয়ে থাকি আমি। বললুম— আরও অনেক ডাকবাক্স খুঁজতে হবে। মিনি নিশ্চয় উত্তব দিয়েছে। কোথাও না কোথাও আছে সে উত্তরটা। খুঁজে বার করতেই হবে আমাকে—'

'আপনার নামটি কি—'

'এখন নাম ভূত। আগে ছিল শিবেন—'

শিবেনের প্রেতাত্মা নিমেষে অন্তর্ধান করল।

নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন নগেনবাবু।

ঠিক করলেন বাড়িওয়ালাকে নোটিশ দেবেন কাল। এ বাড়িতে থাকা নিরাপদ নয়।

না, সব প্রেতাত্মা দেহ ধারণ করতে পাবে না। কিন্তু যারা অতৃপ্ত কামনা নিয়ে মরে তারা নানাভাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করে। আমরা বুঝতে পারি না সব সময়। নিতাই বুঝতে পারছিল না। নিতাই সেদিন রাত্রে খোলা জানালার সামনে বসে পড়ছিল। জানালার দু'পাশ বেয়ে উঠেছে মালতী লতার ঝাড়। সেই মালতী লতার পাতায় পাতায় ফুলে ফুলে যে আকুলতা জাগল, যে শিহরণ বয়ে গেল, যে দোলা লাগল তা নিতাইয়ের মনে কোনো সাড়া তুলল না। সে বুঝতে পারল না যে মিনি কথা বলছে। সে ভাবল হাওয়ার জন্যে মালতী লতাটা দুলছে। সে যদি লক্ষ্য করত তাহলে দেখতে পেত অন্য গাছে পাতা নড়ছে না। মালতী লতার সেই আকুল আলোড়ন নিতাইকে বলতে চাইছিল—' নিতাইদা, তুমি শিবেনবাবুকে লিখে দাও যে আমি তাঁর চিঠি পেয়েছিলাম, কিন্তু উত্তর দেবার সময় পাইনি। তুমি তো জানই কি

হয়েছিল। তোমরা তো কেউ আমাদের বাঁচাবার জন্যে এগিয়ে এলে না। গুণ্ডার দল আমাকে আর মাকে নিয়ে চলে গেল। আমার উপর, মায়ের উপর যে অত্যাচার তারা করেছে তা অকথ্য। তাদের সঙ্গে লড়তে লড়তে আমি মরেছি। আমি ম'রে গেছি তুমি এই খবরটা শিবেনবাবুকে শুধু জানিয়ে দাও। আর জানিয়ে দাও যে কথাটা লজ্জায় তাঁকে বলতে পারিনি সে কথাটা এবং বলেই বা কি হবে। এখন ব'লে তো কোনো লাভ নেই। আমি যে তাঁর নাগালের বাইরে চলে এসেছি, আমি যে মরে' গেছি এ কথাটা জানিয়ে দাও তাঁকে, তিনি আমার উত্তরের অপেক্ষায় বসে আছেন।'

নিতাই কিন্তু তন্ময় হয়ে ডিটেকটিভ উপন্যাসই পড়তে লাগল। মালতী লতার এই আকুলি-বিকুলি তার নজরে পড়ল না। মিনি আর তার মাকে যে গুণ্ডারা হরণ ক'রে নিয়ে গিয়েছিল তা সে জানত। কিন্তু এ নিয়ে সে তেমন উত্তেজিত হয়নি। উত্তেজিত হয়েছিল সেদিনেব ক্রিকেট খেলার ফলাফল নিয়ে। গ্রামের কোনো লোকই গুণ্ডাদের খোঁজে বেরোয় নি। সবাই গা বাঁচিয়ে ঘরে বসেছিল। নিতাইও ও নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় নি, মিনিরা নিতাইয়ের দূর সম্পর্কের আত্মীয়, তবুও ঘামায় নি। মালতী লতাটা রোজই কিন্তু আন্দোলিত হচ্ছিল তার চোখের সামনে। নিতাইয়ের মনে সাড়া জাগল না। একদিন দেবতা কিন্তু সদয হলেন। রাত্রে ভীষণ ঝড় উঠল একটা। মালতী গাছটার ফুল লতা পাতা ঝড়ের বেগে ছিঁড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল শিবেনের উপর। শিবেন তখন আর একটা ডাকবাক্স থেকে বেরিয়ে রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছিল। মালতী লতার ছেঁড়া ডালপালা আর ফুলগুলো তাকে ঘিরে ঘিরে ঘুরতে লাগল আকুল হয়ে। শিবেন কিন্তু বুঝতে পারল না যে তার চিঠির উত্তর এসেছে।

# খুন হলেন সম্পাদক

## শিবরাম চক্রবর্তী

খারাপি যদ্দুর হবার হ'ল, খুনটা হতেই বাকি রইল কেবল। 'খুন খারাপি'—সম্পাদকের সঙ্গে বেশ এক চোট হয়ে গেল আমার। *

ওঁর গোয়েন্দা কাহিনীর মাসিক পত্রিকাতে একটা ডিটেকটিভ গল্প দিয়েছিলাম। পড়ে টড়ে বললেন—কিস্‌সু হয়নি। ডিটেকটিভ গল্প বলছেন, কিন্তু এর ভেতর ডিটেকশন কোথায়? ঘটনা কই? কোথায় বা দুর্ঘটনা? একটা ডিটেকটিভও তো নেই। টিকটিকের লেজ দূরে থাক—টিকিও দেখা যায় না—

টিকটিকি না থাক, তার টিকি বা টাক না দেখা যাক, কিন্তু খুন তো আছে ঠিকই। ওঁর টিকটিক করার প্রতিবাদে আমি বলতে যাই—দস্তুর মতো একটা খুন হয়েছে এর মধ্যে। হয়নি কি?

হ্যাঁ, খুন আছে। খুন আছে বটে, কিন্তু তাই বলেই যে একটা খুনের গল্প হয়েছে, তা আমি বলতে পারব না। বরং বলতে হয়, গল্পটাকেই আপনি খুন করেছেন। খুনের সেই আবহাওয়া কই? খুনীর মনস্তত্ত্ব? সেই রহস্য রোমাঞ্চ কোথায়? সত্যিকারের খুন বলে তো মনে হয় না। খুনীকে মনে হয় যেন কাঠের পুতুল, লেখকের হাতের খেলনা মাত্র। তার কোনো ব্যক্তিত্বই নেই। গল্পের খুনোখুনি, বস্তুত না ঘটলেও, বাস্তবিক না ঘটে থাকলেও তার ভেতরে বাস্তবতার স্পর্শ থাকবে তো? তবেই না মশাই, পড়লে মনে হবে, হত্যাকাণ্ডটি সত্যিই বুঝি ঘটেছিল। না, যদ্দিন আপনি নিজে না একটা খুন করতে পারছেন, তদ্দিন কোনো খুনের গল্পে আপনার হাত খুলবে না।

মহীশবাবু সাফ কথা বলে দিলেন শেষটায়।

আর, এই বলে নিহত গল্পটিকে আমার হাতে ফেরত দিলেন। নিমতলায় পাঠাবার জন্যই মনে হয়। কিন্তু কথাটা ওঁর একদিক দিয়ে খাঁটি, আমি ভেবে দেখলাম। সত্যিই, খুনের কোনো অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। ভালবাসার অভিজ্ঞতা না থাকলে যেমন প্রেমের গল্প লেখা যায় না, খুন-খারাপির বেলায়ও তার অন্যথা হবার কথা নয়।

সম্পাদকের কথায় একটা আইডিয়া—বেশ উঁচুদরের আইডিয়াই পেলাম, বলতে কি!

মামার তার পেয়ে তার পরদিনই আমায় চলে আসতে হ'ল কালিম্পং। কি এক জরুরি কাজে তাঁকে নেপালে যেতে হচ্ছিল, তাঁর অবর্তমানে ফাঁকা বাড়ি আগলাবার দায় আমার।

মামা পালাতেই আমার পালা এলো। এক দিস্তে কাগজ নিয়ে বসে পড়লাম। কালিম্পং-এর ফাঁকা বাড়ি বলে গল্প ফাঁদলাম একটা। ওই ডিটেকটিভ গল্পই। কিন্তু ফাঁদতে গিয়ে মহীশবাবুর কথাগুলো মনে লাগল। ডিটেকটিভ গল্পের কাঠামোটাই আসল। সেইটা ঠিকমত বাঁধতে পারলে খুনগুলো আপনা থেকেই বাধ্য হয়। খুনীরাও অবাধে এসে ফাঁদে পা দেয়। বাধিত হয়েই আসে।

অবিশ্যি, কাঠামোর পরেও আরও থাকে। খুনের আবহাওয়া, খুনীর মনের ভাব আর পুলিশের ভাবের আড়ি—ইত্যাদি। এসব থাকেই। কিন্তু কাঠামো না থাকলে গোটা গল্পটাই কাঠ হয়ে থাকবে।

কাঠামো ভাবতে গিয়ে এক আকাঠের কথা মনে পড়ল। গল্পের নাম পাল্টালাম। বদলে করলাম—'সম্পাদক সাবাড়।' প্লটটা ভাঁজতে লাগলাম মনে মনে। মুগুরের মতোই—ভাঁজতে ভাঁজতে যেমন ঘাম বেরোয়, তেমনি ঘটনাটা বেরোল। ব্যায়ামের ফলে শিরা-উপশিরায় তাজা খুনরা খেলে যায়। তেমনি আমার শীর্ষদেশে খুনের আবহাওয়া খেলতে লাগল। খুনতব্য লোকটাও ক্ষুণ্ণ মুখে দেখা দিল আমার মাথায়। খুনীটাও যেন মাথা নাড়ল। মগজের মধ্যে গজগজ করতে লাগল—খুন ও খুনী। এক খুনোখুনি কাণ্ড!

ফস করে প্যাডের একটা কাগজ নিয়ে চিঠি লিখলাম মহীশবাবুকে। এখানে এখন বুনো হাঁসের মরশুম। কালিম্পং-এর হাঁসের মাংস জগদ্বিখ্যাত। খেয়েছেন নাকি কখনও? এমন খাসা চীজ আর হয় না। খাসি কোথায় লাগে মশাই! এহেন বস্তু একা-একা খেয়ে সুখ নেই। আপনি যদি দিন দুয়েকের জন্যে অবসর করে এখানে আসেন, এসে আমার সঙ্গে যোগ দেন তো খুশি হ'ব খুব। পুনশ্চঃ নতুন একটা গল্প ফেঁদেছি। সেটাও শোনাতাম আপনাকে। আপনার সেদিনের সেই নির্দেশের পর গল্পটা কেমন উৎরেছে দেখতেন যদি!

চিঠি ছেড়ে নিশ্চিন্ত রইলুম। জানি তো আমি, আমার যেমন হাসির দিকে—ওঁর তেমনি হাঁসের দিকে দুর্বলতা। হাঁসের স্বাদ পাবার জন্যে চীনে রেস্তোরাঁর আশেপাশে ঘুরঘুর করেন সে খবরও আমার অজানা ছিল না। ডাক রোসটের হাঁক ছাড়লে ফেরৎ ডাকেই উনি এসে হাজির হবেন। আর কেবল ডাক রোসটের কথাই নয়, কালিম্পং-এর রেস্টের কথাটাও ছিল আমার ডাকে।

গল্পটার নাম পাল্টালাম আবার। বার বার তিনবার। এবারকার নাম হল মহীশ মর্দন। ডিটেকটিভ গল্পটা আর একধাপ এগোলো, তৃতীয় ধাপ। নামতার ধাপ্পা পার হ'ল। বস্তুত, তরোয়ালের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ধরলেও, কলম তার মতই অনেকটা। উভয়েই কাটতে কাটতে এগোয়। আর লেখাও মশাই, যতই কাটা পড়ে, ততই আরও অকাট্য হয়ে ওঠে। অনেক কাটাকুটির পর যা দাঁড়ায় না, তাই নিয়েই যত ফাটাফাটি কাণ্ড!

মহীশবাবুর চরম কথাগুলো কানে বাজছিল আমার—গল্পের মধ্যে কোনো খাদ থাকবে না মশাই। গল্পও যে সোনার জিনিস। সোনার জিনিস যদি খাঁটি না হয়, তাহলেই মাটি। তাহলে আর দাম কি বলুন?

এবং ওইখানেই শেষ নয়। তার পরেও আরও—আপনার গল্পের অপরাধের মধ্যেই শুধু ফাঁকি নেই, অপরাধীর ভেতরেও ফাঁক। সত্যি বলতে, সেইখানেই এর গলতি। আপনার এই

গল্পটা আসলে অপরাধী। এই গিলটি লেখা সোনার বলে। শোনানোর বলে চালাতে এসেছেন আমার কাছে? আমার মতো জহুরীর কাছে? ছিঃ! ছিঃ ছিঃ! বলে আমাকে তিনি ধিক্কার দিয়েছিলেন।

সেই থেকে গিলটি বোধটা আমার মনে জেগে রয়েছে। ছি—ছি করছে ক্ষণেক্ষণে। আর খাদের আইডিয়াটাও—বলতে কি—পেলাম আমি তার থেকেই।

আমাদের এবাড়িটার কাছেই সেই অতলস্পর্শী গহ্বরটা। এমন খাদ যে তার ভেতরে কেউ যদি পড়ে, তার বাদ দেবার কিছু থাকবে না. পড়তে না পড়তেই তুলো হয়ে ধুনে—পিঁজে—সুতো হয়ে—বুনে-আনকোরা কয়েক গজ খাদি হয়ে বেরুবে। অন্য ধার থেকে।

না, বেরুবার কোনো কথাই নেই। সূত্রপাত অব্দি আছে। তার পরে আব নেই। শেষ কোথায় এই খাদের এবং এর খাদ্যের—কেউ তা বলতে পারে না।

খাদটাকে গিয়ে পরীক্ষা করলাম আবার। স্বয়ং খাদক হয়ে নয়—বলাই বাহুল্য। কোনো জিনিসের গভীরে যাবার, তলিয়ে দেখার ভাগ্য আমার হয় না। আমার হচ্ছে ওপর ওপর। সোনার বেলায়, সোনালিদের বেলায় যা দেখেছি, যেমনটা দেখা গেছে—যেমন ধারা দৃষ্ট হয়েছে—যেমনটি ঘটেছে আমার অদৃষ্টে—খাদের বেলায় কি তার কোনো অন্যথা হবে?

আমাদের বাংলোর থেকে দু'ফার্লং দূরে খাদটা। বিগত আসামী ভূমিকম্পের কালেই পাহাড়ের এ-ধারটা ধসে গেছল। কিনারার কাছটা কাচের মতোই ক্ষণভঙ্গুর হয়ে রয়েছে। (তার কাছাকাছি যাওয়ার মত কাঁচা কাজ আর হয় না।) তারপর থেকেই পাহাড়ের এই পাড়টা প্রায় পড় পড় অবস্থায়—দয়া করে পড়লেই হয়।

অদূরে একটা গাছে দড়ি বেঁধে কোমরের সঙ্গে জড়ালাম। তারপর আলতো পায়ে গেলাম কিনারাব কিনারে। কাছাকাছি একটা ফাটলের ফাঁকে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে রেখে চলে এলাম।

মোট দশ, দশটা টাকা একখানা নোটে পুঞ্জীভূত হয়ে সেই ফাঁকের ফোকরে গুঞ্জীভূত হয়ে রইল!

তারপরে পকেট-বই বের করে খুনীর মনস্তত্ত্ব নোট করতে লাগা গেল। শিকারকে বাগাবার আগে খুনীর মনের বিকার কেমন হয়—তার চিত্তে কেমন চোট লাগে। প্রথমেই মনে হ'ল—খুনটা যেন বেমালুম হয়। কেউ যেন না টের পায়—এমনভাবে ঢুকে যায়, যাতে খুনের ওই ব্যাপারটার চরম হয়ে চূড়ান্ত হয়ে একদম খতম হয়ে যায়—ওইখানেই। কোনোই খুঁত থাকে না। তাই নিয়ে তারপরে কোনো খুঁত খুঁত জাগে না কারো খুন করার পর হাতকড়ায়—হাতকড়ার থেকে কাঠগড়ায় গিয়ে না গড়ায়। আসামী হয়ে না দাঁড়াতে হয় অবশেষে। জেল হাজতের কড়াকড়িতে না যেতে হয়. সব ফাঁস হয়ে গিয়ে—ফাঁসি না হয়ে যায় শেষটায়।

অবিশ্যি ফাঁসিকাঠে যে ঝোলে, যাঁকে ঝুলতে হয়, তারও একটা মনস্তত্ত্ব থাকে—এবং সেটাও কিছু কম মারাত্মক নয়। সেটাও জানবার বটে। কিন্তু তদ্দূর এগোবার বাসনা আমার হয় না। সেরকম অবস্থায় মন যে কেমন করে, তা আমি আভাসে আঁচ করতে পারি। কিন্তু ঠিক

*কেমনটি যে করে। তা জানতে সেই ঝুলনযাত্রায় গিয়ে দুলবার—ফাঁসি কাঠে গলা বাড়াবার* মতো বৈজ্ঞানিক মানসিকতা আমার নেই। ফাঁসিতে গিয়ে লটকানোর চেয়ে, আমার মতে, খুন করে সটকানো ঢের ভাল। অনেক উপাদেয়।

দিন-দুয়েক বাদে মহীশবাবু দেখা দিলেন। দেখলাম তেমনতর হৃষ্টপুষ্টই রয়েছেন। শুকিয়ে যাননি একটুও। প্রয়োজনের মতো ওজনেই রয়েছে। দেখে খুশি হলাম। অবিশ্যি খাদের ধারটা কাচের মতোই ভঙ্গুর. তা ঠিক, কিন্তু কাচও তো অনেক সময় কাঁচা কাজ করে। ভাঙে না। কিন্তু মহীশবাবুর দিকে তাকালে এমন পাকা গুটি কাঁচাতে পারবে বলে মনে হয় না। ওই পাহাড়ে দেহ নিয়ে যখন উনি গুটি গুটি পাহাড়ের ওই ক্ষণভঙ্গুরতার উপর দিয়ে পড়বেন, সে-দৃশ্য কল্পনা নেত্রে দেখবার। মোষের মতো এই মহীশের আড়াইমন ভার প'ড়লে আর দেখতে হবে না। কনে দেখার মতোই পাকা কাজ হবে। পাহাড়ের কোনো কোণেই ওঁকে আর দেখা যাবে না।

দেখতে না দেখতে আড়াই মনী মহীশ আড়াই মনের মাটন হয়ে যাবে। দেখাশোনার বাইরেই।

এসেই ওঁর প্রথম কথা—হাঁস কই? শুরুতেই হাঁসফাঁস।

আমি হাসলাম—এই তো আসছেন, খেয়েদেয়ে একটু আরাম করুন—জিরিয়ে নিন। রোদ পড়লে বেরুনো যাবে। বাংলোর ওধারের—বাংলোর ধার বেয়ে পাহাড়ের কিনারে কত হাঁস যে এসে পড়ে, তার ইয়ত্তা নেই। গুণে শেষ করা যায় না। গেঁথে তুললেই হ'ল।

বটে! বটে! উৎসাহে উনি পাতিহাঁসের মতই ককিয়ে ওঠেন।

হাঁস ধরার কাজ—সে কাজ আজ বিকেলেই হাসিল করা যাবে। বলে আমি একটুখানি হাসি।

তারপর আমার নোট বই বার করে নিজের মনের খবর টুকতে লাগি। সত্যি বললে। আমার—মানে, আমার অন্তর্গত খুনেটার—একটু যেন মন কেমন করে। মহীশের উপর একটু কেমন মায়া হয়। আমার গল্প কাটলেও—এমন কি, আমাকে কটুকাটব্য করলেও এর আসন্ন বিয়োগ আমাকে বিধুর করে তোলে। খাদের তলায় ও কাত হয়ে পপাত। মনশ্চক্ষে সে দৃশ্য দেখে আমি কাতর হই।

কিন্তু আর্ট ফর আর্টস শেক। আর্টের জন্যে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার পেছপা হলে চলে না। আর্টের খাতিরেই আমাকে হার্টলেস হতে হবে, ওকে হার্টফেল করতে হবে। আর্টের কারণেই মহীশকে ত্যাগ করতে হবে আমায়—খাদের মধ্যে ছাড়তে হবে—খাদ্য করতে হবে ওকে বাধ্য হয়েই। মায়া কাটাতে হবে—নির্ব্যক্তিকভাবে—নিদারুণ অমায়িক হতে হবে আমাকে।

বিকেলে আমরা বেরুলাম। ঝকঝকে রোদের ঝলমল দিন। খাদের অভিমুখে রওনা হয়ে গেলাম। যেতে যেতে বললাম—আরেকটু বেলা পড়লেই হাঁসরা আসবে। এসে পড়বে অকুস্থলে। তা'হলেও আজ একটু আগেই বেরুনো যাক।

কিনারাটার কাছাকাছি নোটখানাকে দেখা গেল। ফোকরে আটকানো রয়েছে সেইরকম। ভালই রয়েছে। জ্বল জ্বল করছে উজ্জ্বল আলোয়।

মহীশবাবুর দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করে—দেখুন তো। একখানা দশটাকার নোট না? নোট বলেই যেন বোধ হচ্ছে। ওইখানে, ওই খাদের ধারটায় দেখুন তো!

তিনি দেখলেন, হ্যাঁ, সেইরকমই তো দেখাচ্ছে বটে। আশ্চর্য! এখানে দশ টাকার একখানা নোট এলো কোত্থেকে।

কারও ট্যাঁক থেকে কোনো ফাঁকে পড়ে গেছে বোধহয়। উড়ে গিয়ে আটকে রয়েছে ওইখানে।

কাছে গিয়ে দেখতে হয়। বলে তিনি এগুলেন।

সম্পাদকের দূরদৃষ্টি—লেখকের দূরদৃষ্টের মতোই চিরদিনের। সমান প্রখর। তবে টাকা আদায় করার শক্তি দুজনের সমান দায়। স্বভাবতই সম্পাদকের তা একটু বেশি এবং সম্পাদকেরা সে বিষয়ে বেশ হিসেবী।

সেদিকে লেখকরা বরং একটু বে-হিসাবীই। এই কেন এখনই দেখুন না, চোখের উপরই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মহীশকে আগুয়ান দেখেই আমার মনে হ'ল—আর মনে হয়ে মন খারাপ হয়ে গেল—নোটখানা দশটাকার না হলেও হ'ত। কোনো ক্ষতি ছিল না। পাঁচ টাকার হলেও চলত। এমন কি। একখানা এক টাকার নোটেও চলে যেতে পারত—অনায়াসেই। আমরা লেখকরা আর্টের স্বার্থে এমনই মুক্তহস্ত। এমন কি মুক্ত কচ্ছও বলা যায়। অর্থ ব্যয়ে কোনোই পরোয়া করিনে, বাড়তি খরচে কাতর নই। কিন্তু তাই বলে এমন অপব্যয়েরও তো কোনো মানে হয় না। ...

যাক্‌গে। মহীশ তো গেল। সঙ্গে সঙ্গেই গেল। নোটখানাকে নিয়েই নোটের ওপর তার সম্পূর্ণ মোট পড়তে না পড়তেই ধারটা ধসে পড়ল। মোটামুটি তিনজনাই গেল। পাহাড় (অংশত), মহীশের খার্নকয় হাড (যা তাহার দাঁড়িয়েছে এখন), আর অশোকচক্রের মার্কামারা ওই বাহার—দশ টাকার একখানা এক সহমরণের মহাপ্রস্থানে।

বিদঘুটে মহীশের বিচ্ছিরি চিৎকারের রেশ বাতাসে মিলিয়ে যেতেও বেশিক্ষণ লাগল না।

কাণ্ডটা কেউই দেখতে পায়নি। শুনতেই বা ক'জন পেয়েছে?

ফিরে এসে লিখতে বসলাম গল্পটা—ঘটনাটা টাটকা থাকতেই। মনস্তত্ত্ব মূলক লেখার মূল কথা, মনের ভাব তাজা থাকতেই লিখতে হয়—কাগজের পিঠে তুলতে হয় আমূল। মূল্যের বেলায় যেমনটি। হাতে হাতে নগদ। কিংবা মূল্যের বেলায়ও বলা যায়। সেরকম লেখা কখনোই অমূলক বলে বোধ হয় না। মূল্যে খেলে যা হয়, যেমনটি হয়, সে লেখা পড়ে পাঠকেরও তাই ঘটে! তার মনে ঢেঁকুর উঠতে থাকে—অনেকক্ষণ ধরে। সারা অন্তরকে গন্ধমাদন করে তোলো। উটমুখো সম্পাদকেরা সে-সব লেখারই মূল্য দেন। স্বর্ণ-মূল্য।

সে-লেখা সোনার মতোই। নিতান্তই খাঁটি—তার মধ্যে কোনো খাদ নেই। এবং শোনানোর মতোও। কিন্তু শোনাই কাকে মশাই? ধারে কাছে কোনো সম্পাদক নেই। একজন যিনি ছিলেন তিনি নিজেই এখন জানাশোনার বাইরে। ধর্মতত্ত্বের ন্যায় গভীর গুহায় নিহিত। শোনায় খারাপ, কিন্তু তাহলে তিনি নিজেই এখন খাদ্যের মধ্যে গণ্য।

আনকোরা পাণ্ডুলিপির ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গভীর রাত্রে ঘুমটা ভেঙে গেল হঠাৎ! ঘুমভাঙা চোখ মেলতেই চমকে উঠেছি ...

আমার ঘরের আবছায়া অন্ধকারের ভেতর আমার চেয়ারে বসে—ও কে?

মহীশবাবু না?

দেখেই আমি শিউরে উঠেছি!

একি! আপনি এখানে? ওর গলার তলা থেকে ঘর্ঘর ধ্বনির মতোই আমার কথাটা বেরুলো।

দেখতে এলাম আপনার গল্পটা। জানালেন মহীশবাবু, কেমন ওতরালে দেখি—

সে কি! আপনি মারা যান নি নাকি?

সম্পাদকরা কি সহজে মরে? অত সহজে মরবার? অনেক লেখককে মেরে ঘায়েল করে তবেই একটা সম্পাদক হয়...।

কিন্তু আমি...আমি যে আপনাকে...। বলতে গিয়ে সংকোচে বাধে আমার, বলতে কি! আমি যে, স্বহস্তে ঠিক না হলেও...খুন করলাম যে আমি।

বাধ বাধ গলায় বলি!

সম্পাদকরা তো খুন হয়েই রয়েছেন। লেখার জন্য খুন, লেখকদের নিয়ে খুন, আপনার মতন হবু লেখকদের নিয়ে ঘায়েল তাঁরা আরও...কবে যে আপনারা একটু লিখতে শিখবেন, লেখক হবেন, তার ভাবনাতেও খুন আমরা।

আমি বোধ হয় কোনোদিনই লেখক হ'ব না. ওই হবুই থাকব, হবু হবু হয়েই থেকে যাব। লেখক আর হ'ব না। ...কিন্তু আপনি যে খুন হয়ে গেলেন—আমার চোখের ওপর...! আমাদের বিস্ময় মানে না।

খুন খারাপির টিকে নেওয়া থাকে আমাদের। আমাদের মারে কে?

আপনি খুন হননি বলতে চান?'

খুন হলেই বা কি? সম্পাদকের সাত খুন মাপ। সম্পাদকরা অমর...।

এরপর, খুন তো হয়েই ছিল, খারাপিটাও হতে বাকি থাকল না। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে...।

যা হবার তাই হ'ল। আমি হার্টফেল করলাম।

# পরাশরের কমা, সেমিকোলন

## প্রেমেন্দ্র মিত্র

খামটা নিয়ে বেশ করে নেড়েচেড়ে দেখলাম।

লোকটি তাতে যেন একটু বিরক্ত। কিন্তু পরাশরের খোঁজে এসে যার মারফৎ তার দেখা পাবার আশা করে, তাকে বেশি চটাবার সাহস নেই।

আরেকবার শুধু তাই জিজ্ঞাসা করলে—মিঃ বর্মাকে সত্যি পাওয়া যাবে তো?

তাঁকে পাওয়া যাবে, তাঁকে আমিই আপনার কথা জানিয়েছি, আর এখন দেখলেও আপনার সামনেই ফোন করলাম। তিনিও আসছেন বললেন। —গলাব স্বরে অপ্রসন্নতা চাপা না দিয়েই বললাম,—কিন্তু আপনি কি এই খামটাই শুধু তাঁকে দেখাতে এসেছেন?

একটু দ্বিধা করে লোকটি বললে—আজ্ঞে একরকম তাই। তিনি এটা দেখে কি বলেন তার ওপর আমার অন্য প্রশ্ন নির্ভর করছে।

বেশ, তাহলে অপেক্ষা করুন।

খামটা তাকে ফিরিয়ে না দিয়েই একটা ফাইল টেনে নিয়ে মনোযোগ দেবার ভান করলাম।

লোকটাকে ইতিমধ্যে একটু ভাল করেই লক্ষ্য করেছি। চেহারা পোশাকে বেশ একটু পড়তি অবস্থার লোক বলে মনে হয়। বয়সটাও যৌবন সীমা পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের দিকে হেলেছে।

সে দিক দিকে দু গালের লম্বা কুলফি আর মাথায় ঝাঁকড়া হাল ফ্যাশনের জংলি চুল বেশ একটু বেমানানই লাগে যেমন লাগে চোঙা প্যান্টের ওপর হাতকাটা ওয়েস্ট কোট ধরনের জামাটা। পোশাকের যেটুকু চাকচিক্য আছে তা কাটিয়ে দিয়েছে জুতো জোড়ায়। পুরোনো জীর্ণ শুধু নয় তা পালিশ করবার ব্যবস্থাটুকুও হয়নি। চোখে কালো গগল্‌সটায় যা একটু রহস্যের আভাস অবশ্য আছে।

আমার অফিস ঘরে এসেও গগল্‌সটা যে সে খোলেনি তার স্বাভাবিক কারণ অবশ্য থাকতে পারে। হয়ত চোখ টোক উঠেছে। কিংবা একটা টেরা বা কানা চোখের দরুন ও গগল্‌স এঁটে থাকা খুব আশ্চর্য নয়।

লোকটার চেহারার বিষয়ে আর মনোযোগ না দিয়ে খামটা দেখে কিছু সত্যিই আবিষ্কার করবার মতো আছে কি না বোঝবার চেষ্টা করলাম এবার।

যা কিছু গোয়েন্দাগিরি খুব তাড়াতাড়িই সেরে ফেলতে হবে। পরাশর এসে পৌঁছবার আগেই যাতে রহস্য কিছু থাকলে তা ভেদ করতে পারি।

সূত্র যা হাতে পেয়েছি তা একটা খাম মাত্র।

খামটায় বিশেষত কিছুই নেই এমন অবশ্য নয়. প্রথম হাতে নিলেই কয়েকটা লক্ষণীয় ব্যাপার চোখে পড়ে।

সেইগুলি বেশ একটু ভাল করে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে মিনিট পাঁচেকের বেশি লাগল না। এই পাঁচ মিনিট ধরে খামটা উল্টে পাল্টে নাড়াচাড়া করতে করতে ও এক সময়ে ড্রয়ার থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে খামটার দুপিঠ পরীক্ষা করতে দেখে লোকটা ততক্ষণে ভেতরে ভেতরে বোধহয় খাপ্পা হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত নিজেকে আর সামলাতে না পেরে মুখটা ব্যাজার করে জিজ্ঞাসাই করে ফেললে, আপনিও কি মিঃ বর্মার মতো এসব কাজ করেন না কি?

ইচ্ছে করেই বুঝেও যেন না বুঝে বোকা সেজে জানতে চাইলাম কি কাজের কথা বলছেন?

এই মানে—লোকটি এবার অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, এই গোয়েন্দা গিরির টিরিব কাজের কথা বলছি।

না। এবার গলাটা একটু গম্ভীরই করলাম—গোয়েন্দা গিরি আমার পেশা নয়। আর ঠিক কথা যদি জানতে চান, আপনি যার খোঁজে এসেছেন সেই পরাশর বর্মাও পেশাদার গোয়েন্দা নয়। এটা তার সখ মনে করতে পারেন। খানিকটা সখ আর খানিকটা আপনার মতো নাছোড়বান্দা লোকের পেড়াপেড়িতে একাজ তাকে করতে হয়।

খামটা নাড়াচাড়ায় মুখ ব্যাজার করার রেশ হিসেবে লোকটাকে বেশ একটু অপ্রস্তুত করে একটু থেমে এবার জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা পরাশর বর্মার খোঁজ করতে আমার এখানে কেন এসেছেন বলুন তো! পরাশর বর্মার খোঁজ এ ঠিকানায় পাওয়া যায় তাই বা কেমন করে জানলেন।

জানলাম মানে, লোকটা প্রথম একটু ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত যেন সাহস করে কথা বলে গেল, নাম ও খ্যাতির কথা জানলেও পরাশর বর্মার নিজের ঠিকানা অনেক চেষ্টা করেও জোগাড় করতে পারিনি। তারপর মিঃ বর্মা সম্বন্ধে আপনার ক'টা বই পড়ে মনে হ'ল ঠিকানাটা আপনার কাছে এলে বোধহয় পাওয়া যাবে। আপনার ঠিকানাও বইগুলোতে নেই। তবে আপনার কাগজটার নাম সেখানে পেয়ে তাই থেকে এ ঠিকানা বার করতে কষ্ট হয়নি।

তার বিবরণটার ভেতর চাতুরি বা মিথ্যে কিছু নেই বলেই মনে হ'ল। একটু চুপ করে থেকে আবার বললাম, এবার আপনার নামটা জানতে পারি? নামটা অবশ্য আগেই জানতে চাওয়া উচিত ছিল। আমার যেমন ভুল হয়েছে আপনারও তেমনি। আপনিও গোড়ায় পরাশর বর্মার খোঁজ করলেও নিজের নামটা জানাননি।

সেটায় দরকার বোধ করিনি তাই। লোকটি এবার একটু ক্ষুব্ধ স্বরে জবাব দিলে. আপনি জিজ্ঞাসা করলে নামটা নিশ্চয় বলতাম। ওটা গোপন করার কোনো মতলব আমার ছিল না। আমার নাম হ'ল রবার্ট গোমেজ।

রবার্ট গোমেজ! এবার আমার একটু অবাক হবার পালা, আপনি কি তাহলে....

আমার অসমাপ্ত প্রশ্নটা নিজেই পূরণ করে নিয়ে গোমেজ জবাব দিল, না। আমি জন্মসূত্রে বাঙালী নই।

কিন্তু আপনি তো চমৎকার বাংলা বলেন! লোকটির দিকে এবার একটু প্রশংসার দৃষ্টি নিয়েই তাকালাম।

তা বলা খুব আশ্চর্য কিছু নয়, গোমেজ একটু হেসে বললে, আমার জন্ম কেরালায় হলেও ছেলেবেলা থেকে আমি এই বাংলাদেশে মানুষ হয়েছি। পড়াশোনাও করেছি এখানে। এখন বাঙালী এক বন্ধুর সঙ্গে একটা কারবার করি।

একটু থেমে হঠাৎ একটু অধৈর্য প্রকাশ করে গোমেজ আবার বললে, আপনার বন্ধু মিঃ বর্মার এতক্ষণে আসা উচিত ছিল না কি? আর একবার ফোন করে দেখবেন?

না। তার দরকার হবে না। একটু হেসে গোমেজকে আশ্বাস দিলাম, কথা যখন দিয়েছে পরাশর তা রাখবেই। তবে কলকাতায় আজকালকার ট্রাফিক কি তা তো জানেন। রাস্তায় কোথাও আটকে পড়েছে হয়ত। আর একটা কথা আপনাকে বলছি—

একটু থেমে নিজের বক্তব্যটাকে অতিরিক্ত কিছু ওজন দিয়ে বললাম, আপনার যা সমস্যা তার জন্যে পরাশর বর্মার সাহায্যের দরকার আছে বলে আমার মনে হয় না। খামটা আমি নাড়াচাড়া করায় আপনি খানিক আগে খুশি হননি জানি।

গোমেজের মৃদু একটু প্রতিবাদ আশা করে আবাব একটু থেমেছিলাম। কিন্তু গোমেজ যেমন ছিল তেমনি রইল। ক্ষোভটুকু মনের মধ্যে চেপে আবার বলতে হ'ল, কিন্তু আপনার খামের রহস্য যা বার কববার তা আমিই বার করে ফেলেছি। আমি যা বলছি পরাশর এলে তার বিচারের সঙ্গে মিলিয়েই দেখতে পারবেন।

প্রথমতঃ খামটা তাই সামনে তুলে ধরে বললাম, খামটার আকারটা লক্ষ্য করবার মতো। চৌকো ধরনের ছোট খাম। এ ধবনের খাম আর ডাকঘরে পাওয়া যায় না। খামের সঙ্গে ছাপা ডাকটিকিটটাও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। টিকিটটা পনেরো পয়সার। পনেরো পয়সার টিকিট অনেক দিন আগে থেকেই বাতিল হয়েছে। খামটা কবেকাব তা ঠিক করবার আরও দুটো চিহ্ন আছে। একটা হ'ল এই যে খামটা পনেরো পয়সার টিকিটের হলেও তার পাশের পাঁচের অভাবে একেবারে দশ পয়সার উপরি একটা টিকিট আঁটা হয়েছে। শুধু তাই নয় মোট কুড়ি পয়সাব বেশি টিকিট থাকলেও তার সঙ্গে রিফিউজি টিকিট লাগানো নেই। তার মানে পনেরোর জায়গায় কুড়ি পয়সার টিকিট চালু হবার পবে আর রিফিউজি টিকিট প্রবর্তনের আগেকার কোনো সময়ে এ খামটায় ঠিকানা লেখা হয়েছে। ঠিকানা যা লেখা হয়েছে তা থেকেও চেষ্টা করলে কিছু কিছু আবিষ্কার করা যায়, হাতের লেখা বেশ পরিষ্কার গোটা গোটা জোরালো। নামটা দেখা যাচ্ছে ম্যানুয়েল দ্য মেলো আর ঠিকানাটা কেরালার। তার মানে আপনার নিজের জাতেব কোনো লোকেব নামে আপনার নিজের প্রদেশে পাঠাবাব জন্য এ খামটায় ঠিকানা লেখা হয়েছিল। খামটা তারপর কোনো কারণে আর ব্যবহার করা হয়নি। তাতে এ খামটা নিয়ে আপনার এত অস্থির হবার কি আছে বুঝতে পারছি না। পরাশর বর্মাকে দিয়ে তদন্ত করাবার মতো রহস্য এর মধ্যে কি আছে?

আছে এই যে—গোমেজ একটু দ্বিধা করে বললে—ও! ম্যানুয়েল দ্য মেলো আমার একজন পরম শত্রু। এককালে ওকে আমি আমার কারবারের ম্যানেজার করে আমার বাড়িতে রেখেছিলাম। তারপর ওর অবাধ্যতা আর অকর্মণ্যতায় বেগে গিয়ে ওকে বাড়ি থেকেই

তাড়িয়ে দিই। সেই ম্যানুয়েলের নাম ঠিকানা লেখা খাম আমার ড্রয়ারের কাগজপত্রের মধ্যে থাকে কি করে।

এখন তো বোঝা যাচ্ছে—গোমেজকে বুঝিয়ে বললাম—ও খামটা অনেক আগেকার। চিরকাল তো ম্যানুয়েলেব সঙ্গে আপনার ঝগড়া ছিল না। ও খামটা সেই আগেকার দিনে, তাকে চিঠি দেবার জন্যে। হয়ত ঠিকানা লিখে রেখেছিলেন। তারপর ভুলে গেছেন বা আর পাঠাবার দরকার হয়নি।

তবে আর একটা কথাও ভাববার আছে। —নিজের বিচারই আগে নির্ভুল করবার চেষ্টায় বললাম—এ খামের ঠিকানায় কাব হাতের লেখা সেটাও জানা দরকার। আপনি আজকে আমার কাছে আসবেন বলে নাম না দিয়ে শুধু বিপন্ন বলে সই করে যে পোস্টকার্ডটায় পরাশরের সঙ্গে আজ সকালের সাক্ষাৎ চেয়েছিলেন তার লেখা দেখে বুঝছি, এ খামের ঠিকানা আপনার লেখা নয়। কিছু মনে করবেন না। আপনার হাতের লেখা কাঁপা কাঁপা। তার লাইনগুলোও সোজা নয়, আঁকা বাঁকা। এ খামের ঠিকানা কিন্তু পুরুষালি শক্ত হাতে লেখা। সে লেখা কার হতে পারে আপনারই তো বোঝবার কথা। আপনার বাড়িতে আর পুরুষ কে আছে?

কেউ নেই! জোর দিয়ে বললে গোমেজ।

আগেও কেউ ছিল না।

কেউ নেই, আর আগেও কেউ ছিল না! —আশ্চর্য হয়ে বললাম—আমি অবশ্য ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খামের ওপর আঙুলের ছাপ যা পেয়েছি তা বড়দের নয়, ছোট বাচ্চার বলেই মনে হয়। বাচ্চা ছেলেপুলে কেউ আছে?

না। তাও নেই—গোমেজ দৃঢ়ভাবে জানালে—বাড়িতে আমি আর আমার মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। আপনি যা বলছেন তাতে তো ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হ'ল। আমার বাড়িতেই অন্য কারুর হাতে লেখা আমার পরম শত্রুর নাম ঠিকানা দেওয়া খাম কোথা থেকে এলো।

সেটা খুব আশ্চর্য ব্যাপার বোধহয় নয়।

আমি ও গোমেজ দুজনেই চমকে ফিরে তাকালাম। নিজেদের আলোচনায় তন্ময় থাকবার দরুণ পরাশব কখন এসে পেছন দিকে দাঁড়িয়েছে খেয়ালই করিনি।

পরাশর হেসে গোমেজের পাশেই একটা চেয়ার টেনে বসার পর একটু অবিশ্বাসের সঙ্গেই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম,—ব্যাপারটা আশ্চর্য নয় বলছ? মিঃ গোমেজের সমস্যাটা তুমি শুনেছ?

কিছুটা শুনেছি!—বলে আমার হাত থেকে খামটা টেনে নিয়ে সে বললে—এখন বাকিটা শুনতে চাই—তোমাকে লেখা মিঃ গোমেজের পোস্টকার্ডটাও দেখতে চাই।

পোস্টকার্ডটা বার করে দেখার পর সেটা এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে খামটা দেখতে দেখতে সে একটু হেসে বললে—যাক, রহস্যটার মীমাংসা হয়ে সব সমস্যা মেটাবার একটা উপায়ও পাওয়া গেছে।

কি সে উপায়?—গোমেজের আগে আমিই জিজ্ঞাসা করলাম একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে—তুমি কি আমার বিচারগুলো সব ভুল বলছ?

না না, মোটেই নয়।—পরাশর তাড়াতাড়ি আমায় আশ্বস্ত করলে—শুধু তোমার

সিদ্ধান্তগুলোয় সামান্য ক'টা কমা সেমিকোলন লাগাতে হবে। আর সমস্যা মেটাবার উপায় হ'ল...একটু থেমে গোমেজের দিকে ফিরে পরাশর বললে—ম্যানুয়েলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেওয়া।

ম্যানুয়েলের সঙ্গে বিয়ে দেবো লুসির—গোমেজ প্রায় লাফিয়ে উঠল চেয়ার থেকে—যাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি সেই অপদার্থটার সঙ্গে!

আপনি অপদার্থ মনে করতে পারেন। পরাশর শান্ত কণ্ঠে বললে—কিন্তু আপনার মেয়ে লুসি তা করে না। সে ম্যানুয়েলকে নিয়মিত চিঠি লেখে বলেই মনে হয়।

কক্ষনো না।—গোমেজ প্রতিবাদ করলে—খামের ওপরকার লেখা ঠিকানা লুসির বলতে চান?

না। পরাশর আমাদের একেবারে তাজ্জব করে দিয়ে বললে—ও ঠিকানা আপনার হাতের লেখা।

গোমেজ কিছু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, তাঁকে থামিয়ে হেসে বললাম, না পরাশর, এবার তোমার ভুল হচ্ছে। ওঁর পোস্টকার্ডের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলেই বুঝবে খামের লেখা অন্য কারুর।

পোস্টকার্ডের লেখা দেখেই বুঝেছি খামের লেখাটা মিঃ গোমেজেরই।—পরাশর হঠাৎ গোমেজের দিকে ফিরে একটু আদেশের স্বরে বললে, আপনার চোখের ঠুলিটা খুলুন তো মিঃ গোমেজ।

কেন?—গোমেজ বেশ অবাক ও বিচলিত হয়ে বললেন, গগল্‌স খুলতে বলছেন কেন?

কেন বলছি আপনি নিজেই জানেন।—পরাশর এবার নরম গলাতে বললে—তবু খুলুন।

গোমেজ নিরুপায় হয়েই গগল্‌সটা এবার খুললে। খোলার পর বুঝতে আর বাকি রইল না যে গোমেজের দুটি চোখই প্রায় অচল। একটি তার কানা আর একটি কোনো অসুখে ঘোর রক্ত বর্ণ। তাঁর কথায় জানা গেল যে যদিও গগল্‌স তিনি বহুকাল ধরে ব্যবহার করেন, তাঁর ভাল চোখটার অসুখ হবার পর থেকে তিনি ভাল করে আর দেখতেও পান না।

সেটা আপনার এই পোস্টকার্ড দেখেই বোঝা যাচ্ছে।—বললে পরাশর—লাইনগুলো আঁকাবাঁকা অক্ষরগুলো কাঁপা কাঁপা। আপনার খামের ওপরকার ঠিকানা কিন্তু শক্ত হাতে লেখা। ও ঠিকানা যখন লিখেছিলেন তখন আপনার ভাল চোখটায় কোনো রোগ হয় নি। গগল্‌স থাকলেও স্বাভাবিক ভাবে আপনি কাজ কর্ম করতে পারতেন। ঠিকানাটা অবশ্য অনেকদিন আগে লিখেছিলেন। তখন রিফিউজি টিকিটের তো দরকার হতোই না। পনেরো পয়সার টিকিটেই খামের চিঠি যেত।

তুমি বলতে চাও কুড়ি পয়সার টিকিট চালু হবার আগে সেই পনেরো পয়সার টিকিটের দিনে ওখামের ঠিকানা লেখা হয়েছে।—পরাশরকে চ্যালেঞ্জ না করে পারলাম না—পনেরো পয়সার আগে দশ পয়সার টিকিটটা দেখেছ?

সেটা দেখেই বলছি। পরাশর ব্যাখ্যা করলে। এ টিকিটটা আর বছরের 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড ফেয়ার' স্মরণিকার। রিফিউজি টিকিট দরকার হবার আগে শুধু কুড়ি পয়সার টিকিটের দিনে এ টিকিট বারই হয় নি। এ টিকিট সুতরাং সম্প্রতি লাগানো হয়েছে। আপনার ড্রয়ারের কাগজ-পত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে এ পুরোনো খামটা পেয়ে ব্যবহারের জন্যে কেউ এটা পেয়ে তাতে

এখনকাব দশ পয়সার স্ট্যাম্প লাগিয়েছে। ব্যবহার করা কিন্তু তার আর হয় নি। আর আগেই খামটা আপনি পেয়ে গেছেন। চোখ খাবাপ থাকার দরুণ নিজের লেখাটা ঠিক ঠিক ধরতে পাবেন নি। শুধু ম্যানুয়েলের নামটা পড়ে ক্ষেপে গেছেন। আপনার সন্দেহ হয়েছে।

পরাশরকে বাধা দিয়ে উত্তেজিতভাবে বললে গোমেজ—হ্যাঁ, সন্দেহ হয়েছে ম্যানুয়েল কোনো গভীর অসৎ উদ্দেশ্যে এরকম খাম আমার টেবিলের দেরাজে রাখার ব্যবস্থা করেছিল।

সেরকম কোনো উদ্দেশ্য আপনি চেষ্টা করেও ভেবে বার করতে পারেন কি? আপনি তার উপর বিরূপ বলেই মিছিমিছি সন্দিগ্ধ হয়েছেন। পরাশর একটু হেসে তারপর গম্ভীর হয়ে বললে, না মিঃ গোমেজ এ খামটি নেহাৎ নির্দোষ জিনিস, ম্যানুয়েলের এর সঙ্গে এইটুকুই সংশ্রব যে একজন কেউ তাকে এখানে চিঠি পাঠাবার মতলব করেছিল। সে যে কেউ হতে পারে? আপনার বাড়িতে, আপনি আর আপনার মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। কৃত্তিবাস কিন্তু ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে চিঠির ওপর এমন ছাপ কেটেছে যা বাচ্চা বলে মনে হয়।

একটু থেমে পরাশব আমার দিকে ফিরে বললে—বাচ্চার বলে যা ভেবেছ তা মিঃ গোমেজের মেয়ের আঙুলের ছাপ। ছোট বলে তোমার বাচ্চার বলে মনে হয়েছে। মিঃ গোমেজ ম্যানুয়েলকে তাড়িয়ে দেবার পরও তাঁর মেয়ে তাকে চিঠিপত্র লেখার চেষ্টা করে যদি ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাহলে সাধারণ দৃষ্টিতে তার মধ্যে হৃদয়ঘটিত ব্যাপার আছে বলেই সন্দেহ হয় না কি? ব্যাপারটা ঠিক কি হতে পারে মিঃ গোমেজই অবশ্য একটু স্থির হয়ে ভাবলে বুঝতে পারবেন। আমার পরামর্শ হচ্ছে যদি সেরকম দারুণ কোনো বাধা না থাকে তাহলে ওদের দুজনের মিলনের কথাটা মিঃ গোমেজ যেন আরেকবার একটু উদার হয়ে ভেবে দেখেন।

মিঃ গোমেজ কেমন একটু আচ্ছন্নের মতো ধন্যবাদ দিয়ে চলে যাবার পর পরাশরকে বললাম, নিজেকে আমার যে এখন গবেট বলে মনে হচ্ছে।

না, না গবেট হবে কেন?—পরাশর আমায় আশ্বাস দিলে—তুমি সব ঠিকই ধরেছিলে। আমি তোমার কথায় ওই যা বলেছি, একটু কমা সেমিকোলন বসালাম মাত্র।

# দ্বিতীয় দৃষ্টি

## বিমল কর

মাঝ রাস্তায় গাড়িটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। গাড়িতে আমরা চারজন ঃ পারিজাত, তার স্ত্রী লীলা, মণি সেন আর আমি।

আমরা দুপুরে শশী দত্তের কোলিয়ারীতে এক পেট খেয়ে, বিশ্রম সেরে বিকেল নাগাদ বেরিয়ে পড়েছিলাম। শশীকে বড় মনমরা দেখাচ্ছিল। তার মতন আমুদে জীবন্ত মানুষটা যেন একেবারে প্রাণহীন হয়ে গেছে। হবারই কথা। মাসখানেক আগে তার স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে। আচমকা। স্ত্রীর কথাই বলছিল শশী। তার চোখ ছলছল করে উঠছিল।

মণি সেন শশীর মাসতুতো ভাই। সমবয়সী। মণি সেন শশীর কোলিয়ারী থেকে এগারো মাইল দূরে এক হাসপাতালের ডাক্তার। নতুনই একরকম। বছরখানেকও আসেনি।

পারিজাত জাত ব্যবসাদার। তারা দু' পুরুষ ধরে কন্ট্রাক্টারি করে আসছে। বনেদী পরিবার। আভিজাত্যের সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষা বস্তুটাও কম নেই। ঝরঝরে ছেলে। কাজকর্মের ব্যাপারে পাকা। আবার এমনিতে হৈ-হল্লা, গানবাজনা, শিকার—সবটাতেই আছে। তার স্ত্রী লীলাকে পরী বা উর্বশী বলা যাবে না, তবু লীলা সুন্দরী, সুশ্রী। চোখমুখ খুব কাটাকাটা। লীলার চোখ কিন্তু কেমন যেন! মনে হয়, তলায় তলায় কত কিছু যেন বয়ে যাচ্ছে।

আমার ভূমিকাটা এই ক'জনের মধ্যে খানিকটা বেয়াড়া। আমি পারিজাত বা মণি সেনদের চেয়ে বয়েসে কিছুটা বড়। আমার কাজকর্মের ধরনটাও আলাদা, আমি না ম্যানেজার না ইঞ্জিনিয়ার, না ডাক্তার, না কন্ট্রাক্টার। তা হলে আমি কী! আমাকে অনেকে বলে, 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর' দলে। কথাটা মোটামুটি ঠিক। আপাতত ওই পরিচয়টাই থাক।

আমরা গাড়িতে খুব একটা বেশি দূর যাচ্ছিলাম না। মাত্র মাইল নব্বুই। পারিজাতদের নতুন একটা বাংলো বাড়ি কেনা হয়েছে বিষ্ণুগড়ে। তুষুয়া লেকের পাশে একসময়ে আধা সাহেব ও বড়লোকদের ছোট ছোট বাংলো বাড়ি ছিল। সেগুলো একে একে বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। নতুন বা উঠতি ব্যবসাদার বড়লোকরা সেগুলো কিনে নিচ্ছিল। পারিজাতরাও শখ করে একটা কিনেছে। ওর কথাতেই আমরা বাড়িটা দেখতে যাচ্ছিলাম।

যে-জায়গায় এসে গাড়ি আটকাল সেই জায়গাটা জঙ্গল গোছের। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। আমাদের আরও মাইল তিরিশ যেতে হবে। আবহাওয়াটা অবশ্য ভালই। ফাল্গুন মাসের শেষ। আকাশেও যথেষ্ট চাঁদের আলো।

গাড়িটা রাস্তার একপাশে সরিয়ে পারিজাত বনেট তুলে গাড়ির গোলমাল শোধরাবার চেষ্টা করছিল।

মণি সেন তার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল অল্পক্ষণ। তারপর সরে গেল।

লীলাও গাড়ির কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল কিছুক্ষণ; সরে গিয়ে এদিক ওদিক পায়চারি করছিল।

আমি পারিজাতের সামনে টর্চ ধরছি আর ফরমাস খাটছি।

'কি রে, হবে?' আমি বললাম।

'ওর বাবা হবে,' পারিজাত বলল। 'দাও তো, একটু ধোঁয়া টেনে নি।'

পারিজাত মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাকে সিগারেট দিলাম।

লীলা সামান্য তফাতে। মণি সেনকে দেখতে পাচ্ছি না।

পারিজাত লীলাকে বলল, 'এই, তোমার কফি ফ্লাস্কে আর কফি নেই?'

'কি জানি!'

'কি জানি কী! দেখো। থাকা উচিত। দাও, আর এক রাউন্ড করে দিয়ে দাও।'

লীলা গাড়ির কাছে এসে পেছনের সিটের পায়ের দিকে রাখা বাস্কেট থেকে ফ্লাস্ক বার করল।

প্লাস্টিকের ব্যাগে পেপার গ্লাস ছিল কয়েকটা, আমি গ্লাসগুলো বার করলাম।

পারিজাত বলল, 'মণিবাবু কোথায়?'

'এখানেই তো ছিল।'

'ডাকো তো সন্তুদা!'

আমার নাম সন্তু। ডাক নাম। ভাল নাম সন্তোষ। আমি উঁচু গলায় মণিকে ডাকতে লাগলাম।

লীলা পারিজাতকে কফি দিল। আমাকেও।

মণি সেনের কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

পারিজাত বলল, 'লোকটা উবে গেল নাকি হাওয়ায়? আশ্চর্য!'

'আমি দেখছি।'

'দেখো।'

পারিজাত কোনো রকমে কফিটুকু শেষ করে আবার লেগে পড়ল গাড়ি সারাতে। এখনও অন্ধকার হয়নি। তবে পাহাড়ী জায়গা বলে ছায়ায় ছায়ায় ঝাপসা হয়ে এসেছে। এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি বলতে মাঝে মাঝে প্রাইভেট গাড়িই যাচ্ছে, লরি বা বাস আপাতত চোখে পড়ছে না, মাইল দশেক আগে একটা চৌমোড় পেরিয়ে আসার পর আর বাস লরির চিহ্ন দেখছি না। দু-একটা গাড়ি আমাদের পাশে এসে থেমে গিয়ে জানতে চেয়েছে—কোনো আপদ বিপদ ঘটেছে কি না—বা তার দ্বারা কোনো সাহায্য হতে পারে কি না!

পারিজাত বলেছে, 'মাইনর ফল্ট। ইট উইল বি ও-কে স্যার। থ্যাংক ইউ।'

গাড়িগুলো আর দাঁড়ায়নি।

পারিজাত নতুন করে কাজে লাগার সময় বলল, 'সন্তুদা, মিনিট কুড়ি কী আধঘণ্টা। কারবুরেটারটা গণ্ডগোল করছে।'

## দ্বিতীয় দৃষ্টি

আমি মণি সেনকে খুঁজতে বেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম।

ফাঁকা রাস্তা। দুপাশে বিশাল বিশাল গাছ। এপাশে ওপাশে গাড্ডা, মানে পঞ্চাশ ষাট ফুট করে খাদ। চারদিকে জঙ্গল। বিশাল বিশাল শিরীষ, শিশু, শালের মাথার ওপর আকাশটাও যেন ছোট হয়ে এসেছে। ওরই মধ্যে জ্যোৎস্না উঠে গিয়েছিল। বোধ হয় পূর্ণিমা।

মণি গেল কোথায়?

আমি মণিকে ডাকতে ডাকতে আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই হঠাৎ মেয়েলী গলার চিৎকার শুনলাম। লীলার গলা। কী হ'ল?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে গাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করলাম।

গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দেখি—পারিজাত গাড়ির সামনে রাস্তায় মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে। মাথাটাও সোজা রাখতে পারছে না। একপাশে হেলে পড়েছে। লীলা তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। পারিজাতের একটা হাত তার হাতে।

'কী হয়েছে?' আমি বললাম।

'বুক .....।' লীলা বলল, 'কেমন করছে দেখুন না!'

'বুক! .... কী হয়েছে বুকে?'

পারিজাত ঘামছিল। কোনো রকমে বলল, 'ব্যথা.....।'

ব্যথা!

পারিজাত সুস্থ সবল ছেলে। ব্যথা বেদনায় সে ভোগে না। তার কোনো অসুখ বিসুখও নেই। তা হলে?

মণিকে এখন আমাদের ভীষণ দরকার। মণি ডাক্তার। কিন্তু সে কোথায়?

লীলা বলল, 'সন্তুদা, মণিবাবু—?'

'দেখতে তো পেলাম না।'

'কোথায় গেলেন?'

'কী জানি! এই জঙ্গলে যাবার জায়গাই বা কোথায়?'

পারিজাত জল চাইল।

জল দিল লীলা ওয়াটার বটল্ থেকে।

কী করব ভাবছি, এমন সময় মণিকে দেখা গেল। মণি আসছে, আমরা চেঁচিয়ে তাকে ডাকতে লাগলাম।

মণি কাছে এলো। তার কোনো তাড়া নেই।

'কী হয়েছে!'

'বুকে ব্যথা! ছটফট করছে।' লীলা বলল।

মণি হাঁটু গেড়ে বসল রাস্তায়। প্রথমেই কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটা দেখল। তারপর পারিজাতের হাতটা তুলে নিল। আমার মনে হ'ল, হাত তুলে নাড়ি দেখার ব্যাপারে আগ্রহ তার যেন নেই। খারাপ লাগছিল আমার।

মণি বলল, 'কেটে যায়নি। যাচ্ছে। ... কোনো ভয় নেই।' বলে পারিজাতের হাত নামিয়ে রাখল।

মণি যখন উঠে দাঁড়াচ্ছে—ওর চোখ মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বড়ই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। দুই চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, যেন অন্য জগতের, মুখ শান্ত, গম্ভীর, কপালের চামড়াগুলো কুঁচকে উঠেছে।

আমরা বললাম, 'হয়েছে কী?'

মণি কোনো জবাব দিল না।

প্রায় কুড়ি পঁচিশ মিনিট পরে আমরা পারিজাতকে গাড়িতে তুলে আবার যাত্রা করলাম। মণি গাড়ি চালাচ্ছিল এবার। পারিজাত আর লীলা পেছনে বসে—আমরা দু-জন সামনে।

'মাইল ছয় এগিয়ে এসে দেখি—একটা কালভার্ট ভেঙে নিচের নদীতে পড়েছে। নদী বলা ভুল। বড় নালার মতন একটা জলধারা। জল নেই এখন। পাথরে ভর্তি। কালভার্টটা খুবই ছোট, তার বাঁ দিকের অনেকটা জায়গা ধসে নিচে পড়ে গিয়েছে। ওপাশে কিছু লোক, দুই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। ওদের হাতে আলো। লাল কাচ পরানো লণ্ঠন।

আমাদের গাড়ি থামাতে হ'ল।

পারিজাত সুস্থ। তার আর কোনো কষ্ট নেই।

মণি মাটিতে নেমে কালভার্টটা দেখে এসে বলল, 'আমরা যদি সময় মতন আসতুম—গাড়ি না বিগড়ে যেত—আমাদের গাড়ি কালভার্টের ওপর থাকত তখন, আর কালভার্ট ধসত।

আমি বললাম, 'কে বলল?'

'আমি। আমি এটা আন্দাজ করতে পেরেছিলাম।'

'আপনি! আপনি কী ভগবান মশাই? পারিজাত বলল।

মণি হেসে হাসল, তাকালো লীলার দিকে। বলল, 'আপনার হাত ব্যাগে একটা ছোট খাম দিয়েছিলাম তখন, শশীদার বাড়িতে। খামটা খুলে একটা চিরকুট পাবেন। দয়া করে এঁদের দেখান তো।'

লীলা ব্যাগ খুলে খাম বার করল। খামের মধ্যে দু লাইন লেখা।

লেখাটা জোরে জোরে পড়ল লীলা। শুনে আমরা চমকে উঠলাম।

'বিষ্ণুগড় পৌঁছবার আগে রাস্তায় অ্যাকসিডেন্ট হবে। কিছু ভেঙে পড়বে। অন্তত ঘণ্টা খানেক রাস্তার মধ্যে আটকে যাওয়া ভাল।'

অনেকক্ষণ পরে আমি বললাম, 'তুমি কি আমাদের গাড়ি আটকে দিলে নাকি?'

'বলতে পারব না।'

'সময় ঠিক, করলে কেমন করে?'

'চাঁদ দেখে।'

'তুমি এসব জানলে কেমন করে?'

'তা জানি না। আমার এমন হয়। শশীদাকে আমি বলেছিলাম বৌদির কথা। কেন হয় আমি জানি না।'

# অদৃশ্য চুম্বক

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ট্রেনে প্রত্যেকদিনই ভিড় থাকে। বসবার জায়গা পাওয়া একটা দৈবাৎ সৌভাগ্যের ব্যাপার। কলেজ থেকে ফেরার সময় সুলেখাকে প্রায় রোজই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আসতে হয়। যদিও সে মেয়েদের কামরায় ওঠে, তবু সেখানেও জায়গা থাকে না।

মঙ্গলবার দিন ছুটি হয়ে গেল একটু তাড়াতাড়ি। সুলেখার কয়েকজন বন্ধু সিনেমা দেখবে ঠিক করল। কলেজেব কাছেই সিনেমা হল। সেখানে চার্লি চ্যাপলিনের একটা ছবি এসেছে। সুলেখাও রাজি হয়ে গেল। চার্লি চ্যাপলিনের দুটি মাত্র ছবি দেখেছে এর আগে, সেই থেকে চার্লি তার দারুণ প্রিয়।

কিন্তু সিনেমা হলে গিয়ে টিকিট কেটে গেট দিয়ে ঢোকবাব মুখে সে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বন্ধুদের বলল, না রে, আমি আজ যাব না, তোরা যা!

বন্ধুরা সবাই অবাক। পাঁচটি মেয়ে দশটি বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস কবলো, কী ব্যাপার যাবি না কেন?

সুলেখা বলল, আমার শরীরটা আজ কী রকম লাগছে! আমি বরং বাড়ি চলে যাই।

এই মেয়ের দলের মধ্যে কৃষ্ণাই সুলেখার বেশী বন্ধু। ওদের বাড়িও কাছাকাছি।

কৃষ্ণা এবারে একটু উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, শরীর খারাপ লাগছে? কী হয়েছে রে? পেট ব্যথা করছে?

সুলেখা ভুরু কুঁচকে বলল, না, সে রকম কিছু না, ঠিক বুঝতে পারছি না, কী রকম যেন লাগছে! তোরা চলে যা, তোদের দেরি হয়ে যাবে। অন্য মেয়েরা বলতে লাগল, চল চল, একটু বাদেই ঠিক হয়ে যাবে। চার্লি চ্যাপলিন এমন হাসাবে তাতেই সব অসুখ সেরে যায়।

কৃষ্ণা বলল, না রে, টিকিট কাটার পরেও ও যখন যেতে চাইছে না, তখন নিশ্চযই সিরিয়াস কিছু ব্যাপার। এই সুলেখা, তুই একলা ফিরতে পারবি, না আমিও তোব সঙ্গে যাব?

সুলেখা বলল, না না, তার দরকার নেই। আমি ঠিক চলে যাব।

টিকিট ফেরৎ দিয়ে সুলেখা একটা সাইকেল রিক্সা নিয়ে চলে এলো স্টেশনে। ঘড়ি দেখলো পৌনে তিনটে বাজে। আর দশ মিনিটের মধ্যেই কৃষ্ণনগর লোকাল এসে যাবে।

সুলেখার ঠিক যে শরীর খারাপ লাগছে, তা নয়। আবার বন্ধুদের সে মিথ্যে কথাও বলেনি। শরীরটা কী রকম লাগছে। কী রকম যেন একটা অস্বস্তি। গত তিনদিন ধরে মাঝে মাঝেই

এরকম হচ্ছে তার। শরীরটা হঠাৎ ঝিম ঝিম করে উঠছে। তখন মনে হয়, কোথাও কে যেন খুব করে ডাকছে তাকে। তার এক্ষুনি যাওয়া দরকার।

ঠিক সময়েই ঝমঝম করে স্টেশনে এসে ঢুকল কৃষ্ণনগর লোকাল। এখন ট্রেন মোটামুটি ফাঁকা। মেয়েদের কামরায় মাত্র সাত আটজন রয়েছে। একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলল সুলেখা। বাবাঃ, কতদিন পরে যেন আজ সে বসে বসে যেতে পারবে।

কামরায় উঠে জানালার ধারে একটা জায়গা পেয়ে সুলেখা মাথা হেলিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সুলেখার বাড়ি মাত্র চারটে স্টেশন পরে। এই ট্রেনে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগার কথা। সুলেখার জ্ঞান ফিরল দেড় ঘণ্টা পরে।

ট্রেন তখন একটা অচেনা স্টেশনে থেমেছে। সুলেখা নেমে পড়ল টপ করে।

সে যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল কিংবা বাড়ি ছাড়িয়ে এতটা দূরে চলে এসেছে, সে জন্য একটুও দুশ্চিন্তার ছাপ নেই তার মুখে। বরং মুখখানা বেশ খুশী খুশী দেখাচ্ছে।

এমন হন হন করে বেরিয়ে গেল সুলেখা যে গেটের টিকিট চেকার তার কাছে টিকিট চাইল না। এই জায়গাটায় সুলেখা আগে কখনো আসে নি। অচেনা জায়গায় এলেই মানুষের মুখ-চোখ একটু অন্যরকম হয়ে যায়। কিন্তু সুলেখা বেশ সচ্ছন্দভাবে নেমে এলো স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে। বাইরে কয়েকটা সাইকেল রিক্সা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কাছে গেল না সুলেখা। স্টেশনের সামনে তিন দিকে তিনটে রাস্তা। বিনা দ্বিধায় ডান দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগল সুলেখা।

নীল রঙের শাড়ি পরে আছে সুলেখা, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগে তার বই-খাতা, তার চুল বেণী করে বাঁধা। তরতর করে সে হাঁটতে লাগল, যেন এই রাস্তা তার অনেক দিনের চেনা। এখানেই তার বাড়ি।

খানিকটা বাদেই শহর ফুরিয়ে গেল, রাস্তার দু'ধার প্রায় ফাঁকা। এক জায়গায় একটা ছোট ব্রীজ, তার তলা দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে যাচ্ছে।

এবারে মূল রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে নদীর ধারের সরু পথ ধরে হাঁটতে লাগল সুলেখা। মিনিট পাঁচেক হাঁটবার পর রাস্তাটা এক জায়গায় শেষ হয়ে গেল। সেখানে একটা ইঁটখোলা। সেই ইঁটখোলাটায় অনেক দিন কাজ বন্ধ, লোকজন নেই, এখানে ওখানে আগাছা জন্মে আছে।

একটা ছোট ছেলে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে সুলেখাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, ও দিদি, এ দিকে কোথায় যাচ্ছেন?

সুলেখা থমকে দাঁড়িয়ে অদ্ভুতভাবে তাকাল ছেলেটির দিকে। তার চোখ দুটো যেন জ্বল জ্বল করছে। সে তাকিয়েই রইল, কোনো কথা বলল না।

ছেলেটি আবার জিজ্ঞেস করল, দিদি, এদিকে কোথায় যাবেন? কার বাড়ি খুঁজছেন?

সুলেখা বলল, চুপ!

তারপর সে আবার হাঁটতে লাগল ইঁটখোলার মধ্য দিয়ে।

ছেলেটি চেঁচিয়ে বলল, ও দিদি, ওদিকে যাবেন না। সাপ আছে। ওদিকে আর কোনো বাড়ি নেই।

সুলেখা গ্রাহ্যই করল না।

ইটখোলাটা পার হবার পর খানিকটা জংলা জায়গা। দেখলেই মনে হয়, এখানে মানুষজন আসে না। তারই মধ্য দিয়ে খুব দ্রুত হাঁটছে সুলেখা।

এই অবস্থায় সুলেখাকে দেখলে তার চেনা কোনো লোক নিজেব চোখকেই বিশ্বাস করতে পারত না। সুলেখা খুব শান্ত আর লাজুক ধরনের মেয়ে। কলেজ ছাড়া সে আর একলা কোথাও যায় না কখনো। এই রকম একটা জায়গায় সে অ্যাডভেঞ্চাব করতে আসবে, এটা যেন ভাবাই যায় না।

জংলা জায়গাটার পরে একটা বিশাল জলাভূমি। অনেকটা দহের মতন। কুচকুচে কালো রঙের পুরোনো জল। কিন্তু জল খুব গভীর নয়, মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ জেগে উঠেছে। সেই সব দ্বীপে বড় বড় গাছও আছে।

সুলেখা সেই জলাভূমির ধারে এসেও থামল না। বিনা দ্বিধায় জলে নেমে গেল।

তার পায়ের চটি এবং হাঁটু পর্যন্ত শাড়ি ভিজিয়ে সে হেঁটে গেল জলের মধ্য দিয়ে। প্রথমে যে দ্বীপটা পড়ল, সেটাতেও সে উঠল না।

এবারে জল আর একটু গভীর হ'ল। হাঁটু ছাড়িয়ে তার উরু ডুবে গেল। তবু তার ভয় নেই। সুলেখা সাঁতার জানে না।

তৃতীয় দ্বীপটার কাছে এসে সুলেখা জল ছেড়ে পাড়ে উঠল। এখানে বেশ বড় একটা ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছ রয়েছে। তার তলাটা অন্ধকার মতন। সেইখানে সুলেখা তার কাঁধ থেকে ঝোলাটা নামিয়ে রাখল। তারপর তেঁতুল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল বেশ নিশ্চিন্তভাবে।

সঙ্গে সঙ্গে সে আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

জায়গাটা এমনই যে এখানে সাপ-খোপ থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। দুষ্টু লোকেরা সুলেখার বয়সী মেয়েকে একলা বসে থাকতে দেখলে তার সর্বনাশ করে দেবে।

সেই রকম একটা লোক দেখেছিল সুলেখাকে। ইঁটখোলার ডান পাশে সে দাঁড়িয়েছিল। সুলেখাকে জংলা জায়গাটার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে দেখে সে অবাক হয়ে যায়। তারপর সে সুলেখাকে অনুসরণ করতে থাকে লুকিয়ে লুকিয়ে।

লোকটি দুষ্টু বা বদ কিনা তা ঠিক বলা যায় না। হয়ত এমনিতেই কৌতূহলে সে পিছু নিয়েছিল সুলেখার। একটি অচেনা যুবতী মেয়েকে জলার মধ্যে চটি জুতোশুদ্ধ নেমে যেতে দেখলে তো যে কারুরই কৌতূহল হবে।

লোকটিও জলে নেমে পড়ে আসছিল সুলেখার পেছনে পেছনে। সুলেখা যখন তেঁতুল গাছওয়ালা দ্বীপটায় উঠে পড়ল, তখন লোকটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে। সুলেখা একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি। তাই লোকটাকে দেখতেও পায়নি।

সুলেখা সেখানে বসে পড়বার পর লোকটির চোখ লোভে চকচক করে উঠল। এখান থেকে কেউ চেঁচালে কোনো মানুষজন সহজে শুনতে পাবে না।

কিন্তু লোকটি যেই সেই দ্বীপটায় উঠতে যাবে, ঠিক তখনই তার কাছাকাছি জল তোলপাড় হয়ে উঠল। তাল সামলাতে না পেরে লোকটি চিৎ হয়ে পড়ে গেল জলে। তারপরেই সেই

শান্ত, পচা জলের দহে কী করে যেন দেখা দিল তীব্র স্রোত। সেই স্রোতের টানে সাঁ সাঁ করে ভেসে যেতে লাগল লোকটি। সে ভাল সাঁতার জানে, তবু সেই স্রোতের সঙ্গে যুঝতে পারল না। ভাসতে ভাসতে কোথায় সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুলেখা সেভাবেই অজ্ঞান অবস্থায় বসে রইল অনেকক্ষণ। ক্রমে ক্রমে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে এলো। সেই তেঁতুল গাছটায় অনেক পাখির বাসা। পাখিরা সব ফিরে এলো ঘরে। গাছের নিচে ঐ রকম একটি মেয়েকে বসে থাকতে দেখে যেন অবাক হয়ে ডাকাডাকি করতে লাগল বেশি করে। একটা ধেড়ে ইঁদুর সুলেখার কোলের উপর দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। সে বুঝতেই পারেনি ওখানে কেনো মানুষ বসে আছে।

তারপর আর একটু রাত হতেই সমস্ত পাখিব ডাক থেমে গেল। চতুর্দিক একেবারে চুপচাপ, নিস্তব্ধ। সেই সময় জ্ঞান ফিরে এলো সুলেখার।

সে কিন্তু এবারেও অবাক হ'ল না, ভয়ও পেল না। তার মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম করছে। কে যেন তাকে ডাকছে। কে যেন তাকে কাছে আসতে বলছে।

ঠিক তিন দিন আগে বাত সাড়ে ন'টাব সময় সুলেখা এসে দাঁড়িয়েছিল ওদের বাড়ির বারান্দায়। সেদিন আকাশ ছিল মেঘলা। এই রকম মেঘলা আকাশে যদি একটা দুটো তারা খুঁজে বার করতে পারে, তা হলে সুলেখার খুব আনন্দ হয়। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে তারা খুঁজছিল।

তারা সে দেখতে পায়নি, তার বদলে সে দেখেছিল, মেঘের ওপর দিয়ে একটা সূক্ষ্ম আলোর রেখা ঘুরছে। প্রথমে সে ভেবেছিল কোনো এরোপ্লেন বুঝি। কিন্তু তার পরই মনে হয়েছিল প্লেনেব তো সোজা যাবার কথা। আলোটা ঘুরছে কেন?

ঠিক তখনই সুলেখার মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠেছিল। আর সেই সঙ্গে মনে হয়েছিল, তাকে কেউ ডাকছে।

সে-ই প্রথমবার। তারপর থেকে এ বকম আরও কয়েকবার হয়েছে।

অন্ধকারেব মধ্যে সুলেখা চারদিকে তাকাল। এভাবে সে কেন এসেছে তা সে নিজেই জানে না। মাথার মধ্যে ঝিম ঝিম ভাবটা আবার বাড়ছে।

সুলেখা ফিস ফিস কবে বলল, আমি এসেছি! আমি এসেছি!

তখন তেঁতুল গাছেব ঘন পাতা ভেদ করে একটা আলোর রেখা নেমে এলো নিচে। একটা ঠিক গোল বলের মতন আলো লাফাতে লাগল তার সামনে।

সুলেখা সেই আলোটার দিকে হাত বাড়িয়ে আবার বলল, আমি এসেছি! আমি এসেছি!

তাবপর সেই গোল আলোটা লাফিয়ে উঠে এলো সুলেখার বুকে। সুলেখাব সারা শরীরে ঘুবতে লাগল।

সুলেখার মনে হ'ল, কেউ যেন তাকে খুব ভালবেসে আদর করছে। এরকম আদর সে কোনো দিন পায়নি। সে চোখ বুজে দারুণ তৃপ্তির সঙ্গে বলতে লাগল, আঃ! আঃ!

সেই আলোটা অনেকক্ষণ ধরে খেলা করতে লাগল সুলেখার বুকে। তার স্পর্শ যেন ঠিক কোনো মানুষের ছোঁয়ার মতন।

সুলেখা চোখ বুজেই জিজ্ঞেস কবল, তুমি কে? তুমি আমাকে কেন এখানে ডেকেছো?

কোন উত্তর নেই। আলোটা এবার সুলেখার ঠোঁট ছুঁলো।

সুলেখা ফিস ফিস করে বলল, তুমি এত ভাল! তুমি যতবার ডাকবে, আমি ততবার আসব। আঃ! আঃ!

তারপর আলোটা সুলেখার দুই চোখ ছুঁয়ে দিতেই সুলেখা আবার অজ্ঞান হয়ে গেল।

সুলেখার আবার যখন জ্ঞান ফিরল, সে দেখল, সে বসে আছে সেই অচেনা স্টেশনের একটা বেঞ্চে। স্টেশনের ঘড়িতে দেখল রাত্তির সোয়া আটটা বাজে। উল্টো দিক থেকে একটা ট্রেন আসছে।

সুলেখা এবারে অবাক হ'ল খুব। এখানে সে এলো কী করে? সেই জলাভূমির মধ্যে তেঁতুল গাছ, সেখান থেকে সে কখন ফিরল, কী করে ফিরল? কিংবা, সে কি আসলে অন্য কোথাও যায়নি, এই বেঞ্চিতে বসেই এতক্ষণ ঘুমিয়েছে, আর সব ব্যাপারটাই স্বপ্নে দেখেছে?

কিন্তু সুলেখার শাড়ী কোমর পর্যন্ত একদম ভেজা। তার পায়ের চটিও ভিজে জবজবে হয়ে আছে। এবং কেউ যেন তাকে সত্যিই আদর করেছে তার প্রমাণ, তার সমস্ত শরীর জুড়ে রয়েছে এক অদ্ভুত সুন্দর ভালো লাগা। যে তাকে আদর করেছে, সে যদি আবার ডাকে, তাহলে সুলেখা নিশ্চয়ই আবার ছুটে যাবে।

# খুনী

## শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

শুভঙ্করকে যদি খুনী হিসেবে চিহ্নিত করা যায় তাহলে কিছু তথ্যগত ত্রুটি থেকে যাবে। কারণ বস্তুতঃ শুভঙ্কর এখনো কাউকে খুন করেনি। কিন্তু তাকে যারা খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানে তারা অবশ্যই স্বীকার করবে যে শুভঙ্করের মধ্যে কিলার ইনস্টিংট আছে। সবচেয়ে বেশি জানে সে নিজে।

শুভঙ্করের বৈশিষ্ট্য এই যে, সে ডান হাতে ঘড়ি বাঁধে। ঘড়িটা খুব শক্ত করে বাঁধেনা। ঢিলা চেন-এ বাঁধা ঘড়িটা ঢল ঢল করে। হাত নাড়লে ছফাৎ করে চেন-এর শব্দ হয়। বাঁ হাতে স্টেনলেস স্টিলের একটা বালা যেমন শিখদের হাতে থাকে। সে লম্বা চুল আর জুলপী রাখে, গোঁফ রাখেনা, বিশাল তার কাঁধ, অসম্ভব পেশীবহুল হাত। জামার বুকের ওপরের তিনটে বোতাম সে কখনো আটকায় না। ফলে তার রোমশ এবং ফর্সা বুক দেখা যায়। খুব চাপা প্যান্ট পরে। ফলে উরু ফুলে থাকে প্যান্টের ওপরে। শক্ত আর ভারী জুতো পরতে সে ভালবাসে। অনেকটা লম্বাও শুভঙ্কর। ফর্সা, বলিষ্ঠ, আক্রমনাত্মক চেহারা।

চরিত্র অবশ্য খুবই সরল, হাসির ব্যাপার ঘটলে হাসতে হাসতে বেহেড হয়ে যায়। ফুটবল বা ক্রিকেটের মাঠে দর্শক হয়ে গিয়েও সে তুলকালাম চেঁচায় হা-হা করে। অল্পেই ভীষণ উত্তেজিত হয়, আবার অল্পেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। প্রচণ্ড আড্ডা মারতে ভালবাসে। খাওয়া তার প্রচণ্ড প্রিয় বিষয়। যখন খায় তখন মনে হয়, জিঘাংসাবশে খাচ্ছে। সে সময়ে কারো দিকে তাকায় না, কথা বলে না, অন্যমনস্ক হয় না। ঘুমও তার অসম্ভব প্রিয়। যখন ঘুমোয় তখন অতলে তলিয়ে যায়। ছুটির দিন হলে, কাজ না থাকলে, একঘেয়েমী লাগলে সে সোজা গিয়ে বিছানা নেয়। ঠিক এক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রচণ্ড সিনেমাও দেখে সে। সপ্তাহে তিনটে চারটে। বেশির ভাগ নাইট শো। আর তার প্রিয় হচ্ছে মহিলাবৃন্দ। কোনো বিশেষ মহিলার প্রতি নয়, কিংবা কেবল সুন্দরীদের প্রতিই নয়, সাধারণভাবে যে কোনো মেয়েই তার জীবনপথে রাস্তা পার হয় তার প্রতিই সে মনোযোগী। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, মহিলাদের মধ্যে কাউকেই সে কখনো তেমন করে পায়নি। বার দুই দুজন মহিলা তাকে কারণবশতঃ চড় মেরেছিল বলেও শোনা যায়। আবার প্রেম নিবেদন করেছে, এমনতরো মহিলাও আছেন।

হোসেন নামে এক বন্ধু আছে শুভঙ্করের। অবশ্য বন্ধু বলতে যা বোঝায় তা না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। হোসেনের বয়স শুভঙ্করের চেয়ে অনেক বেশী। হোসেনের চুল এবং দাড়ি যথেষ্ট পাকা, চলন বলন ধীর স্থির। রোগা এবং আপাতদৃষ্টিতে শান্ত মানুষ সে। কলেজ স্ট্রীটের

ফুটপাথে তার একটা বইয়ের দোকান আছে, আর আছে একটা ছোটো মতো বই বাঁধাইয়ের কারবার। পাজামা আব শার্ট পরে শীত গ্রীষ্ম, খালাসীটোলায় দিশি খায়, মাথার টাক ঢাকতে একটা মুসলমানী এবং মারোয়াড়ীর মাঝামাঝি কায়দার কালো টুপি পরে। লোকে বলে সে আসলে কায়েতের ছেলে, দেশের গ্রামে এক নষ্ট চরিত্র ঘটনা ঘটার পর থেকে নাম ভাঁড়িয়ে কলকাতার জঙ্গলে লুকিয়ে আছে! তা হোসেন বেশ ভাল জ্যোতিষ। পুরোনো পুঁথিপত্র ঘেঁটে সে বিস্তর জ্যোতিষী শিখেছে, তার সংগ্রহে অন্ততঃ পঞ্চাশখানা দুর্লভ জ্যোতিষ শাস্ত্র ঘটিত বই আছে। সে সকলের হাত আর কোষ্ঠী বিচার করে।

শুভঙ্কর তার দোকান থেকে কয়েকবার বই কিনেছিল। খুব সহজেই শুভঙ্করের বন্ধু হয়ে যায় অচেনা লোক, তুই তোকারির সম্পর্ক এসে যায়, হোসেনও সেরকমভাবেই বন্ধু হয়েছিল।

সেই হোসেনই একদিন তার হাত দেখে বলে—দ্যাখ শুভ, তোর সব ভাল, কিন্তু তোর মধ্যে খুনীর ইনস্টিংট আছে।

—কি করে বুঝলি? বলে শুভঙ্করও নিজের হাত দেখতে থাকে।

—রেখা তো আছেই। তার ওপর তোর দুটো হাতের বুড়ো আঙুলের আকার দেখেও বোঝা যায়।

—খুন করবো নাকি রে?

—করবি।

—যাঃ।

—মাইরি। সাবধানে থাকিস।

কথাটা উড়িয়ে দেয়নি শুভঙ্কর। ছিঁটেফোঁটা সত্য ওর মধ্যে আছে। সে নিজেও ছেলেবেলা থেকে টের পায় যে কাউকে কাউকে তার প্রায়ই খুন করতে ইচ্ছে হয়েছে।

হোসেন সান্ত্বনা দিয়ে বলে—অবশ্য ভেবেছিন্তে খুন করা নয়। কোল্ড ব্লাডেড বা প্রি-মেডিটেডেডও নয়। দুম করে রাগের বশে করে ফেলতে পারিস। রাগ হ'তে সাবধান।

রাগটা অবশ্য শুভঙ্করের কিছু বেশী। রাগলে সে পাগলের মতো চেঁচায়। রাগলে সে নাচে। রেগে গেলে পৃথিবীটাই তার কাছে রক্তাক্ত হয়ে যায়।

হোসেন তাকে খালাসীটোলায় নিয়ে গিয়ে দিশি মদের মজা শেখাল। সে ভারী মজা। প্রথম ঝাঁঝ আর স্বাদ পার হয়ে মদের হৃদয়ে পৌঁছে যেতে পারলে এক কেরিকেটেড জগৎ—কথাটা হোসেনই তাকে বলেছিল।

—তুই যে বলিস আমি খুন করব—সে কি সত্যি? শুভঙ্কর একদা দিশি মদে তার ভেলা ভাসিয়ে কেঁদে বলেছিল, সকলের সামনে।

পাশে একটা ভীতু ঠেলাওলা বসে ছিল, কথাটা কানে যেতে সে উঠে অন্যপাশে সরে বসে।

হোসেন গম্ভীরভাবে বলে সত্যি।

—করবই?

—করবিই।

শুনে শুভঙ্কর টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তবে শালা—

হোসেন হাত ধরে টেনে তাকে বসিয়ে দিয়ে বলে—আজ থাক।

—না, আজই। করব কখন, এখনই করে ফেলি।

—পরে করিস।

শুভঙ্কর বায়না করতে থাকে—না, আজই।

হোসেন বিরক্ত হয়ে বলে—মজাটা নষ্ট করিস না। এতগুলো লোক তেষ্টা মেটাতে এসেছে, এখানে ব্লাডশেড করলে সবাইকে তেষ্টা নিয়েই পালিয়ে যেতে হবে।

—না, এখানেই। একটা খুন, মাত্র একটা! শুভঙ্কর প্রায় কেঁদে ফেলে।

হোসেন গম্ভীর হয়ে বলে, কি দিয়ে করবি? ছোরা টোরা আছে?

না তো!

—তবে? বসে যা। ভাল করে খা, ফেজটা কেটে যাবে।

গেলও।

শুধু হোসেন নয়, আরো কয়েকজন বলেছে। যেমন কুমকুম নামে একটি মেয়ে একবার বলেছিল—আপনার যা চেহারা, ঠিক গুণ্ডার মতো।

—নাকি?

—সত্যি, আমি কালরাত্রে স্বপ্ন দেখেছি, আপনি টগরকে গলা টিপে মেরে ফেলেছেন।

—সত্যি?

—বিশ্বাস করুন। স্বপ্ন যদিও, কিন্তু স্বপ্ন তো লোকে এমনি এমনি দেখে না? কিছু একটু সত্য থাকেই।

টগরকে খুন করার অবশ্য কোনো কারণ নেই। টগর শুভঙ্করদের বাড়ির পুরোনো চাকর। তার বয়স আশির ওপরে। সে চোখে ভাল দেখেনা। কানে শোনেনা, প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এ বাড়িতে চাকরের কাজ করার পর সে ঝিম মেরে গেছে। ভুল বকে, ভুল করে, ভুল শোনে। এমনিই একদিন মরে টরে যাবে। ভীমরতি খুব হয়েছে এখন। তাকে প্রচণ্ড ভালবাসে শুভঙ্কর। বাড়ির সবাই বাসে। শুভঙ্করের মা তাকে নিজের হাতে ভাত বেড়ে খাওয়ায়। তবু শুভঙ্কর ব্যাপারটা ভেবে দেখে। একটু ভয় হয়। নিজের দুহাতের বুড়ো আঙ্গুল নিয়ে চিন্তা করে, হাতের রেখা নিয়ে ভাবিত হয়। তার ভিতরে অবিশ্বস্ত খুনী কি সত্যিই লুকিয়ে আছে?

শুভঙ্কর সম্প্রতি একটা বেশ ভাল চাকরি পেয়েছে। এ গ্রেড কোম্পানীর জুনিয়র অফিসার। প্রচুর টাকা কামায়। চাকরিটা অবশ্য ধরা-কয়া করে হয়েছিল। তার এক বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী জ্যাঠামশাই আছেন। আত্মীয় নন, ডাকের জ্যাঠামশাই। তিনি অনেককে চাকরি দিয়েছেন, শুভঙ্করকেও। শুভঙ্কর প্রচুর টাকা মাইনে পায়, কিছু করার নেই অত টাকা দিয়ে। সে ওড়ায়। মাসের প্রথম দিকে পার্ক স্ট্রীটের রেস্তরাঁয় সে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গিয়ে হাল্লা চিল্লা আর খানা-দানা করে। মেয়েছেলেদের নাচ দেখে। একদিন একটা বড় রেস্তরাঁর বেয়ারা টিপ্‌স নিয়ে তাকে সেলাম দেয়নি। শুভঙ্কর এত রেগে গিয়ে ছিল যে বলার নয়।

সোজা উঠে গিয়ে সে বেয়ারাটার ঘাড় ধরে টেবিলের সামনে হিঁচড়ে নিয়ে এলো, মাথার টুপি ফেলে দিল ঝাপড় মেরে। মাথাটা নুইয়ে ধরে প্রচণ্ড ঘুঁসি তুলেছিল। বন্ধুরা ধরে ফেলে।

সেই ঘটনার সাক্ষী সুদেব পরে নেশা কেটে গেলে ঐ একই কথা বলে—তোর ভিতরে একটা ভয়ঙ্কর ক্রুয়েলটি আছে।

সেই রেস্তরাঁর গোলমালটা অবশ্য অনেক দূর গড়ায়। সব বড় রেস্তরাঁতেই ভাড়া করা কিছু মস্তান থাকে, মাতালদের সামলায়। শুভঙ্করের সেই কাণ্ডের পর তারা এসে তাকে দলবলশুদ্ধ প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। অপমানটা শুভঙ্কর ভোলেনি. বলে—কেন?

## খুনী

—রেস্তরাঁর বেয়ারাটা আর একটু হলে খুন হয়ে যেত।

—যাঃ!

—সত্যি। তোকে পুরো খুনীর মতো দেখাচ্ছিল।

—দূর! শুভঙ্কর ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

সুদেব সিরিয়াসভাবে বলে—উড়িয়ে দিও না বাপ, আব একটু হলে খুনটা হয়েও যেতে পারত।

—কিভাবে? শুভঙ্কর অবাক হয়ে বলে—কিভাবে হ'ত ? একটা ঘুঁষি খেয়ে লোকটা মরে যেত নাকি ?

—ঘুঁষি নয় চাঁদু, তোমার হাতে খাওয়ার ছুরিটা ছিল যে।

—ছিল।

—আলবাৎ। সেটা নিয়েই তো তুই উঠে গেলি। লোকটাকে ধরে ছুরিশুদ্ধ হাত ওপরে তুলেছিলি মারবার জন্য।

শুভঙ্কর শিউরে ওঠে। খুব বেঁচে গেছে সে। সে নিজের হাতের বুড়ো আঙুল দুটোর দিকে চেয়ে থাকে। আঙ্গুল দুটোর মাথা মোটা, চওড়া, অন্য আঙুলগুলোর সঙ্গে সেটার অনেক পার্থক্য।

সানি নামে একটা মেয়ের সঙ্গে লেক-এ বসেছিল শুভঙ্কর। সন্ধ্যেবেলা। এই সময়টায় শুভঙ্করের অবসরপ্রাপ্ত বাবাও আরো কয়েকজন বুড়ো মানুষের সঙ্গে লেক-এর ধার ধরে হাঁটাহাঁটি করেন। এখন হেমন্তকাল। তাই কিছু হিম পড়ে। বুড়ো মানুষদের পক্ষে ঠাণ্ডাটা ভাল নয়। উপরন্তু লেক-এর গাছ-গাছালি থেকে বিশ্রামরত পাখিরা আচমকা গায়ে মাথায় পুরীষ বর্ষণ করে। তাই শুভঙ্করের বাবা একটা ছাতা নিয়ে যান। সেইটে মাথায় ধরে হাঁটলে ঠাণ্ডাও লাগে না, পাখিদের অবিমৃষ্যকারীতা থেকেও আত্মরক্ষা চলে।

সানিকে নিয়ে লেক-এ বসে প্রেমপূর্ণ কথাবার্তা বলার সময়ে সে হঠাৎ বাবাকে দেখল। ছাতা মাথায় কয়েকজন বুড়োর সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছেন। বাবাকে দেখে সতর্ক হওয়ার কিছু নেই। ছানি কাটা চোখে এখন আর অতটা দৃষ্টিশক্তি নেই, তার ওপর শুভঙ্কর সানিকে নিয়ে একটু অন্ধকার ঘেঁষে বসেছে। বাবা বুঝতে পারবেন না।

শুভঙ্কর সানিব কানে কানে বলল—সানি, ঐ তোমার হবু শ্বশুর যাচ্ছে।

—কৈ, কোথায়? বলে সানি কৌতূহল দেখায়।

এরকম অনেক মেয়েকেই বলে শুভঙ্কর। শেষ পর্যন্ত তার বাবা যে কার শ্বশুর হবেন সে বিষযে ঘোর অনিশ্চয়তা আছে।

—ঐ যে, ছাতা মাথায়।

—অনেককে দেখছি, চার পাঁচজন, ওরা সবাই কি শ্বশুর শীপের জন্য অ্যাপ্লিক্যান্ট নাকি ?

—যাঃ। লজ্জা পেয়ে শুভঙ্কর বলে—ঐ যে রোগা মতো। সামনের জনেব পরে যে যাচ্ছে।

—তোমার বাবা? সানি এই বলে অন্ধকারে যতদূর সম্ভব দেখবার চেষ্টা করে। ঠিক এ সময়ে কতগুলো চ্যাংড়া ছোঁড়া ও পাশ থেকে বুড়োদের উদ্দেশ্য করে সুর করে চেঁচিয়ে বলতে থাকে— বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর....

বুড়ো মানুষরা এই আওয়াজ শুনে দ্রুত হাঁটেন। একজন ম্লান স্বরে অন্যজনকে বলেন—নাতিরা কি বলছে শুনছেন?

অন্যজন, অর্থাৎ শুভঙ্করের বাবা উত্তর দেন—ওরা বুঝবে কি?

বয়স হলে বুঝবে ছাতার কেন দরকার হয়।

কিন্তু অপমানটা সহ্য করতে পারেনি শুভঙ্কর। বিশেষতঃ যখন সানি সঙ্গে রয়েছে এবং সবই শুনতে পাচ্ছে।

ছোঁড়াদের আওয়াজ শুনে সানি হেসে ফেলে—কি বলছে শুনছো? মাগো পারেও দুষ্টু ছেলেরা বুড়োদের ক্ষ্যাপাতে।

শুভঙ্কর সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারে যে তার ভিতরে সত্যিই খুনী ইনস্টিংট আছে।

—এই শালা! বলে লাফিয়ে উঠে ছুটে গেল সে।

ডান হাতে ঘড়ি, বাঁ হাতে বালা, লম্বা, ঝাঁকড়া চুল মাথায়। তার চেহারাটা তখন সাংঘাতিক দেখাচ্ছিল। সে প্রায় ছেলেগুলোর ওপর লাফিয়ে পড়ল। সব ছেলেই কিন্তু ষণ্ডাগুণ্ডা নয়। এই ছেলেগুলো ভীতু টাইপের ছিল। শুভঙ্করের চেঁচানি শুনে পালাল তারা।

—বাবাকে অপমান! অ্যাঁ, আমার বাবাকে নিয়ে ঠাট্টা!

ছেলেগুলো দৌড়ঝাঁপ করে পালিয়ে গেল, সন্ধ্যেবেলাটা খাট্টা হয়ে গেল একেবারে।

সানি পরে বলল—শুভ, তোমাকে বিয়ে করতে ভয় হয়।

—কেন?

—তুমি বড় হুট করে রেগে যাও যে!

—এরকম অপমান দেখলে রাগব না? বাঃ!

সানি গম্ভীর হয়ে বলে—অত রাগবার মতো কিছু বলেনি তো ছেলেগুলো। রাস্তায় ঘাটে এর চেয়ে অনেক খারাপ আর অপমানকর কথাবার্তা আমাদের কানে আসে।

শুভঙ্কর কিন্তু লজ্জিত হয়েছিল, বলল—হুঁ।

—ছেলেগুলো ভাল। সানি বলে—অন্যরকম ছেলে হলে তোমাকে ছেড়ে দিত না। শুভ, যখন সঙ্গে মেয়েমানুষ থাকে তখন ওরকম বেহেড হতে নেই। মারপিট লাগলে আমি কি করতাম?

—হুঁ! শুভঙ্কর চিন্তান্বিত হয়ে বলে।

—এটুকুতেই যদি এত রাগ হয় তো সত্যিকারের তেমন কিছু হলে তো তুমি খুনও করতে পারো।

শুভঙ্করের বুকটা চমকে ওঠে, সেই যন্ত্রণা। হোসেন তাকে বলেই দিয়েছে, সে একদিন খুন করবে। কথাটা কি অমোঘ?

ঘটনাটা ঘটলো এভাবে।

একটা মেঘলা ছুটির দিনে দুটো গাড়ি বোঝাই হয়ে শুভঙ্কর আর বন্ধু বান্ধবীরা ডায়মণ্ডহারবারে পিকনিক করতে গেল। দুটো গাড়ির মধ্যে একটা হয়েছে দামী শেভ্রলে, তার মালিক জয়ন্ত। জয়ন্তর সঙ্গে শুভঙ্করের খুব একটা প্রীতির সম্পর্ক নয়। জয়ন্তকে শুভঙ্কর সহ্য করতে পারে না। ও বড়লোক, ভাল ছাত্র, ভাল স্পোর্টসম্যান, মেয়েরা জয়ন্তকে সামনে পেলে আর কারো দিকে তাকায় না। সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কিছু স্বাভাবিক জন্মগত গুণ জয়ন্তর আছে। তার স্বভাব চমৎকার। সবসময়ে হেসে কথা বলে, কথায় ভরা থাকে সহৃদয়তা, ক্ষমা, দয়া ও মমতা।

এ ছেলেকে কি সহ্য করা শুভঙ্করের পক্ষে সম্ভব? তাই জয়ন্তর সঙ্গে কথা বলার সময়ে সবসময়েই শুভঙ্করের কথাবার্তায় একটা ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ এসে যায়। যেমন, জয়ন্ত যখন গাড়িটা মনোযোগ দিয়ে চমৎকার চালিয়ে নিচ্ছে, তখন পিছন থেকে শুভঙ্কর বলল—জয়, তোর গাড়ির ইঞ্জিনে একটা শব্দ হচ্ছে কেন রে?

—কিসের শব্দ?

—গোলমেলে শব্দ।

—আমি পাচ্ছি না। জয়ন্ত বলে।

—আমি পাচ্ছি। শুভঙ্কর বলে।

মানময়ী নামে যে অসাধারণ সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে জয়ন্তর প্রেম, সে সামনের সীটে ওর পাশে বসে ছিল। সে হঠাৎ কৌতুকের চোখে সানগ্লাসটা খুলে পিছু ফিরে শুভঙ্করের দিকে চেয়ে বলে—আপনি কি গাড়িব এক্সপার্ট ?

শুভঙ্করের ভয়ঙ্কর রাগ হ'ল। না, সে গাড়ি চালাতেও জানে না। সে মাথা নাড়ল।

মানময়ী হেসে বলল—কোনো ভয় নেই শুভঙ্করবাবু। গাড়ির কোনো ডিফেক্ট নেই। আমিও তো গাড়ি চালাই, তাই জানি।

পিকনিকের জায়গায় গিয়েও নানারকম হচ্ছিল। যেমন শুভঙ্কর ভাল সাঁতারু নয়, আর জয়ন্ত দুর্দান্ত সাঁতার দেয়। জলে নেমে জয়ন্তর সঙ্গে কমপিট করতে গিয়ে সে নাকানি চোবানি খেল। অকারণেই প্রায় তার মেজাজ চড়ে যাচ্ছিল।

মেয়েরা সঙ্গে আছে বলে মদের ব্যবস্থা ছিল না। এক ক্রেট সফট ড্রিংকস আনা হয়েছে।

শুভঙ্কব ঠাট্টা করে বলে—জয়ন্তটা মেয়েছেলে হয়ে গেছে। এই কোক কিংবা লেমনেড তো মেয়েদের ড্রিংক।

আবার মানময়ী ঠাট্টা করে বলে—আপনি খুব মস্ত পুরুষ নাকি! ড্রিংক করলেই পুরুষ হয়?

—না না, তা বলিনি।

—যান না, গাঁয়ের দিকে গেলে চোলাই পেয়ে যাবেন।

ঝগড়া নয়, কিন্তু সকলের সামনেই একটা অপমান।

জয়ন্ত দারুণ রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইল। শুভঙ্কর গান জানে না। কিন্তু মেয়েরা মুগ্ধ হয়ে জয়ন্তকে ঘিরে আছে। তার মধ্যে সানি বা কুমকুমও রয়েছে। শুভঙ্কর বুঝতে পারে, তার চেহাবা বা গুণাবলী জোব মার খেয়ে যাচ্ছে জয়ন্তর কাছে। তাই সে এক সময়ে দলছুট হয়ে গেল অভিমানে। একা একা গঙ্গার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে বেড়াতে লাগল। শীতের নদীতে জেলেরা মাছ ধরছে নৌকায। একটা হাল্কা মেঘ দূর ঘুড়ির মতো স্থির হয়ে আছে আকাশে। ওপারে বনরাজি নীলা। কিন্তু প্রকৃতি তাকে আকর্ষণ কবে না। ভিতরে ভিতরে একটা অসম্ভব ফাটো-ফাটো প্রতিশোধস্পৃহা।

যখন সবাই জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে, পাতা শতরঞ্চিও তোলা হয়ে গেছে তখনও জয়ন্ত আর তিনটে ছেলে ঘাসে বসে তাস খেলছিল। তাগাদা দিতেই তারা বলে—যাচ্ছি, যাচ্ছি, আর পাঁচ মিনিট, এই ডিলটা শেষ হলেই—

সকলেই বিরক্ত। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। প্রচণ্ড শীত। ওরা তার মধ্যে একটা ডিল শেষ করে আর একটা শুরু করে দিল।

শুভঙ্করের বাগটা ছিলই। সে ধমক দিয়ে বলল—দু মিনিটের মধ্যে না উঠলে সব হাঁটকে মাটকে দেব।

খেলোয়াড়দের একজন বলে—তাই নাকি ? দে না! জিওগ্রাফি পাল্টে যাবে। বারো টাকা হারছি, ইয়ার্কি নয়।

জয়ন্তও বলে—তোবা অন্য গাড়িটায় চলে যা। আমরা পরে যাব।

কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ শুভঙ্কর মনে করল যে এটা তাকে ইচ্ছাকৃত অপমান। আবছাভাবে তার নিজেব কিলার ইনস্টিংটের কথা মনে হ'ল। রাগে অন্ধ হয়ে গেল বোধবুদ্ধি।

সে লাফিয়ে পড়ে দুই লাথিতে ছিটকে দিল সকলের হাতের তাস। জড়াজড়ির মধ্যে একটা নির্ভুল লাথি কষাল জয়ন্তর পেটে। সবাই অবাক। তারপরই লাফিয়ে উঠে সবাই তাকে ধরতে চাইছিল।

শুভঙ্কব এক ঝটকা মেরে ছুটে গেল। মস্ত একটা ডেগের মধ্যে বঁটি, ছুরি, হাতা-খুন্তি সব ভরা হয়েছে, ডেগটা তোলা হয়েছে গাড়ির ক্যারিয়ারে। শুভঙ্কর গিয়ে সেটার ভিতর থেকে মাংসকাটা ছুরিটা টেনে নিয়ে এলো।

সবাই বাধা দিচ্ছে, জয়ন্ত লাথি খেয়েও উঠে দাঁড়িয়েছে অবাক হয়ে। শুভঙ্কর সকলের হাত ছাড়িয়ে তার দিকেই ছুটে গেল।

কিছুই হয়নি।

হোসেনের কথাটা ফলেনি আজও।

কি করে ফলবে? ছুরি হাতে যখন ছুটে যাচ্ছিল শুভঙ্কর, তখনো নিশ্চিত সে জানত আজই সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটবে। যা কখনো ঘটেনি, কিন্তু ঘটার অপেক্ষায় আছে।

সে তাই নিশ্চিত সেই পরিণতির দিকে বইয়ে দিয়েছিল নিজেকে। দৌড়ে গিয়ে সে জয়ন্তর সামনে একটা হাত তুলে কি একটা দুর্বোধ্য চিৎকার করে উঠেছিল।

জয়ন্ত তার ব্যথাতুর মুখখানায় সামান্য হাসি হেসে বলল—দূর শালা, ওভাবে লাথি মারতে আছে! খুব লেগেছে রে!

মানুষ এরকম নরম সহৃদয়ভাবে তার আক্রমণকারীর সঙ্গে কথা বললে মারা যায়?

সবাই শ্বাস বন্ধ করে চোখ বুজে যখন রক্তপাত এবং মৃত্যুর অপেক্ষা করছে তখন জয়ন্ত হাত বাড়িয়ে শুভঙ্করের কাঁধ দরে বলল—আমাকে একটু ধরে ধরে নিয়ে যা।

শুভঙ্কর হতভম্ব হয়ে বুঝল, সে পারেনি। জোর বেঁচে গেছে।

হোসেন বলে—খুব সাবধান শুভ। তুই একদিন খুন করবি।

শুভঙ্কর বলে—যাঃ।

হোসেন বলে—করবিই!

শুভঙ্কব বড় ম্লান হয়ে যায়। আবাব ভাবে, আমার মধ্যে যে অচেনা লোকটা আছে, যে খুনী তাকে একবার পেলে হ'ত।

শুভঙ্কর বলে—করব। শুভঙ্করকে।

# পথিমধ্যে ভয়ঙ্কর

## সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আচমকা অদ্ভুত শব্দ করতে করতে আমাদের গাড়িটা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গেল। গেল তো গেলই। অনেক চেষ্টা করেও তার গোঁ ছাড়াতে পারলুম না। ঘড়ি দেখলুম। পাঁচটা কুড়ি। গ্রীষ্মের বিকেল। এক পাশে ধু ধু ফাঁকা মাঠ, অন্য পাশে ছোট বড় গাছের জঙ্গল। সামনে সাঁকো। একটা ছোট নদী দেখা যাচ্ছিল। তার ওপরে পাঁচিল ঘেরা কারখানার মতো বাড়ি। কারখানা নিশ্চয় নয়। হয়ত ফার্ম হাউস। শুকনো মুখে সঙ্গীটির দিকে তাকালুম। উনি অভ্যাস মতো চোখে বাইনোকুলার রেখে জঙ্গলের দিকে কিছু দেখছেন। পাখি ছাড়া আর কি? ওর ওই এক বাতিক।

বললুম—মাই ডিয়ার ওলড ম্যান, দয়া করে একবার এদিকে নজর দেবেন কি?

ওর যেন কানেই ঢুকল না কথা। এমন কি গাড়িটাও যে চরমভাবে বিগড়ে গেছে, তাও যেন টের পাচ্ছেন না। বাইনোকুলারে চোখ রেখে পিঠ সোজা করে বসেছেন। নিশ্চয় দুর্লভ কিছু নজর পড়েছে।

—এই যে স্যার, শুনছেন? আমরা থেমে গেছি।

কাকে কী বলছি! বুড়ো মানুষ। নির্ঘাৎ বাহাত্তুরে ধরেছে। আপশোস হতে লাগল, বারবার জেনেশুনে একই ভুল করে আসছি। ওর মতো পাগল ছাগল মানুষের পাল্লায় পড়ে কতবার কতভাবে হন্যে হয়েছি, সংখ্যা নেই। অথচ বড় যাদুকর এই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার—একবার মিঠে গলায় ডার্লিং ডেকে ফেললেই আমি বশ হয়ে যাই।

আসছি দুমকা থেকে রামপুরহাটের দিকে। গাড়িটা ল্যাণ্ডমাস্টার। যাবার সময় একটুও গোলমাল করে নি। কিন্তু ফেরার পথে সেই দুপুর থেকে বার তিনেক ঝামেলা বাধিয়েছে। এর ফলে দেড় ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে। এতক্ষণ রামপুরহাটে সরকারী বাংলোয় পৌঁছে বিশ্রাম নেবার কথা। আগামীকাল সকালে কলকাতা রওনা হতেই হবে। খবরের কাগজে রিপোর্টারের চাকরি করি। আজ রাতেই রামপুরহাট থেকে টেলিগ্রামে একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠানোর কথা আছে। দুমকায় কয়েকলক্ষ আদিবাসীর এক রাজনৈতিক সম্মেলন হয়ে গেল। খুব উত্তেজনা ছড়াচ্ছে আদিবাসী আন্দোলন। পৃথক রাজ্যের দাবি উঠেছে। এখানে ওখানে প্রায়ই কিছু সংঘর্ষ ঘটছে।

গিয়েছিলুম সম্মেলনের কভারেজে। অথচ আমার বরাত। গিয়েই দেখি কোত্থেকে বেমক্কা সেখানে উপস্থিত রয়েছেন, প্রখ্যাত বুড়ো ঘুঘু এই কর্নেল। পুলিশ সুপার ওর স্নেহভাজন বন্ধু।

সেই সুবাদে আতিথ্য নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে দুর্লভ জাতের পাখি আর পোকামাকড় দেখে বেড়িয়েছেন। আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরেছিলেন। হ্যালো সুইটহার্ট! তোমার সঙ্গেই কলকাতা ফেরা যাক তাহলে!

ওকে দেখেই ভেবেছিলুম, ব্যাস, এই হ'ল আর কী! যেখানে এই বুড়ো ঘুঘু সেখানেই তো খুনখারাপি---সুতরাং গোয়েন্দাগিরি! এবার চাকরিটা আর বাঁচানো যাবে না। কিন্তু ভাগ্য ভাল, খুনখারাপির গোয়েন্দাগিরিতে ওর আবির্ভাব হয়নি। এসেছেন নিছক ভ্রমণে। যাই হোক, একা বোকার মতো চুপচাপ কলকাতা ফেরার চেয়ে একজন সঙ্গী পাওয়া গেল। বিশেষ করে, কর্নেলের মতো সঙ্গী যে হয় না—তা অস্বীকার করব না।

পথে তিনবার গাড়ি বিগড়ানোতে মনে একটা অস্বস্তি জাগছিল। কেন, তা বলা কঠিন। এই চতুর্থবার যখন বিগড়োল, এবং সন্ধ্যার মুখোমুখি— তখন সেই অস্বস্তি বেড়ে গেল। মনে হ'ল, এই বুড়োর ভাগ্যদেবতা যিনি---তাঁরই কারচুপিতে আমি বরাবর যেমন জড়িয়ে যাই, এবারও যাব। ভাবলুম, ওকে এড়িয়ে একা ফেরাই ভাল ছিল। তাহলে নিশ্চয় গাড়ি এমন বদমাইসি করত না।

আফশোসে বিরক্তিতে এসব ভাবছি, হঠাৎ দেখি উনি উঠলেন। চোখে বাইনোকুলার তেমনি লাগাল—দরজা খুলে নামলেন। এবং কোনো কথা না বলে দিব্যি হনহন করে ব্রিজের দিকে এগোলেন। ক্ষেপে গিয়ে ডাকতে ঠোঁট ফাঁক করেই বুজিয়ে দিলুম। পাগল ছাগল লোকটার কাণ্ড দেখতে থাকলুম। নিশির ডাকে যেমন নাকি লোকে বেরিয়ে পড়ে, তেমনি সম্মোহিতের মতো নাকবরাবর জঙ্গল ঠেলে চলেছেন। কোনো দুর্লভ জাতের পাখি দেখেছেন নাকি!

কর্নেল অদৃশ্য হলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে নামলুম। যথারীতি ইঞ্জিনের ঢাকনা তুলে গণ্ডগোলের কারণ খুঁজতে ব্যস্ত হলুম।

এক ঘণ্টারও বেশি নানান চেষ্টাতেও কিছু হ'ল না। রাস্তায় কোনো লোক নেই যে ঠেলতে বলব। অগত্যা এগিয়ে গেলুম নদীর ওপারে সেই খামার বাড়িটার দিকে। ওখানে গেলে নিশ্চয় সাহায্য পাব।

কর্নেলের কথা মন থেকে মুছে ব্রিজ পেরিয়ে গেলুম। দুশো গজ দূরে ফার্মের গেটটা দেখা গেল। সাইনবোর্ডে লেখা আছেঃ ভূমিলক্ষ্মী ফার্ম হাউস (প্রাইভেট) লিমিটেড। কেন্দুহাটি, বীরভূম। কাছাকাছি কোনো গ্রাম দেখা গেল না। ফার্মটা একেবারে একলা হয়ে আছে। পূর্বে-দক্ষিণে অনেকটা জমিতে বেড়া দিয়ে চাষবাস করা হচ্ছে। বাড়ির এলাকাও বিশাল। পশ্চিমে নদী এবং জঙ্গল। উত্তরে রাস্তা, রাস্তার উত্তরে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ।

গেটে কোনো লোক নেই। কিন্তু খোলা আছে। ভিতরে সব্জীখেত আর ফুলবাগিচা। মধ্যে চমৎকার একফালি রাস্তা। ভেতরে ঢুকে পড়লুম। সামনে একতলা কয়েকটা ঘর, বাঁদিকে গুদামঘর ও টিনের শেড। অনেক কৃষিযন্ত্র দেখা গেল। রীতিমতো মেকানাইজড কৃষির ব্যবস্থা আছে তাহলে। ডান দিকে তাকাতেই এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল।

পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছেন স্বয়ং মহামান্য কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। এবং টুপি খুলে নিচের কোনোকিছুর প্রতি যেন হুকুম জারি করছেন। ভীষণ নাড়ছেন টুপিটা। মাঝে মাঝে নাচের

ভঙ্গীতেও কী সব করছেন। বাতাস বইছে জোর। উনি কিছু বলছেন—কিছু শোনা যাচ্ছে না স্পষ্ট।

ব্যাপারটা দেখে তো আমি হতভম্ব। সব রাগ বিরক্তি পলকে ঘুচে গিয়ে বেদম হাসি পেল। হো হো করে হেসে উঠলুম। চেঁচিয়ে বললুম—হ্যালো ওল্ড ফেলার! সার্কাস দেখাচ্ছেন কাকে?

এবার উনি আমাকে দেখতে পেলেন। পেয়েই টুপিসুদ্ধ হাত নেড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন—গো ব্যাক, গো ব্যাক জয়ন্ত! সাবধান!

হাসতে হাসতে ওঁর দিকে এগোলুম।—ব্রিলিয়াণ্ট কর্নেল! আপনি সার্কাসেও খেলোয়াড় ছিলেন, বলেন নি তো এতদিন!

কর্নেল আবার চেঁচিয়ে উঠলেন—জয়ন্ত! এগিও না—এগিও না?

আমার সামনে কিছু সব্জীঝাড় ও মাচান। তার ওধারে সেই পাঁচিল। ওঁর কথা গ্রাহ্য না করে এগোলুম। তারপর কর্নেলের দিকে তাকিয়ে হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে বললুম—সাবাস কর্নেল! জোর জমেছে।

কথা শেষ হতে না হতে আচমকা সামনে মাচানের ওপাশে একটা জান্তব গর্জন শোনা গেল—গাঁক গাঁ—আঁ—ক! তারপরই দেখি একটা প্রকাণ্ড সাদা ষাঁড় ভয়ঙ্কর শিং দুটো কাত করে ঝোপ ঠেলে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

যেই দেখা, দিশেহারা হয়ে একলাফে কী ভাবে সেই পাঁচিলে উঠে পড়লুম, জানিনা। কর্নেল আমার কাছে এগিয়ে এলেন। ষাঁড়টা ততক্ষণে আমাদের নিচে। শিং নেড়ে গাঁক গাঁক করছে।

এই সময় একটা লোক বেরিয়ে এলো ওপাশের ঘর থেকে। ব্যাপারটা তার চোখে পড়তেই সে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি শুরু করল। আরও জনা তিনচার লোক বেরিয়ে এলো। একজন চেঁচিয়ে বলল—টুপি! টুপি! আপনার লাল টুপিটা লুকিয়ে ফেলুন!

এতক্ষণে ষাঁড়টার রাগের কারণ বোঝা গেল! কর্নেল অপ্রস্তুত হয়ে তক্ষুনি ওঁর লাল টুপিটা পকেটে লুকিয়ে ফেললেন। লোকগুলো ষাঁড়টাকে বশ মানাতে ব্যস্ত হ'ল।...

আজকাল গ্রামাঞ্চলে অনেক জায়গায় কী এলাহি কারবার হচ্ছে, ভাবা যায় না! খবরের কাগজের চাকরির সুবাদে এরকমের ফার্ম দেখা ছিল। তবে ভূমি লক্ষ্মী ফার্ম তেমন বড় প্রজেক্ট নয়। মাঝারি ধরণের একটা কমপোজিট ইউনিট এবং নিছক প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ। মালিকের নাম হেমেন্দ্র ভূষণ নায়েক। শক্ত সমর্থ প্রৌঢ় মানুষটি খুবই অমায়িক। ঠাকুরদার আমলে জমিদারি ছিল। বাবা ছিলেন জোতদার। উনিও তাই—তবে প্রচলিত অর্থে নয় চাষবাসের সঙ্গে আছে ফিশারি আর ডেয়ারি। তিরিশটা দুধেল ভাল জাতের গরু আছে। দৈনিক গড়ে পাঁচ-সাত মণ দুধ হয়। ভোরবেলা নিজের স্টেশনওয়াগানে রামপুর হাট থেকে রেলে কলকাতা চালান দেন। কথায় কথায় অসুবিধাগুলো জানালেন—রিপোর্টার সামনে পেলে যা হয়। ব্যাঙ্কের দেনা শোধ করা যাচ্ছে না। সেচ ব্যবস্থার দিকে সরকার আদৌ মন দিচ্ছেন না, শুধু বক্তৃতাই সার। তার ওপর মফস্বলের বিদ্যুৎ বিভ্রাট তো লেগেই আছে। ঘনঘন লোড শেডিং হয়। ফার্মে লোকসানের অঙ্ক ফুলে ফেঁপে উঠছে দিনে দিনে।

কর্নেল উসখুস করছিলেন অনেকক্ষণ থেকে। উনি একটু থামতেই বললেন—আপনার ষাঁড়টা খুব রসিক মনে হচ্ছে হেমেন্দ্রবাবু!

হো হো করে হাসলেন হেমেন্দ্র—রসিক? মোটেও না স্যার! ব্যাটা যত বদরাগী তত খুনে! খুব ভাল জাতের ষাঁড় হলে কী হবে? অচেনা লোক দেখলেই গোঁজ উপড়ে আগড় ভেঙে তাড়া করবে। এই ক'মাস তিন-তিনটে লোককে জখম করেছে।

আমি বললুম—লাল রঙ ওর চক্ষুশূল। তাই না হেমেন্দ্রবাবু?

কর্নেল বলে উঠলেন—জয়ন্ত, তুমি স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই সম্পর্কে হেমিংওয়ের বই পড়ে দেখ। লড়ুয়েদের বলে মাতাদোর। তাদের হাতে নাকে লাল কাপড় আর একটা তরোয়াল। লাল কাপড় দেখিয়ে ষাঁড়কে ক্ষেপিয়ে দেয়। তারপর...

হেমেন্দ্র বাধা দিয়ে বললেন—স্পেন বলুন, বাংলাদেশ বলুন, ষাঁড় ইজ ষাঁড়! আর লাল কাপড় বলছেন। এই যে, এই দেখুন না—আজ দুপুব বেলা আমার কী দশা করেছে: মনিব বলেও খাতির করে না ব্যাটা। যেই আদর করতে গেছি, অমনি শিং মেরে বসল। ভাগ্যিস পাঞ্জাবি ছিল গায়ে, খানিকটা কাপড়ের ওপর দিয়ে গেল। নয়ত ভুঁড়ি ফেঁসে যেত? যাই বলুন স্যার, ষাঁড় ইজ ষাঁড়। লাল কাপড় কোনো কথা নয়।

উনি হাসতে হাসতে ওঁর সাদা টেরিকটনেব পাঞ্জাবির নিচের দিকটা দেখালেন। নিচে ঝুলেব জায়গায় পকেটের কাছে দু ইঞ্চিটাক লম্বা এক ইঞ্চি চওড়া ফাঁক। ষাঁড়ের শিঙে উড়ে গেছে। কর্নেলের নির্ঘাৎ ভীমরতি ধরেছি। উনি একেবারে মুখটা এগিয়ে সেই ফাঁকটা দেখে নিলেন এবং আঙুলে ফাঁকটা পরখও করলেন—যেন সত্যি না মিথ্যে, তাই দেখছেন। হেমেন্দ্র বাবু বললেন—পাঞ্জাবিটা পুবোনো। ওব দোষ নেই। একটুতেই ফরফব করে ছিঁড়ে যায়। এই দেখছেন না? বুকেব কাছে কেমন ফেটেফুটে গেছে!

আমার অবাক লাগল। পাড়াগাঁয়ে মানুষ এখনও কত সরল আর সাদাসিধে! এতবড় ফার্মের মালিক, অথচ তার জন্য এতটুকু দেমাক বা সাজগোজের ঘটা নেই। ছেঁড়া জামা পরেই কাটাচ্ছেন।

কর্নেল হঠাৎ বললেন—আপনার দেখছি পান খাবার অভ্যেস আছে!

হেমেন্দ্রবাবু যেন চমকে উঠলেন।—পান? না তো! বলেই নিজেব জামাটা বুকের কাছে দেখে নিয়েই আবার হো হো কবে হাসলেন।—ও হ্যা। মানে—মাঝে মাঝে খাই। কদা চিৎ!

আমি হসতে হাসতে বললুম—একটু আগেও খেয়েছেন কিন্তু।

নিজের জিভ বের ক'রে আত্মভোলা মানুষটি দেখে নিলেন। তারপর আবার সেই প্রাণখোলা হাসি।—কী কাণ্ড: খেয়ালই নেই! তাও বটে। দুপুরে এক পানখোর এসেছিল। কেন্দুহাটির নরহরিদা। তার কাছেই সখ কবে একটা খিলি নিয়েছিলুম। দেখছেন কাণ্ড! জামাটা কী বিচ্ছিরি হয়ে গেছে! পাঁচু! ও পাঁচু!

ডাক শুনে একটা লোক এলো। উনি জামাটা খুলে ওকে দিয়ে বললেন—এটা কেচে দে তো বাবা! এক্ষুনি কেচে দে।

পাঁচু বলল—এই সন্ধ্যেবেলা কেচে কী হবে গো? কাল সকালে দেবো'খন।

হেমেন্দ্র তক্ষুনি রেগে বললেন—সকাল হতে হতে আর দাগ উঠবে? যা—এক্ষুনি কেচে ফ্যাল। ...তারপর কর্নেলেব দিকে ঘুরে বললেন—তাহলে আপনার কথাই সত্যি স্যাব। পানের লাল রং দেখেই ব্যাটা তখন ক্ষেপে গিয়েছিল আমার ওপর। ঠিকই বলেছেন আপনি।...

এই ভাবে আমাদের কথাবার্তা চলতে থাকল। একসময় হেমেন্দ্র বাবুর মিস্ত্রি এসে জানাল, আমার গাড়িটা ঠিক হয়েছে। শুনে উঠে দাঁড়ালুম। বললুম—তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ হেমেন্দ্রবাবু। চলি। আসুন কর্নেল!

কর্নেল কী যেন ভাবছিলেন—মুখটা গম্ভীর। বললেন—যাবে?

—হ্যাঁ। কাল সকালেব মধ্যে কলকাতা পৌঁছতেই হবে।

কর্নেল হেমেন্দ্রবাবুর দিকে ঘুরে বললেন—ইয়ে, হেমেন্দ্রবাবু! নদীর ওদিকে বেশ জঙ্গল দেখলুম। নানা জাতের পাখির আড্ডা। আমার আবার পাখি দেখার প্রচণ্ড বাতিক। তাই ভাবছিলুম...

হেমেন্দ্রবাবু নীরস কণ্ঠস্বরে বললেন—পাখি? পাখি দেখবেন? পাড়াগেঁয়ে পাখি সব—আপনারা শহুরে মানুষ, ভাল লাগবে? তাছাড়া স্যাব, এই মাঠের মধ্যে চাষাভুষো হয়ে থাকি। আপনাদের অনেক কষ্ট হবে হয়তো।

স্পষ্ট বুঝলুম হেমেন্দ্রবাবুব পক্ষে ঝামেলা হবে, যদি আমরা থাকি। ঝামেলা তো নিশ্চয়। এমন অতিথিদের জন্যে বিছানাপত্র, ঘব ইত্যাদির সুব্যবস্থা তো চাই। অথচ কর্নেল যেন মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে চান। অদ্ভুত বেহায়া লোক তো! এমন স্বভাব কখনও দেখিনি কর্নেলের! খুব বিরক্ত হয়ে বললুম—পাখি দেখতে হলে ক্যাম্প-ট্যাম্প সঙ্গে নিয়ে আসবেন কর্নেল। এখন ওঠা যাক। রাত বেড়ে যাচ্ছে।

কর্নেল বেহায়া হয়ে বললেন—আরে, তুমি হেমেন্দ্রবাবুকে অমন অভব্য ভাবছ কেন? আমাদের দেশের মানুষ খুব অতিথিবৎসল সজ্জন। হেমেন্দ্রবাবু, কোনো রকম ব্যস্ত বা উদ্বিগ্ন হবার দরকার নেই। আমরা খোলা ওই বারান্দায় শোব। সঙ্গে কিছু খাবার আছে- -আপনার অসুবিধা হবে না!

হেমেন্দ্রবাবু হন্তদন্ত হয়ে জিভ কেটে বললেন—আ ছি ছি! আমি কি তাই বলছি? আপনাদের মতো মানুষ পাওয়া ভাগ্যের কথা! ওরে পাঁচু! হারাধন! মকবুল!

উনি ব্যস্তভাবে ডাকাডাকি করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। আমি রাগে বিরক্তিতে ফুঁসে উঠলুম। চাপা গলায় বললুম—আপনার নির্ঘাৎ ভীমরতি ধরেছে, কর্নেল! ছিঃ? এমনিভাবে যেচে পড়ে থাকার কোনো মানে হয়? আর কখনো আপনার সঙ্গে কোথাও যাব না।

কর্নেল যেন ধ্যানে বসে চোখ বুজেছেন। আমাব কথা শেষ হলে চোখ খুলে বললেন—তুমি কি কিছু বলছ জয়ন্ত?

—না। কিচ্ছু বলিনি।

বুড়ো মৃদু হাসলেন।—বৎস জয়ন্ত, ফার্মহাউসে রাত কাটানোর মধ্যে যে রোমাঞ্চ আছে, যে থ্রিল অ্যাণ্ড সাসপেন্স আছে—তা তুমি এ যাবৎ কোথাও পাওনি। আই প্রমিস অ্যাণ্ড অ্যাসিওর ইউ।

কিসের প্রতিজ্ঞা এবং প্রতিশ্রুতি তা আর জিগ্যেসও করলুম না, এত বেশি রেগে গেলুম। কর্নেল ততক্ষণে আবার চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়েছেন। উঃ। এই পাগলের হাত থেকে কী ভাবে উদ্ধার পাব কে জানে!

পাশাপাশি দুটো ঘব। পেছনের ঘরটায় দুটো খাটিয়া ছিল। নিশ্চয় পাঁচুরা শোয়। সেখানে মোটামুটি রকমের বিছানায় দুজনে শুয়ে পড়লুম, তখন বাত সাড়ে দশটা। জানলাগুলো খোলা। কোনো ঘরেই ফ্যান নেই। হেমেন্দ্রবাবু বিলাসী মানুষ নন। মিট মিটে বাল্বটা নিভিয়ে দিলুম। কর্নেলের নাক ডাকতে শুনলুম সঙ্গে সঙ্গে। আশ্চর্য তো! এমন করে ঘুমোতে কখনও দেখিনি। গবমে আমাব ঘুম এলো না। জানলার বাইরে গেটের বাল্বটা অল্প আলো দিচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে এলোমেলো ভাবছিলুম।

গতকাল বিকেলে ব্রিজের কাছে গাড়ি খাবাপ হওয়ার পর থেকেই কর্নেলের আচরণ কেমন অস্বাভাবিক লাগছে। ভূতগ্রস্তের মতো বাইনোকুলার চোখে রেখে জঙ্গলে ঢুকে যাওয়াব দৃশ্যটা মনে পড়ছিল। আমাব কথায় কানই দিলেন না—কেমন নাকবরাবর হেঁটে চলে গেলেন। তারপর দেখলুম, ফার্মেব পাঁচিলে উঠে পড়েছেন ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে। ষাঁড়ের পাল্লায় পড়তে গেলেন কেন হঠাৎ? ষাঁড়টা তো ফার্মের মধ্যেই ছিল। কেন ঢুকলেন ফার্মে? কোনো বিরল জাতের পাখিকে অনুসবণ করেই কি?

হ্যাঁ, তাই সম্ভব। তাই যেচে পড়ে থাকতে চাইলেন ফার্মে। তার মানে কালও আমার বেরনো হচ্ছে না। নিশ্চয় সেই দুর্লভ পাখির খোঁজ করবেন সকাল থেকে। খুব ঝামেলা করছে বুড়ো। এবার কোনোমতে কলকাতা ফিরলে আর ওর নাগালের মধ্যে যাব না।...

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে গেছি। তারপর যখন ঘুম ভাঙল, চোখ খুলে দেখি প্রচণ্ড অন্ধকাব। জানালা দিয়ে গেটের আলোটা আসছে না। নিশ্চয় লোডশেডিং।

কর্নেলেব নাক ডাকার শব্দ শুনতে পেলুম না। তাহলে উনিও জেগে আছেন। চাপা গলায় ডাকলুম—কর্নেল, জেগে আছেন নাকি?

কোনো সাড়া নেই। আরও তিনবাব ডেকে সাড়া না পেয়ে উঠলুম। ওঁর বিছানায় হাত বাড়িয়ে টেব পেলুম, বুড়ো নেই। তাহলে নৈশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন! এমন উৎকট সখ উনি ছাড়া কারও থাকতে পারেনা।

খুব গরম লাগছিল। সিগারেট ধবিয়ে যতক্ষণ না সেটা শেষ হ'ল, চুপচাপ বসে থাকলুম খাটিযায। তখনও কর্নেলেব কোনো সাড়াশব্দ নেই। ঘড়ি দেখলুম। রাত দুটো পাঁচ। তারপব দরজাব দিকে তাকিয়ে দেখি, দবজা খোলা। বারান্দায় গেলুম। কয়েক মিনিট অপেক্ষা কবেও কর্নেলের পাত্তা নেই। ল্যাট্রিনটা বাগানের কোণার দিকে বয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে কাকেও দেখলুম না। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ঘবে ফিরে এলুম। বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আবাব সিগারেট ধরালুম। সিগারেটার আধখানা পুড়েছে, হঠাৎ বাইরে কোথাও কর্নেলের ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল—হেমেন্দ্রবাবু! জয়ন্ত। হেল্প! হেল্প!

তক্ষুনি চেঁচিয়ে সাড়া দিলুম—কর্নেল! কর্নেল! কী হয়েছে?

তাবপর মনে পড়ল, আমার কিটব্যাগে একটা টর্চ আছে। টর্চটা বের করে দৌড়ে বাইবে বেরোলুম। বাগানের পশ্চিমদিকে টর্চের আলো জ্বেলেছে কে। সেই আলোয় দেখলুম, কর্নেল আবার সেই পাঁচিলে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড নাচছেন এবং চীৎকার করে যাচ্ছেন।

আমাব টর্চের আলো মুহূর্তে যা দেখবার দেখিযে দিল। সেই ষাঁড়টা! শিং নেড়ে পাঁচিলের নিচে লম্ফঝম্প করছে। শিঙে পাঁচিলটাকে গুঁতোচ্ছে। সামনের দু পায়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে।

রাগব, নাকি হাসব ভেবে পেলুম না। রাত দুপুরে কর্নেল আবার সেই একই ব্যাপার কেন ঘটিয়ে বসলেন, এটাই বড্ড অদ্ভুত!

হেমেন্দ্র বাবুর লোকেরা ততক্ষণে হেরিকেন জ্বেলে এনেছে। হেমেন্দ্র বাবুর হাতে টর্চ। উনি চেঁচাচ্ছেন—ভূষণ! ফাঁস নিয়ে এসো! ফাঁস!

বিকেলের মতোই ষাঁড়টাকে ক'জনে কায়দা করে ফেলল। তারপর টানতে টানতে আগড় গলিয়ে বেড়ার মধ্যে ঢোকাল। তখন কর্নেল লাফ দিয়ে নামলেন। নেমেই বললেন—হেমেন্দ্রবাবু! আপনার মেন সুইচ পরীক্ষা করে দেখুন তো শিগগির!

হেমেন্দ্রবাবু হাসতে হাসতে বললেন—দেখব কী। এ তো সব সময় হচ্ছে। লোডশেডিং। কিন্তু স্যার, আপনি কীভাবে এখন রামুর পাল্লায় পড়লেন?

সেই সঙ্গে আমি বললুম—এখন অন্ধকারে লাল টুপিও দেখা যায় না। তা ছাড়া এখন লালটুপি আপনার পরার কথাও নয়।

কর্নেল কোনো জবাব না দিয়ে হনহন করে এগোচ্ছিলেন। ওঁর মুখটা কেমন গম্ভীর। হেমেন্দ্রবাবু ও আমি ওঁকে অনুসরণ করলুম। বারান্দায় এগিয়ে যেতে যেতে কর্নেল একখানে দাঁড়ালেন। বললেন—হুম! এখানেই তো মিটার বোর্ড ছিল মনে হচ্ছে।

হেমেন্দ্রবাবু বললেন—হ্যাঁ স্যার। ওই যে, কোণায়। কিন্তু. .

কর্নেল মেনসুইচের কাছে গিয়ে অস্ফুটে বললেন—মাই গুডনেস!

তারপরই আলো জ্বলে উঠল গেটে। হেমেন্দ্রবাবু অবাক হয়ে বললেন—সে কী! মেনসুইচ অফ করেছিল কে?

কর্নেল কথা বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছেন, হঠাৎ ষাঁড়ের বেড়ার দিক থেকে হেমেন্দ্র বাবুর লোকেরা উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল—বাবু! বাবু! শিগগির এখানে আসুন, শিগগির!

এবার সবার আগে কর্নেলকে দৌড়তে দেখলুম। বাগানের একাংশে বেড়া, বেড়ার মধ্যে ষাঁড়ের খোঁয়াড়। ষাঁড়টা পোয়ালের গাদায় মুখ ঢুকিয়ে ভোজনে ব্যস্ত। আর হেরিকেনের আলোয় লোকগুলো কিছু ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

গিয়ে যা দেখলুম, স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। একটা মধ্যবয়স্ক লোক চিত হয়ে পড়ে আছে। তার পরণে ময়লা ধুতি, গায়ে ফতুয়া মতো জামা। তার বুকে কলজের কাছটায় চাপচাপ রক্ত। হেমেন্দ্র চেঁচিয়ে উঠলেন—নরহরিদা! এ যে নরহরিদা! সর্বনাশ! মারা গেছে নাকি?

কর্নেল হাঁটু দুমড়ে লোকটাকে কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন—অনেকক্ষণ আগে মারা গেছে! কিন্তু .. ইনি এখানে কোত্থেকে এলেন?

হেমেন্দ্রবাবু প্রায় হাউমাউ করে কেঁদে বললেন—এ হবে আমি জানতুম! ওই অলক্ষুণে বদমাস ষাঁড় খুন খারাপি না করে ছাড়বে না—ঠিক বলেছিলুম! বাবা চণ্ডী! দ্যাখতো, ওর শিঙে রক্তটক্ত লেগে আছে নাকি।

টর্চ ফেললুম আমি। হ্যাঁ—ষাঁড়টার ডান শিঙে রক্ত থকথক করছে। কর্নেল বললেন—কী সর্বনাশ! হেমেন্দ্রবাবু, ইনি নিশ্চয় আপনার কোনো কর্মচারী?

হেমেন্দ্রবাবু বললেন—না স্যার। উনি কেন্দুহাটির নরহরি দাশমশাই। খুব বড় ব্যবসায়ী। রামপুরহাটেও ওর কাঁসা-পেতলের কারবার আছে। ইদানীং এই মাঠে অনেকটা জমি কিনেছিলেন নরহরিদা। আমার মতোই ফার্ম করার ইচ্ছে ছিল। ছেলেরা লায়েক হয়ে ব্যবসা

দেখছে। উনি নিজে ফার্ম দেখবেন, এই ছিল মতলব। তার ওপর সম্প্রতি বিহারে হিরণপুরের গোহাটা থেকে এক গাই গরু কিনেছিলেন। কে ওঁর মাথায় ঢুকিয়ে দিল কে জানে, আমার মতো ডেয়ারি খুললে খুব পয়সা হবে। তাই আমার কাছে ক'দিন ধরে খুব যাতায়াত করছিলেন।

কর্নেল বললেন—কিন্তু এখানে ষাঁড়ের খোঁয়াড়ে রাতদুপুরে...

বাধা দিয়ে হেমেন্দ্রবাবু বললেন—বলছি স্যার। বড্ড একগুঁয়ে মানুষ নরহরিদা। যখন মাথায় ডেয়ারি ঢুকেছে, তখন রক্ষে নেই। ওদিকে হাড়কিপটে—বড্ড কৃপণ, বুঝলেন? দুটো গরু থেকেই কয়েকশো গরুর স্বপ্ন এসেছে মাথায়। তাই একটা ভালজাতের ষাঁড় চাই। আমার ষাঁড়টা বেজায় পছন্দ। সবসময় এসে সাধাসাধি করছিলেন, ষাঁড়টা যেন ওঁকে বেচে দিই। কেন দেবো, বলুন স্যার? সখ করে কিনেছি।

কর্নেল বললেন—হুম! কিন্তু রাতদুপুরে ষাঁড়ের খোঁয়াড়ে...

হেমেন্দ্রবাবু ফের বাধাদিয়ে বললেন—স্যার, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু—কথায় বলে। নিশ্চয় উনি ষাঁড়টা চুরির মতলবে এসেছিলেন। তাছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে?

কর্নেল মাথা নেড়ে বললেন—উঁহু! চুরি করলে তো ধরা পড়ে যাবেন! ষাঁড় চুরি করা কি সম্ভব?

হেমেন্দ্রবাবু ব্যস্তভাবে বললেন—ঠিক বুঝতে পারলেন না স্যার! একেবারে চুরি নয়। ষাঁড়টা নিয়ে গিয়ে একটা দিন লুকিয়ে রাখতেন এবং তাতেই ওঁর গরু দুটো প্রেগন্যান্ট হ'ত! ভাল জাতের দুধেল গরুর জন্ম হ'ত!

—সে তো আপনাকে অনুরোধ করলেই হ'ত।

—হ'ত না স্যার! অন প্রিন্সিপল, আমি বাইরের কোনো গরুর জন্য ষাঁড় তো দিতুম না। উনি অবশ্য আমাকে তাও অনুরোধ করেছিলেন। দেবো কেন বলুন? একে তো কমপিটিশান—তার ওপর আমার ষাঁড়, আমি নগদ পাঁচ হাজার টাকায় কিনেছি। এটা প্রেসটিজেরও ব্যাপার কিনা! তাছাড়া এক জনকে দিতে হলে আরও সবাই চাইবে। আমি তো স্যার দেশশুদ্ধু ভাল গরু প্রোডিউস করার দায়িত্ব নিই নি। সরকারের সে ব্যবস্থা আছে। সবাই সরকারের কাছে যাক। ব্লক আপিসে যাক।..বলে হেমেন্দ্রবাবু আচমকা ভেঙে পড়লেন।—ও নরহরিদা! এ তুমি কী করলে।

কেন্দুহাটি থানার পুলিশ অফিসার হিতেন গুপ্ত জিপে চেপে সদলবলে এলেন সকাল আটটায়। ষাঁড়ের শিঙের গুঁতোয় মৃত্যু—সুতরাং দুর্ঘটনার একটা সাধারণ তদন্ত ছাড়া আর কীই বা হবে! হিতেনবাবু হেমেন্দ্রবাবুকে একচোট শাসাতে ভুললেন না। —তিনটে জখম, তারপর এই ডেথ। ওই খুনে ষাঁড় আপনি শিগগির বিদেয় করুন মশাই। নাহলে ভীষণ বিপদে পড়বেন।

হেমেন্দ্রবাবু অনুনয় বিনয় করে দারোগাবাবুকে শান্ত করলেন। আড়ালে ডেকেও নিয়ে গেলেন। তার মানে যা বোঝার, সবাই বুঝল। নরহরিবাবুর মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতেও চাইলেন। কিন্তু নরহরিবাবুর ছেলেরা তা নেবে কেন? তাদের অঢেল পয়সা আছে। ক্ষতিপূরণ

নেওয়াটা অপমানজনক। তাছাড়া এ তো লজ্জার কথাও বটে। বাবা ষাঁড় চুরি করতে এসেছিল। খিট কেল কি কম হবে? তিন ছেলের মধ্যে ছোট ভীষণ রাগী। সে শাসাল—আজই ষাঁড়টাকে গুলি না করে জলগ্রহণ করবে না। হেমেন্দ্রবাবু করজোড়ে ক্ষমা চাইতে থাকলেন।

গ্রাম থেকে অনেক মাতব্বর লোকেরা এসেছিলেন। তাঁরা মধ্যস্থ হয়ে সব মীমাংসা করে দিলেন। নরহরিবাবুর নিয়তি—তা না হলে অমন মানুষ রাত দুপুরে ষাঁড় চুরিই বা করতে আসবেন কেন? নিশির ডাকে বেচারাকে ঘর ছাড়া করেছিল। কেউ কেউ জনান্তিকে বলল—পিপড়ের পাছা থেকে গুড় তুলে খায়, এমন কিপটে লোক। পয়সাব লোভ বড্ড। তাই ষাঁড় চুরি করতে এসেছিল।

লাশ যথারীতি মর্গে গেল। দারোগাবাবু কর্নেলকে পাত্তাই দিলেন না। কর্নেল গতিক বুঝে কাঁচুমাচু মুখে সরে এলেন। আমি ব্যাপারটা দেখে খুব হাসলুম।

বেলা তখন সাড়ে দশটা। সবে চুকে গেছে। দারোগা লাশ নিয়ে চলে গেছেন। ভিড সরেছে। কর্নেল একটা শিরীষ গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ফার্মের একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে বললুম—আর কী? এবার বেরোনো যাক।

কর্নেল আমার হাত ধরে টানলেন। লোকটা চলে গেল। একটু এগিয়ে এক জায়গায় দাঁড়ালেন কর্নেল। তারপর বললেন—জয়ন্ত কি খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছ?

—নিশ্চয। আপনার মতো বাহাত্তুরে ধরেনি তো আমাকে।

—জয়ন্ত, জয়ন্ত! তুমি রাগ করছ। কিন্তু বাহাত্তুরে হয়ত তোমাকেই ধরেছে।

—মোটেও না। আসলে আপনার মাথায় গোয়েন্দাপোকা কামড়াচ্ছে। স্রেফ দুর্ঘটনাকেও আপনি মেনে নিতে পারছেন না। কারণ, আপনার স্বভাব শকুন যেমন মড়া দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি আপনিও...

—জয়ন্ত, জয়ন্ত! আমাকে শকুন বলছ?

—বলব। একশোবার বলব।

—হ্যাঁ, আমি শকুনই বটে। আমার চোখে শকুনের দৃষ্টিশক্তি আছে ডার্লিং!

—অস্বীকার করছি না। তাই তো, কাল বিকেলে কেন আমি তোমার গাড়ি বিগড়ানো দেখেও দেখলুম না? কেন আমি শুকুনেব মতো নদীর ধারে জঙ্গলের দিকে চলে গেলুম—তোমার কথার কোনো জবাব না দিয়েই কেন চলতে থাকলুম?

—নির্ঘাৎ চরে মড়া দেখেছিলেন?

—ঠিক বলেছো, জয়ন্ত। তবে মড়া তখনও দেখিনি, শুধু গন্ধ টেব পেয়েছিলুম। টনক নড়েছিল।

চমকে উঠে বললুম—তার মানে? মড়ার গন্ধ—দ্যাট ইজ ডেডবডি! মার্ডার! কর্নেল হাসলেন।—আচ্ছা জয়ন্ত, গতকাল বিকেলে তুমি ষাঁড়টা দেখেছিলে, গতরাতে দেখেছ, এবং আজ সকালেও দেখেছ। কোনো অদ্ভুত কিছু চোখে পড়েনি।

—না তো!

—ষাঁড়ের শিঙে বিকেলে কোনো পেতলেব ছুঁচলো ডগাওযালা টুপি পরানো ছিল না। অথচ রাতে যখন ষাঁড়টা দেখলুম. তখন টুপি পরানো আছে। তাতে বক্ত লেগে আছে।

বাধা দিয়ে বললুম—তাই তো বটে!

—তার মানে সন্ধ্যার পর কোনো একসময় শিঙে ছুঁচলো টুপি পরানো হয়েছিল।

—কিন্তু হঠাৎ অমন তীক্ষ্ণ ধারালো টুপি পরানো হ'ল কেন?

কর্নেল সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললেন—জয়ন্ত, কাল রাতে আমি জেগেছিলুম। নাক ডাকানোটা নেহাৎ কৌশল। ঘুমোনো সম্ভব ছিল না, জয়ন্ত। আমি একটা কথা ভাবছিলুম, যে ডেডবডির গন্ধ পেয়ে নদীর চরে গিয়েছিলুম, সেটা দেখার অপেক্ষায় ছিলুম।

—তার মানে? ডেডবডির কথা কেন ভাবছিলেন? তখন ডেডবডি কোথায়?

—কাল বিকেলে নদীর চরে একজনকে চুপি চুপি বালি সরাতে দেখছিলুম। বাইনোকুলারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল, সে কিছু একটা পুঁতছে। তাই দৌড়ে সেদিকে এগোলুম। যেতে যেতে লোকটা কাজ শেষ করে পালায়। তখন খুঁজতে খুঁজতে আবিষ্কার করলুম, লোকটা বালিতে একটা লোহার গোঁজ লুকিয়ে রেখে গেল। দেড়ফুট লম্বা, একইঞ্চি মোটা গোঁজ— যা দিয়ে গরু বাঁধা খুঁটি হয়। গোঁজের ডগায় টাটকা রক্ত দেখে এমনি টের পেলুম, কী ঘটেছে।

—বলেন কী!

—স্পষ্ট জানলুম, এটা একটা মার্ডার উইপন। অথচ জঙ্গলে ঢুকে বা চরে কোথাও ডেডবডি পেলুম না। তখন বোঝো আমার মনের অবস্থা! এখানে এই ফার্ম ছাড়া কোনো বসতি নেই। তাই সন্দেহক্রমে ঢুকে পড়লুম ফার্মে। ঢুকেই পড়ে গেলুম ষাঁড়ের পাল্লায়।

—তাহলে আপনি সেজন্যেই যেচে পড়ে থাকতে চাইলেন?

—হ্যাঁ জয়ন্ত। ডেডবডিটা আবিষ্কার করা জরুরী ছিল। তবে ষাঁড়টা প্রথমে দেখেই আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল। খুনের পদ্ধতি অর্থাৎ এ্যালিবাই কী ধরনের হবে, সঙ্গে সঙ্গে আঁচ করে নিয়েছিলুম। তারপর হেমেন্দ্রবাবুর জামায় পানের দাগ দেখলুম। অথচ উনি মুখ ফসকে বলে ফেললেন, পান খান না। তখন সব স্পষ্ট হ'ল।

—তাহলে ওগুলো কি রক্তের দাগ?

—হ্যাঁ। আর ওই জামা ছেঁড়ার ব্যাপারটা ষাঁড়ের শিঙে ঘটেনি। ...বলে কর্নেল পকেট থেকে একটা সাদা কাপড়ের ছোট্ট টুকরো বের করলেন।—এই সেই টুকরো। এটা নরহরি বাবুর হাতের মুঠোয় ছিল। কাল রাতে লাশ পরীক্ষার সময় এটা ওঁর মুঠোয় পেয়ে গিয়েছিলুম। তার মানে, খুব ধস্তাধস্তি হয়েছিল। খুনের সময় হেমেন্দ্রবাবু জামাটা কত জায়গায় ছেঁড়া দেখেছ, আশা করি এখনও ভোলনি।

শুনতে শুনতে আমি স্তম্ভিত। এদিক ওদিক তাকিয়ে বললুম—কিন্তু এত সব প্রমাণ পেয়েও পুলিশকে কিছু বললেন না?

কর্নেল দুঃখিত মুখে বললেন—বলেও লাভ হ'ত না জয়ন্ত। দারোগা ভদ্রলোক সৎ মানুষ নন। উল্টে আমাদেরই হয়রান করতেন। মাঝখান থেকে কোনো প্রমাণই কাজে লাগাবার সুযোগ পেতুম না। দুর্নীতিবাজ অফিসার হলে যা হবার, তাই হ'ত। এই কাপড়ের টুকরো, লোহার গোঁজ—সবকিছু লোপাট হয়ে যেত। তার চেয়ে আমরা এখনই রামপুরহাট পুলিশ সুপারের কাছে যেতে চাই। গাড়ি বের করো। শিগগির!

গাড়ি বের করলুম। হেমেন্দ্রবাবুর কাছে বিদায় নিলুম। এবার উনি কিছুতেই আসতে

দেবেন না। অনেক সাধাসাধি করলেন। মনে মনে বললুম—শয়তানের কাজ চুকে গেছে। এখন আমাদের উপস্থিতি তো আর বাধা সৃষ্টি করবে না।

পথে আসতে আসতে বললুম—গতরাতে কেন বেরিয়েছিলেন বলেন নি কিন্তু।

কর্নেল জবাব দিলেন—একটা লাশ কখন ষাঁড়ের খোঁয়াড়ে ঢোকানো হবে, তাই দেখতে। কিন্তু আমার উপস্থিতি টের পেয়ে গেল ব্যাটা। অমনি ষাঁড়টাকে আগড়ের বাইরে ঠেলে দিল। ষাঁড়টা বদমেজাজী সন্দেহ নেই। তক্ষুনি তেড়ে এলো।

—মেনসুইচ অফ করাটা নিশ্চয় চোখে পড়েছিল আপনার?

—হ্যাঁ। হঠাৎ গেটের আলো নিভলেই আমি বেরিয়ে পড়েছিলুম। টের পেয়েছিলুম, লাশটা এবার আমার অজ্ঞাত কোনো গুপ্তস্থান থেকে আনা হচ্ছে।

কতক্ষণ চুপচাপ থাকার পর জিগ্যেস করলুম—কিন্তু মোটিভ কী খুনের?

কর্নেল একটু হাসলেন।—নবহরি বাবুর ছেলেদের কথাবার্তা কান পেতে শোনো নি। বিশেষ করে ছোট ছেলেটার কথা? মহাজনী কারবার ছিল নরহরিবাবুর। তাই অনুমান করছি, হেমেন্দ্রবাবুর কাছে অনেক টাকা সুদে আসলে নিশ্চয় পাওনা হয়েছিল। অথচ এসব কারবার গ্রামাঞ্চলে কোনো রকম খাতা কলমে হয়-টয় না। বিশেষ করে এক সময়ে জমিদার বংশের লোক হেমেন্দ্রবাবু। মুখের কথায় মহাজন টাকা দেয়। হেমেন্দ্রবাবুর প্ল্যান ছিল, টাকা চাইতে এলেই খুন করবেন এবং ষাঁড়ের ওপর দায়টা চাপাবেন। খুব সহজ পদ্ধতি!

হেসে বললুম—ব্যাটা হেমেন্দ্রবাবু টেরও পাচ্ছে না যে কী ঘটতে চলেছে?

কর্নেল গম্ভীর হয়ে বললেন—নরহরিবাবুও টের পাননি যে কী ঘটতে চলেছে! এই হয়, জয়ন্ত। যে খুন করে আর যে খুন হয়, তারা যেন কিছুক্ষণের জন্য বড্ড নিঃসাড় হয়ে পড়ে। মানুষের বোধবুদ্ধির এই নিঃসাড় বা ফ্রিজিং অবস্থার মধ্যেই শযতানের আবির্ভাব ঘটে।

# কাঠের পা

## হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রথমে খোঁজ পেল হরিযা মালী।

বেশ বেলা হয়েছে। এ সময়ে প্রফেসর উঠে পড়েন। সোজা রাস্তা ধরে বাদামতলা পর্যন্ত বেড়িয়ে আসেন। তারপর বারান্দায় বসে চায়ে চুমুক দেন।

হরিযাই চা তৈরি করে দেয়। বিস্কুট কেনা থাকে।

হরিযা উঁকি দিল। দরজা বন্ধ, জানালাগুলোও।

এটা অবশ্য খুবই স্বাভাবিক, কারণ এই পাহাড়ি জায়গায় শীতের প্রকোপ বেশ বেশি।

একটু পরে হরিযা দরজায় ধাক্কা দিল। কোনো সাড়া নেই।

আশ্চর্য কাণ্ড। এরকম তো হবার কথা নয়।

হরিয়া দরজায় কান পেতে রইল। না, নিস্তব্ধ। ক্রাচের কোনো শব্দ নেই।

ব্যাপারটা মোটেই ভাল ঠেকল না।

হরিয়া বেরিয়ে গেল।

একটু দূরে দীনবন্ধু বাবুর বাড়ি। অবসরপ্রাপ্ত নামজাদা সাব-জজ। প্রফেসরের বিশেষ বন্ধু।

হরিযা ডাকল, সরকারবাবু, সরকারবাবু।

বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে দীনবন্ধু সরকার একটা বই পড়ছিলেন, হরিয়ার চীৎকারে এগিয়ে এলেন।

কিরে হরিয়া?

আজ্ঞে, প্রফেসরকে এত করে ডাকছি, কোনো সাড়া পাচ্ছি না।

সেকি? চল আমি যাচ্ছি।

দীনবন্ধু সরকার কোট গায়ে দিয়ে হরিয়ার পিছন পিছন এ বাড়িতে এসে দাঁড়াল।

হরিয়া আবার দরজায় ধাক্কা দিল।

দীনবন্ধু সরকার চীৎকার করলেন।

প্রফেসর, ও প্রফেসর।

কোনো সাড়া নেই। দীনবন্ধু সরকার চিন্তিত হলেন।

আমি তো ভাল বুঝছি না হরিয়া। তুই সাইকেলে করে একবার থানায় চলে যা। আমার নাম করে ছোট দারোগাকে আসতে বল।

বলবার সঙ্গে সঙ্গে হরিয়া সাইকেলে বেরিয়ে গেল।

## কাঠের পা

দীনবন্ধু সরকার একটা গাছের গুঁড়িতে বসলেন।

প্রফেসর এখানে আছেন দশ বছরেরও বেশি। কোনো এক কলেজে পড়াতেন। বিপত্নীক। ছেলেমেয়ে নেই। রিটায়ার করে এখানে আস্তানা বেঁধেছেন। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। হরিয়া দেখাশোনা করে। আদিবাসী একটি প্রৌঢ়া দুবেলা রেঁধে দিয়ে যেত।

মাঝে মাঝে কিছু লোক আসত।

প্রফেসর বলতেন, ছাত্রের দল মাঝে মাঝে জ্বালাতে আসে। আর বলেন কেন! কিছু কি আর মনে আছে। এখন কত রকম নতুন থিয়োরি হয়েছে। প্রফেসর বোটানি পড়াতেন। মাঝে মাঝে কখনও গভীর জঙ্গলের মধ্যে চলে যান। গাছপালা সংগ্রহ করে আনেন।

প্রফেসরের একটা পা নেই। হাঁটু থেকে কাঠের পা লাগানো। বগলে ক্রাচ। এ অসুবিধায় প্রফেসর অভ্যস্ত। অবসর গ্রহণ করার পরই এক দুর্ঘটনায় পা হারিয়েছিলেন। রাস্তা পার হতে গিয়ে বাসের তলায় পাটা থেঁতলে গিয়েছিল। যমে মানুষে টানাটানি। পা কেটে বাদ দিয়ে প্রফেসর বাড়ি ফিরেছিলেন।

প্রফেসর দীনবন্ধুবাবুর দাবার সঙ্গী।

রোজ সন্ধ্যায় দুজনে দাবার ছক পেতে বসেন। খেলা জমে উঠলে দুজনে কেউই উঠতে চায় না।

হরিয়া ডেকে ডেকে প্রফেসরকে উঠিয়ে নিয়ে যেত।

সাইকেলের শব্দ হতে দীনবন্ধুবাবু ফিরে দেখলেন।

হরিয়া সাইকেলে ফিরছে।

কি রে কি হ'ল?

ছোট দারোগা জীপে করে আসছেন।

দীনবন্ধু বাবু রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

একটু পরেই পথের বাঁকে জীপ দেখা গেল।

শুকনো পাতার স্তূপ উড়িয়ে দুরন্ত বেগে আসছে।

ঠিক দীনবন্ধুবাবুর সামনে এসে জীপ থামল।

জীপ থেকে ও.সি মোহন সিং লাফিয়ে নামল।

নমস্কার সরকার সাব কি ব্যাপার?

কিছু বুঝতে পারছি না। প্রফেসরের দরজায় ধাক্কা দিয়েও দরজা খুলতে পারছি না।

চলুন, দেখি একবার।

মোহন সিং-এর ইঙ্গিতে জীপ থেকে একজন কনস্টেবল নামল।

বন্ধ দরজায় সজোরে বুটের লাথি।

দরজার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

মোহন সিং হরিয়ার দিকে ফিরে বলল—বাড়িতে শাবল আছে?

হরিয়া একটা শাবল এনে দিল।

কনস্টেবল দরজার ফাঁকে শাবল দিয়ে চাপ দিল। কয়েকবার চাপ দেবার পরই দরজার কব্জা খুলে পাল্লা কাত হয়ে পড়ল।

মোহন সিং টান দিয়ে দরজা খুলে ফেলল।

আগে মোহন সিং, তারপর কনস্টেবল, সবশেষে দীনবন্ধু সরকার আর হরিয়া।

বিছানাব ওপর প্রফেসর শুয়ে।

শোবার ভঙ্গীটা কারোরই ভাল ঠেকল না।

কাছে গিয়ে দেখল, দুটো চোখ বিস্ফারিত, মুখের দু পাশে ফেনা।

মোহন সিং দেহের ওপর হাত রেখে বলল, অনেকক্ষণ আগে সব শেষ হয়ে গেছে। দেহ বেশ শক্ত।

দীনবন্ধুবাবুর দিকে ফিরে মোহন সিং জিজ্ঞাসা করল, কত বয়স হয়েছিল ভদ্রলোকের?

তা প্রায় বাষট্টি হবে। বয়সের আগেই কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ কবেছিলেন।

কি মনে হচ্ছে আপনার?

স্বাভাবিক মৃত্যু বলে তো মনে হচ্ছে না। দেখছেন মুখ চোখের ভঙ্গী যেন দমবন্ধ করে মারা হয়েছে।

দীনবন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কে মারল, সে বের হ'ল কি করে? ঘর তো ভিতর থেকে বন্ধ।

মোহন সিং একটু চিন্তিত হ'ল। এগিয়ে গিয়ে জানালাগুলো পরীক্ষা করল। জানালাগুলো সব ভিতর থেকে ছিটকিনি দেওয়া। কাঠের পা আর ক্রাচ কোণের দেওয়ালে হেলান দিয়ে রাখা।

তাহলে অতখানি এলো কিভাবে?

মোহন সিং বলল, আগে ডেডবডি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দিই, রিপোর্ট কি বলে দেখি তারপর কর্তব্য ঠিক করা যাবে।

কনস্টেবল জীপ নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মোহন সিং ঘরে তালা দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। লোক এসে হাতের ছাপ নিয়ে যাবে। কলকাতা এখান থেকে খুব দূর নয়। দরকার হলে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট থেকেও লোক আসতে পারে।

মোহন সিং দীনবন্ধু সরকারকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি শেষ কবে প্রফেসরকে দেখেছেন?

দীনবন্ধুবাবু শোকে মুহ্যমান হয়েছিলেন। ভাবতে আশ্চর্য লাগছিল, এত দ্রুত একটা পরিচিত মানুষ চিরদিনের জন্য সরে যাবে। মোহন সিংয়েব প্রশ্নেব উত্তরে বললেন, কাল রাত্রেও প্রফেসর আমার সঙ্গে দাবা খেলেছিলেন। তবে একটু যেন অন্যমনস্ক। উনি খুব পাকা খেলোয়াড়। কোনোদিন ওঁকে হারাতে পারি না, কাল দুবার মাত করে দিয়েছি। আমি বলেছিলাম, কি হ'ল প্রফেসর, মনটা কোনদিকে?

প্রফেসর চমকে উঠে বলেছিলেন, মন ঠিক আছে। দুপুর থেকে শরীরটা খুব যুত নেই। আজ তাড়াতাড়ি উঠব।

সাড়ে সাতটার মধ্যেই প্রফেসব উঠে পড়েছিলেন।

আমি ভেবেছিলাম, আমাদের তো বয়স হচ্ছে। শরীর সব দিন কি আর এক রকম থাকে।

হরিয়াও প্রশ্নের উত্তরে নতুন কোনো আলোকপাত করতে পারল না।

কেবল বলল, দুপুর বেলা দুটি লোক এসেছিল, বোধহয় ছাত্রই হবে। দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল।

প্রফেসরের দেহ পোস্টমর্টেমের জন্য নিয়ে যাওয়া হ'ল। লোক এসে হাতের ছাপও তুলে নিল। নানাদিক থেকে ঘরের ফটো। কলকাতায় ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে পাঠাবে।

দীনবন্ধু সরকার যখন বাড়ি ফিরলেন বেশ ম্রিয়মান অবস্থা। বিশেষ কারও সঙ্গে মিশতেন না একমাত্র প্রফেসর ছাড়া। এই বয়সে নতুন করে বন্ধু সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়।

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁগো, কি শুনছি?

বাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে দীনবন্ধুবাবু বললেন—প্রফেসর মারা গেলেন।

হঠাৎ?

মানুষ কি আর বলে কয়ে মারা যায়।

আমার কিন্তু বাবু সন্দেহ হচ্ছে।

সন্দেহ, কিসের সন্দেহ?

জলজ্যান্ত লোকটা এভাবে মারা যাবে!

দেখি ডাক্তারের রিপোর্ট আসুক।

অন্যদিন দীনবন্ধুবাবু একটু বেড়িয়ে আসেন, আজ বাড়ির মধ্যেই বসে রইলেন। মনটা খুব খারাপ। কে বলেছিল, পরমায়ু পদ্মপাত্রে জল। ঠিক কথাই। বিকালে বেড়াতে বেড়াতে থানার দিকে গেলেন।

মোহন সিং থানায় ছিল।

অভ্যর্থনা করে বলল, আসুন, আসুন, কি খবর?

খবর তো আপনাদের কাছে।

এই একটু আগে রিপোর্ট এসেছে, অবশ্য লিখিত রিপোর্ট নয়, ডাক্তার সেন ফোনে জানিয়েছেন যে মৃত্যু হয়েছে করোনারি অ্যাটাকে। যাক নিশ্চিন্ত। নয়তো এই নিয়ে ঝামেলা হ'ত।

করোনারি অ্যাটাকে?

তাই তো বললেন। প্রফেসরের হার্টের অবস্থার কথা কিছু জানেন আপনি? উনি কোনোদিন কিছু বলেছেন?

না, হার্টের অবস্থা খারাপ এমন কথা বলেননি। তবে খুব সাবধানী লোক ছিলেন। তিনমাস অন্তর রক্তপরীক্ষা করাতেন। সুগার, কোলেস্টেরাল, ইউরিয়া সব চেক করাতেন।

মোহন সিং দার্শনিকের ভঙ্গীতে বলল, আর মশাই যত চেক করান, মৃত্যু যখন থাবা বসায়, তখন কিছুর পরোয়া করে না। সব রিপোর্ট বানচাল করে দেয়।

আচ্ছা চলি।

দীনবন্ধুবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

মোহন সিংও সঙ্গে সঙ্গে উঠল।

স্যার, এখবরের জন্য আপনি এতটা হেঁটে এলেন কেন? বাড়িতে ফোন রয়েছে। ফোন করে জেনে নিলেই পারতেন।

একটু হাঁটতেও বেরিয়েছিলাম, সেই সঙ্গে খবরটা নিয়ে গেলাম।

দীনবন্ধু সরকার বাড়ি ফিরে এলেন।

সামনের বাগানে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হ'ল।

স্ত্রী এগিয়ে এসে বললেন—আমি একটা কাজ করেছি।

কি কাজ?

পারিজাত বক্সীকে ফোন করে দিয়েছি।

দীনবন্ধু ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

পারিজাত বক্সী কে?

পারিজাত বক্সীর নাম শোনোনি? বিখ্যাত সখের গোয়েন্দা।

দীনবন্ধুবাবুর মনে পড়ে গেল।

পারিজাতবাবুর সম্বন্ধে চমকপ্রদ সব কাহিনী এখানে ওখানে শুনেছেন। খবরের কাগজের পাতায় পড়েছেন। বিখ্যাত গোয়েন্দা। ব্যোমকেশ বক্সীর ভাইপো।

আর একটা কথাও মনে পড়ে গেল।

গৃহিনীর সঙ্গে পারিজাতবাবুর লতায় পাতায় কি একটা সম্পর্কও আছে।

কি বললেন পারিজাত বক্সী?

আজ রাত সাড়ে সাতটার মধ্যে পৌঁছে যাবেন।

দীনবন্ধু হাত ঘড়ি দেখলেন।

প্রায় ছ'টা।

শীতের বিকাল। এর মধ্যেই সন্ধ্যার রূপ নিয়েছে।

তাহলে স্টেশনে কাউকে পাঠাতে হয়।

কাকে আর পাঠাবে। কেউ তো ওঁকে চেনে না। তা ছাড়া উনিও বলেছেন, কারও স্টেশনে থাকার দরকার নেই। উনি ঠিক চিনে আসতে পারবেন।

দুজনে অপেক্ষা করলেন। সাড়ে আট বাজল। পারিজাতবাবুর দেখা নেই। স্টেশন খুব দূরে নয়। মিনিট দশেকের পথ। রিক্সায় মিনিট পাঁচেক। ট্রেন ঠিক সময়ে এসেছে। ট্রেনের শব্দ বাড়ি থেকে পাওয়া গেছে।

ন'টা বাজল।

দীনবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কই গো, তোমার পারিজাত বক্সীর কি হ'ল?

কি জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাকে তো বললেন, নিশ্চয় আসব।

আর এসেই বা লাভ কি। প্রফেসরের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

পৌনে দশ, দুজনে যখন শুতে যাচ্ছে, বাড়ির সামনে রিক্সা এসে থামল।

সুটকেশ হাতে নিয়ে পাবিজাত বক্সী নামলেন।

দীনবন্ধুবাবু পারিজাত বক্সীকে কোনোদিন দেখেন নি। তিনি কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে দেখতে লাগলেন।

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী এগিয়ে গিয়ে বললেন, খুব লোক যাহোক। এই আপনার সাড়ে সাতটা?

পারিজাত বক্সী হাতজোড় করে দুজনকে নমস্কার করে বললেন দেরী করে আসার জন্য মাপ চাইছি। কতকগুলো কাজ সেরে এলাম।

কথা হ'ল খাবার টেবিলে।

দীনবন্ধুবাবুর ঠিক সময়ে খাওয়ার অভ্যাস। তিনি আগেই খেয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী আর পারিজাত বক্সী একসঙ্গে খেতে বসলেন।

একটা চেয়ার নিয়ে দীনবন্ধুবাবু সামনে বসে রইলেন।

আমি বাড়িটা দেখে এলাম। করোনারি অ্যাটাক কি না জানি না, তবে হার্টফেল করে আপনাদের প্রফেসর মারা গেছেন, সেটুকু বোঝা যাচ্ছে। ভিসারায় বিষ জাতীয় কিছু পাওয়া যায় নি। দেহেও বিষের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।

কিভাবে মৃত্যু হয়েছে বলে আপনার বিশ্বাস?

দীনবন্ধুবাবুর প্রশ্নের উত্তরে পারিজাত বক্সী বললেন, এত তাড়াতাড়ি কিছু বলা মুস্কিল। আমাকে দিন কয়েক সময় দিন।

খাওয়া দাওয়ার পর সুটকেশ থেকে কোলের বালিশ আর একটা বিলাতী কম্বল বের করে পারিজাত বক্সী বললেন, আমি চলি।

দীনবন্ধুবাবু আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই অবাক।

এত রাত্রে আপনি আবার কোথায় যাবেন?

আমি প্রফেসরের বাড়িতে শোব।

কিন্তু সে বাড়ি তো তালাবন্ধ।

আমি থানায় গিয়ে মোহন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে চাবি নিয়ে এসেছি। আচ্ছা গুডনাইট। কাল সকালে দেখা হবে।

পারিজাত বক্সী বেরিয়ে গেলেন।

বাড়ি খালি।

হরিয়া মালীও নেই। প্রফেসরের মৃত্যু হবার পর তার আর এখানে রাত কাটাতে সাহস হয়নি।

তালা খুলে পারিজাত বক্সী ভিতরে ঢুকলেন।

হাতড়ে হাতড়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালালেন।

তারপর এঘর ওঘর ঘুরে বেড়ালেন।

দুটো মাত্র ঘর। একটা একটু বড় আর একটা ছোট। শোবার ঘরে একটা শেলফ। তাতে কিছু বোটানির বই, কিছু হালকা নভেল। মাঝখানে একটা গোল টেবিল। একটা খাট।

ভিতরের ঘরে একটা আলনা। তাতে কিছু জামাকাপড় ঝুলছে। একটা দেয়াল আলমারি। তাতে কয়েকটা ওষুধের শিশি।

সেগুলো পেড়ে মনোযোগ দিয়ে পারিজাত বক্সী দেখলেন।

ঘুমের বড়ি, মাথা ধরার অ্যানাসিন, ডায়াবিটিস। শেষের ওষুধটা দেখে মনে হ'ল প্রফেসরের ডায়াবেটিস ছিল।

একদিকে একটা ফাইল। সেটা পেড়ে নিয়ে পারিজাত বক্সী বিছানায় বসলেন। পরপর রক্তের রিপোর্ট, প্রস্রাব, স্টুল যাবতীয় কিছু পরীক্ষা করিয়েছেন। সবই স্বাভাবিক। শেষদিকে ডায়াবেটিসের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু রক্তে শর্করার ভাগ খুবই সামান্য। ওষুধ খেয়ে প্রফেসর সেরে গেছেন।

পারিজাত বক্সী এবার আলনায় ঝোলানো জামাকাপড়গুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। লম্বা কোটের পকেটে কিছু গাছের পাতা বোধহয় তাঁর বোটানী চর্চার জন্য। একটা রুমাল, নস্যির কৌটা।

সব দেখা হলে পারিজাত বক্সী প্রফেসরের বিছানাটা তুললেন।

না, কিছু নেই।

এ ভদ্রলোকের বোধহয় কেউ কোথাও ছিল না। কোনো চিঠিপত্র নেই। এমনকি যে ছাত্ররা আসাযাওয়া করত, তারাও কোনোদিন এক লাইন লিখে খোঁজ নেয়নি।

রীতিমত আশ্চর্যজনক।

পারিজাত বক্সী হাত ঘড়িতে সময় দেখলেন। রাত বারোটা বেজে গেছে। মাটিতে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন।

ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। পারিজাত বক্সী উঠে ঘরের চেহারাটা আর একবার দেখলেন।

কোণের দিকে একটা ক্রাচ আর কাঠের পা।

তিনি আগেই শুনেছিলেন দুর্ঘটনায় প্রফেসর একটা পা হারিয়েছিলেন। কাঠের পা ব্যবহার করতেন।

পারিজাত বক্সী উঠে গিয়ে ক্রাচ আর কাঠের পা-টা নিয়ে এলেন।

ক্রাচটা নামী বিলাতী কোম্পানির। চকচকে পালিশ। দামী কাঠ। বগলে চেপে রাখার জায়গাটা মোটা রবারের।

অবশ্য সেটা খুব স্বাভাবিক। সারাজীবনের জিনিস। কাজেই এই নিত্য দিনের সঙ্গীটির পিছনে প্রফেসর পয়সা খরচ করবেন এটাই আশা করা যায়।

ক্রাচটি নাড়াচাড়া করতে করতে পারিজাত বক্সীর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে এলো।

ক্রাচটির মাঝামাঝি জায়গায় একটা স্ক্রু। এখানে স্ক্রু থাকবার তো কোনো কারণ নেই! স্ক্রুটি নাড়াচাড়া করতে করতে ক্রাচটিও দুভাগ হয়ে গেল। ওপরের অংশ ছোট, নীচের অংশ বড়। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার নীচের অংশ ফাঁপা। কাগজপত্র গুটিয়ে কিংবা অন্য কোনো জিনিস বেশ রাখা যায়।

ক্রাচটি কোলে নিয়ে পারিজাত বক্সী চুপচাপ বসে রইলেন। জীবনে ক্রাচ অনেক দেখেছেন, কিন্তু ঠিক এভাবে ফাঁপা ক্রাচ এর আগে আর দেখেননি।

গোপনীয় দলিল, নিষিদ্ধ জিনিসপত্র রাখার পক্ষে আদর্শ ব্যবস্থা।

কিন্তু প্রফেসর কি ধরনের লোক ছিলেন যে এই প্যাটার্নের ক্রাচ করার তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল।

রোদ পড়েছে। পারিজাত বক্সি ক্রাচ আর কাঠের পা কোণের দিকে সরিয়ে রেখে উঠে পড়লেন।

মুখ হাত ধুয়ে দরজায় তালা দিয়ে দীনবন্ধু বাবুর বাড়ি চলে এলেন।

দীনবন্ধুবাবু বাড়ির সামনেই দাঁড়িয়েছিলেন।

পোশাক দেখে মনে হয়, প্রাতঃভ্রমণ শেষ করে অপেক্ষা করছেন।

পারিজাত বক্সীকে দেখে বললেন, কাল অনেক রাতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমোচ্ছেন বলে আর ডাকতে পাঠাইনি।

পারিজাত বক্সী বললেন, আপনার সঙ্গে প্রফেসরের আলাপ কি এখানে আসার পর, না আগে?

বাড়ির মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে দীনবন্ধুবাবু উত্তর দিলেন, না, আগে আলাপ ছিল না। এখানে অসার পর।

ভদ্রলোকের আসল নাম তো তারকনাথ রায়?

হ্যাঁ। কলেজে প্রফেসরী করতেন বলে সবাই প্রফেসর বলত।

কোন কলেজে পড়াতেন জানেন?

শুনেছিলাম মেট্রোপলিটান কলেজের বোটানীর প্রফেসর ছিলেন।

দুর্ঘটনায় একটা পা কাটা যায়?

তাই শুনেছি।

আচ্ছা আপনি প্রফেসরের বাড়িতে গেছেন?

হ্যাঁ গেছি বইকি। তবে উনিই আমার বাড়ি বেশি আসতেন।

এমন কি কোনোদিন হয়েছে, আপনার সামনে ওঁর ছাত্রের দল এসেছে?

হ্যাঁ হয়েছে।

আপনার সামনে উনি তাদের সঙ্গে বোটানী নিয়ে আলোচনা করতেন?

না, ছাত্রদের বলতেন, তোমবা একটু বসো, এঁব সঙ্গে কথা শেষ করে তোমাদের কথা শুনব।

চা জলখাবার শেষ করে পারিজাত বক্সী বললেন, দীনবন্ধুবাবু আমি আজ একবাব কলকাতায় যাব।

কলকাতায়?

হ্যাঁ, আমাব কতকগুলো কাজ আছে। সম্ভব হলে আজ রাত্রে ফিবব, কিংবা কাল। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

কি বলুন।

আমি তালার ওপব আমার তালা দিয়ে যাচ্ছি। মোহন সিং যদি আসেন, বলবেন যেন প্রফেসবের বাড়ির মধ্যে ঢোকার চেষ্টা না করেন।

আপনার কি মনে হচ্ছে পারিজাতবাবু?

দীনবন্ধুবাবু আর কৌতূহল দমন করতে পাবলেন না।

এখন কিছু বলতে পারছি না, তবে মনে হচ্ছে প্রফেসরের মৃত্যুর মধ্যে রহস্য আছে। সেই রহস্যের জট আমাকে ছাড়াতে হবে।

দীনবন্ধুবাবু চুপ করে শুনলেন।

হঠাৎ পারিজাত বক্সী জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা হরিয়া মালী কেমন লোক?

হরিয়া। হরিয়াকে তো ভালই মনে হয়। বাড়িওয়ালার লোক। প্রফেসর আসাব আগে থেকেই এ বাড়ীর দেখাশোনা করে। মাঝে মাঝে হাঁড়িয়া খায়, এছাড়া আর কোনো দোষ নেই।

একটু পরেই পারিজাত বক্সী রওনা হয়ে গেলেন।

মোহন সিং এদিকে এলো না। বিকালের দিকে বেড়াতে বেড়াতে দীনবন্ধুবাবুই থানায় গেলেন।

জীপ থেকে মোহন সিং নামছিল, দীনবন্ধুবাবুকে দেখে বলল, কি স্যার, কিছু বলবেন?

না, কি আব বলব।

কিছু মনে করবেন না স্যার। সখের গোয়েন্দাদের কাজই এই। সোজা কাজ আরও কঠিন করে তোলা। স্বাভাবিক একটা মৃত্যুকে নিয়ে মিস্টার বক্সী যা প্যাঁচ কষছেন। আমার অবশ্য কিছু বলার নেই। ডেপুটি কমিশনার ফোন করে আমায় নির্দেশ দিয়েছেন, মিস্টার বক্সীকে সাহায্য করার জন্য। আমি সাহায্য করে যাব।

মোহন সিংয়ের কথায় মনে হ'ল, বাইরে থেকে পারিজাত বক্সী এসে এ কেসে হাত দেওয়াতে সে খুব সন্তুষ্ট নয়। অবশ্য সখের গোয়েন্দা আর পুলিশ অফিসারের মধ্যে এই মানসিক সংঘর্ষ সব ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।

পারিজাত বক্সীকে দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী ফোন করে জানিয়েছেন শুনলে হয়তো মোহন সিং মোটেই খুশী হবে না।

পারিজাত বক্সী ফিরলেন তারপরের দিন বিকালে।

মুখ চোখের চেহারা বেশ গম্ভীর।

মনে হ'ল গম্ভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন।

দীনবন্ধুবাবু নন, তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু হদিশ হ'ল?

কিসের?

প্রফেসরের কেসের?

এখনও সব হয়নি, তবে এইটুকু জেনে রাখুন মেট্রোপলিটান কলেজে তারকনাথ রায় বলে, বোটানীর কেন, কোনো বিষয়ের কোনো প্রফেসর ছিল না।

দীনবন্ধুবাবু আর তাঁর স্ত্রী সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন।

সে কি?

হ্যাঁ। আর মোটর দুর্ঘটনায় প্রফেসরের সাংঘাতিকভাবে আহত হওয়ার কথাও ঠিক নয়। আমি বড় বড় হাসপাতালের বেশ কয়েক বছরের রেকর্ড দেখেছি।

তাহলে এ ধরণের মিথ্যা কথা বলে লাভ?

লাভের কথা যিনি বলতে পারতেন তিনি আর আমাদের মধ্যে নেই। আচ্ছা পুলিশের লোক কি প্রফেসরের বাড়িতে এসেছিল?

না।

এবার দীনবন্ধুবাবু প্রশ্ন করলেন, তাহলে যেসব ছাত্ররা প্রফেসরের কাছে আসত?

প্রফেসর যেমন ভুয়ো, ছাত্রেরা তেমনই ভুয়ো হতে পারে।

একটু থেমে পারিজাত বক্সী বললেন, আর প্রশ্ন নয়, আমাকে একটু চা দিন তো। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। লজ্জিত হয়ে দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, ছি, ছি, আমি এখনই এনে দিচ্ছি।

রাত্রে পারিজাত বক্সী প্রফেসরের বাড়িতে চলে এলেন।

ক্রাচটা নিয়ে আবার বসলেন।

ঘর অন্ধকার। বক্সীর হাতে জোরালো টর্চ।

উল্টে পাল্টে অনেকক্ষণ ধরে দেখলেন।

না আর কোথাও কিছু নেই।

এবার কাঠের পা টেনে নিলেন।

সাধারণ কাঠের পা। বিশেষ বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না।

পায়ের সঙ্গে আটকানোর জন্য চামড়ার স্ট্র্যাপ রয়েছে।

স্ট্র্যাপটা নাড়াচাড়া করতে করতে ভাঁজ করা একটা কাগজের টুকরো মেঝের ওপর পড়ল।

পারিজাত বক্সী কাগজের টুকরোটা কুড়িয়ে নিলেন।

সাধারণ ছোট কাগজ। মাঝখানে কালো কালিতে দুটি অক্ষর লেখা।

শি-ত।

কথাটা শীত নয়, সেটা বুঝতে অসুবিধা হ'ল না। কারণ শীত বানান যে শিত নয় সেটুকু জানার মতন বিদ্যা প্রফেসরের ছিল।

তাছাড়া মাঝখানে হাইফেনই বা কেন?

শব্দটা মামুলি নয়, তাহলে এত যত্ন করে কাঠের পায়ের স্ট্রাপের সঙ্গে বাঁধা থাকত না।

যদি কিছু রহস্য থাকে তাহলে তা এই কাগজকে কেন্দ্র করেই।

এবারেও পারিজাত বক্সী মেঝের ওপর বিছানা পাতলেন।

চোখে ঘুম নেই: কেবল চিন্তা, শি-ত কথাটার কি অর্থ হতে পাবে।

যদি অন্য কোনো ভাষার কথা হয় তা হলেই মুস্কিল। সে ভাষা জানতে না পারলে জীবনে এর রহস্যোদ্ধার করা যাবে না।

রাত অনেক। একটু তন্দ্রার মতন এসে থাকবে, হঠাৎ খুট করে শব্দ!

পারিজাত বক্সীর ঘুম খুব সজাগ।

মনে হ'ল শব্দটা খাটের পাশের জানালার কাছ থেকে আসছে।

কে যেন জানালা খোলার চেষ্টা করছে।

শুয়ে শুয়ে পারিজাত বক্সী ভিতর দিকে সরে গেলেন খাটের আড়ালে।

সব দরজায় কাচ দেওয়া। ভারি, শক্ত কাচ। তার ওপর লোহার ক্রশবার। কাচ ভেঙে গেলেও ভিতরে ঢোকা সম্ভব নয়।

খুট, খুট, খুট।

দেয়ালে হেলান দিয়ে পারিজাত বক্সী দেখতে লাগলেন।

বাইরে ফিকে জ্যোৎস্না। সব অর্ধস্পষ্ট। একটা লোকের কালো কাঠামো দেখা গেল।

একটু পরেই কাচ খুলে গেল। লোহার ক্রশবারও বিচিত্র উপায়ে সরানো হ'ল।

বিরাট আকারের একটি লোক ঘরে ঢুকল।

লম্বায় বোধহয সাড়ে ছ'ফুট। সবল চেহারা। নিগ্রো হওয়া আশ্চর্য নয়। মনিবন্ধে বাঁধা চ্যাপ্টা টর্চ। সেই আলোর সাহায্যে লোকটা সোজা ক্রাচ আর কাঠের পা নিয়ে খাটের ওপর বসল।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে ক্রাচের প্যাঁচ খুলে ফেলল। কাঠের পায়ের স্ট্র্যাপও।

তারপর ভিতরে হাত দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিছু না পেয়ে হতাশাব্যঞ্জক একটা শব্দ করল।

বাইরে শিয়াল ডেকে উঠতেই লোকটা চমকে উঠল। আস্তে আস্তে উঠে আবার জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জানালার কাছে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল তারপর আর দেখা গেল না।

পারিজাত বক্সী তাড়াতাড়ি খাটের ওপর উঠে বসলেন।

জানালার কাচ ঠিক আটকানো রয়েছে। লোহার ক্রশবারও।

জানালার কাছে মুখ রেখে পারিজাত বক্সী দেখলেন, দীর্ঘ লোকটা জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছে। একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

এবার পারিজাত বক্সী নিঃসন্দেহ হলেন।

লোকটা এই কাগজটার সন্ধানেই এসেছিল। কাগজটা কোথায় আছে সেটা তার জানা। কাগজটার মধ্যে লেখা শব্দ দুটোয় কোনো সঙ্কেত ছিল।

বাকি রাত পারিজাত বক্সী পায়চারি করলেন।

কি হতে পারে ওই শব্দ দুটোর অর্থ!

নিশ্চয় কোনো নিষিদ্ধ দ্রব্যের কারবারে প্রফেসর লিপ্ত ছিল। ছাত্র সেজে যারা আসত, তারা ছাত্র নয় এই কারবারের অংশীদার।

এ সব ব্যবসায় যা হয়ে থাকে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে রেষারেষি। একজন আর একজনকে পৃথিবী থেকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

দীনবন্ধুবাবুর শরণ নিতে হবে। এখানে শি-তে বলে কোনো সাঁওতালি মহল্লা আছে কিনা খোঁজ নিতে হবে। কিংবা এ দুটো অক্ষর কোনো লোকের আদ্যাক্ষর নয়তো!

ভেবে পারিজাত বক্সী কিছু কূলকিনারা পেলেন না। ভোর হ'ল। পারিজাত বক্সী আগে জানালাটা পরীক্ষা করলেন। অন্য কাচগুলো ঠিক আছে। একটা জানালার কাচ আলগা বসানো। ক্রশবারের স্ক্রুগুলোও খোলার ব্যবস্থা আছে।

তার মানে, রাতে সদর দরজা না খুলে, জানালার কাচ সরিয়ে প্রফেসরের নিজের পক্ষে বাইরে আসাযাওয়ার সুবিধা ছিল। দরকার হলে রাতবিরেতে বাইরের আগন্তুককেও বাড়ির মধ্যে আনা চলত।

সকালে পারিজাত বক্সীকে দেখে দীনবন্ধুবাবু চমকে উঠলেন। কি ব্যাপার? চেহারা এমন হয়েছে কেন? সারা রাত ঘুমোন নি?

পারিজাত বক্সী হাসলেন।

ঘুমোবো কি, আপনাদের দেশে প্রহরে প্রহরে যা শেয়ালের ডাক।

চা পানের পর পারিজাত বক্সী বললেন, দীনবন্ধুবাবু, আপনার ফোনটা ব্যবহার করব?

নিশ্চয়, নিশ্চয়, এর জন্য আপনি আবার জিজ্ঞাসা করছেন। আপনি তো আছেন আমরা স্বামী-স্ত্রী একটু হাটে যাব। আজ হাট বার।

পারিজাত বক্সী ডেপুটি কমিশনার গোয়েন্দা বিভাগের বাড়িতে ফোন করলেন। আমাকে একটা খোঁজ দিতে হবে।

বলুন।

সাড়ে ছ'ফুট লম্বা লোক, বিদেশী হওয়া বিচিত্র নয়, একটু খুঁড়িয়ে চলে। জাহাজের খালাসি হলেও হতে পারে।

গালের কাছে খুব বড় কাটা দাগ?

কি জানি অন্ধকারে দেখেছি অতটা লক্ষ্য করিনি।

ফটো দেখলে চিনতে পারবেন?

বোধহয় পারব।

ঠিক আছে, আমার লোক গোটা চার পাঁচ ফটো নিয়ে আপনার কাছে যাবে। মোটরে পাঠাবো। ঘন্টা আড়াই তিনের মধ্যে পৌঁছে যাবে। আপনি দেখে বলবেন।

ঘণ্টাখানেক পর দীনবন্ধু দম্পতি হাটথেকে ফিরলেন।

দীনবন্ধুবাবুর হাতে ঝুড়িতে তরিতরকারি। দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রীর হাতে একটা শালপাতার ঠোঙা।

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী বাইরের ঘরে টেবিলের ওপর রাখা রেকাবিতে ঠোঙা উপুড় করে দিলেন, একরাশ শিউলি ফুল পড়ল।

বসে বসে পারিজাত বক্সী দেখছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন এ ফুলও কি হাট থেকে কিনলেন?

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী মাথা নাড়লেন।

না, না, এ'র পয়সা দিয়ে কেনা নয়। প্রফেসরের বাগানে শিউলিতলায় পড়েছিল। কুড়িয়ে নিয়ে এলাম।

পারিজাত বক্সী চমকে সোজা হয়ে বসলেন।

মনে মনে বিড় বিড় করলেন, শিউলিতলা মানে শি-ত। তাইতো এই সহজ কথাটা মনে আসেনি।

দীনবন্ধুবাবু প্রশ্ন করলেন, কি বললেন?

না কিছু না। একটা কথা মনে পড়ে গেল।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর পারিজাত বক্সী প্রফেসারের বাড়িতে চলে এলো।

দীনবন্ধু দম্পতি দিবা নিদ্রায় মগ্ন।

একটা খাটিয়ায় বসে হরিয়া দড়ি পাকাচ্ছিল।

পারিজাত বক্সী তার সামনে গিয়ে বসল।

হরিয়া একটা কাজ করতে হবে।

বলুন বাবু।

একটা চিঠি থানার অফিসারকে দিয়ে আসতে হবে।

দিন।

পারিজাত বক্সী একটা চিঠি আর একটা পাঁচ টাকার নোট হরিয়ার হাতে দিলেন।

টাকা কি হবে বাবু?

রেখে দাও তোমার কাছে। এতটা পথ যাবে।

হরিয়া বেরিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের জন্য পারিজাত বক্সী নিশ্চিন্ত।

সাঁওতালের হাতে টাকা এলে সে হাঁড়িয়া না খেয়ে ফিরবে না।

শিউলি গাছটা বাড়ির পিছন দিকে। তখনও শিউলি তলায় অনেক ফুল পড়ে রয়েছে। কে যেন সাদা আসন বিছিয়ে রেখেছে।

কোমরে বেল্টে বাঁধা যন্ত্র বের করে পারিজাত বক্সী কাজে লেগে গেলেন।

প্রায় একঘণ্টা এদিক ওদিক খোঁড়ার পর একটা কাঠের বাক্সের সন্ধান মিলল। চন্দন কাঠের

ছোট বাক্স। তালা বন্ধ। তালা খুলতে অসুবিধা হ'ল না। ওপরে কাগজের ফালি, সেগুলো সরাতেই পারিজাত বক্সীর চোখ ধাঁধিয়ে উঠল। গোটা দশেক হীরা। ঔজ্জ্বল্যে চকমক করছে। আসল কি নকল পারিজাত বক্সীর পক্ষে বলা সম্ভব নয়। যদি আসল হয়, তবে এর দাম অনেক।

এবার বোঝা গেল প্রফেসর হীরার চোরাকারবারে লিপ্ত ছিলেন। বাইরে থেকে হীরা আসত, কিংবা এখান থেকে বাইরে চালান যেত।

এ সব ব্যবসায় শেষ পর্যন্ত যা হয়, প্রফেসরের তাই হয়েছিল। ভাগ নিয়ে পয়সা, কিংবা দলপতি হবার স্পৃহা। একজন আর একজনকে খতম করার চেষ্টা করে।

পারিজাত বক্সী বাক্সটা সাবধানে নিয়ে আবাব ভাল করে মাটি চাপা দিলেন।

দীনবন্ধুবাবুর বাড়ি ফেরার একটু পরই একটা মোটর এসে দাঁড়াল। একটি লোক কয়েকটি ফটো পারিজাত বক্সীর হাতে দিল। পারিজাত বক্সী গভীর মনোনিবেশ সহকারে ফটোগুলো দেখলেন। প্রতিটি ফটোর পিছনে নাম আর বিশেষত্ব লেখা। বিশেষত্ব অর্থাৎ লোকটা কি ধরনের ব্যবসায় লিপ্ত। একটা ফটো চোখে লাগল।

লম্বা চেহারা। সাড়ে ছ' ফুটের কাছাকাছি। গালে কাটা দাগ। পিছনে নাম লেখা, আফজল ইরানী। বাঁ পায়ে গুলি লাগার পর একটু খুঁড়িয়ে চলে। পাথরের কারবার! পেশায় জাহাজের খালাসী।

পারিজাত বক্সী জিজ্ঞাসা করলেন এ লোকটা কোথায় আছে এখন?

একবার জেল হবার পর খালাসীর চাকরি আর নেই। কোথায় আছে রেকর্ড নেই।

জেল হয়েছিল কেন?

একটা লোককে ছোরা মেরেছিল। কি ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল।

ঠিক আছে, এই ছবিটা আমি রাখলাম। বাকিগুলো আপনি নিয়ে যান।

লোকটা চলে যেতে পারিজাত বক্সী হীরাগুলো বাক্স থেকে বের করে নিজের সুটকেসের গোপন পকেটে রেখে দিলেন। তারপর রাস্তায় বেরিয়ে ছোট ছোট পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে বাক্সের মধ্যে রেখে দিলেন।

এবার প্রফেসরের ঘরের মধ্যে ঢুকে দুটো বইয়ের মাঝখানে বাক্সটা রেখে দিলেন।

দীনবন্ধুবাবুর বাড়িতে যখন ফিরে এলেন, তখন স্বামী স্ত্রী দুজনেই উঠে পড়েছেন। চা নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

দীনবন্ধুবাবুর স্ত্রী বললেন, কি ব্যাপার আপনার, দুপুরে ঘুমোন নি?

পারিজাত বক্সী হেসে উত্তর দিলেন, যে কাজের ভার দিয়েছেন, ঘুম চোখ থেকে পালিয়েছে।

দীনবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু কিনারা হ'ল?

মনে তো হয়, অদ্য শেষ রজনী। দেখা যাক।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই তিনজন কনস্টেবল এসে সেলাম করে দাঁড়াল। পারিজাত বক্সী তাদের সঙ্গে চাপা গলায় অনেকক্ষণ ধরে কথা বললেন। তারপর রাত একটু গভীর হতে চারজন বেরিয়ে পড়ল।

খুব সুবিধা। অন্ধকার রাত! কোথাও একটি তারার ইশারাও নেই। বেশ শীত। চারজনে প্রফেসরের বাড়ির পাশে ঝোপের আড়ালে রইল। সময় যেন আর কাটে না। ঝোপে ঝোপে জোনাকীর ঝাঁক। প্রহরে প্রহরে শিয়ালের চিৎকার। কনকনে পাহাড়ি ঠাণ্ডা।

হঠাৎ জঙ্গল থেকে দীর্ঘাকৃতি এক ছায়ার আবির্ভাব। খুব ধীর পদক্ষেপে একটা লোক এগিয়ে এলো।

একটু দাঁড়াল। দেখল এদিক ওদিক। তারপর প্রফেসরের বাড়ির দিকে পা চালাল।

পারিজাত বক্সী খুব সাবধানে লোকটাকে অনুসরণ করলেন।

জানালা খুলে লোকটা ভিতরে লাফিয়ে পড়ল। জোরালো টর্চের বাতি জেলে সারা ঘর দেখল। এদিক ওদিক খুঁজতে খুঁজতে বইয়ের ফাঁকে বাক্সটা দেখতে পেয়ে সেটা বুকে তুলে নিল।

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের চিৎকার।

বাইরে পা দিতেই পারিজাত বক্সীর গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল।

আফজল ইরানী, মাথার ওপর দুটো হাত তোলো।

লোকটা চমকে উঠে পকেটে হাত ঢোকাবার আগেই দেখল পুলিশ বাহিনী তাকে বেষ্টন করে ফেলেছে। ফগলাইটের উজ্জ্বল আলো তার ওপর।

বল, তারক রায় তোমার কি ক্ষতি করেছিল?

দু'এক মিনিটের দ্বিধা তারপর লোকটা চেঁচিয়ে উঠল।

লোকটা বেইমান, আমার সঙ্গে নেমকহারামি করেছে।

আফজল বাকি কথা বলল থানার মধ্যে।

তারক রায়ের সঙ্গে আফজলের অনেকদিনের পরিচয়। সুদূর বর্মায়। ক্রমে অন্তরঙ্গতা হয়। দুজনে ব্যবসা শুরু করে। আফজল দেশ বিদেশ থেকে দামী পাথর নিয়ে আসে, তারক রায় সে সব পাথর জহুরীদের কাছে বিক্রী করে পয়সা ভাগ করে নেয়। বর্মা থেকে তারক রায় এদেশে আসার পরও ব্যবসা চলে। খুব বড় শহরে আসা যাওয়া করা একটু অসুবিধা। পুলিশের নজরে পড়ার ভয় ছিল, তাই তারক রায় এইরকম জায়গায় ডেরা বাঁধে।

বেশ চলছিল ব্যবসা, কিন্তু তারক রায় নেমকহারামি শুরু করে। একবার গোটা ছয়েক নীলা আফজল সংগ্রহ করে নিয়ে আসে, তারক রায় সেগুলো ফুটো বলে ফেরৎ দেয়। তারপর দশটা পোখরাজের বেলাতেও তাই করে। আফজলের সন্দেহ হয়। বুঝতে পারে আসল পাথর সরিয়ে ফুটো পাথর আফজলকে ফেরত দেওয়া হচ্ছে।

তারপর বিদেশে আফজল একটা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছিল। নারীঘটিত মামলায়। ছ'বছরের জেল হয়। জাহাজের চাকরি যায়। তাও জেল থেকে বেরিয়ে একটি লোককে দিয়ে সে কিছু হীরা পাঠিয়ে দিয়েছিল। লোকটিকে বলতে বলেছিল, আফজল মারা গেছে। তার স্ত্রী-পুত্র খুব কষ্টে আছে। হীরাবাবদ টাকাগুলো হাতে হাতে দিতে।

তারক রায় দেয়নি। বলেছে, ইদানীং আমি নাকি তাকে ফুটো পাথর দিচ্ছিলাম, কাজেই হীরাগুলো যাচাই না করে সে একটি পয়সাও দিতে পারবে না।

তারপর লোকটাকে অনেকবার পাঠিয়েছি। তারক রায় এড়িয়ে গেছে।

আমি খবব পেযেছিলাম, তাবক রায় আর একটা দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা নানা জায়গা থেকে তাকে পাথরের যোগান দিচ্ছে।

আমি একদিন রাত্রে তারক বায়ের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। জানালা আলগা ছিল, সেটা জানা ছিল। ওই পথেই আগে যাওয়া আসা করেছি।

কি আশ্চর্য, আমাকে দেখে কথা বলবার আগেই তারক রায় আর্তনাদ করে শক্ত হয়ে বিছানার ওপর পড়ে গেল। তার ধারণা আমি মারা গেছি। মরা মানুষকে চোখের সামনে দেখে বোধহয় অজ্ঞান হযে গিয়েছিল।

আমি জানতাম ক্রাচের কোটরে পাথরগুলো থাকে, কিন্তু সেরাত্রে বেশীক্ষণ থাকতে সাহস হয়নি। তারপর আবার এসেছিলাম, খুঁজে পাইনি। ইতিমধ্যে খবর পেয়েছি তারক রায় মারা গেছে। ভাল হয়েছে। হারামজাদা যাক। আজ জিনিসগুলো পেয়েছি। এই চন্দনের বাক্সসুদ্ধই আমি তাকে দিয়েছিলাম।

আফজল গভীর মমতায় চন্দনের বাক্সটা বুকে চেপে ধরল।

পাবিজাত বক্সী মোহন সিংযেব দিকে ফিরে বললেন, আমার কাজ শেষ। এবার আপনাদের কাজ শুরু। যা করবার করুন।

আফজল, একটা কথা শুধু তোমাকে বলে যাই, আজও তুমি আসল জিনিস পাও নি। আসল জিনিসের মালিক সবকার। এগুলো সেখানেই পৌঁছে দেওযা হবে।

সেকি !

আফজলের কণ্ঠ থেকে আর্তস্বর বেরিয়ে গেল।

সে তাড়াতাড়ি চন্দনেব বাক্সটা খুলে দেখেই বাক্সটা মেঝের ওপর আছড়ে ফেলল।

পাথরের নুড়িগুলো থানার মেঝের ওপব ছড়িযে পডল।

# যুবতী রূপসী লাস্যময়ী এবং

## কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তেজনায় চৌচির হয়ে গেছে সোমচক স্টেশন।

সঠিকভাবে বলতে গেলে শুধু স্টেশনে নয়, সমস্ত জনপদকে উত্তেজনা সাপটে ধরেছে। সংবাদটি চাউর হয়ে যাবার পর থেকেই সকলের মধ্যে একই আলোচনা চলেছে। কলকাতার মতো বড় জায়গায় এ ব্যাপারে হয়তো কোনো গুরুত্ব নেই। কিন্তু সোমচকের নিরুপদ্রব জীবনে নিঃসন্দেহে এ এক উল্কাপাত।

ব্যাপারটি প্রথম থেকেই বলতে হয়।

পঁচাত্তরটা গুডস ওয়াগান সমেত ইঞ্জিনটা স্টেশনের অদূরে দাঁড়িয়ে ধুঁকছিল। অদূরের অর্থ হ'ল নির্জন এক সাইডিং। এখানে যে কুড়িখানা খালি ওয়াগান রয়েছে, তাতে স্টোন চিপস ভরা হবে। বোল্ডার আর চিপস সরবরাহের জন্য সোমচকের খ্যাতি বহুদূর প্রসারিত।

রামভারোসা রেলের ক্যাজুয়াল গ্যাংম্যান। একটানা বেশ কিছুদিন কাজ করার পর তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার জায়গায় বহাল হয়েছে এখন অন্য একজন। সে আবার কিছুদিন পরে বসবে। তখন আবার নতুন করে কাজ পাবে রামভারোসা। এইভাবেই চক্রাকারে ঘুরছে সমস্ত ব্যাপারটা।

অবশ্য রামভারোসা তখন বেকার বসে থাকে না। ডাল রুটির ব্যবস্থা ভগবান জুটিয়ে দেন ঠিক। ব্যবস্থাটা আর কিছু নয়—যে সমস্ত ঠিকেদার চিপস ইত্যাদি সাপ্লাই করে তাদের ওখানে কুলির কাজ।

শীতের সকাল।

সাবধানে লাইনের পর লাইন অতিক্রম করে রামভারোসা ওয়াগানগুলোর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। একধারে পাথরের কুচির অসংখ্য স্তূপ। নিকটবর্তী পাহাড় থেকে খসিয়ে আনার পর ট্রাক বোঝাই করে এখানে আনা হয়েছে। অন্যান্য কুলী বা বাবুদের কাউকে না দেখে রামভারোসা একটু অবাক হ'ল। তারপরই অবশ্য মনে হ'ল অনেক তাড়াতাড়ি এসে পড়েছে।

জীর্ণ কম্বলটা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে এধার ওধার তাকিয়ে নেবার পর স্থির করল, ভাল করে রোদ্দুর ওঠার আগে বা লোকজন এসে পড়া পর্যন্ত খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে না থেকে, কোনো একটা খালি ওয়াগানের মধ্যে গিয়ে বসবে। তারপর বিড়ি ধরাবে।

পরপর কয়েকটা ওয়াগানের কপাট খোলা। একটা বেছে নিয়ে তাতে রামভারোসা উঠে পড়ল। ভেতরটা অন্ধকার হলেও মনোরম উষ্ণতা বিরাজ করছে। সে কয়েক পা এগোবার

পরই চমকে উঠল। নরম কিছুর উপর পা পড়েছে। কেউ এখানে আগে থেকেই শুয়ে আছে নাকি।

. পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বালাতেই যা দেখলো, তাতে টলে পড়ে যাচ্ছিল, কোনোরকমে সামলে নিল নিজেকে। উপুড় অবস্থায় একটি মেয়ে পড়ে আছে। সাজ-পোশাক দেখে ভদ্রঘরের বলেই মনে হয়। আর ঘাড়ের একটু নীচে ভারী হাতলযুক্ত একটা ছোরা আমূল বিঁধে রয়েছে।

পড়ি কি মরি অবস্থায় রামভারোসা ওয়াগান থেকে নামল। তারপর ছুটল স্টেশনের দিকে। দীর্ঘ প্ল্যাটফর্মে তখন মন্থর পায়ে পদচারণা করছিলেন সোমচক স্টেশনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মোহিত ঘোষাল। হাই ব্লাডপ্রেসারের রুগী। ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে সকাল বিকাল এইভাবে একটু বেড়িয়ে নেন। প্রাক্তন গ্যাংম্যানকে তীরবেগে ছুটে আসতে দেখে তিনি বিলক্ষণ অবাক হলেন। ব্যাপারটা কি ?

কি হয়েছে রে রাম?

বড়বাবু—হাঁপাতে হাঁপাতে রামভারোসা বলল, একটা মেয়ে ওখানে মরে পড়ে আছে বড়বাবু।

ট্রেনে কাটা পড়েছে? সিগনালের কাছে বোধ হয়?

আজ্ঞে না। খালি ওয়াগানের মধ্যে। ঘাড়ের কাছে বড় একটা ছোরা বেঁধান রয়েছে।

বলিস কি! খুন—মোহিত ঘোষাল যুগপৎ বিরক্ত এবং ভীত হলেন।—কি ঝামেলা, খুন হওয়ার জায়গা পেল না? কি বললি, মেয়েলোক মরেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, বড়বাবু।

যতঃসব। নাও, ঠেলা এখন সামলাও। রাম, দেখতো বাবা আর পি. এফ-এর রূপলাল আছে কিনা। তাকে ডেকে নিয়ে আয়। দেখি গিয়ে আমার কবর খোঁড়ার কি রকম ব্যবস্থা হয়েছে।

রামভারোসা আবার ছুটল।

বিড়বিড় করে বকতে বকতে মোহিত ঘোষাল অফিস ঘরের দিকে গেলেন। টর্চটা নেওয়া দরকার। এর পরের ঘটনার মধ্যে অবশ্য কোনো বৈচিত্র ছিল না। মৃতদেহ চাক্ষুষ করার পর মহা বিচলিত ঘোষাল নিজের ওপরওলাকে সমস্ত কথা জানালেন ফোনে। নির্দেশ এলো অবিলম্বে যেন স্থানীয় পুলিশকে সংবাদ দেওয়া হয়।

অবিলম্বে ইন্সপেক্টর প্রেমকিশোর এসে পড়লেন।

মূল অংশ থেকে ওই ওয়াগানটি আলাদা করে নেওয়া হ'ল। পুলিশ ফটোগ্রাফার উপুড় অবস্থায় এবং পরে সোজা করে শুইয়ে খানকয়েক স্ন্যাপ নিল। প্রেমকিশোর খুঁটিয়ে দেখলেন। মৃতা মহিলার বয়স সাতাশের বেশি কখনই হবে না। রূপবতী সন্দেহই নেই। পরনে মূল্যবান শাড়ি। আধুনিক প্যাটার্নের গয়নাও রয়েছে হাতে, কানে এবং গলায়।

একাধিক প্রশ্ন প্রেমকিশোরের মনে ওঠা-নামা করতে লাগল। যাত্রীবাহী কোনো ট্রেনের কামরায় মৃতদেহ পাওয়া গেলে বিস্ময় প্রকাশ করার কিছু থাকে না। মাসে দুমাসে এরকম ঘটনার কথা শুনতে পাওয়া যায়। ট্রাঙ্কের মধ্যে মৃতদেহ বা খালি কামরায় ছুরিকাহত ইত্যাদি।

কিন্তু খালি গুডস ওয়াগানে আধুনিকার লাশ পাওয়া রীতিমত অভিনব ব্যাপার। পূর্বে এরকম ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয় না।

তবে কি—

প্রেমকিশোরের চিন্তা বাঁকা পথে মোড় নিল। রেপ-ঘটিত ব্যাপার নয়তো? মেয়েটিকে কেউ ভুলিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিল। তারপর বিশেষ মুহূর্তে সে বাধা দিয়েছে। ধস্তাধস্তি হয়েছে দুজনের মধ্যে। শেষ পর্যন্ত সবল পুরুষটির কাছে পেরে না উঠে বাধ্য হয়েছে আত্মসমর্পণ করতে। দৈহিক সুখলাভ করার পর সেই পুরুষ জানাজানি হবার ভয়ে চিরদিনের মতো মুক করে দিয়েছে মেয়েটিকে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে আর কি।

এই যুক্তির উপরও অবশ্য শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে থাকতে পারলেন না প্রেমকিশোর। পারিপার্শিক অবস্থা অন্য কথা বলছে। ঘাড়ের চারিপাশে রক্ত জমাট বেঁধে থাকা ছাড়া, ওয়াগানের কোথাও রক্তের ছিটে ফোঁটা নেই, নেই কোনো ধস্তাধস্তির চিহ্ন। তাছাড়া কোনো আধুনিকাকে, শীতের গভীর রাতে এমন একটা বেখাপ্পা জায়গায় ভুলিযে নিয়ে আসা একরকম অসম্ভব।

সুতরাং ধরে নেওয়া চলে খুন এখানে হয়নি। অন্যত্র মেয়েটিকে শেষ করে মৃতদেহ বয়ে এনে খালি ওয়াগানের মধ্যে ফেলে রেখে হত্যাকারী নির্বিঘ্নে চম্পট দিয়েছে। এই যুক্তিই বাস্তব ঘেঁষা বলে মনে হয়। চিন্তা ভাবনা দূরে সরিয়ে প্রেমকিশোর এবার জেরার কাজে নামলেন। অবশ্য মৃতদেহ থানার উদ্দেশ্যে রওনা করিয়ে দেওয়া হ'ল।

রামভারোসার ডাক পড়ল প্রথমে।

বেচারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। সাত সকালে কেন যে এখানে আসতে গিয়েছিল, সেই আক্ষেপই এখন বারংবার তাকে উতলা করে তুলছে। কোনোরকমে ঢোক গিলে গিলে কিভাবে মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিল বলল।

এরপর মোহিত ঘোষাল এলেন।

তাঁর এজাহার শেষ হবার পর মালগাড়ির ড্রাইভারকে ডেকে পাঠালেন প্রেমকিশোর। কালচে নীল রংয়েব কোট পরা—মাথায় চেক চেক রুমাল বাঁধা ড্রাইভার জাতে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। বেপরোযা ভঙ্গীতে সে পুলিশ অফিসারের সামনে এসে দাঁড়াল।

আপনি এখানে কখন এসে পৌঁছেছেন?

রাত তিনটে আন্দাজ সময়।

রওনা হয়েছিলেন কোথা থেকে?

জাফারনগর থেকে।

মাঝপথে আর কোনো স্টেশনে আপনাকে থামতে হয়েছিল?

হ্যাঁ।

কোথায়?

দিওয়ানগঞ্জ আর রসুরপুরে। দু-জায়গা থেকে আমাদের মাল তুলতে হয়েছিল।

কোনোরকম সন্দেহজনক ব্যাপার তখন লক্ষ্য করেন নি?

না। দুটো স্টেশনেই অনেক লোকজন কাজে হাত লাগিয়েছিল। তখন সম্ভব ছিল না মৃতদেহ কোনো ওয়াগানে চালান করে দেওয়া।

মৃতদেহ সম্পর্কে তাহলে আপনি কিছুই বলতে পারেন না?

না। এমন ঘটনা অন্যত্র ঘটেছে শুনলে আমি বিশ্বাস করতাম না।

এরপর তার সহকারীকে ডাকা হ'ল।

তার বক্তব্য ড্রাইভারের অনুরূপ।

গার্ডকে আহ্বান করা হ'ল এবার। গার্ড বঙ্গদেশীয় এক তরুণ। প্রেমকিশোর লক্ষ্য করলেন, তাকে কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে। দাঁড়িয়ে না থেকে সে অনুরোধ ছাড়াই বসে পড়ল একটা টুলের উপর। এজাহার পর্ব চলছিল স্টেশন মাস্টারের ঘরে।

ওই লাশ সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে পারেন?

ইন্সপেক্টরের প্রশ্নের উত্তরে গার্ড বললেন, কি করে বলব বলুন? আমি তো ছিলাম একেবারে পিছনে।

আপনার দায়িত্বেই তো গুডস ট্রেন জাফারনগর থেকে রওনা হয়েছিল?

তা হয়েছিল। নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে আমি অত্যন্ত সচেতন। কোনো রকম ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিনি। কিভাবে যে লাশ ওয়াগানের মধ্যে এলো ভগবান জানেন।

আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। শরীর ভাল নেই নাকি?

এখন ভাল আছি।

কি হয়েছিল?

চলন্ত গাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মাথা ঝিম ঝিম করে সেন্সলেস্ হয়ে পড়ি।

গার্ডের কাছ থেকে নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যাবে না, একথা প্রেমকিশোর বুঝেছিলেন। তাঁকে বিদায় করে দিয়ে স্টেশনে আর অপেক্ষা করা যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। থানার উদ্দেশ্যে জীপে চড়ে বসলেন।

এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের কথা চাপা থাকে নি। হৈ হৈ পড়ে গেছে সোমচকে! অজস্র গুজব লাতাপাতা বিস্তার করে চলেছে। কৌতূহলী এবং উৎসাহী মানুষ ভীড় করে এসেছে থানায়। পোস্টমর্টেমে পাঠাবার আগে বডি অনেকেই দেখেছে—কিন্তু সনাক্ত করতে পারে নি কেউ। অর্থাৎ মৃতা তরুণীর পরিচয় রয়ে গেছে ঘন তিমিরেই।

যথাসময় পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট পাওয়া গেল।

বলা হয়েছে, প্রথমে হত্যাকারী গলায় চাপ সৃষ্টি করে যুবতীকে সজ্ঞাহীন করে তোলে—ওই চাপে মৃত্যুও হয়ে থাকতে পারে। তারপর অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো বলশালী ব্যক্তির দ্বারা এ কাজ সম্ভব। কারণ ছোরার সাত ইঞ্চি অংশ শরীরের ভেতরে ছিল।

ইতিমধ্যেই প্রেমকিশোর ছোরাখানা পরীক্ষা করে দেখেছেন। লম্বায় পাক্কা দশ ইঞ্চি। আধ-ইঞ্চি পুরু স্টিলের ব্লেড। নীচের দিককার বক্রতা লক্ষ্য করে অনুমান করে নেওয়া যায়, এই ছোরা নেপাল বা ভুটানের তৈরী।

প্রেমকিশোর শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, হত্যাকারী অর্থের লোভে নিজের হাত রক্তাক্ত করে তোলে নি। তার সে রকম ইচ্ছে থাকলে মৃতা যুবতীর গায়ে একখানাও সোনার গয়না থাকতো না। হত্যার উদ্দেশ্য অনেক গভীরে নিহিত রয়েছে।

আরো একটি ধারণা তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। যেখান থেকে গুডস ট্রেন

রওনা হয়েছে, অর্থাৎ জাফারনগরেই যুবতীকে খুন করা হয়েছে। তারপর কোনো উপায়ে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে মৃতদেহ খালি ওয়াগানে চালান করে দেওয়া হয়েছে। এখানে রেলের কর্মচারীরা যে যাই বলুক না কেন, আসলে কেউই খালি ওয়াগানগুলো সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। ভালভাবে তারা যদি লক্ষ্য করতো, তবে মৃতদেহ জাফারনগরেই আবিষ্কৃত হ'ত।

তদন্তের প্রথম ধাপ হ'ল ভিক্টিমের পরিচয় সংগ্রহ করা।

বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে প্রেমকিশোর মৃতা যুবতীর ছবি জাফারনগরে পাঠিয়ে দিলেন। ওখানকার পুলিশ ভালভাবে অনুসন্ধান করে কয়েকদিন পরে জানাল, মৃতা জাফারনগরের বাসিন্দা ছিল না। রসুরপুর আর দিওয়ানগঞ্জ থেকেও ওই একই ধরনের সংবাদ পাওয়া গেল। তাছাড়া ওই দুই জায়গার রেল কর্তৃপক্ষ জোরের সঙ্গে জানিয়েছেন, খালি ওয়াগানগুলো খালিই ছিল। দু-জায়গাতেই রেলকর্মীরা তাদের নিয়ম অনুসারে খালি ওয়াগান পরীক্ষা করে দেখেছে, মৃতদেহের কোনো চিহ্ন তারা দেখতে পায়নি।

বিচিত্র রহস্য।

তাঁর থিওরি শক্ত খুঁটিতে পোতা নেই লক্ষ্য করে প্রেমকিশোর হতাশ হলেন। প্রকৃত ব্যাপারটা কি? আকাশ থেকে নিশ্চয় মৃতদেহ চলন্ত ওয়াগানে ঝরে পড়ে নি? তার সামনে এরপর একটি মাত্র পথ খোলা রয়ে গেল—ওই পথ ধরে এগিয়ে গেলে হয়তো মৃতার পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হতে পারে। পরিচয় না পেলে হত্যাকারীকে কখনোই মুঠোর মধ্যে পাওয়া যাবে না।

অনেক চিন্তা ভাবনার পর বিহার আর বাংলার কয়েকটি সংবাদপত্র বেছে নিলেন তিনি। বলাবাহুল্য ওইগুলিই দুই প্রদেশের জনপ্রিয় দৈনিক। মৃতার ছবি ছাপার ব্যবস্থা হ'ল ওই সমস্ত দৈনিক পত্রে। পুলিশ কি চায় তাও জানান হ'ল। মনে হয় ছবি দেখে কেউ না কেউ মৃতা সম্পর্কে কিছু সংবাদ দিতে পারবে।

কলকাতার প্রখ্যাত জুয়েলার রামদুলাল সরকারের অফিস ঘরটি নেহাত ছোট নয়। মূল্যবান আসবাবপত্রে সজ্জিত। দেয়ালের এখানে-ওখানে খানকয়েক ল্যান্ডস্কেপ ঝুলছে। চকচকে পেলমেটের ওপাশ থেকে নেমে আসা ভিনিলিন নেটের পর্দা দরজা আর জানালাগুলিকে ঢেকে রেখে গৃহকর্তার সুরুচির কথাই ঘোষণা করছে। কলকাতার মণিকার সমাজের মধ্যমণি হলেন রামদুলাল।

তিনি অফিস ঘরেই ছিলেন।

সুদৃশ্য সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে রিভলভিং চেয়ারে একটু হেলে বসেছিলেন তিনি। বিলক্ষণ বিমর্ষ দেখাচ্ছিল তাঁকে। মেদবহুল শরীরও যেন কিছুটা চুপসে গেছে। টাকের চারপাশের কাঁচাপাকা চুল অন্যান্য দিনের মতো আজ সযত্নে আঁচড়ানো নেই। অফিস ঘরে তিনি একা নেই।

লাল চামড়ায় মোড়া চেয়ারখানা এখন বাসবের অধিকারে।

রামদুলাল সরকারের বিশাল মুখের উপর চপচপে ঘাম জমেছিল। রুমাল দিয়ে ভাল করে মুছে নিয়ে বাসবের দিকে তাকালেন। বাসব নির্বিকার ভঙ্গীতে পাইপ টেনে যাচ্ছিল।

আমার ছেলের মুখে ব্যাপারটাতো আপনি মোটামুটি শুনেছেন।

মোটামুটি নয়, আমি বিশদভাবে জানতে চাই। সমস্ত খুঁটিনাটি যদি বলতে পারেন, তবে আরো ভাল হয়।

এরপর নড়েচড়ে বসে রামদুলাল সরকার যা বললেন, তাতে বৈচিত্র্যের অভাব ছিল না। দিন দশেক আগের কথা। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল কলকাতা। কোথাও কোথাও নাকি কোমর জল দাঁড়িয়ে গেছে, এরকম সংবাদও কানে আসছিল। প্রতিদিন আর ডি জুয়েলার্সে কেনাকাটা হয় হাজার হাজার টাকার। শোচনীয় জল হওয়ার দরুন সেদিন ক্যাশে শ'ছয়েক টাকাও জমা পড়েনি। জল কাদা ভেঙে ক্রেতারা কেনই বা আসবেন।

প্রচুর বিরক্তি নিয়ে রামদুলাল নিজের অফিস ঘরে পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন। এই ধরনের বৃষ্টির কোনো মানে হয় না। ব্যবসাপত্র সমস্ত নষ্ট—লোকে যে করে খাবে তার উপায় নেই। সমস্ত বাড়তটাই তো পড়ে আছে। সে সময় জল হলে কি ক্ষতি ছিল?

একসময় পায়চারী থামিয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বেলা তখন তিনটে। নেটের পর্দা সরিয়ে তাকালেন রাস্তার দিকে। বৃষ্টি ধরে গেছে। যাক, বাঁচা গেল—মনে মনে বললেন তিনি। এখনও কারবারের জন্য কিছু সময় পাওয়া যাবে। রামদুলাল এতক্ষণ পরে সিগারেট ধরালেন। কয়েক টান সবেমাত্র দিয়েছেন—

তাঁর মুখ আলোকিত হয়ে উঠল।

দোকানের সামনে এসে থামল একখানা দামী গাড়ি। গাড়ি থেকে নামলেন শোভন পোশাকে সজ্জিত একজোড়া নারী পুরুষ। মহিলা অসামান্যা রূপবতী সন্দেহ নেই। অভিজ্ঞ রামদুলাল সরকার বুঝলেন মোটা খদ্দের। জানালার কাছ থেকে সরে এসে সিগারেট গুঁজে দিলেন অ্যাসট্রেতে। বেরিয়ে এলেন অফিস ঘর থেকে।

নারী পুরুষ তখন কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

কর্মচারীদের সরিয়ে রমদুলাল নিজেই ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য প্রয়াসী হলেন। অবশ্য মুখ ভরিয়ে তুললেন আগে বিগলিত হাসিতে। জানতে চাইলেন কি রকমের অলঙ্কার প্রয়োজন হবে।

নরম গলায় পুরুষ বললেন, হীরে বসানো নেকলেস আছে?

আছে। ডায়মণ্ড সেট করা নানা ধরনের গলার গয়না আপনি আমার কাছে পাবেন।

কয়েক বাক্স এসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।

পছন্দ করার ব্যাপারে অবশ্য যুবতীই বেশি আগ্রহী হলেন।

এর কত দাম?

আজ্ঞে, উনিশ হাজার টাকা পড়বে।

আশা করি দামের ব্যাপারটা—পুরুষ বললেন, আমাকে অন্যত্র যাচাই করে নিতে হবে না।

আহত গলায় রামদুলাল বললেন, কোনোরকম গোলমাল এখানে পাবেন না। পুরোনো প্রতিষ্ঠান। সুনামের দিকে আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেই চলি।

নিলাম এটা। আমার বোনের বিয়ে। বেশ কিছু গয়না চাই। সমস্তই বোধহয়—

নিশ্চয় আপনার চাহিদা আমি পূরণ করতে পারব।

অতি মাত্রায় উৎসাহিত হয়ে উঠলেন রামদুলাল। কলকাতার বাইরের লোক এঁরা। বিয়ের

বাজার করতেই এখানে এসেছেন। এরকম ক্রেতার সাক্ষাৎ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। সকাল থেকে ক্ষতির যে কাজের জের চলেছে, এতক্ষণে তার উপর পূর্ণচ্ছেদ পড়ল।

থরে-থরে গয়না এসে পড়তে লাগল।

নানা ডিজাইনের, নানা অঙ্গের চোখ ঝলসানো সমস্ত গয়না। যুবতী ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। মনে মনে পছন্দের ওজন পরীক্ষা করছেন বোধহয়। ঠিক এই সময়—আচম্বিতেই লোমহর্ষক নাটকের অবতারণা হ'ল।

যুবতী যখন গয়না পছন্দ করছেন, তাঁর সঙ্গী পুরুষ তখন ছোট একটা সুটকেশ হাতে করে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ সুটকেশ কাউন্টারের উপর রেখে, অদ্ভুদ দ্রুততার সঙ্গে পকেট থেকে রিভলবার বার করলেন।

রামদুলাল সচকিত হলেন।

পরমুহূর্তে শুনতে পেলেন ভারী অথচ চাপা গলায় রিভলবারধারী বলছে, চেঁচাবার চেষ্টা করবেন না কেউ। চেম্বারে ছ'টা গুলি আছে।

দ্রুত হাতে সমস্ত গয়না সুটকেশে ভরে ফেলল যুবতী। তিনজন কর্মচারী আর রামদুলাল কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন। রিভলবারের সামনে দাঁড়িয়ে লম্প-ঝম্প করা চলে না। তাবড় তাবড় সাহসীকেও থিতিয়ে যেতে হয়।

চারজনের যখন সম্বিত ফিরল তখন দুজনে ফেরার। মাত্র পঞ্চাশ সেকেন্ড থেকে এক মিনিটের মধ্যে বিশাল এক ডাকাতি ঘটে গেল। সদর দরজার সামনে দুজন দারোয়ান পাহারায় ছিল, এত কাণ্ড যে ঘটে গেছে তারাও আঁচ করতে পারেনি। এরপর হৈ-হল্লা, হাক-ডাক, হা হুতাসের বন্যা বয়ে গেল।

পুলিশ এলো।

অপহরণকারীদের সন্ধান পাওয়া গেল না। মোট এক লক্ষ দশ হাজার টাকার গয়না নিয়ে তারা যেন হাওয়ায় মিশে গেছে। মূহ্যমান রামদুলাল সরকার ভালই জানেন, পুলিশ যতই অনুসন্ধান চালাক, তাদের ধরা সম্ভব হবে না।

এতক্ষণ পরে বাসব বলল, ছবিখানা আপনার চোখে পড়ল কখন?

কালকের দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছিল। মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছেন। নিয়মিত কাগজ-টাগজ পড়া হচ্ছে না। আজ সকালে আমার একজন কর্মচারী বলাতে দেখলাম। সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই মিঃ ব্যানার্জী। যে মেয়েটির ছবি ছাপা হয়েছে, ডাকাতদের মধ্যে সে একজন নিশ্চিত।

দৈনিক পত্রখানা টেবিলের উপর রাখা ছিল। ছবিখানা খুঁটিয়ে দেখল বাসব। মনে হয় যুবতীর শায়িত অবস্থায় তোলা ছবি বাক্সের মতো ধরে ছাপা হয়েছে। নীচে লেখা রয়েছে—এই মহিলার মৃতদেহ খালি ওয়াগনের মধ্যে পাওয়া গেছে। যদি কারুর এই মহিলার পরিচয় জানা থাকে, তবে সাঁওতাল পরগনা জেলার সোমচক পুলিশ স্টেশনের সঙ্গে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।

এরপর আপনি কি করলেন?

রামদুলাল বললেন, পুলিশকে জানালাম। তারপর মনে হ'ল, পুলিশ যা করছে করুক।

প্রাইভেটলি এনকোয়ারি করিয়ে আমি বরং কাজটা যতটা পারি এগিয়ে নিয়ে যাই। বুঝতেই পারছেন, গরজ আমারই। তাই ছেলেকে পাঠিয়ে ছিলাম আপনার কাছে।

এই মহিলাই আপনার দোকানে সেদিন এসেছিলেন, এ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত ?

হ্যাঁ। আমার কোনো সন্দেহ নেই।

তদন্ত আরম্ভ করবার এ এক জোরালো সূত্র।

বাসব উঠে দাঁড়াল।

আজ রাত্রের ট্রেনেই আমি সোমচক রওনা হচ্ছি। দেখা যাক, কতদূর কি করা যায়।

কলকাতা থেকে সোমচকের দূরত্ব ঘণ্টা কয়েকের বেশি নয়। পাহাড় ঘেরা চমৎকার ছোট্ট শহর। বিহারে অবস্থিত হলেও এখানে বাঙালি সংখ্যা প্রচুর। কি সূত্রে এত বাঙালি এখানে বসবাস আরম্ভ করেছেন নিঃসন্দেহে তা গবেষণার বিষয়। সিজিনে বাইরে থেকে প্রচুর লোক আসে হাওয়া বদল করতে।

স্টেশন মাস্টার মোহিত ঘোষালের সঙ্গে বাসবের প্রথমে দেখা হ'ল। কি প্রয়োজনে সে এখানে এসেছে তাঁকে জানাল! মনে মনে যত অতিষ্ঠই হোন না কেন, মুখে ঘোষাল সহযোগিতার মনোভাব দেখালেন।

নানা কথার পর বাসব প্রশ্ন করল, সেই গার্ডকে আজ পাওয়া যাবে?

বিকেলের দিকে পাবেন।

ড্রাইভার? তার সঙ্গেও কথা বলতে চাই।

তাকেও বিকেলে পাওয়া যাবে।

এককাপ চা খেয়ে বাসব স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো। থানায় পৌঁছাতে রিক্সায় লাগল দশ মিনিট। প্রেমকিশোর নিজের অফিস ঘরেই ছিলেন। বাসব কলকাতা পুলিশের কাছ থেকে অনুরোধ পত্র নিয়ে এসেছিল। পরিচয় পাবার পর ও সমস্ত অবশ্য দেখতে চাইলেন না প্রেমকিশোর। বাসবের কার্যকলাপ সম্পর্কে তাঁর অনেক জানা ছিল। তাকে এই কেসে সহযোগী হিসাবে পেয়ে তিনি বিলক্ষণ খুশি হলেন।

মৃতদেহ প্রাপ্তি, পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট, গার্ড, ড্রাইভার এবং ফায়ারম্যানের বিবৃতি পরবর্তী তদন্ত সম্পর্কে সমস্ত কিছু জেনে নিল বাসব ইন্সপেক্টরের কাছ থেকে। তদন্তের সুবিধার জন্য গার্ড এবং অন্য দুজনকে কয়েকদিন সোমচকেই থাকতে বলা হয়েছে। বাসবের থাকার ব্যবস্থা ইন্সপেক্টরই করে দিলেন। প্রায় লাগোয়া একটা বাড়ি অতি সম্প্রতি খালি হয়েছিল। বাড়িওলার সঙ্গে কথা বলে নেওয়া হ'ল। পুলিশের অনুরোধ অনেক ক্ষেত্রে রাখতেই হয়। খাবার দাবার হোটেল থেকে আসবে। একজন কনস্টেবলকে দেওয়া হ'ল তার সুখ-সুবিধা দেখার জন্য।

বিকেলের দিকে বাসব রেলের কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করল। গুডস ট্রেনের অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ড্রাইভারের দৈহিক গঠন ভালই। বিশেষত্ব বর্জিত মুখের অধিকারী। সচরাচর যা দেখা যায়—স্বভাবে কোনো উদ্ধত্য কিন্তু প্রকাশ পাচ্ছে না।

আপনি পুলিশকে যা বলেছেন তা আমি পড়েছি। বাসব বলল, সে সমস্ত কথা দ্বিতীয়বার আলোচনা করে লাভ নেই। আমি অন্য কিছু জানতে চাই। আপনি বলেছেন দিওয়ানগঞ্জ বা

রসুরপুর ছাড়া আর কোনো স্টেশনে গুডস ট্রেনে স্টপেজ ছিল না, কাজেই এই দুজায়গা ছাড়া আর কোনো স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ায় নি।

আপনি ঠিকই বলছেন।

এক এক সময় তো এমনও হয়, সিগন্যাল না পেয়ে অজায়গায় গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে। সে রকম কোনো ব্যাপার ঘটেছিল কি?

ঘন ঘন কয়েকবার সিগারেটে টান দিয়ে ড্রাইভার বলল, সিগন্যাল বাধার সৃষ্টি কোথাও করেনি। তবে—

বলুন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন দিওয়ানগঞ্জের আধ মাইলটাক পরে একবার আমাকে গাড়ি থামাতে হয়েছিল।

কি রকম?

গাড়ি থামানোর কারণ বিশদভাবে এবার ড্রাইভার বুঝিয়ে দিল। ওখানে বেশ প্রশস্ত একটা টানেল আছে। আগে প্রবল বৃষ্টি হলে পাহাড় থেকে জল গড়িয়ে এসে টানেল ভর্তি করে দিত। ইদানিং টানেলের দুপাশে নালার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সেদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছিল। রাত তখন গভীর। টানেলের কাছাকাছি পৌঁছবার পরই ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে হয়। কারণ লক্ষ্য করা গিয়েছিল, টানেলের জল ভরে গেছে। লাইনের উপর ফুট খানেকের কম জল হবে না। দুপাশের নালার মুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই বিপত্তি সহজেই অনুমান করা গেল। ড্রাইভার ফায়ারম্যানকে সঙ্গে নিয়ে নেমে পড়েছিল ইঞ্জিন থেকে। নালার দুপাশের মুখ কেটে দিতেই দ্রুত জল নেমে যায়। তারপর আবার গুডস-ট্রেন স্টার্ট নেয়।

কতক্ষণ সময় লেগেছিল ওখানে?

মিনিট কুড়ি।

গার্ড কোথায় ছিলেন? তিনি নিশ্চয় নালা কাটার সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন?

না। তিনি আসেন নি।

ব্যাপারটা একটু বেখাপ্পা মনে হচ্ছে যেন?

আমরাও অবাক হয়েছিলাম। পরে জেনেছি তখন তিনি মোটেই সুস্থ ছিলেন না।

ড্রাইভারকে আর কোনো প্রশ্ন না করে বিদায় দিল বাসব। গার্ড বিনয় ঘোষকে আহ্বান করা হ'ল এবার। দোহারা গড়নের গার্ড দেখতেই সাধারণতঃ সকলে অভ্যস্ত। ইনি তার বিপরীত। ডিগডিগে বোগা এ[illegible] অম্বলের রোগ হয়েছে এমন মুখের ভাব।

বাসব প্রশ্ন করল, দিওয়ানগঞ্জের কাছে, টানেলের সামনে গাড়ি কি দাঁড়িয়ে পড়েছিল?

হ্যাঁ।

শুনলাম সে সময় আপনি নিজের কামরা থেকে নামেননি। ব্যাপারটা কি? এক্ষেত্রে আপনার তৎপর হওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল, নয় কি?

বিনয় ঘোষ থতমত খেলেন।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, আমি নামতে পারি নি। মানে.

আপনি ডিউটিতে ফেল করলেন কেন?

অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। বুঝতে পারিনি গাড়ি ওখানে থেমেছে। ড্রাইভার এখানে যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন গাড়ি থেমে যাওয়ার কথা রিপোর্ট করছিল তখন ব্যাপারটা জানতে পারি।

অসুস্থ শরীর নিয়ে ডিউটিতে এলেন কেন?

অসুস্থ ছিলাম না। দিওয়ানগঞ্জে খেয়েছিলাম। তারপর থেকেই গা গুলোতে আরম্ভ করে।

রেলওয়ে টি স্টলে চা খেয়েছিলেন?

ওখানে রেলের কোনো টি স্টল নেই। দুবে কোম্পানি চা আর খাবারের কারবার করে।

বিনয় ঘোষকে বিদায় দেওয়া হ'ল।

বাসব প্রেমকিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার দৃঢ় ধারণা কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নয়, টানেলের দুপাশের নালার মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

মালগাড়িটা আটকানোই হত্যাকারীর উদ্দেশ্য বলছেন?

একজ্যাক্টলি। মৃতদেহ ওই সময় খালি ওয়াগনে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমাদের অনুসন্ধান চালাবার পরিধি কমে এলো। বুঝতে নিশ্চয় পারছেন সোমচক নয়, দিওয়ানগঞ্জের বাসিন্দা ছিল মৃতা যুবতী। ওখানে আমাদের একবার যাওয়া দরকার।

পরের দিন সকালের ট্রেনে দুজনে রওনা হ'ল। টানেল অতিক্রম করবার সময় বাসব লক্ষ্য করল, পাহাড়ের সেই অংশে বহু কুলী পাথর কাটছে। এই সমস্ত পাথর পরে চিপস আর বোল্ডারের আকারে অন্যত্র চালান করা হয়।

দিওয়ানগঞ্জে নেমে দুজনে লাইন ধরে হাঁটতে হাঁটতে টানেলের কাছে এলো। নালা পরীক্ষা করতেই পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নয়, পাথর আর মাটি দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়েছিল। ওখান থেকে সরে এসে বাসব তীক্ষ্ণ চোখে চারিধার দেখতে লাগল। হঠাৎ এক জায়গায় দৃষ্টি আটকে গেল। ঘাসের মধ্যে কি যেন একটা চকচক করছে। এগিয়ে গিয়ে রুমালের সাহায্যে বস্তুটা তুলে নিল। নতুন একটা লাইটার।

কিভাবে এলো ওটা এখানে?

প্রেমকিশোরের প্রশ্নের উত্তরে বাসব চিন্তিত গলায় বলল, কারুর পকেট থেকে পড়ে গেছে।

কার বলে আপনার মনে হয়? হত্যাকারীর নয়তো?

জোর দিয়ে এখন কিছু বলা যায় না। চলুন, ফেরা যাক।

স্টেশনের দিকে দুজনে ফিরে চলল।

এই শহরের লোকসংখ্যা কত হবে?

হাজার পঞ্চাশেকের বেশিতো বটেই।

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিয়ে বলল, হাজার পঞ্চাশেক লোকের মধ্যে থেকে হত্যাকারীকে খুঁজে বার করা সহজ কথা নয়। তবে আমরা যদি বিষয়টিকে অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করি তবে অনেক ঝামেলাকে হয়তো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হলেও হতে পারে।

কি রকম?

টানেলে যাতে বৃষ্টির জল না জমে তার জন্য নালা কাটার ব্যবস্থা করা হয়েছে একথা

সকলের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কারণ সাধারণ মানুষ ট্রেনে চড়েই টানেল অতিক্রম করতে অভ্যস্ত। পায়ে হেঁটে ওখান দিয়ে যাবার কোনো প্রয়োজনীয়তাই দেখা দেয় না। ওই বিশেষ ব্যবস্থার কথা জানা সম্ভব যারা পাথর কাটছে আর কয়ারী কোম্পানির মালিকদের।

আপনার কি মত ?

অনুমান ঠিক পথ ধরেই এগুচ্ছে।

হত্যার ব্যাপারে কুলীদের কিন্তু বাদ দিতে হবে। অবশ্য ওদের মধ্যে কাউকে টাকা দিয়ে নালার মুখ বন্ধ করানো হয়ে থাকতে পারে। মৃতা যুবতীর সাজ পোশাক হাবভাব এবং কলকাতায় যে দুঃসাহসীকতার পরিচয় দিয়ে এসেছে তাতে স্বাভাবিক ভাবেই মনে আসবে যে কুলীদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করত না। এখন বাকী রইল কয়ারীর মালিকবর্গ। আমাদের অনুসন্ধান করে দেখতে হবে, এখানে ক'টি কোম্পানি পাথর কাটছে এবং তাদের মালিক কে কে ?

বিশেষ অসুবিধা হ'ল না।

স্থানীয় পুলিশের সাহায্যে অতি সহজেই ইনফরমেশন পাওয়া গেল। চারটি কোম্পানি আছে। এই সমস্ত কোম্পানির মালিক হ'ল যথাক্রমে গৌতম বাগচী, প্রিয়তোষ করগুপ্ত, রোহিনী সেন এবং দেবব্রত সান্যাল। বিস্ময়ের বিষয় সকলেই বাঙালি।

আরো এক জবর সংবাদ পাওয়া গেল।

মৃতা যুবতীর পরিচয়। ছবির কপি নিয়ে দিওয়ানগঞ্জের পাড়ায় পাড়ায় পুলিশ খোঁজ-খবর নিতে আরম্ভ করেছিল। ফল পাওয়া গেল তাতেই। বারবধূ পল্লীর একজন দালালের কাছ থেকে জানা গেল, এই মেয়েটির নিষিদ্ধ পল্লীতে ঘর নেওয়া আছে। নিয়মিত অবশ্য সে থাকে না। মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যায়। কোথা থেকে এখানে এসেছে সেকথা কারব জানা নেই। পাড়ার অন্য কারুর সঙ্গে মেলামেশা করে না। তবে যে ক'দিন এখানে এসে থাকে, অনেক বহিরের আগমন হয় তার ঘরে। তার আর্থিক অবস্থা আশাতীত ভাল।

নাম মানকুমারী।

ভিক্টিম তাহলে বারবণিতা ছিল।

কয়ারী কোম্পানির মালিক চারজনকে আহ্বান করা হ'ল থানায়। এলেন তাঁরা। বাসরের সঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হ'ল। কোনো কেসের তদন্ত ভার নিয়ে সে এখানে এসেছে তাও শুনলেন সকলে। কারুর মুখে অবশ্য ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না।

রামদুলাল সরকার গয়না চোরের চেহারার বর্ণনা দিয়েছিলেন। দোহারা গড়ন, চোখে চশমা, পুরুষ্ট বাহারে গোঁফ, কালো ব্যাকব্রাস করা ঘন চুল, বয়স বছর পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। বাসব লক্ষ্য করল, দুটো মিল সকলের উপরই প্রযোজ্য---দোহারা গড়ন আর বয়স পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। তবে রোহিনী সেনের সঙ্গে অন্যান্য বিবরণও কিছুটা মিলে যাচ্ছে।

তাঁর সঙ্গেই বাসব প্রথমে কথা আরম্ভ করল।

বাকীরা পাশের ঘরে চলে গেলেন।

বুঝতেই পারছেন একটা হত্যাকাণ্ডের সমাধানে পৌঁছানো কত কঠিন। আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন নিশ্চয়, আশা করাটা অন্যায় হবে না।

রোহিনী সেন বিরক্তির সুরে বললেন, আপনাদের কাণ্ডকারখানায় আমি অবাক হয়ে গেছি। কোথাকার কে খুন হয়েছে, তার আমি কি জানি।

খুন হয়েছে একটি মেয়ে। মানকুমারী নামে কাউকে চেনেন?

মোটেই না। আমি ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাকি মশাই। অন্য মেয়ে তো দূরের কথা, নিজের স্ত্রীর সংবাদ রাখাই সময় সময় আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে ওঠে।

১০ই জানুয়ারী আপনি কোথায় ছিলেন?

এই ধরনের আজে-বাজে প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই। এই শহরের আমরা গণ্যমান্য লোক মনে রাখবেন।

উত্তর দেওয়া না দেওয়াটা আপনার ইচ্ছে। তবে এই সঙ্গে আপনারও মনে রাখা দরকার কেসটা খুনের, তদন্তের কাজে বাধার সৃষ্টি করার একটা অফেন্স নিশ্চয়ই জানেন? শেষবারের মতো প্রশ্ন করছি, ১০ই জানুয়ারী কোথায় ছিলেন?

রোহিনী সেন এবার একটু চিন্তা করলেন। তারপর গলা নামিয়ে বললেন, এখানেই ছিলাম।

টানেলের কাছে আপনার পাথর কাটার কাজ চলছে তো?

হ্যাঁ।

সেদিন ওখানে সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করেছিলেন?

আমি ওয়ার্ক সাইটে মোটেই যাই না। কর্মচারীরা কাজ সামলায়। তাছাড়া অবিশ্রান্ত সময় বৃষ্টি হওয়ার দরুন আট তারিখ থেকে এগারো তারিখ পর্যন্ত কাজ বন্ধ ছিল।

শুধু আপনার কাজ বন্ধ ছিল, না আর সকলের?

আপনি অদ্ভুত প্রশ্ন করছেন মশাই। বৃষ্টির দরুন আমার কাজ যদি বন্ধ থাকে তবে আর সকলের কাজ কিভাবে হবে?

আপনার আর কোনো প্রশ্ন নেই নিশ্চয়?

উত্তরের অপেক্ষা না করেই রোহিনী সেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাসবের মুখে হাসি ফুটে উঠল। এই ফাঁকে সে পাইপ ধরিয়ে নিল। এবার এলেন গৌতম বাগচী। এঁরও গোঁফ আছে—বাটারফ্লাই। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। বাসব কিছু বলার আগেই তিনি বললেন, মালগাড়ির মধ্যে একজন মেয়ের মৃতদেহ পাওয়া গেছে তার জন্য আমাদের টানাটানি করছেন কেন?

টানাটানি নয়। সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ বলতে পারেন।

বাইরে এত লোক রয়েছে, আর ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ আমাদেরই করবেন। ব্যাপারটা কি?

অকারণে মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলা আমাদের স্বভাব নয়। ভেতরে একটা ব্যাপার নিশ্চয় আছে। যাই হোক, আসল কথায় এবার আসি। শুধু শুধু খুন নয়, কলকাতার একটি বিখ্যাত জুয়েলারি ফার্ম থেকে বহু টাকার গয়না অপহরণও এর সঙ্গে জড়িত।

বলেন কি।

এই কেসের গুরুত্ব তাই অনেক বেড়ে গেছে। আপনি মানকুমারী নামে কাউকে চেনেন?

গৌতম বাগচী সচকিত হলেন।

মানকুমারী।

হ্যাঁ। চেনেন এনামে কাউকে? চিনি। ভালভাবেই চিনি বলতে পারেন।

তারপর গলা নামিয়ে বললেন, আমাদের সেনসাহেব—রোহিনী সেনের কথা বলছি, খুব যাতায়াত আছে ওর ডেরায়।

তাই নাকি!

হঠাৎ মানকুমারীর খোঁজ করছেন কেন বলুন তো?

মানকুমারীই খুন হয়েছে।

গৌতম বাগচী চমকে উঠলেন।

অ্যাঁ— বলেন কি?

আমার তো ধারণা হচ্ছিল আপনি জানেন একথা। মানকুমারীর সঙ্গে আপনার কোথায় আলাপ হয়েছিল?

এবার একটু ইতস্ততঃ করলেন গৌতম বাগচী।

দেখুন ... . ইয়ে আমার একটু জায়গা বিশেষে যাবার অভ্যাস আছে। একদিন তার কাছে গিয়ে পড়েছিলাম আর কি। তারপর—কি ঝামেলা, আমাকেই মানকুমারীর হত্যাকারী বলে ঠাওরান নি তো?

বাসব ও কথার উত্তর না দিয়ে বলল, ধন্যবাদ। অনেক সাহায্য করেছেন আর বিরক্ত করব না।

এবার এলেন প্রিয়তোষ করগুপ্ত।

পাশের ঘর থেকে প্রেমকিশোর এক একজনকে পাঠিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রশ্ন-উত্তর বাংলাতেই চলছিল। প্রিয়তোষের মুখে দাড়ি গোঁফ নেই, মাথায় চকচকে টাক। চোখের ঔজ্জ্বল্য দেখে বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়।

আপনাকে কেন বিরক্ত করছি নিশ্চয় জানেন?

ইন্সপেক্টরের মুখে শুনলাম, জটিল এক কেস হাতে নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন। সেই সম্পর্কে কি সমস্ত জিজ্ঞাসাবাদ আছে। দেখে দেখে আমাদেরই বা ডেকে পাঠালেন কেন বুঝলাম না। ব্যাপার কি?

বলছি। তার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দিন।

বলুন?

মানকুমারী নামে কোনো মেয়েকে আপনি চেনেন?

চিনি!

কিভাবে চিনলেন?

গৌতম বাগচীর মতো ইতস্ততঃ না করে প্রিয়তোষ করগুপ্ত বললেন, বাজারের মেয়েমানুষ। আমি মাঝে মাঝে তার ঘরে গেছি।

তার সম্পর্কে আপনি কতদূর কি জানেন?

বলতে গেলে বিশেষ কিছুই জানি না। রেট হাই হওয়ার দরুন তার ঘরে পয়সাওয়ালাদেরই আনাগোনা। কোথা থেকে এখানে এসেছিল আমি একবার জানতে চেয়েছিলাম। কথাটা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল। মানকুমারী সম্পর্কে এত প্রশ্ন করছেন কেন? সেকি কোনো গোলমালে জড়িয়ে পড়েছে নাকি?

বাসব পাইপ ধরিয়ে নিল।

মানকুমারী খুন হয়েছে।

সেকি!

করগুপ্তর চোখে বিস্ময়ের ঢেউ জাগল।

একটু হেসে তিনি বললেন, তার জীবনের পরিণতি যে এরকম হবে আগেই আমি ধারণা করেছিলাম।

একথা বলছেন কেন?

অন্যান্য বাজারের মেয়ের মতো সে ছিল না। মাঝে মাঝে কোথায় সে গা ঢাকা দিত। কানাঘুসো শুনেছি, গাঁজা স্মাগলারদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। তখনই আমি ভেবেছিলাম, এ মেয়ের কপালে অনেক দুঃখ।

আপনি বলছেন স্বার্থ নিয়ে বিবাদ বেঁধে ছিল। তারই শিকার বেচারা?

অসম্ভব নয়।

মানকুমারীর বাঁধা গ্রাহক কে কে ছিল বলতে পারেন?

বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে প্রিয়তোষ করগুপ্ত বললেন, বাঁধা গ্রাহক বলতে একমাত্র রোহিনী সেন। আমি আর বাগচী যেতাম মাঝে মাঝে। অন্তরঙ্গতা বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। বুঝতেই পারছেন আমরা যেতাম মোটা টাকার বিনিময়ে প্রমোদ ক্রয় করতে।

বাগচী আর সেন ছাড়া আর কাউকে জানেন যে তার ঘরে ঘন ঘন যেত?

দীনদয়াল যেত প্রায়ই।

সে কে?

একজন স্যাকরা। চোরাই মাল কেনাবেচা করে শুনেছি।

অনেক মূল্যবান সংবাদ আপনার কাছে পাওয়া গেল। আর আটকাবো না। দেবব্রতবাবুর সঙ্গে কথা হয়ে গেলে আমারও আজকের পর্ব শেষ হয়। আসুন তাহলে—

প্রিয়তোষ করগুপ্ত চলে গেলেন।

এবার এলেন দেবব্রত সান্যাল। মুখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায় বিলক্ষণ বিরক্ত হয়েছেন। এঁরও গোঁফ দাড়ি নেই। কাঁচা পাকা চুল বেশ পাতলা হয়ে এসেছে। অন্য তিনজনের মত সাজ পোশাকে তেমন চাকচিকা নেই।

মানকুমারী খুন হয়েছে ইত্যাদি বলার পর প্রশ্ন করল, আপনি তাকে চিনতেন?

না। আমি বড় ঘরের ছেলে। তৃতীয় শ্রেণীর মেয়ে মানুষদের সঙ্গে নটঘট করার কথা ভাবতেও পারি না।

আমি যতদূর জানি বড় ঘরের বহু ছেলে ঐ ধরনের মেয়েদের পিছনে ঘুরে পেনিলেস হয়ে যায়।

অস্বীকার করি না। তবে আমার কথা স্বতন্ত্র। আমি নবদ্বীপে গিয়ে কণ্ঠি নিয়েছি। আমার কি ওই সমস্ত নোংরামিতে যাওয়া সাজে?

তা বটে। আচ্ছা, আপনার সমব্যবসায়ী—আরো যে তিনজন এসেছেন, তাঁদের সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?

ওরা বাজারের মেয়ে মানুষের পিছনে টাকা ওড়াচ্ছে। এইটুকু বলতে পারি।

আর কিছু?

না।

বাসব বুঝল শক্ত ঠাই। পেটের কথা উগরে দেবার পাত্র নন ভদ্রলোক। যে কোনো প্রশ্ন করা হোক না কেন, তিনি উত্তর দেবেন সংক্ষিপ্ত—না। কাজেই আর পণ্ডশ্রম না করে দেবব্রত সান্যালকে বিদায় দিল। মিনিট পাঁচেক পরে পাথর কোম্পানির মালিকরা থানা থেকে বেরিয়ে যাবার পর প্রেমকিশোর এ ঘরে এলেন।

বললেন হাসতে হাসতে, মনে হ'ল ওঁরা আপনার উপর খুশি নন। তারপর আশার আলো কিছু দেখতে পেয়েছেন?

এগিয়ে যাবার মতো কিছু সূত্র অবশ্যই পেয়েছি। শুনুন, তিনটে কাজ এখন আপনাকে করতে হবে।

বলুন?

করতে হবে মানে ব্যবস্থা করতে হবে। আজই ক্যালকাটা পুলিশের কাছে লোক পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। আমি চিঠি দিয়ে দেব। উত্তর নিয়ে সে কালকের রাত্রের ট্রেনেই যেন ওখান থেকে রওনা হয়।

বেশ। দ্বিতীয় কাজটা কী?

আজই মানকুমারীর ঘর সার্চ করতে হবে।

সময় নষ্ট না করে আমরা এখুনি রওনা হতে পারি। এখান থেকে নিষিদ্ধপল্লী বেশি দূরে নয়।

তৃতীয় কাজটা হ'ল, আমি কয়েক জায়গায় যাব কিছু খোঁজ খবর নিতে। কাজের সুবিধার জন্য স্থানীয় একজন সাব ইন্সপেক্টর যেন আমার সঙ্গে থাকে।

এ আর এমন বড় কথা কি। এখানকার ইনচার্জ গোলকনাথকে বলে ব্যবস্থা করছি।

দিওয়ানগঞ্জের নিষিদ্ধপল্লী অন্যান্য বড় শহরের মতো জেল্লাদার নয়। ঘনবদ্ধ বাড়ির শ্রেণী রাস্তার দুধারে। বারান্দায় বারান্দায় পাখির খাঁচা ঝুলছে। কোনোটায় ময়না, কোনোটায় আবার টিয়া। মানকুমারীর দোতলা বাসস্থান একেবারে রাস্তার শেষ প্রান্তে।

বিকালেই পুলিশ পৌঁছাল ওখানে।

প্রতিটি ঘর মূল্যবান আসবাবে সজ্জিত। দেখেশুনে বিশ্বাস করা শক্ত এই বৈভবের অধিকারিণী হয়ে দেহের ব্যবসায় লিপ্ত ছিল। বহুক্ষণ ধরে তল্লাস চালাবার পরও এমন কিছু পাওয়া গেল না যাতে হত্যা রহস্য কিছুটা অন্ততঃ স্বচ্ছ হয়।

তবে একটা জিনিস পাওয়া গেল। এক শিশি স্পিরিটগাম। এই ধরনের কিছু মানকুমারীর মতো মেয়ের কাছে থাকার কোনো মানে হয় না। কাজেই সন্দেহজনক। শিশিটা ছিল একটা ট্রাঙ্কের মধ্যে রাখা একগাদা শাড়ির আড়ালে।

দুদিন কেটে গেছে।

বাসব খুবই ব্যস্ত ছিল।

শহরে মোট ছেষট্টিটা মনোহারী দোকান আছে ছোট বড় মিলিয়ে। এই সমস্ত দোকানে কি

যেন অনুসন্ধান করে বেড়িয়েছে। সঙ্গে ছায়ার মতো ছিল একজন পুলিশ কর্মচারী। দোকানদাররা যদি তাকে আমল না দেয় তাই এই ব্যবস্থা।

*স্বর্ণকার দীনদয়ালের সঙ্গে দেখা করলে মন্দ হ'ত না। তবু তার সঙ্গে দেখা করেনি। সাবধান হয়ে যেতে পারে। সরঞ্জাম কলকাতা থেকে সঙ্গেই আনা হয়েছিল—কৌশলে কয়েকজনের হাতের ছাপ সংগ্রহ করা হয়েছিল, তার প্রিন্ট নেওয়া হয়। তারপর পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফাঁদ পাতার পাকা ব্যবস্থা করা হয়েছিল।*

এরপর চারজনকে আহ্বান করা হ'ল।

তারা আসতে চাননি। ভদ্র নাগরিককে পুলিশ এইভাবে হয়রান করার অধিকারী কিনা—প্রশ্ন তুলেছেন। আইনের সাহায্য নেওয়া হতে পারে এ হুমকিও দিয়েছেন কেউ কেউ। তা সত্ত্বেও থানায় আসতে হয়েছে প্রত্যেককে। তাঁদের আসার প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে বাসব, প্রেমকিশোর আর থানা ইনচার্জকে সঙ্গে নিয়ে এলো। এতক্ষণ চারজন একজন সাব ইনসপেক্টরের সামনে বসে গজরাচ্ছিলেন।

বাসব মৃদু হেসে বলল, আপনাদের মনের অবস্থা অনুমান করে নিতে আমার অসুবিধে হচ্ছে না। ভবিষ্যতে আর বিরক্ত করব না এ নিশ্চয়তা অবশ্যই দেওয়া যায়। আপনারা নির্বোধ নন। বুঝতে নিশ্চয় পেরেছেন, মানকুমারীর খুন হওয়ার ব্যাপারে আমরা আপনাদের সন্দেহ করেছি। আপনারা চারজন মিলে যে তাকে খুন করেছেন একথা বলছি না। তবে আপনাদের মধ্যে একজনের হাত যে রক্তাক্ত হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

দেবব্রত সান্যাল একটু উসখুস করলেন।

বাকীরা সম্পূর্ণ নির্বিকার।

সুখের কথা, হত্যাকারীকে আমি জানতে পেরেছি। হত্যার মোটিভ পরিষ্কারভাবে বুঝতে না পারলেও অনুমান করে নিয়েছি। এ ব্যাপারে দীর্ঘ অভিজ্ঞতাও আমাকে সাহায্য করেছে। মানকুমারী বারবনিতা। হত্যাকারীর তার কাছে যাতায়াত ছিল। দুজনের মাথায় বিচিত্র এক পরিকল্পনার উদয় হয়। কলকাতায় গেল দুজনে। অত্যন্ত দুঃসাহসিকতা দেখিয়ে আর. ডি সরকার জুয়েলারি থেকে বহু টাকার গয়না নিয়ে সরে পড়ল। তারপর যা হয়ে থাকে। দুজনের মধ্যে বনিবনা হ'ল না নিশ্চয়। পুরুষ বন্ধুটি বিবেচনা করে দেখে থাকবে, কু-কাজের সাক্ষীকে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক নয়। মানকুমারীকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হ'ল। যতদূর সম্ভব সন্দেহমুক্ত থাকাই ভাল। মৃতদেহ অন্যত্র পাচার করে দেবার মতলব করল হত্যাকারী। এতে পুলিশকে মিসলিড করা হবে এবং ঘটনাটিও অন্য লাইনে চলে যাবে। কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ার দরুন পাথর কাটার কাজ বন্ধ ছিল। টানেলের দিকে যাওয়ার প্রয়োজন পড়েনি কারুর। কাজেই হত্যাকারী যখন নালার মুখ বন্ধ করতে যায় তখন কেউ তাকে দেখতে পায়নি। তার ট্রাক আছে। ট্রাকে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যেতে কোনো অসুবিধা হয় নি। অন্ধকারে সে গুডস ট্রেনের অপেক্ষা করতে থাকে। ট্রেন আসে—টানেল জলে ডুবে গেছে দেখে থেমে যায়। তারপর একটি ওয়াগনে মৃতদেহ চালান করে দেয় সে। অবশ্য এর আগেই সব ব্যবস্থা হত্যাকারীকে করে রাখতে হয়েছিল। কৌশলে দিওয়ানগঞ্জে গার্ডকে চা-এর সঙ্গে এমন কিছু খাওয়ানো হয়, যাতে সে অসুস্থতা বোধ করল। তখন ড্রাইভার তার সঙ্গীকে নিয়ে নালা কাটবে—তৃতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ গার্ড আলো নিয়ে এধার ওধার ঘোরাঘুরি করলে, মৃতদেহ চোখে পড়ে যাওয়ার

সম্ভাবনা। তাই এই সতর্কতা। হত্যাকারী অবশ্য আরো একটি কাজ করেছিল। এ অঞ্চলের ধূর্ত স্যাকরা হ'ল দীনদয়াল। হত্যাকারীর অনুরোধে মানকুমারী নিজের আবেক বাঁধা খদ্দেরকে *দীনদয়ালের সহযোগিতায় সমস্ত গয়না বিক্রি করে ফেলতে পেরেছিল। এই বাঁধা খদ্দেরটি* বিভিন্ন জায়গা থেকে চোরাই মাল কিনে মুনাফা করে থাকেন।

এক নাগাড়ে এতখানি বলার পর বাসব থামল।

সকলে আগেকার মতই চুপচাপ।

পাইপ ধরিয়ে নিয়ে আবার বলল, গৌতমবাবু, গয়নাগুলো সম্পর্কে এবার কিছু বলবেন কি ?

গৌতম বাগচী বিস্ময়ে ভেঙে পড়লেন।

আমি .... আমি আবার কি বলব?

আপনি ছাড়া আর কে বলতে পারেন বলুন?

সমস্ত কিছুর একটা সীমা আছে মিঃ ব্যানার্জী। আপনি আমার সম্মানে আঘাত করার চেষ্টা করছেন।

স্যাঙ্গুইন না হয়ে কোনো কিছু বলা আমার অভ্যাস নয়। নানা ধরনের চোরাই মাল কিনে অন্যত্র বিক্রি করার ব্যবস্থা আপনার অনেকদিনের। না, না, আপত্তি করে আর নিজেকে হাস্যস্পদ করে তুলবেন না। পুলিশ অলরেডি আপনার বাড়ি রেড করেছে। সরকার জুয়েলার্সের গয়না ছাড়াও বহু জিনিস পাওয়া গেছে। এবার বুঝতে পেরেছেন বোধহয় স্যাকরা দীনদয়াল পুলিশের চাপে পড়ে সমস্ত কথা স্বীকার করেছে। আপনাকে এতক্ষণ এখানে আটকে রেখে আমরা ওই সমস্ত কাজই করেছিলাম।

গৌতম বাগচী কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। তাঁর কপালে চিটচিটে ঘাম দেখা দিয়েছে। বাকী তিনজন এখনও ঠোঁট চেপে বসে রইলেন। প্রেমকিশোরের উজ্জ্বল দৃষ্টি বাসবের মুখের উপর। পাইপ নিভে গিয়েছিল। আবার ধরিয়ে নিয়ে ঘন ঘন টান দিল কয়েকবার।

অবশ্য আপনার অপরাধের গুরুত্ব যতই হোক না কেন—বাসব বলল, আমি জানি গৌতমবাবু, আপনি মানকুমারীকে খুন করেন নি, হত্যাকারী অত্যন্ত বুদ্ধিমান আপনার চেহারার সঙ্গে মেক-আপের সাহায্যে নিজের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে সে কলকাতায় ডাকাতি করেছিল। তবে চালে তার একটা ভুল হয়েছে। দীনদয়াল স্যাকরার কথা আমাকে না বললে আমরা গয়নাগুলির হদিশ কখনোই পেতাম না। একটু বেতাল অবস্থার মধ্যে আমাদের থাকতে হ'ত। যাহোক, একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, সর্বক্ষেত্রে নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান মনে করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নয়। এ কথা নিশ্চয় এখন প্রিয়তোষবাবু হৃদয়ঙ্গম করছেন।

আমি! আকাশ থেকে পড়লেন প্রিয়তোষ করগুপ্ত। আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি করছেন কেন?

টানাটানি না করে উপায় নেই যে। আমরা জেনে ফেলেছি, ঠাণ্ডা মাথায় আপনি মানকুমারীকে খুন করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজের টাকের উপর নকল ব্যাকব্রাস তুলে, গোঁফ এঁটে, চশমা পরে—নিজের ভোল সম্পূর্ণ পাল্টে সরকার জুয়েলারিতে দুপুরে ডাকাতি করেছেন।

চিৎকার করে উঠলেন করগুপ্ত, পাগলের প্রলাপ শুনতে এখানে আসিনি। আর এক মুহূর্ত

এখানে নয়। একজন ভদ্রলোকের সম্মান নিয়ে খেলা করার পরিণাম যে কত মারাত্মক হতে পারে, তা আপনারা শিগগিরই বুঝতে পারবেন। চলি—

তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

দাঁড়ান—

বাধা দিলেন প্রেমকিশোর।

বললেন দৃঢ় গলায়, আপনার বাইরে যাওয়া হবে না। আপনাকে আমি গ্রেপ্তার করলাম।

প্রিয়তোষ করগুপ্ত চিৎকার করে উঠলেন।

এর মানে কি। আপনারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি যে দোষী তার প্রমাণ কই?

বাসব মৃদু হেসে বলল, প্রমাণের অভাব নেই প্রিয়তোষবাবু। আপনি একটু সতর্ক থাকলে অবশ্য ধরা শক্ত হ'ত। আপনার সবচেয়ে বড় ফল্ট কোথায় হয়েছে জানেন—সরকার জুয়েলারির কাউন্টারে অন্যমনস্কভাবে হাত রাখা। ক্যালকাটা পুলিশ সেই ছাপের প্রিন্ট তুলতে ভুল করে নি। তার কপি আমি আনিয়েছি। সেদিন আমার সঙ্গে যখন এই ঘরে আপনাদের কথা হয়, টেবিলের গায়ে হাতের ছাপ রেখে যান। আপনার হাতের ছাপের সঙ্গে কলকাতা থেকে আনা ছাপের হুবহু মিল হয়েছে। যেখানে মৃতদেহ মালগাড়িতে চাপানো হয়, সেখানে একটা লাইটার কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। তার উপর থেকে তোলা ছাপও আপনার হাতের ছাপের সঙ্গে মিলেছে। আপনি এখানে একজন নামকরা লোক। লাইটার নিয়ে দোকানে দোকানে খোঁজ করতেই, একজন দোকানদার বলে ওটি আপনি তার দোকান থেকে কিনেছেন। আরো প্রমাণ আছে। রেলওয়ে স্টলের একজন বয়কে আপনি টাকা দিয়ে হাত করেছিলেন। সে চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে এমন কিছু খাইয়েছিল যাতে গার্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। যাক, আমার কাজ শেষ হ'ল। আদালতে আপনাকে সোপর্দ করার দায়িত্ব পুলিশের, সে কাজ তারা সুচারু রূপে করবেন এ বিশ্বাস আমার আছে। ওয়েল ইন্সপেক্টর, এখন আমি চলি। কলকাতায় ফেরার আগে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

বাসব উত্তরের অপেক্ষা না করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। রোহিনী সেন আর দেবব্রত সান্যাল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। গৌতম বাগচী একইভাবে মাথা নত করে বসে রয়েছেন। প্রিয়তোষ করগুপ্ত ফুঁসছেন। তাঁর সমস্ত শরীর দুলে দুলে উঠছে। ঘেমে নেয়ে উঠেছেন। কিন্তু উত্তেজনার দরুন কিছুই বলতে পারছেন না।

# শতাব্দীর সেরা প্রবঞ্চকের কাহিনী

## বীরু চট্টোপাধ্যায়

হকচকিয়ে গেল ক্যানের সেই হোটেল মালিক।

একি স্বপ্ন না সত্যি, কোনো অ্যাপেয়েন্টমেন্ট নেই, কিছু নেই, বিরাট গাড়ি থেকে তার হোটেল পোর্টিকোতে এসে নামলেন কিনা হিজ রয়েল হাইনেস দি কিং ফারুখ অব ঈজিপ্ট।

সারা হোটেল স্বস্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ম্যানেজার, মালিক হন্তদন্ত হয়ে অভিবাদন করে বলে উঠল, আমাদের ক্ষুদ্র হোটেলে সু-স্বাগতম ইওর রয়েল হাইনেস।

মুচকি হাসলেন রাজা ফারুখ। মাথা দুলিয়ে সকলের অভিবাদনের প্রত্যুত্তর দিলেন।

এই শুরু। যে কয়দিন রইল রাজা ফারুখ চালাল বাদশাহী খানাপিনা। পান করল পৃথিবীর সবচেয়ে দামী দামী মদ। ভোগ করল সুন্দরী সুন্দরী নারী দেহ।

তারপর হোটেল মালিকের জন্য পরম বজ্রাঘাতের মতো এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। রাজার অসীম ধনদৌলত, তার কাছে আগে ভাগে অর্থের উল্লেখ করা ভয়াবহ অশিষ্টতা। অতএব যা চাইলো তাই অকাতরে হোটেল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করে গেল মাননীয় প্রখ্যাত অতিথিকে। অতঃপর আশি লক্ষ ফ্রাঙ্কের বিল বাকি রেখে এক রাত্রে কেটে পড়ল তথা কথিত এই নরপতি সবার অলক্ষ্যে। তাজ্জবকাণ্ড। হৈ হৈ পড়ে গেল হোটেলে সারা শহরে। তবে সবাই নিশ্চুপে নীরবে।

কেন না একটু বিশদভাবে খোঁজ নিয়ে জানা গেল এ লোকটা আদৌ মিশরের রাজা নয়, এ একজন আন্তর্জাতিক জোচ্চোর, লোকটার চেহারার সঙ্গে মিশরের রাজার আশ্চর্য মিল। হোটেল মালিক ভুল করেছিল, এই প্রবঞ্চকও সেই সুযোগ নিয়ে তাকে দ'য়ে মজিয়ে গেল। লোকটা যখন হোটেলে বসে স্ফূর্তি করে রাজসিক জীবন যাপন করছে ঠিক সেই সময় দেখা গেল আসল রাজা ফারুখ ইয়োরোপের এক নিভৃত স্থানে নারী সমভিব্যাহারে সূর্যস্নান করছেন।

হোটেলে থাকাকালীন পূর্ব পূর্বকার কৌশলমতো অঢেল টাকা নিয়েছিল সেখানকার বড় বড় ব্যাঙ্ক থেকে। উপায়হীন ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ কিল খেয়ে কিল চুরি করল। নিজেদের মূঢ়তা কে আর প্রকাশ করতে চায়। ব্যাঙ্কের গুডউইলেরও দাম আছে।

সে সব ধনী কন্যাদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করেছিল তারা যখন হাপুস নয়নে কাঁদছে সে সময় প্রখ্যাত এই প্রবঞ্চক স্পেনে মাদ্রিদের ব্যাঙ্কে জাল চেক-এর পর চেক ভাঙিয়ে চলেছে। সেখানে নিজেকে নামকরা এক মার্কিন ব্যবসায়ী বলে জাহির করে ঠকিয়ে চলেছে। মাদ্রিদে যখন প্রবেশ করে তখন তার পকেট ছিল প্রকৃতই গড়ের মাঠ কিন্তু অচিরেই তার ওভার কোট

সহ ৮ পকেট টাকায় টাকায় ফুলে উঠল। জুয়ার আড্ডায়। মদ্যশালায়, গণিকালয়ে দিবারাত্র সে অর্থব্যয় করে যাচ্ছিল অজস্রভাবে।

এখন কথা হ'ল কে এই শ্রেষ্ঠ আন্তর্জাতিক প্রবঞ্চক?

নাম মিঃ গ্রিশান। দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ, স্থূলকায়। নিজেকে সে অতীব ধনাঢ্য ব্যক্তি প্রচার করে দেশে দেশে সে প্রচুর নরনারীকে ঠকিয়ে বেড়াচ্ছে।

তার চেহারায় এমন একটা অকর্ষণ ছিল যাতে যুবতী মেয়েরা মৌমাছির মতো এসে জুটতো। সে কাউকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, কারুর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করে তাদের যাবতীয় অর্থ আত্মস্যাৎ করত।

আমেরিকার টরেন্টো শহরে এক কারখানা বিক্রীর ব্যাপারে মালিক ও ক্রেতা উভয়কেই বোকা বানিয়ে কয়েক হাজার ডলার হাতিয়ে সে কেটে পড়ল। উঠলো এসে আটলান্টিক পেরিয়ে লন্ডনের ওয়েস্ট এণ্ড এলাকায়। এখানেও তার সেই একই কৌশল কায়দা। ধনী সমাজে মিশে গেল নিজেকে বড় লোক পরিচয় দিয়ে। লোভনীয় ব্যবসার প্ল্যান শুনিয়ে এক ধনী দুহিতাকে দোহন করল। এবং অর্থে নবাবী চালে থাকতে লাগল। যা হয়ে থাকে, মৌমাছির মতো জুটলো আরও অনেক যুবতী অনেক পরিষদ ও চাটুকার। সেই ধনী দুহিতার নাম অ্যামি। অ্যামির সঙ্গে গ্রিশান প্রেমে ডুবুডুবু। নিজেকে কোটিপতিরূপে জাহির করেছে গ্রিশান এই ইংরেজ প্রেমিকাটির কাছে।

সরলগুণা ধনী যুবতী অ্যামি সবিস্ময়ে শুনেছে, মিঃ গ্রেঞ্জারের (অ্যামির কাছে এই নামই বলেছে গ্রিশান) ওকলাহামায় অসংখ্য তৈলখনি বর্তমান, আছে টরেন্টোর কাছে বিশাল মোটর তৈরীর কারখানা। অথচ আসলে মিঃ গ্রেঞ্জার ওরফে মিঃ গ্রিশান এই সব স্থান চোখেও দেখেনি জীবনে। ওর নাকি এক বিরাট পশুশালাও রয়েছে কানাডার কোথায় সবিস্তারে এই অলীক কাহিনী শুনিয়ে যুবতী অ্যামিকে মন্ত্রমুগ্ধ করে ফেলে।

গ্রিশান অ্যামিকে অ্যামেরিকার চেক দিয়ে ওর কাছ থেকে প্রচুর পাউণ্ড নিতে লাগল। ভয় কি এতবড় কোটিপতি। তাছাড়া পরমানন্দের কথা গ্রিশান অ্যামিকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে।

ওদিকে টরোন্টোয় পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে গ্রিশানকে। গ্রিশান ওরফে গেলির্ড ওরফে গ্রেঞ্জার নামক দাগী তস্করকে কানাডিয়ান মার্ডন্টিস পুলিশ কানাডা দেওারেশন এবং মার্কিন এফ. বি. আই ওকে পাকড়াও করবার জন্যে হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। এফ. বি. আই খবর পাঠালো স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে। যেদিন খবর পৌঁছল সেদিন অ্যামির সঙ্গে বিয়ের এনগেজমেন্ট ঘোষণা করলো গ্রিশান এক হোটেলে মহোৎসবের মাধ্যমে।

অ্যামি ইতিমধ্যে তার হবু বর ও প্রেমিকাকে তার মার্কিন চোখ-এর বিনিময়ে ভারতীয় নিরিখে প্রায় আটলাখ টাকার মতো পাউণ্ড দিয়ে বসে আছে। ভেবেছিল সেই চেকগুলো সময়মতো আমেরিকার ব্যাঙ্ক থেকে ভাঙিয়ে নেবে। ভয় কি কোটিপতি প্রেমিক তার।

নামকরা এক হোটেলে বিরাট ভোজসভা উৎসব। হোটেলে অতিথি অভ্যাগতরা সবাই হাজির। কিন্তু গ্রিশান আসছে না কেন? তার এত দেরী হচ্ছে কেন? অ্যামি মহা চিন্তায় পড়ল, অধৈর্য হয়ে পড়ল।

শেষে গ্রিশান যে হোটেলে বসবাস করত সেখানে অ্যামি ফোন করে শুনল মিঃ গ্রিশান দুঘণ্টা আগে সেই হোটেল ছেড়ে চলে গেছে তার লাগেজ পত্র নিয়ে।

অ্যাঁ...ভয়ে আতঙ্কে শঙ্কায় অ্যামির সর্বশরীর কাঁপতে লাগল।

কেবল গ্রাম গেল আমেরিকার ব্যাঙ্কে। সেখান থেকে সংবাদ এল মিঃ গ্রেঞ্জারের নামে সে ব্যাঙ্কে কোনো অ্যাকাউন্টই নেই।

গ্রিশান সে সময় জাহাজে করে মার্সাই বন্দরের দিকে এগিয়ে চলেছে।

আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনী ইন্টারপোল-এ খবর গেল। তারা দেশ বিদেশে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল অসাধারণ এই প্রবঞ্চককে। দুনিয়া জোড়া যাদের গোয়েন্দা বাহিনী সেই ইন্টার-পোল হতাশভাবে যখন খুঁজে বেড়াচ্ছে, সে সময় বহাল তবিয়তে গ্রিশান চলে গিয়েছে ট্যাঞ্জিয়রে।

সেখানে গিয়ে ভাব জমিয়ে ফেলল সেখানকার প্রখ্যাত এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সুন্দরী কন্যার সঙ্গে। যেমন রূপ তেমন যৌবন। স্মারেও লোকটা। প্রেম প্রণয়ের বাণে বিদ্ধ করে প্রেমিকাকে সঙ্গে নিয়ে গেল তার বাবার ব্যাঙ্কে।

কানাডার জাল পাশপোর্ট ও কাগজপত্র দেখিয়ে প্রেমিকার বাবা ম্যানেজার মশাইকে পাঁচ হাজার পাউণ্ডের এক চেক ভাঙিয়ে দিতে অনুরোধ করল।

এ যে অনেক টাকা! ম্যানেজার ভদ্রলোক ইতস্তত করল। বলল, কিছু মনে করবেন না। আমার কোম্পানির নিয়ম অনুসারে কানাডার ব্যাঙ্কে একটা তার করে জেনে নিতে হবে আগে।

—বাবা! প্রেমে ডুবুডুবু মেয়ে মিনতিভরা কণ্ঠে বাধা দিল, এ তুমি কি বলছ বাবা! মিঃ গ্রিশান একজন মালটিমিলিয়নিয়োর বিশিষ্ট ভদ্রলোক, তাকে কিনা...বেশ আমি ওর জামিন রইলাম। এবার দেবে তো? জানো এ টাকা না পেলে আমাদের বিরাট একটা প্রোগ্রাম মাটি হয়ে যাবে, আজ-রাত্রের জাহাজে আমরা দুজন স্পেনে বেড়াতে যাব ঠিক করেছি যে।

—কয়েকশ' পাউণ্ড আমি ধার দিতে পারি মিঃ গ্রেঞ্জার, পাঁচ হাজার পাউণ্ড একটা বিরাট অঙ্ক। ম্যানেজার শেষ চেষ্টা করে।

—এক্সকিউস মি ধার আমি নিইনা, পাইপ মুখে সু-গম্ভীর কণ্ঠে গ্রিশান বলে ওঠে, জীবনে এক কানাকড়িও আমি ধার করিনি, করবার প্রয়োজনও হয়নি। শুনুন মিস্টার, তিন তিনটে তেলের খনির ও একটা রেল বোর্ডের মালিক হয়ে টাকা ধার করার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়। অল রাইট, আপনি অনায়াসে কানাডার ব্যাঙ্কে কেবল গ্রাম করে দেখতে পারেন।

—বাবা, মেয়ে ফের মিনতি করে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে, তুমি যখন কেবল গ্রামের উত্তর পাবে ততক্ষণ কি আমাদের জাহাজ বসে থাকবে।

মেয়ের আবদার, অনন্যোপায় ম্যানেজার বিরাট অঙ্কের সেই চেক ক্যাশ করে দিল।

সে রাত্রে স্পেনগামী জাহাজ যখন ছাড়ল রূপসী সেই মেয়েটি তখন আর গ্রিশানের দেখা পেল না। গ্রিশান তৎপূর্বে বিকেলের এক জাহাজে ক্যাসাব্লাঙ্কার পথে পাড়ি জমিয়েছে।

সকালে কানাডার ব্যাঙ্কে থেকে যথারীতি জবাব এলো উক্ত নামে সে ব্যাঙ্কে কোনো অ্যাকাউন্টই নেই।

ম্যানেজার বাবা ও প্রেমিকা মেয়ে উভয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

এই রকম অ্যাডভেঞ্চারে ভরা গ্রিশানের জীবন। এক দেশ থেকে অন্যদেশ। নানান লোক

নানান চরিত্র। এক জায়গায় বেশিদিন থাকবার উপায় নেই। চলমান জীবন, গ্রিশানকে এগিয়ে যেতেই হবে।

ক্যাসাব্লাঙ্কার পথে জাহাজে সে এক ব্রিটিশ অয়েল ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলল। তার কাছ থেকে কায়দা করে জেনে নিল তৈল খনির তথ্যাদি। এক সময় চুরি করে হাতড়ালো সেই ইঞ্জিনিয়ারের বই কাগজপত্র, নকশা প্রভৃতি। ভবিষ্যতে যাতে সে নিজেকে অয়েল ইঞ্জিনিয়াররূপে জাহির করতে সক্ষম হয়।

হলোও তাই। মরক্কোতে অয়েল ইঞ্জিনিয়ার রূপে পরিচয় দিয়ে চালালো চরম স্ফূর্তির বহর। নাইটক্লাব, গণিকা, ধনী দুহিতা, নিরবচ্ছিন্ন মদ্যপান—চলল অহোরাত্র। শিকাগো ব্যাঙ্কের নামে চেক ভাঙিয়ে বহু নারী সংসর্গ ও মদের ফোয়ারা ছোটাল গ্রিশান। হোটেলের বহু বিল বাকি রাখল।

একদিন যথা স্বভাব অলক্ষিতে পর্তুগালগামী জাহাজে আবার চেপে বসল সে, এক জায়গায় থামলে চলবে না। পর্যটক সে। নতুন নতুন স্থানেই তো নতুন নতুন মজা। তাছাড়া একস্থানে স্থানুর মতো থাকলে ধরা পড়ে যাবারও ভয় রয়েছে।

গ্রিশান সব সময় চলত নবাব বাদশাহী চালে। তার কাছে ভুত-ভবিষ্যৎ নেই, শুধু বর্তমান এবং বর্তমানই ধ্রুব সত্য। ভবিষ্যতের ভাবনা সে আদৌ করে না। লক্ষ লক্ষ টাকা সে উড়িয়েছে এবং ওড়াচ্ছে। সঞ্চয় করেনি কখনো। টাকা হাতের ময়লা, টাকা অসত্য, স্ফূর্তিই সত্য।

মার্সাই বন্দরে যখন সে জাহাজ থেকে অবতরণ করল তখন তার পকেটে মাত্র তেইশটি মুদ্রা।

এবার সে নাম বদলাল। গ্রিশান নামটা বড় বেশি চাউর হয়ে পড়েছে ইউরোপ ও আমেরিকায়। এ নামে আর ভাড়ামি করা উচিত হবে না।

তীরে নেমে সে তার চুলগুলো হাত দিয়ে এলোমেলো করে দিল, জামা প্যান্টে ধূলিকাদা মাখাল। নিজের নখের আঁচড়ে নিজ মুখ রক্তাক্ত দাগে ভরিয়ে ফেলল।

পোর্ট-পুলিশকে এক বানানো গল্প বলে তাক লাগিয়ে দিল। গল্পটি হ'ল ঃ সে একজন আমেরিকান টুরিস্ট। নাম তার মশিয়ে গ্রেঞ্জার। দুজন ফরাসি নষ্ট চরিত্র ছুঁড়ির পাল্লায় পড়ে মদ্যপানে লিপ্ত হয়। ছুঁড়ি দুটো তার মদে হয়ত কিছু মিশিয়ে থাকবে। ফলে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তখন ছুঁড়ি দুটো তাকে মারধর করে তার পয়সাকড়ি এমনকি পাসপোর্ট বইটাও কেড়ে নিয়ে চম্পট দেয়।

—আমায় মার্কিন কন্সালের কাছে নিয়ে চলুন।

কন্সাল ভদ্রলোক অতীব দয়ালু প্রকৃতির মানুষ। বিশ্বাস করল ওর এই বানানো রোমাঞ্চকর কাহিনী। সে ওকে নতুন পাসপোর্ট দিল ও দিল প্রচুর অর্থাদি। শত হলেও নিজ দেশের লোক, জাতভাই বলে কথা।

অর্থাদি হয়ত না হলেও চলত, তবে পাসপোর্ট না থাকলে যে পদে পদে ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল। যাক সে ভাবনা চুকে গেল। দেশে ফিরে যাবে বলে যথপোযুক্ত অর্থাদি দিয়েছে মার্কিন কন্সাল। সে টাকায় জাওয়ার গাড়ি কিনে গ্রিশান চলল ক্যানেতে।

সেই ক্যানেতে গিয়ে রাজা ফারুখরূপে এক হোটেলে থেকে তাদের সমূলে সর্বনাশ করার কাহিনী পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

ক্যানের টাকা ক্যানেতেই ফুঁকে দিয়ে এসেছিল গ্রিশান।

ক্যানের পর তিনমাস সে লিসবন, সুইজারল্যান্ড, বার্ন প্রভৃতি স্থানে একের পর এক প্রতারণা করে গেল। তৎপর গেল ইতালি দেশে। এখানে সে কত যুবতী কত হোটেল মালিক ও কত ব্যাঙ্ককে যে কাঁদিয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই।

এরপব প্যারিস। প্যারিসে যখন এলো তখনও পকেট তাব ফাঁকা। রোজ ভেলমেট নাম্নী বাইশ তেইশ বছর বয়সেব এক ধনী বিধবা যুবতীকে গ্রিশান তাব আজব চাতুর্যে প্রেমে ফাঁসাল। মেয়েটি সেরা সুন্দবী এবং খুবই অভিজাত বংশের। কতশত লোভাতুব পুরুষ চেষ্টা করেও এই যুবতীকে হাত করতে পারেনি। পরে অবশ্য এক পরম ধনী বৃদ্ধের গলায় মালা দিয়েছিল।

বৃদ্ধটি অচিরে মারা যেতে রোজ স্বামীর অঢেল সম্পত্তির মালিক হয়ে গেল।

সেই অতুল বৈভব লুটে নিল তস্কর গ্রিশান। রোজ ভেলমেটকে দিয়ে সে লাখ লাখ টাকার চেক ভাঙিয়েছে।

একদা গ্রিশান প্যারিসস্থ আমেরিকান এক্সপ্রেস অফিসে গেল চেক ভাঙাতে।

কাউন্টারের মেয়েটির হাতে দিল পঁচিশ হাজার টাকার একটা চেক। এটিও শিকাগো ব্যাঙ্কের উপর কাটা চেক। মেয়েটি চেক নিয়ে চলে গেল ভেতবে ম্যানেজারের দস্তখত করাতে। ব্যাপার দেখে সন্দিগ্ধমনা গ্রিশান সহসা ভয় পেয়ে ভাবল মেয়েটা বোধকরি পুলিশে সংবাদ দিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে হাওয়া হয়ে গেল।

ইন্টারপোলের হেড কোয়ার্টার প্যারিসে তখনও গ্রিশানের কোনো ফটোগ্রাফ পৌঁছয়নি। আশ্চর্য। তবু ওরা গ্রিশানের তদন্তে মেতে উঠল অপরাপর স্থান থেকে আসা খবরাখবর পেয়ে। এবার ইন্টারপোল-এর গোয়েন্দারা সারা প্যারিসের যাবতীয় নাইট ক্লাবে ছড়িয়ে পডল।

চোরের দশ দিন, গেরস্তের একদিন। রাত্রে এক সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে বিছানায় কণ্ঠ লগ্ন অবস্থায় গ্রেপ্তার হ'ল অবশেষে গ্রিশান।

বিচার হ'ল। নয় লক্ষ ডলার জরিমানা ও দশমাস কারাদণ্ড। এখানেই শেষ নয়। ওকে প্যারিসের দণ্ডভোগ শেষে যেতে হবে মাদ্রিদ, সেখান থেকে লিসবন, লন্ডন, সুইজারল্যান্ড, মরক্কো, কানাডা, অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র. সব জায়গায়ই ওর বিচার ও দণ্ডভোগ অপেক্ষা করে আছে।

# মৃত্যুদূত

## চিরঞ্জীব সেন

১৯৬৫ সালের গোড়ায়। বিল মারফিও নামে একটা বদমাশ জুয়াড়ি মাফিয়া কর্তাদের আদেশ অমান্য করে রোড আইল্যান্ড স্টেটের প্রভিডেন্স শহরে একটা বাড়ির তিন তলায় একটা অ্যাপার্টমেন্টে নিজস্ব গ্যাম্বলিং ডেন বা জুয়াখানা খুলল।

জুয়াখানা খোলবার পরও মাফিয়ারা তাকে কয়েকবার সাবধান করেছে, কিন্তু মারফিওর গায়ে ভীষণ জোর, কাউকে গ্রাহ্য করে না, অনেক অপরাধ করেছে অতএব মাফিয়াদের আদেশ সে অগ্রাহ্য করেই চলল।

মাফিয়ারা বলল, দেখে নেব।

মারফিও বলল, অমন অনেক শালা বলে, দেখা যাবে কে দেখে নেয়।

এরপর যখন দেড় বছর পার হয়ে গেল, তখন মারফিও ভাবল, ব্যাটারা নিজেরাই ভয় পেয়েছে, নিজেদের গর্তে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু মারফিও ভুল বুঝেছিল।

১৯৬৬ সালের ১৩ জুলাই, বেলা পৌনে বারোটা। মারফিও তার জুয়াখানার অপর পারে রাস্তায় কর্নার কিচেনে দু-তিনজন বন্ধু নিয়ে লাঞ্চ করছিল। এমন সময় তার টেবিলের ওপর কার যেন ছায়া পড়ল। মারফিও মুখ তুলে দেখল, তার সামনে দাঁড়িয়ে ভীষণ দর্শন বিরাট চেহারার একটা গুণ্ডা, হাতে রিভলবার।

মারফিও ভয় পেয়ে গেল। আজকের তারিখটা ভীষণ অপয়া, নইলে আজই সে তার রিভলবার আনতে ভুলে গেল। বন্ধুদের কারও কাছে একটা ছোরাও নেই।

লোকটার চেহারাও যেমন বিরাট, গলার আওয়াজটাও তেমনি গম্ভীর। রেস্তোরাঁতে তখন বেশি লোক ছিল না। লোকটা তার রিভলবার ঘুরিয়ে প্রত্যেককে বলল, মরতে যদি না শখ হয়ে থাকে তাহলে মাথায় হাত তুলে মুখ নিচু করে মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো। রাইট নাও। দেরি কর না, এই তুমি, তুমি।

মারফিওর একজন সঙ্গী ইতস্তত করছিল কিন্তু লোকটা তার ভারি বুট দিয়ে তাকে এমন জোরে একটা লাথি মারল যে সে হুমড়ি খেয়ে মেঝেতে পড়ে গেল। সে আর উঠল না।

তারপর মারফিওকে বলল, চল ওই টেলিফোন বুথটার ভেতর তোমার সঙ্গে কথা আছে। বলে বিপজ্জনকভাবে রিভলবার নাড়তে লাগল। এখানেও ওই একই ব্যাপার। মানুষ মরবে জেনেও বাধা দেবার চেষ্টা করে না, ভাবে আততায়ী যদি দয়া করে তাকে ছেড়ে দেয়।

মাফিয়ারা ছাড়বার পাত্র নয়। মারফিওর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে উঠে সুড়সুড় করে বুথের মধ্যে ঢুকল।

লোকটা বাইরে থেকে দরজা বন্ধ কবে দিল, তারপর বাইরে থেকে কাঁচের ভেতর দিয়ে মারফিওর মাথায় আর বুকে চারবার গুলি চালাল। তারপর ছুটেও পালাল না, ধীরে সুস্থে বাবুয়ানি চালে রাস্তায় বেরিয়ে ভিড়ে মিশে গেল। রাস্তার লোকে তখনও টের পায়নি, দিন দুপুরে একটা খুন হয়ে গেল।

রেস্তোরাঁয় যারা ছিল তারা বুঝল এটা মাফিয়াদের কাজ। লোকটা বেরিয়ে যাবার পর কারও সাহস হ'ল না যে চেঁচিয়ে অন্তত লোক জড করে, খুনীকে তাড়া করা তো দূরের কথা।

মারফিওর মৃত্যুর একমাস পূর্বে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। রককো ডিসেগলিও ছাব্বিশ বৎসর বয়স্ক সুদর্শন যুবক। একদা বক্সিং লড়ত, গায়ে জোর আছে, বেপরোয়া, কাউকে কেয়ার করে না। তার জ্বালায় পাড়ার কোনো বিবাহিতা বা অবিবাহিতা যুবতী রাস্তায় বেরোতে সাহস করে না।

রককোর কয়েকজন ইয়ারবক্সি ছিল। আসলে তাদের কাজ পাড়ায় পাড়ায় গুণ্ডামি করে বেড়ানো। বোস্টন শহরে এক জায়গায় কয়েকজন মাফিয়া জুয়ো খেলছিল। রককো তার গুণ্ডা স্যাঙাতদের লেলিয়ে দিল, যা ওদের মালকড়িগুলো ছিনিয়ে নিয়ে আয়।

ওস্তাদের অর্ডার। তারা তখনি গিয়ে রিভলবার দেখিয়ে জুয়োর আড্ডা থেকে মালকড়ি যা পেল তাই নিয়ে পালিয়ে এলো। রোজগার মন্দ হয়নি, সাড়ে তিন হাজার ডলার।

কিন্তু পালাতে হ'ল না। ঠিক তিনদিন পরে ম্যাসাচুসেটসের টপসফিল্ড শহরে নতুন বারগাণ্ডি রঙের একটা থাণ্ডারবার্ড গাড়িতে দেখা গেল রককোর লাশ পড়ে রয়েছে। তাকে ভীষণভাবে মার দেওয়া হয়েছে, পরে গুলি করে খুন করা হয়েছে।

যারা নৃশংস, যারা দুশ্চরিত্র ও নেশাখোর তাদের কোনো নীতি নেই, জোব যার মুল্লুক তার বাক্যে যারা বিশ্বাসী, তাদের সঙ্গে পেরে উঠাই মুশকিল।

কোনো সামাজিক কারণে সিসিলি দ্বীপে এই দলের উৎপত্তি। সেখান থেকে তারা ছড়িয়ে পড়েছে আমেরিকায়। এরা সকলে একদা সিসিলি বা ইতালির অধিবাসী, কিন্তু বর্তমানে এরা আমেরিকার নাগরিক। আমেরিকার কতকগুলি বিশেষ অঞ্চলে, যেমন নিউইংলন্ড, নিউজার্সি রোড, আইল্যান্ড রাজ্যে এদের প্রচুর প্রভাব। কোসা নসট্রা, ফ্যামিলি মব, সিন্ডিকেট মাফিযোসি প্রভৃতি নামে এরা পরিচিত। মাদক দ্রব্য স্মাগলিং, টাকা ধার দেওয়া, নারী ইত্যাদি নিয়ে এরা ফলাও ব্যবসা করে। এদের মধ্যে ক্রোড়পতিও আছে কয়েকজন। এরা নিজেরা তো গুণ্ডামি করেই, তাছাড়া এরা মাইনে দিয়ে ডাকাত পোষে, ঘাতক পোষে।

মাফিয়া দল আজকের নয়। আমাদের দেশের ছেলেরা যেমন বর্গির নাম শুনলে আজও কেঁপে ওঠে, ঠগীর নাম শুনলে ছেলের বাবা আজও ভয় পায়, চম্বলের ডাকাতদের নাম শুনলে আগ্রা, ভিন্দ, মোরেনা ইত্যাদি অঞ্চলের লোকেরা ভয় পায়, তেমনি মাফিয়াদের নাম শুনলে পৃথিবীর এক বিস্তৃত অঞ্চলের নর-নারী আতঙ্কিত হয়।

মাফিয়ারা নিজেরা কিন্তু নিজেদের এই নামটিই ব্যবহার করে না এবং এই দলের জাল কত দূর বিস্তৃত, কি পরিমাণ বিভীষিকাব বাজত্ব সৃষ্টি করেছে এই দল, এরা কতদূর নৃশংস এবং ওদের দলের গঠন সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছুই জানা ছিল না, আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অফ

ইনভেস্টিগেশন অর্থাৎ এফ. বি. আই-এর মাত্র ১৯৬৪ সালের পর থেকে বিস্তারিত কিছু জানা যাচ্ছে।

এর কারণ হ'ল প্রতি মাফিয়াকে ওমারত অর্থাৎ মাফিয়া শপথ নিতে হয়। এই শপথের গুরুত্ব সাংঘাতিক। মুখ বুজে থাকব, একটিও কথা বলব না, নইলে মৃত্যু। দলের কোনো কথা অন্য কোনো ব্যক্তিকে ঘুণাক্ষরে প্রকাশ করলেই তাকে দলের আর কেউ হত্যা করবে। কিছু প্রকাশ করা দূরে থাকুক, যদি জানা যায় যে, কেউ কিছু প্রকাশ করতে উদ্যত হয়েছে, তাকে তখনই মরতে হয়েছে। মাফিয়ারা এই গোপনীয়তা কঠোরভাবে রক্ষা করে বলেই তাদের বিষয় কিছু জানা যায়নি।

জানা গেল যোসেফ ভ্যালাচি ধরা পড়বার পর। ভ্যালাচির নামে একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এফ. বি. আই আবছাভাবে জানতো মাফিয়া দলের অন্য একটা নাম আছে, সেটাই হ'ল আসল নাম। মাথা ধরার ওষুধ অ্যাসপিরিন নামে পরিচিত; কিন্তু এর আসল নাম হ'ল অ্যাসেটিল স্যালিস্যালিক অ্যাসিড, তেমনি প্রচলিত নাম হ'ল মাফিয়া, কিন্তু আসল নাম হল কোসা নসট্রা, যার অর্থ হল আমাদের ব্যাপার আমাদের জিনিস। ইতালিয়ান ছাড়া কেউ ওই দলভুক্ত হতে পারে না, অবিশ্যি ইতালিয়ান নয় এমন অনেকে এই দলের হয়ে কাজ করে।

কোসা নসট্রা বিভিন্ন ফ্যামিলি ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ফ্যামিলি নিজ নিজ এলাকায় সর্বময় কর্তা। আমেরিকার বিভিন্ন শহর যথা বোস্টন, বাফেলো, চিকাগো, ক্লিভল্যান্ড, ডেট্রয়েট, ফ্যানসাস সিটি, লস এঞ্জেলস, নিউআর্ক, নিউ অরলিনস, নিউইয়র্ক সিটি, ফিলাডেলফিয়া, পিটসবার্গ এবং স্যান ফ্রানসিসকোতে ফ্যামিলিগুলি ছড়িয়ে আছে। এছাড়া মিয়ামি এবং লাস ভেগাসে-এ যে কোনো ফ্যামিলি কাজ করতে পারে। এই দুটি হ'ল লুজ বা ওপন শহর।

মূল কোসা নসট্রা উচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হলেও প্রতি ফ্যামিলি কিন্তু স্বতন্ত্র। ফ্যামিলির প্রধান কর্তা হ'ল কেপো বা বস তারপরে যার স্থান, সে হ'ল সাবকেপো বা আমার বস। এরপর হ'ল কয়েকজন লেফটেনান্ট অর্থাৎ কেপোরেজিমে। প্রতি কেপোরেজিমের অধীনে থাকে এক একটি রেজিম বা ক্রু। কয়েকজন কর্মী নিয়ে এক একটি রেজিম গঠিত হয়।

মোট সভ্যের এক তৃতীয়াংশ নিউইয়র্কে বাস করে এবং এখানে আছে পাঁচটি ফ্যামিলি। এদের সকলেরই ব্যবসা আছে, অফিস আছে। কেউ হ'ল পোশাক প্রস্তুতকারক, কেউ জমিবাড়ি কেনাবেচা করে, কেউ তৈরি করে আইসক্রিম, কারও আছে রেস্তোরাঁ। ওসবই হ'ল আবরণ, আড়ালে চলে হত্যা, গুণ্ডামি, রাহাজানি, ডাকাতি, নারীধর্ষণ, নারী বেচাকেনা, অত্যন্ত চড়া সুদে অর্থ লগ্নি, নারীঘটিত ও এল. এস. ডি ইত্যাদির ব্যবসা।

আমেরিকায় মাফিয়াদের সর্বময় কর্তা বা বিভা বগ বলে এখন কেউ নেই, যদিও নিউইয়র্কের অন্যতম ফ্যামিলির কর্তা ভিটো জেনোভিজ এই পদটি দাবি করত। তবুও বেসরকারিভাবে মাফিয়াদের একজন সম্রাট ছিল। তার নাম লাকি লুকিয়ানো। তাকে আমেরিকা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। লুকিয়ানো দক্ষিণ ফ্রান্সে বসবাস করত এবং সেখান থেকে জিরায়নের স্মাগলিং ব্যবসা করত।

লাকি লুকিয়ানো বা অন্য কোন মাফিয়া নায়ককে দেখে অপরাধী মনে হবে না, মনে হবে বুঝি কোনো ডিপ্লোম্যাট কিংবা কোনো কারখানার মালিক। বড় জোর কোনো বড় কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান।

কিছুদিন থেকে আমেরিকায় যৌথভাবে যেসব অপরাধ ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হচ্ছে তার সূত্রপাত মাফিয়া দল তথা ইতালিয়ানরা আরম্ভ করেনি। ইতালিয়ানরা দলে দলে আমেরিকায় আসতে আরম্ভ করে উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং এসে দেখে যে আইরিশ ও ইহুদিয়া দলবদ্ধভাবে খুন, জখম, ডাকাতি, নারীধর্ষণ, ব্যাভিচার, ছিনতাই, জুয়াচুরি ইত্যাদি সর্বরকম অপরাধে লিপ্ত। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুর্ধর্ষ ছিল জেমস বয়েচা নামে দল। আমেরিকা যেন এদের রাজত্ব। তারা কারও তোয়াক্কা করত না।

এই ইতিহাস তো সকলের জানা আছে যে, গোড়ার দিকে উপনিবেশ স্থাপনের জন্য ইয়োরোপের জেল খালি করে কয়েদীদের আমেরিকায় পাঠানো হ'ত। এর সঙ্গে স্বার্থসিদ্ধির প্রশ্নও জড়িত ছিল। গুণ্ডা কয়েদীদের কাছ থেকে আর কি আশা করা যেতে পারে?

প্রথমদিকে ইতালির নেপলস, ক্যালাব্রিয়া অঞ্চল আর সিসিলি থেকে দলে দলে নরনারীরা আসতে থাকে। এরা সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী ছিল। নিজ নিজ সম্প্রদায়ের প্রতি এরা অনুরক্ত ছিল। দল গঠনেও এরা দক্ষ ছিল, কিন্তু এদের প্রধান ত্রুটি হ'ল, আইনের প্রতি অবজ্ঞা। এই দুটি বিশেষ চরিত্রানুগ গুণের জন্যে এরা আজ আমেরিকায় অপরাধ জগতে প্রাধান্য লাভ করেছে।

এই সব আগন্তুক ইতালিয়ানদের মধ্যে যারা বদ লোক ছিল, তাদের দলবদ্ধভাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ গত শতাব্দীর শেষ দশকে নিউ অরলিনসের বন্দরে। বন্দরে যে সব মাল জাহাজে বোঝাই হতে যেত বা জাহাজ থেকে খালাস হয়ে আসত তাদের কাছ থেকে এরা নিয়ম করে চাঁদা আদায় করত। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলেই বিপদ।

এই দল অনেক দূর এগিয়ে ছিল। নিউ অরলিনসের পুলিশ প্রধান এদের গুণ্ডামি বন্ধ করতে উঠে পড়ে লাগলেন। কিন্তু তিনি খুন হলেন। অপরাধীরা অবিশ্যি নিষ্কৃতি পেল না। পুলিশ কঠোর হস্তে এদের দমন করবার জন্য উঠে পড়ে লাগল। উনিশজনকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। অপরাধীরা রীতিমত দলবদ্ধ। তাদের হাতে অনেক পয়সা। তারা বড় বড় আইনজীবি নিয়োগ করল। ঘুষ দিয়ে জুরিদের ওপর প্রভাব বিস্তার রকরল। শেষ পর্যন্ত তারা ষোলোজনকে খালাস করতে পেরেছিল। কিন্তু জনগণের ক্রোধ থেকে তারা অব্যাহতি পেল না।

কিন্তু জনগণ ওই ষোলোজন আসামীর ভিতর থেকে এগারোজনকে ছিনিয়ে নিয়ে গাছের ডালে ঝুলিয়ে কিংবা পিটিয়ে মেরে ফেলল। ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছিল যে, ওয়াশিংটন ও রোমের মধ্যে কূটনীতিক সম্পর্ক ছিন্ন হবার উপক্রম হয়েছিল।

তবুও এই হ'ল সূত্রপাত। জনগণ জানতে পারে আরও একদল শক্তিশালী অপরাধীব আবির্ভাব হয়েছে।

নিউ অরলিনসের দলটির কাজকর্ম তো স্থানীয় বন্দরেই আবদ্ধ ছিল, কিন্তু এরই পায়ে পায়ে আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইতলিয়ানদের আর একটি দলের ক্রিয়াকলাপ ছড়িয়ে পড়ছিল। এই দল ব্ল্যাক হ্যান্ড নামে পরিচিত ছিল। গোড়ার দিকে এদের কাজকর্ম নিজেব দেশবাসীদেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ব্ল্যাক হ্যান্ড চক্রের কাজ ছিল ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা। মোটা টাকা দাবি করে এরা চিঠি পাঠাত; সেই চিঠির নিচে একটা কালো হাত আঁকা থাকত। নির্দিষ্ট স্থানে ও সময়ে টাকা না দিতে পারলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করা হ'ত। তাকে না পেলে তার স্ত্রী কিংবা কন্যাকেও

ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের উপর অত্যাচার করা হ'ত, কিংবা ছেলেমেয়েদের হাত-পা ভেঙে দেওয়া হ'ত।

সিসিলিতে মাফিয়াদের বা নেপলসে ক্যামোরাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী তাদের জানা ছিল অতএব চিঠি পেলেই প্রাপক যেভাবে হোক টাকা মিটিয়ে দিত। কিন্তু সকলে টাকা মেটাতে পারত না বা মেটাতে পারলে অন্যভাবে বিপদগ্রস্ত হ'ত এবং মেটাতে না পারলে তো কথাই ছিল না।

১৯০৯ সাল নাগাদ এই অত্যাচার নিউ ইয়র্ক সিটিতে এত ব্যাপক হয় যে ব্ল্যাক হ্যান্ডদের দমন করবার জন্যে একটি পুলিশ স্কোয়াড গঠন করা হয়। স্কোয়াডের ভার দেওয়া হয় একজন ইতালিয়ানকে। তার নাম লেফটেনান্ট যোসেফ পেট্রোসিলো। বিদেশে ইতালিয়ানদের বদনাম তিনি সহ্য করতে রাজি নন। তিনি ব্ল্যাক হ্যান্ডদের দমন করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। হায়! নিউ অরলিনসের পুলিশ প্রধানের মতো বেচারিকে একদিন মরতে হ'ল।

অপরাধীদের বিষয় তথ্য আদান প্রদানের জন্য তিনি সিসিলি গিয়েছিলেন এবং সেখানেই তাঁকে পিছন থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ হ'ল ১৯০৯ সালের ঘটনা।

আগে যে ভ্যালাচির নাম উল্লেখ করেছি, তার বয়স তখন পাঁচ বছর। মাফিয়া তথা কোসা নসট্রা-এর বিষয় মার্কিন এফ. বি. আই বা অন্যান্য সংস্থা আজ যে এত বিস্তারিতভাবে জানতে পেরেছে তা এই ভ্যালাচির জন্যেই, তাই তার নাম আবার উল্লেখ করা হ'ল।

ভ্যালাচি আমেরিকাতেই জন্মেছিল। ম্যানহাটনের হারলেমে ওর বাবা-মা ইতালির নেপলস অঞ্চল থেকে আমেরিকায় এসেছিল। ওর বাবা ঠেলাগাড়ি টেনে শাক-সবজি ফেরি করিত, পরে শ্রমিকের কাজও করেছিল। অনেক ছেলেমেয়ে ; অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না, তার ওপর লোকটি ভীষণ মাতাল।

১৯৩০ সালে আমেরিকায় ইতালিয়ান বদমায়েস ও গুণ্ডাদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ভীষণ মারামারি হয়েছিল। সরকারি নথি-পত্তরে এই মারামারি ক্যাস্টেলামার্স ওয়ার নামে উল্লিখিত আছে। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর পরে ভ্যালাচি না বলা পর্যন্ত ওই মারামারির মূল এবং বিবরণ মার্কিন পুলিশের অজ্ঞাত ছিল। ইতালিয়ানদের মধ্যে একটা মারামারি হচ্ছে, খুনজখম হচ্ছে, তারা এ পর্যন্ত জানত, কিন্তু কেন মারামারি হচ্ছে তা তারা জানত না। এদের ভেতর মারামারি আজ চলছে যদিও চেহারা এবং পদ্ধতি পাল্টেছে।

পরে যা মাফিয়া বা কোসা নসট্রা দল নামে পরিচিত হ'ল তাদের দলবদ্ধভাবে গুণ্ডামির রাজত্ব ১৯২০ সালের আগে ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয়নি। এই কুড়ির দশকে সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। এই সময়টা মার্কিন ইতিহাসে প্রজিবিশন এজ নামে পরিচিত। কিন্তু অ্যালকোহল তথা মদের নেশাও আকর্ষণ যে কত তীব্র, তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। এই মদের জন্য কত সংসার ছারখার হয়ে গেছে, কত মানুষ পশু হয়ে গেছে।

সরকার তো মদ খাওয়া নিষিদ্ধ করে দিলেন, কিন্তু মদ তো খেতে হবে। ছোটখাট বহু ভাটিখানা গোপনে গজিয়ে উঠল। ওই গোপন ব্যবসা তখন প্রধানত চালাত আইরিশ, জু ও পোল্যান্ডের পোলরা। ভাটিখানার সঙ্গে গণিকালয় ও জুয়ার ব্যবসাও ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

দেশি ও বিদেশি মদ গোপনে সরবরাহ করা যা বুটলেগিং নামে পরিচিত, এই ব্যবসাটাই

ইতালিয়ানরা ভাল বুঝত। ছোট ছোট নোংরা ইতালিয়ান পল্লীতে মদ চোলাই আরম্ভ হয়ে গেল, অনেক ভাটিখানা সৃষ্টি হ'ল। গুণ্ডা দল বলাটা ঠিক হ'ল না, দস্যু দল বলাই ঠিক।

এই দশকের শেষে কয়েকজন ডাকাতের ভয়ে মার্কিনবাসীরা জান-মান বাঁচাতে বিব্রত হয়ে পড়ল। এরা সবাই মূলে ইতালিয়ান। এদের মধ্যে প্রধান হ'ল অ্যালফনস ক্যাপোন বা স্কারফেস অ্যাল, জিউসেপ্পি ম্যাসেরিয়া বা জো-দি বস চার্লি লুকিয়ানো বা লাকি লুকিয়ানো, ভিটো জেনেভিজ বা ডন ভিটো, উইলিয়াম মরেত্তি বা উইলিমুর, জোসেফ ডোটা বা জো অ্যাডোনিস এবং ফ্রানসিসকো ক্যাস্টি গলিয়া বা ফ্রাংক কাস্টলো এবং আরও কেউ।

ওদের মধ্যে অ্যালক্যাপোনের নাম আমাদের কাছে সর্বাধিক পরিচিত হলেও সর্বপেক্ষা ধূর্ত ও দুর্ধর্ষ ছিল চার্লি বা লাকি লুকিয়ানো। লাকি লুকিয়ানোর কাহিনী আমরা পরে বিস্তারিতভাবে বলব। সে কাহিনী যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনি চিত্তাকর্ষক।

এইসব দস্যুদের মধ্যে অথবা আরও ছোটখাট দস্যুদের মধ্যে দলাদলি চলত। খুন জখমও হ'ত। মার্কিন পুলিশ এগুলোকে গ্যাং ওয়ার অফ দি আন্ডার ওয়ার্ল্ড বলত।

ইতালিয়ান বুটলেগারজের অনেক দল ছিল। ইতালির যে গ্রাম বা অঞ্চল থেকে এরা এসেছিল, তাদের দল সেই গ্রামের বা অঞ্চলের নামে পরিচিত ছিল। এই সব নাম বাইরের লোকেরা জানত না। অনেক ছোট ছোট দল থাকলেও প্রধান দুটি দল ছিল সিসিরিয়ান এবং নিয়াপলিটান।

এই সিসিরিয়ানদের মধ্যে প্রধান দলটার নাম ছিল ক্যাস্টেলা মারিজ। সিসিলি দ্বীপের ক্যাস্টেলা মেয়ার ডেল গলফো শহর থেকে এরা আমেরিকায় এসেছিল। চিকাগো অঞ্চলেই এদের প্রাধান্য ছিল। এরা' নিউ ইয়র্কে বাস করত। এদের নেতা ছিল স্যালভাতোর ম্যারানজানো।

১৯৩০ সালে নেতৃত্বের লড়াই আরম্ভ হ'ল। জিউসেপ্পি ম্যাসেরিয়া বা জো দি বস চাইল ম্যারানজানোকে ঠকিয়ে সর্বাধিনায়ক হতে। ম্যারানজানো ছাড়া ওদেরও দলের আরও কয়েকজন কড়া সর্দার ছিল, তাদেরও হঠানো দরকার। এরা আবার পৃথক পৃথক শহরের নেতৃত্ব নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিল। এই সব নেতাদের মধ্যে প্রধান ছিল ভিটো জেনোভিজ লাকি লুকিয়ানো, ফ্রাংক কাস্টেলো ইত্যাদি।

দলের ভেতরও ছোট বা বড় নেতৃত্ব নিয়েও খুনোখুনি এদের বরাবর অব্যাহত ছিল, আছে ও থাকবে। কাকে যে কে কখন খুন করবে তা কেউ জানে না। খুন করার এক মিনিট আগেও কেউ বুঝতে পারত না যে তাঁর শিয়রে শমন এসে গেছে। যে কোনো মুহূর্তে যে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করত। কারণে অকারণে যে কেউ যাকে ইচ্ছে হত্যা করত। ভিটো জেনেভিজ এবং লাকি লুকিয়ানোর নেতা ছিল জো দি বস ম্যাসোরিয়া আর অপর দলের নেতা ছিল স্যালভাতোর ম্যারানজানো। এই দুই দলের অনেক খুন জখম হবার পর কোনো এক দলের থেকে শান্তির প্রস্তাব এলো।

ম্যারানজানো ভিটো আর লুকিয়ানোকে জানিয়ে দিল যে জো দি বস বেঁচে থাকতে সে শান্তির কোনো প্রস্তাব গ্রাহ্য করবে না। জো দি বস ছিল বেঁটেখাটো মোটাসোটা। ভিটো লুকিয়ানো এবং দলের আর কেউ কেউ তাকে বলত গ্রিজবল বা চর্বির ডেলা।

ভিটো আর লুকিয়ানো একদিন স্থির করল চর্বির ডেলাটা অপদার্থ কোনো কাজের নয়

ওটাকে সরিয়ে ফেলা যাক। অতএব লুকিয়ানো একদিন কোনি আইল্যান্ডের স্কারপাটো রেস্তোরাঁতে খাবার জন্যে জো দি বস কে আমন্ত্রণ করল। এই তার শেষ খাওয়া। ভিটো আর লুকিয়ানো যে তাকে যমের বাড়িতে নিয়ে এসেছে তাও বেচারি জানতে পারেনি, কারণ পিছন থেকে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।

আর কোনো বাধা রইল না। কোসা নসট্রার বৃহত্তর স্বার্থে দুই দল এক হ'ল। ম্যারানজানো নেতা। প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইতালি থেকে ম্যারানজানো আমেরিকায় এসেছিল। সে লেখাপড়া জানা লোক, মোটেই মূর্খ নয়। সাতটা ভাষা জানত এবং একদা পাদ্রী হবার পেশা বেছে নিয়েছিল, ধর্মপুস্তক নিয়ে রীতিমত আলোচনা ও পড়াশোনা করত।

ম্যারানজানো জুলিয়াস সিজারের দারুণ ভক্ত ছিল। সিজারের বিষয়ে তার বই-এর আলমারি ভর্তি। সিজারের সৈন্যদলের আদর্শে সে তার কোসা নসট্রাব দল গঠন করেছিল। তফাৎ ছিল এই যে সিজার লড়াই করত প্রকাশ্যে আর কোসা নসট্রা কাজ করত গোপনে।

ম্যারানজানো নেতা হয়ে একদিন একটা মিটিং ডাকল। নিউইয়র্কের একটা বড় পাড়ার নাম ব্রংকস। সেখানকার একটা রাস্তা ওয়াশিংটন অ্যাভিনিউ। এই অ্যাভিনিউ-এর কাছে একটা হলে মিটিং হচ্ছে। প্রায় চার পাঁচশ' সভ্য এসেছে। অনেকে পরস্পরকে চেনে না।

ডায়াসে যীশুর একটি ক্রুশবিদ্ধ ছবি টাঙানো হয়েছে, দেওয়ালেও সাধু সন্তদের বা বাইবেলের কিছু কিছু ছবি ঝুলছে। বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ, তবু কেউ যদি ঢুকে পড়ে তাহলে সে ভাববে ইতালিয়ানরা কোনো ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করছে।

হলের আকার অনুযায়ী ভিড় বেশিই হয়েছে। বসবার জায়গা নেই। অনেকেই দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু কেউ বিরক্ত নয়।

ম্যারানজানো ইতালিয়ান ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করল। প্রথমেই সে জো দি বসকে আক্রমণ করল। অনেক অহেতুক হত্যার অভিযোগে ম্যাসেরিয়াকে অভিযুক্ত করল ম্যারানজানো। এখন আর খুনোখুনি নয়। এখন সে কাপো ডি টুট্টি কাপি অর্থাৎ বস অফ অল বসেস, সকল কর্তার কর্তা। সে নতুন করে দল গঠন করেছে নতুন নিয়ম-কানুন তৈরি করেছে কিন্তু সর্বোপরি কোসা নসট্রার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। অতীতকে ভুলে কাজে নামতে হবে।

ম্যারানজানো এখন সর্বময় কর্তা। আমরা যাকে মার্কিন মুল্লুকের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত দস্যু বলে জানি সেই অ্যাল ক্যাপোনকেও ম্যারানজানোর আদেশ শুনতে হ'ত। ক্যাপোন এই মাফিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।

ম্যারানজানোর নেতৃত্বে মাস দুই বেশ শান্তিতে কাটল। কিন্তু ইতিমধ্যে তো অনেক খুন জখম হয়েছে। চম্বলের দস্যুদের মতো বদলা নেবার প্রবৃত্তি কারও কারও প্রবল হয়ে উঠল। স্বয়ং ম্যারানজানো মতলব আঁটল, সে জো দি বস-এর দলের বাঘা বাঘা গুণ্ডাগুলোকে সরিয়ে ফেলতে পারলে তাকে আর পায় কে। প্রথমেই ভিটো জেনোভিজ আর লাকি লুকিয়ানোকে খতম করা দরকার। তার পরে অ্যালকাপোন।

লুকিয়ানোও কম ধূর্ত নয়। ম্যারানজানোর মতলব না জেনেই লুকিয়ানো ম্যারানজানোকে খতম করার মতলব আঁটছে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে, এই দুই দলের সাময়িক শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হ'ল কিছু সময় নেওয়া যাতে নতুন নতুন ষড়যন্ত্র করে প্রতিদ্বন্দ্বীদের শেষ করা যায়।

ম্যারানজানোর পণ শত্রুর শেষ রাখব না। একটা মিটমাট হলেও লাকি লুকিয়ানো ও ভিটো জেনোভিজ তাদের আজন্ম শত্রু। তাছাড়া ওরাও যে ম্যারানজানোকে হত্যা করবার জন্যে মনে মনে মতলব আঁটছে না বা সুযোগ খুঁজছে না তাই বা কে জানে? অফেন্স ইজ দি বেস্ট ফরম অফ ডিফেন্স। প্রতিরক্ষার সেরা পথই আক্রমণ।

কাকে কাকে নিধন করতে হবে ম্যারানজানো তার একটা তালিকা তৈরি কবল। তালিকার মাথায় নাম রইল ভিটো জেনোভিজ, লাকি লুকিয়ানো, ফ্রানসিসকো, কাস্টলো, অ্যাল ক্যাপোন ইত্যাদির। এদের একে একে শেষ করতে হবে। এরা মরলেই ম্যারানজানো তখন হবে কোসা নসট্রার প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন নেতা, তখন ম্যারানজানোকে আর কেউ চ্যালেঞ্জ করতে সাহস করবে না।

কিন্তু ম্যারানজানো তো নিজের হাতে এদের খুন করতে পারে না, অতএব সে একজন গুণ্ডাকে ভাড়া করল। গুণ্ডাটার নাম ভিনসেন্ট ম্যাড ভগ কল। লোকটা যেমন দুঃসাহসী, তেমনি তার হাতের টিপ, একেবারে অব্যর্থ।

ম্যারানজানো খুব গোপনে তার ষড়যন্ত্রের জাল বুনছিল, এমনকি তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী বা ঘাতক ভ্যালাচিকেও কিছু বলেনি। তবুও বিরাট একটা ষড়যন্ত্র একা একা সম্পূর্ণ করা যায়নি, সর্বক্ষেত্রে সম্ভবও নয়। কাউকে কাউকে দলে টানতে হয় এবং এক টুকরি ডিমের মধ্যে দু একটা খারাপ ডিম থাকতে পারে। একজন না একজন বিশ্বাসঘাতক থাকবেই থাকবে।

ম্যারানজানোর দলের একজন চাঁই হ'ল, টমাস থ্রি ফিঙ্গার ব্রাউন লুচিজ সংক্ষেপে টমি ব্রাউন। কোসা নসট্রা দলের সভ্যদের অনেকেরই অমন ছদ্মনাম থাকে। যাই হোক, টমি ব্রাউনের আশঙ্কা হ'ল যে ম্যারানজানো তাদেরকে শিগগির হত্যা করবে. ভিটো, লুকিয়ানো ইত্যাদিকে পথ থেকে সরিয়ে দেবে তার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বাদ দেবে না। টমি স্থির করল এই লোককে আর বাড়তে দেওয়া যায় না।

টমি ব্রাউন আর দেরি করল না। ম্যারানজানোর এই গোপন প্ল্যান সে ভিটো জেনোভিজ আর লাকি লুকিয়ানোর কাছে ফাঁস করে দিল। শুধু ফাঁস করা নয়, ম্যারানজানোকে হত্যা করার তখনই একটা প্ল্যান তৈরি হয়ে গেল।

ম্যারানজানো নাকি ব্যবসাদার। পার্ক অ্যাভিনিউতে গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল বিল্ডিং-এ তার একটা অফিস ছিল, মাল আমদানি করা এবং বাড়ি জমি কেনাবেচার। টমি ব্রাউন এই অফিস ম্যারানজানোর সঙ্গে দেখা করে বলল যে ভিটো আর লুকিয়ানো তার সঙ্গে দেখা করতে চায়, কিছু বিষয় নিয়ে ওরা দুজনে আলোচনা করতে চায়। টমি ব্রাউন ম্যারানজানোকে আরও বলল যে. এই সুযোগেই দুজনকে একই সঙ্গে হত্যা করা যাবে। ওদের দুজনকে এক সঙ্গে পাওয়া যায় না, তাছাড়া একজন খুন হলে আর একজন পালাবে এবং পরে বদলা নেবাব চেষ্টা করবে, অতএব এই-ই সুযোগ। ভিনসেন্ট কল তার একজন সঙ্গীকে সঙ্গে রাখবে, লবিতে দুজনে রিভলবার তাক কবে অপেক্ষা করবে। লবিতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুজন গানম্যানের রিভলবার থেকে দুটি গুলি দুটি দুশমনেব খুলি এফোড় ওফোড় করে দেবে। ব্যস. খতম!

টমি ব্রাউনের প্ল্যান শুনে ম্যারানজানো উল্লাসিত হয়ে উঠল। ১৯৩১ সালেব ১১ সেপ্টেম্বর বেলা তিনটের সময় মিটিং ঠিক করা হ'ল। আর ওদিকে ভিটো জেনোভিজ আব লাকি লুকিয়ানোকে টমি ব্রাউন অন্য পরামর্শ দিল।

তিনটের সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট। বেশ, দশ মিনিট আগে তোমরা দুজন গানম্যানকে পাঠাও। তারা পুলিশের ডিটেকটিভ সেজে ম্যারানজানোকে চেম্বারে ঢুকে খতম করে আসুক। এই প্ল্যানই অনুমোদিত হ'ল এবং ঘটনাও ঘটল অ্যাকর্ডিং টু প্ল্যান।

ম্যারানজানো নাকি কয়েকদিনের মধ্যে তার অফিসে পুলিশের হামলা আশঙ্কা করছিল। সেই জন্যে অফিসে রিভলবার আনা সে নিসিদ্ধ করে দিয়েছিল। সেদিন আবার ম্যারানজানোর দেহরক্ষী ভ্যালাচিও অনুপস্থিত। এই ব্যাপারটা টনি ব্রাউন জানত কিংবা কাকতালীয়বৎ ঘটে গিয়েছিল।

চারজন পুলিশ ম্যারানজানোর অফিসে ঢুকল। তারা পুলিশের ব্যাজ দেখিয়ে নিজেদের শনাক্ত করে কর্মীদের বলল, নিজের নিজের সিট ছেড়ে উঠে দেওয়ালের ধারে দু'হাত তুলে দেওয়ালে মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়াতে। দুজন পুলিশ রিভালবার বার করে তাদের পাহারা দিতে লাগল।

আর দুজন ঢুকল ম্যারানজানোর চেম্বারে। একজন তার ব্যাজ দেখিয়ে বলল, আমরা থানা থেকে আসছি তোমার সঙ্গে কথা আছে।

ওহ্ পুলিশ, যাক বাঁচা গেল। কিছু খসবে আর কি! ম্যারানজানো নিশ্চিন্ত হ'ল। জেনোভিজ আর লুকিয়ানো এক্ষুনি আসবে, তার আগেই ওদের বিদেয় করা যাক।

তারপর ম্যারানজানো নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বোধহয় উদ্দেশ্য ছিল স্টিল আলমারি খুলে টাকা বার করা। সেই লোক দুজনও ঝট করে তার দুপাশে এসে গেছে।

ম্যারানজানোও চকিতে বুঝতে পেরেছে কি ঘটতে যাচ্ছে। সে চট করে ঝুঁকে পড়ে তার টেবিলের ড্রয়ার খুলে রিভলভার বার করতে গেল। ড্রয়ার খুলেও ছিল। রিভলবারে হাত ঠেকিয়ে ছিলও, কিন্তু ঝুঁকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা সরু ও শাণিত ছোরা তার পিঠে আমূল প্রোথিত হ'ল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই চারিটি গুলি. ম্যারানজানো মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ম্যারানজানোকে খুন করে ওরা দুজন বাকি দুজন সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখল ভিনসেন্ট কল এবং আর একজন লবিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের দেখেই ওরা বলল, আরে কেটে পড়, পুলিশ আসছে।

লাকি লুকিয়ানো মাফিয়া সাম্রাজ্যের সম্রাট হতে চায়। তার অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী। এদের মধ্যে ওজনে ভারি হ'ল ভিটো জেনোভিজ। তবে জেনোভিজ ব্যক্তিগত নানা ব্যাপারে বিব্রত ছিল। ইতিমধ্যে তাকে ইয়োরোপে পালাতে হয়েছিল। ইয়োরোপ থেকে ফিরে এসে দেখল তার বৌ অ্যানা নানারকম ঝামেলা পাকিয়ে রেখেছে।

ভিটো পালিয়ে গিয়ে ইতালিতে ছিল। ইতালিতে থাকবার সময় ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে খুব দোস্তি করেছিল, এমন কি নোলা শহরে পার্টির একটি বাড়ি তৈরির জন্যে আড়াই লাখ ডলার দান করেছিল। ভিটো ইতালিতে থাকতে থাকতেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেঁধে ওঠে। মার্কিন সৈন্যরা ইতালিতে অবতরণ করে নোলা দখল করে। ভিটো তখন নোলাতে ছিল। সেখানে আমেরিকানদের দলে ভিড়ে যায় এবং দো-ভাষীর কাজ করতে থাকে। ওদিকে তলে তলে আবার ব্ল্যাক মার্কেটিং-এর ফলাও কারবার আরম্ভ করে দিয়েছিল। কীর্তিমান পুরুষ সন্দেহ নেই।

অ্যানার সঙ্গে ভিটো ঝগড়া করল, চড় চাপড়ও দিল। রিভলবার দেখিয়ে ভয়ও দেখাল। ফলে অ্যানা ভিটোকে ছেড়ে চলে গেল। আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা উঠল।

মামলার সময় অ্যানা আদালতে অনেক কিছু ফাঁস করে দিল। চশমা আঁটা পাদ্রীসাহেবের মতো দেখতে হলে হবে কি, লোকটি হাড় বদমাশ। অত পয়সা করল কি করে? জুয়ো, চোবা মদ বিক্রি, ড্রাগ স্মাগলিং, ব্ল্যাকমেলিং, এই সব করেই তো, এইসব কথা অ্যানা বলল।

এই সব খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এবং খবরের কাগজে ভিটোর নাম ছাপা হতে থাকায় দলের মধ্যে তার পজিশন কিছুটা ঢিলে হয়ে গেল।

অ্যানার এই অবস্থার জন্য ভিটো দায়ী করল অ্যান্টনি স্ট্রোলো বা টোনি বেন্ডারকে। বেন্ডারের স্থান ছিল তার দলে ভিটোর নিচেই। ভিটো যখন ইয়োবোপে, তখন অ্যানাকে দেখাশোনার ভার বেন্ডারের। কিন্তু বেন্ডার তা করেনি।

ভিটো এতদূর ক্ষিপ্ত হয়েছিল যে সে ঠিক করেছিল বেন্ডারকে খুন করবে। কিন্তু বেন্ডার তার ছেলেবেলার বন্ধু এবং তার বিয়ের সময় সে ছিল বেস্টম্যান। এইসব ভেবে বেন্ডারকে হত্যা কর'র পরিকল্পনা ত্যাগ করল।

তবে কি অ্যানাকেই খুন করবে? কেউ কেউ পরামর্শ দিল যে একে বৌ তায় মেয়েমানুষ। তাকে খুন করে আর কেলেঙ্কারি বাড়িও না, গৌবব বাড়বে না।

কিন্তু কাউকে যে খুন করতেই হবে নইলে দলের মধ্যে নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পারছে না! ঠিক, হয়েছে ফ্রানজকে খন করবে।

স্যালভাতোর লুকিয়ানোর বয়স নয় কি দশ, তখন সিসিলি দ্বীপে লেরকারা ফ্রিড্ডিতে গন্ধকের কারখানায় কাজ করতে হ'ত তাকে। বাবা খুবই দরিদ্র ছিল। তারপর কি করে একদিন তার বাবা তার মা, দুই ভাই আর তাকে নিয়ে জাহাজে চেপে আমেরিকায় এসে হাজির। কি করে তা সম্ভব হয়েছিল তা সে জানে না।

নিউ ইয়র্কে যে পাড়ায় এসে উঠল সে পাড়াটা মোটেই ভাল নয়। তাছাড়া এই অল্প বয়সেই তার মনে হয়েছিল সে এই নতুন দেশে বেঁচে থাকতে হলে শুধু গায়ের জোরেব ওপরই নির্ভর করলে চলবে না, শিয়ালের মতো ধূর্ত হতে হবে। সেই বযস থেকে সে পাঠ নিতে আরম্ভ করল, গুরুর অভাব নেই।

একটা স্কুলে ভর্তি হ'ল। নতুন ভাষা শেখবার খাতিরে কিছু কিছু পডাশোনা কবতে হ'ত। টেনেটুনে পাঁচবছর স্কুলে ছিল। সেই বয়সেই পাড়ার বদ ছেলেদেব দলে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এই ছেলেব দল হাতে ইট পাথর ছোট লাঠি, বেসবল খেলার স্টিক নিয়ে হৈ হৈ কবে ছোটখাট মুদিখানার দোকানে ঝাঁপিয়ে পড়ত, যা পারত লুটপাট করত, কাঁচ ভাঙত, জিনিসপত্র তছনছ করত। পুলিশ আসবার আগেই চটপট কোথায় কেটে পডত।

এদিকে আবাব স্কুলে পডতে পডতেই একটা টুপির কারখানায় কাজে ভর্তি হয়ে গেল। সপ্তাহে ছ'দিন, দিনে দশ ঘণ্টা করে কাজ, মাইনে মাত্র সাত ডলার। এক জায়গায় জুয়ো খেলা হচ্ছিল। দু এক ডলার খেলে দেখাই যাক না। স্যালভাতোর খেলায় মেতে উঠল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত খেলা চলল। খেলা শেষে যখন সে বাড়ি ফিরছে তখন তার পকেটে দু'শ চুয়াল্লিশ ডলার। সেই ১৯১৩ সালের পক্ষে প্রচুর টাকা।

প্রথম খেলাতেই বাজিমাৎ। ছেলেটা খুব লাকি তো। ব্যস সেই থেকে তার নাম চালু হযে গেল। পরে সে স্যালভাতোর বদলে নামের আগে চার্লস বসাল এবং লুকিয়ানার বদলে মার্কিন রীতিতে লুকিযানো হ'ল। এখন তার নাম চার্লস লাকি লুকিয়ানো।

বাঘ রক্তের স্বাদ পেয়ে গেল। জুয়ো খেলে সেই দু'শ চুয়াল্লিশ ডলার জিতল, এরপর সৎপথে রোজগার করা সে ছেড়েই দিল। যারা বোকা তারা মিছিমিছি দিন রাত্তির গাধার খাটনি খাটে।

কিন্তু সেই দু'শ চুয়াল্লিশ ডলার দু সপ্তাহেই শেষ। জুয়ো খেলার লাক তাকে ত্যাগ করেছে বোধহয়। চড়া সুদে টাকা ধার করতে লাগল। শুধু হাতে ধার নিতে গেলে চড়া সুদ দিতে হয়, ঠিক ঠিক সময়ে সুদও দিতে হয়।

আবার তার ভাগ্য কিছুটা খুলল। চোরাপথে ডোপ বেচতে লাগল। বেশ লাভ। দৈনিক আয় হতে লাগল দশ ডলার। সেই আয় বেড়ে দাঁড়াল তিরিশ ডলার। তাকে আর পায় কে, সে সত্যিই লাকি।

বছর দুই বেশ চালিয়েছিল, কিন্তু একদিন ফাঁদে পড়ে গেল। এক রাত্রে বোধহয় একটু গোলমাল হয়ে পড়েছিল। সাদা পোশাকের পুলিশকে কোকেন বেচে বসল। আর যায় কোথায়? আট মাস কয়েদ হয়ে গেল। তবে জেলখানায় সৎ ব্যবহারের জন্যে দু মাস কয়েদ মাফ হ'ল; ছ'মাস খেটে বেরিয়ে এলো। তখন সে পাকা শয়তান।

জেল থেকে বেরিয়ে পুরোনো পাড়া ফার্স্ট অ্যাভিনিউ ছেড়ে নতুন পাড়া মালবেরি বেগু-এ উঠে এলো। প্রথমে নিজের দল তৈরি করল, তারপর কুখ্যাত ফাইভ পয়েন্টার দলে ভিড়ে পড়ল। আরও পরে গাড়ি কিনল। দামি স্যুট পরতে আরম্ভ করল, আর আরম্ভ করল নতুন নতুন যুবতী সংগ্রহ করে গণিকালয় স্থাপন করতে। নারী-মাংস, বেআইনি মদ, চরস, কোকেন, হেরোইন ইত্যাদি সাপ্লাই করে প্রচুর লাভ।

আস্তে আস্তে সে পাকাপোক্ত হয়ে উঠল। মাফিয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে লাগল। মাফিয়া তার আদর্শ হয়ে উঠল। কবে সে নিজে মাফিয়াসো হবে।

লুকিয়ানো নিজে সিসিলির ছেলে। একটা দলের ভেতর থাকলে কাজ করার সুবিধে হয়। আগ্রহী হলেই তো হবে। তার আগে বড় ওজনের কোনো মাফিয়া সর্দারের সঙ্গে পরিচয় হওয়া দরকার। সেই দলনেতা তাকে দলে ঢোকাবে। কিন্তু যেচে সে কারও খোসামোদ করবে না, তবে চাঁইদের সঙ্গে সে সদ্ভাব রাখবে, দরকার হলে তাদের সাহায্য করবে।

লাকি লুকিয়ানো সত্যিই লাকি। তার দ্রুত উন্নতির মূলে হ'ল তার পেশা নির্বাচন। অন্যান্য মাফিয়া নেতারা চোরা মদ, মাদকদ্রব্য, স্মাগলিং, দস্যুবৃত্তি ইত্যাদি বেছে নিয়েছিল, কিন্তু গণিকাদের নিয়ে কেউ ব্যবসা করেনি। তাছাড়া লুকিয়ানো ছিল খুব ক্ষিপ্র ও চতুর। তার কথা বলার ধরন ছিল ভারি চমৎকার শত্রুকেও কাবু করে ফেলত কথা বলে। আর চেহারা দেখে তাকে অপরাধী বলে মনে হ'ত না।

ঠিক এই সময়ই একজন তাকে খবর দিল, আরে লাকি তুমি এখানে কি করছ? তোমাকে যে ম্যাসেরিয়া খুঁজছে?

খবরে গুরুত্ব আছে। ম্যাসেরিয়া যে সে নেতা নয়। সে যদি অপরিচিত কাউকে খুঁজে বেড়ায় তাহলে বুঝতে হবে ব্যাপারটার গুরুত্ব অনেক।

জো ম্যাসেরিয়ার শক্তি হ'ল তার বন্দুক। ১৯০৭ সাল থেকে সে বন্দুক দিয়েই কথা বলে এসেছে। মানুষ খুন করা তার কাছে ছেলেখেলা। তার অন্তরঙ্গ সঙ্গী বা সহায়কদের মধ্যে কাকে যে কখন খুন করবে তা নিজেও জানে না। অনেকদিন কাউকে খুন করা হয়নি, হাত সুড় সুড়

করছে, ঠিক আছে ভিত্তোরিওকে খুন কর। ভিত্তোরিওর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই কিন্তু হাতের কাছে আপাতত তাকে পাওয়া যাচ্ছে কিংবা হয়ত একজন কনস্টেবল অর্থাৎ ফপ কোথায় পাহারা দিচ্ছে, গাড়িতে যেতে যেতে টাবগেট প্র্যাকটিস কবাব ছলে তাকে গুলি করা হ'ল। কোনো কারণই নেই তাকে মারবার, কোনো প্রবোচনা নেই। এই হ'ল মাফিয়া চরিত্র।

কোনো মাফিয়া কাউকে টাকা ধার দিয়েছে। সে হয়ত একটা সুদের কিস্তি খেলাপ করেছে। দাও তার হাত ভেঙে।

ম্যাসেরিয়ার বুদ্ধি ছিল তীক্ষ্ণ, দল গঠন করতে যেমন দক্ষ, তেমনি আবার খুন জখম বা ডাকাতি-জুয়াচুরি করার প্ল্যান রচনা করতেও ওস্তাদ, অদ্বিতীয়।

বেঁটে খাটো, মোটাসোটা, শুয়োরের মতো খুতকুতে চোখ আর শেয়ালের মতো ধূর্ত এই ম্যাসেরিয়াকে সবাই চেনে, খাতির করে। আমেরিকায় তখনও মদ্যপান নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ হলেই চোরা ব্যবসা ফেঁপে ওঠে। চোরা মদ ব্যবসায়ের রাজা ছিল ডায়মন্ড জিন।

চিকাগোর এক রেস্তোরাঁয় তাকে কে গুলি কবে হত্যা কবল। এই রাজ সিংহাসন দখল কবতে হলে নিজের হাত মজবুত করতে হবে। সিরো টেরানোভা জনি ডেরিও, অ্যাল ক্যাপোন, এরা সবাই দুর্দান্ত ও দুঃসাহসী চাঁই। এদের সবাইকে পার্টনাব করে নিয়ে ম্যাসেবিয়া অপ্রতিহত গতিতে চোরা মদের ব্যবসা চালাতে লাগল। কিন্তু সিংহাসন অটুট বাখতে হলে দলে আরও কড়া লোক চাই।

একজন লোক হ'ল ফ্রাঙ্ক কাস্টেলো। আসল নাম ফ্রানসেসকো কাস্টিগলিয়া। গুণ্ডার সর্দার কিন্তু মাথা খুব সাফ। উত্তব জীবনে মার্কিন সিনেটে নির্বাচিত হযেছিল। কাস্টেলোব মতো আব একজন লোক চাই। লুকিয়ানো হ'ল সেই লোক।

লুকিয়ানোর গণিকালয়েব ব্যবসাযে দরকার হলেই ম্যাসেরিয়া টাকা দেবে আর লুকিয়ানো তাব গণিকালযগুলিতে ম্যাসেরিয়ায় চোরা মদ বিক্রি করবে। সুবিধে দবেই দেবে ম্যাসেরিয়া, কিন্তু ম্যাসেরিয়ার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে তাকে হটিয়ে ম্যাসেরিয়া বস অফ বসেস হতে চায়, সেজন্য লুকিযানোর সাহায্য দরকার। লুকিয়ানো তাকে সাহায্য করবে তো? নিশ্চয় লুকিয়ানো রাজি হবে।

কাস্টেলো আর লুকিয়ানোর মতো দুজন জবরদস্ত সহকাবী পেযে জো ম্যাসেরিয়া তরতব করে উঠতে লাগল। এই জন্যে সৃষ্টি করতে হযেছিল এক বিভীষিকাব বাজত্ব।

উমবারটো ভ্যালেনটি ছিল ম্যাসেরিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বী। একদিন তার দলের সঙ্গে ম্যাসেরিযার দলের ভীষণ মাবামারি লাগল, রাস্তাতেই গুলিবৃষ্টি। নির্দোষ কতজন পথচাবি মরল। পুলিশ সাঁ...আঁ-আঁ করে সাইরেন বাজিয়ে এসে পড়ল।

ম্যাসেবিয়া তখন একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। পালাতে গিয়ে বিরাট জোয়ান এক পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল। পুলিশ তাকে কিছুতেই ছাড়ল না। কিন্তু মাফিয়াদের এমনি প্রভাব যে তার কিছু হ'ল না। ওপরের চাপে তাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

দু'বছরের মধ্যেই জো ম্যাসেরিযা হ'ল জো দি বস। মাফিযা রাজত্বের সিংহাসনে সে আরোহণ করল।

ভ্যালেনটি কিন্তু ভোলেনি. বদলা নেবার জন্যে দারুণ একখানা পিস্তল নিয়ে সব সময় ঘুরে বেড়ায়, রাস্তায় হোক আর যেখানেই হোক একা পেলেই গুলি করবে।

জো দি বস থাকত লোয়ার ইস্ট সাইডের একটা ফ্ল্যাটে। আগস্ট মাস, বেশ গরম। কোথায় যেন যাবে বলে জো নিচে নেমেছে। একতলায় এসে রাস্তায় নামতে হলে দরজার বাইরে বেশ কয়েকটা সিঁড়ি ভাঙতে হ'ত। শেষ ধাপে নেমে রাস্তায় যেই এক পা বাড়িয়েছে অমনি কোথা থেকে একটা গুলি এসে ঠিক তার মাথায় ওপর দেওয়ালে বিঁধল।

জো চট করে মাথা নিচু করে রাস্তার উল্টোদিকে ছুট লাগাল। ঠিক সামনেই ছিল একটা টুপির দোকানে। জো মোটা হলে কি হয় বেশ ক্ষিপ্র ও স্মার্ট। ও সোজা দৌড়ায়নি, একটু এঁকে বেঁকে দৌড়াচ্ছিল। জো ধাঁ করে টুপির দোকানে ঢুকে পড়ে একেবারে মেঝেতে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। ইতিমধ্যে টুপির দোকানের শো কেসের কাঁচ ভেদ করে গুলি দোকানের ভেতর ঢুকেছে।

ভ্যালেনটির লক্ষ্য নিশ্চয় অব্যর্থ নয় তাহলে প্রথম গুলিটাই জো-এর খুলি উড়িয়ে দিত। তবুও সে সব কটা গুলি নষ্ট করেছিল এবং ব্যর্থ হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

জো কিন্তু কাউকে দেখতে না পেলেও, বুঝতে পেরেছিল যে এ কাজ ভ্যালেনটির। টুপিওয়ালা ভ্যালেনটিকে দেখতে পেয়েছিল কিন্তু সে ভ্যালেনটিকে চিনত না। তার কাছ থেকে বর্ণনা শুনে জো সুনিশ্চিত হয়ে নিজেও দোকান থেকে পালাল। পুলিশ আসবার আগে সরে পড়া ভাল।

ভ্যালেনটি এখন পাগলা কুকুর। পাগলা কুকুরকে রাস্তায় ছেড়ে রাখা নিরাপদ নয়।

কয়েকদিন পরে ম্যাসেরিয়া অর্থাৎ জো দি বস ভ্যালানটিকে টেলিফোন করল। জো জানত ভ্যালেনটি স্প্যাঘেটি খেতে খুব ভালবাসে, স্প্যাঘেটির প্রতি তার রীতিমত দুর্বলতা আছে। ইস্ট সাইডে একটা ইতালিয়ান রেস্তোরাঁ আছে। দাম একটু বেশি কিন্তু তার তুল্য মিট স্যান্ডউইচ আর স্প্যাঘেটি সারা নিউ ইয়র্কে কেউ তৈরি করতে পারে না।

ম্যাসেরিয়া টোপ ফেলল। সে ভ্যালেনটিকে টেলিফোনে বলল, ওহে আর খুনোখুনি করে নিজেদেরই জাত ভাইকে মেরে আর কি হবে, তাব চেয়ে এসো দুজনে মিটমাট করে ফেলা যাক। রাজি?

রাজি।

বেশ, আজই রাত্রে তাহলে চলে এসো ইস্টসাইডে সেই স্প্যাঘেটি রেস্তোরাঁয়। আমি স্পেশাল ডিসের অর্ডার দিয়ে রাখছি, তাছাড়া গল্প করতে করতে ড্রিঙ্ক করা যাবে।

ম্যাসেরিয়াই আগে এসেছিল। সে আগে এসে রেস্তোরাঁর ধারে দুটো লোক মোতায়েন রেখেছিল যারা উড়ন্ত পাখিকে গুলি করে মারতে পারে, মানুষ তো কোন ছার। ভ্যালেনটি কিন্তু ম্যাসেরিয়াকে বিশ্বাস করেছিল। সে সঙ্গে কোনো লোক আনেনি শুধু একটা অটোমেটিক রিভলবার তার পকেটে ছিল, যা তার নিত্যসঙ্গী।

দুজনে হাসিমুখে দুজনকে অভ্যর্থনা করল। হ্যান্ডশেক করল। দুজনে ঠিক করল দু দলের চাঁইদের নিয়ে একদিন একটা মিটিং করে সব কিছু পাকা করে নিয়ে যাবে। অতি উত্তম প্রস্তাব।

দুজনে প্রেমসে গল্প করল, মজাসে ড্রিঙ্ক করল। ভ্যালেনটি বোধ হয় একটু বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছিল. প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে দুজনে দুই পুরোনো বাড়ির মতো রেস্তোরাঁয় বাহিরে এলো। দরজা পার হবার ঠিক আগে জো বলল তুমি এগোও, আমি জুতোর ফিতেটা বেঁধে নিই, বলে , ম্যাসেরিয়া একটা চেয়ারের ওপর ডান পা-টা তুলে দিল।

ভ্যালেনটি তখন টলছে। তাই টলতে টলতে সে যখন রাস্তায় নামল তখন দুদিক থেকে দুটো গুলি ছুটেও এলো ওর গায়ে, লাগল না।

গুলির আওয়াজেই ভ্যালেনটির নেশা ছুটে গেল। ট্যাক্সি ট্যাক্সি করেই ছুটতে লাগল। কোথা থেকে একটা ট্যাক্সি সাঁ করে এসে তার পাশে দাঁড়াল। বেচারি দরজাটা খুলেছে কিন্তু ভেতরে পা দিতে হ'ল না। প্রায় একইসঙ্গে দুটো গুলি এসে তাকে বিধল। মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, দেহ প্রাণহীন।

রেস্তোরাঁর পিছনে দরজা দিয়ে জো এসে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে অপেক্ষা করছিল। তার প্রেরিত ঘাতক দুজনও কাজ শেষ করে দৌড়ে এসে গাড়ির দু'পাশ খুলে উঠতে না উঠতেই জো ম্যাসেরিয়া গাড়ি চালিয়ে দিল। এবারে তার সিংহাসন নিষ্কণ্টক হ'ল। কিন্তু সত্যিই হ'ল কি?

লুকিয়ানোকে পাকাপাকিভাবে জেলে ঢুকিয়েও অন্যান্য বিলি বাবস্থা করে জো দি বস তার ইস্ট সাইড ফ্ল্যাট ছেড়ে ওয়েস্ট সেন্ট্রাল পার্কে বিলাসবহুল প্রশস্ত ফ্ল্যাটে উঠে গেল।

লাকি লুকিয়ানোর কাজ কারবার ভালই চলতে লাগল। আয়ও হচ্ছে হাজার হাজার ডলার, দামি গাড়ি চড়ে দামি স্যুট পরে ভাল ফ্ল্যাটে থাকে, খুব চতুর।

কিন্তু খুব কম বয়সে সে যে ভুল করেছিল সেই আর একবার করল। আর একজন ছদ্মবেশী ফেডারেল এজেন্টকে হেরোইন বেচল। তার ফ্ল্যাট সার্চ করেও খানিকটা হেরোইন পাওযা গেল।

এজেন্ট তাকে এক শর্তে ছাড়তে রাজি হ'ল যদি লাকি বলে দেয় সে কোথা থেকে তার সাপ্লাই পাচ্ছে। লাকি সত্যই চতুর। অন্য দলের একজন মাফিয়া তার শত্রু ছিল। লাকি জানত তার ঘরে প্রচুর পরিমাণে হেরোইন জমা আছে। লাকি তার ঠিকানা বলে দিল।

ফেডারেল এজেন্ট সেই ঠিকানায় হানা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে এক বাক্স ভর্তি কয়েক লক্ষ ডলারের হেরোইন তুলে নিয়ে গেল। লাকি ছাড়া পেল।

# পথের কাঁটা

## ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগের একটি শ্রাবণ সন্ধ্যা থেকেই এ গল্পের শুরু করা যাক।

গাঁয়ের নাম পলাশ ডাঙ্গা। গঙ্গারই একটি পুরোনো খাত গাঁয়ের পাশ ঘেঁষে চলে গেছে। ঠিক গঙ্গা নয়, কিন্তু এখনও সারা বছর তাতে জলস্রোত বয়ে চলে। বর্ষায় তো জলে টুবু টুবু হয়ে যায়। লোকে বলে কানা গঙ্গা।

তা পলাশডাঙ্গা বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। একটা ভাল হাই স্কুল আছে, সম্প্রতি একটা কলেজও খোলা হয়েছে, তাছাড়া মেয়েদের জন্যও আছে একটা জুনিয়ার হাইস্কুল। সেখানকার পড়া শেষ করে ছাত্রীরা যাতে প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে পারে তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন কলেজ হওয়ায়, পাশ করলে, তারাও ছেলেদের সঙ্গে একত্রই পড়তে পারবে সেই কলেজে।

শুক্ল পক্ষের আকাশ, পূর্ণিমার আর বেশি দেরী নেই। শ্রাবণ মাস হলেও কয়েকদিন বৃষ্টি হয়নি, তাই নদীর ধারের ঘাসগুলো এখনও বেশ শুকনো। সেই শুকনো ঘাসের মধ্যে বসে দুই বন্ধুর কথা হচ্ছিল।

অনিমেষ বলল, 'হেড মাস্টার মশাই আমাদের দু'জনকেই তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে বলেছেন। আজ যাবি?'

'কি জন্য কিছু বলেছেন নাকি'—মনোজের স্বরে আগ্রহের স্বর অনিমেষের অগোচর রইল না। কারণটা সে জানে। ডাকবার কারণটাও এবং আগ্রহের কারণটাও। যদিও ওর একটার সঙ্গে অন্যটার কোনো সম্বন্ধ নেই। মুখের চাপা হাসি গোপন করার চেষ্টা না করে সে বলল, 'বোধহয় পরীক্ষার খবর টবর কিছু জানতে পেরেছেন। তুই বোধহয় একটা স্কলারশিপ পাবি।'

ওরা দু'জনেই এবার স্থানীয় স্কুল থেকে ম্যাট্রিক দিয়েছে। দু'জনেই স্কুলের সেরা ছাত্র। তবে মনোজ সকলের চাইতে ভাল। এজন্য স্বভাবতই ওরা হেড মাস্টার মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র। তাঁর বাড়িতে ওদের অবাধ গতি এবং সেই সূত্রেই তাঁর স্ত্রী এবং কন্যা কল্পনার সঙ্গেও তারা পরিচিত। কল্পনাও ওদের প্রায় সমবয়সী এবং সেও এবার প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসেছিল।

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে সমবয়সী মেয়েদের সম্বন্ধে ছেলেদের হঠাৎ একটা সচেতনতাবোধ আসে—মনস্তত্ত্ববিদরা এই রকম একটা কথা বলে থাকেন। কাজেই কল্পনা সম্বন্ধে ওদের দু'জনেরই যে একটু আগ্রহ দেখা দেবে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সম্প্রতি এই

আগ্রহটা মনোজের দিক থেকে একটু বেশি মাত্রায় দেখা যাচ্ছিল। অনিমেষেরও যে একেবারে ছিল না তা নয়, তবে সেটা বাইরে ততটা প্রকাশ করে ফেলত না। কল্পনা তন্বী, কল্পনা সুন্দরী। তার ওপর পাড়া গাঁ'র মেয়েদের মতো মোটেই সে জবুথবু নয়। ছেলেদের সঙ্গে সমানে তর্ক করতে পারে, দরকার হলে কাটাকাটা জবাব দিতে পারে, যা শ্লেষাত্মক হলেও অশালীন নয়। এই জন্যই ওকে ওদের ভাল লাগে। কল্পনারও যে খারাপ লাগে তা মনে হয় না, তবে কার প্রতি তার আগ্রহ বেশি সেটা ঠিক বোঝা যায় না। তা বোঝবার চেষ্টা না করাই বোধ হয় ভাল। কারণ, শাস্ত্রেই তো বলেছে, ওদের মনের খবর দেবতারাই জানেন না, মানুষ তো ছার।

মনোজ এটা ঠিক বুঝতে পারে না বা বুঝতে চায় না। আব সেই জন্যই আবাল্য বন্ধু অনিমেষকে সে এখন বেশ একটু প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতে আরম্ভ করেছে।

এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্য বরাবরই ছিল ওদের মধ্যে। লেখাপড়ায়, খেলাধুলায়, আরও নানা ব্যাপারে। স্কুলের পরীক্ষায় সাধারণত মনোজই প্রথম হ'ত, কিন্তু যদি দৈবাৎ কোনোবার অনিমেষ মনোজকে হারিয়ে তার ওপরে উঠে যেত তা হলে আর রক্ষা ছিল না। মনোজ তখন অনিমেষকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলত এবং যতদিন না ফিরতি পরীক্ষায় ওকে আবার পরাজিত করতে পারত ততদিন মেলামেশাটা বেশ কমিয়ে দিত। খেলা-ধূলায় অবশ্য অনিমেষের সঙ্গে ও বেশিরভাগ সময়েই এঁটে উঠতে পারত না, কিন্তু সেখানেও ওর মনোভাব গোপন থাকত না। অনিমেষ শুধু হাসত। মনেব ভাব চেপে রাখার ক্ষমতা তার ছিল অনেক বেশি। স্কুলের পরীক্ষায় মনোজকে হারাতে পারলে সে খুশি হ'ত নিশ্চযই, কিন্তু তা নিয়ে হৈ-চৈ করে বেড়াত না, তেমন কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করত না খেলাধূলায় বেশি বাহাদুরি দেখাতে পারলে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও দু'জনেব মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল গাঢ়। সত্যি সত্যিই গাঢ়। কিন্তু এবারকার প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা যেন একটু অন্য ধরনের।

হেড মাস্টার মশায়ের বাড়ি যেতেই দরজা খুলে দিল কল্পনা। মুখ ভর্তি হাসি নিয়ে বলল, "বাবা এই এখনই আসবেন। বসো তোমরা, চা খাবে?" তারপরেই মনোজের দিকে কটাক্ষ হেনে বলল, কিন্তু মশাই, অমনি অমনি পালালে চলবে না। এবার একটা ভাল রকম ফিস্ট চাই। বাবা শুনে এসেছেন, যা নম্বর পেয়েছ তাতে স্কলারশিপ তো নির্ঘাত, চাই কি কমপীট করেও যেতে পার।"

অনিমেষ হেসে বলল, "আমিও তাই বলছিলাম মনোজকে। তবে ফিস্টের কথাটা বলি নি। ওটা তুমি বলবে বলে।"

"হুঁ, যেন আমিই একাই ফিস্ট খাব, তোমরা চেয়ে চেয়ে দেখবে, তাই বুঝি? তা বাপু, তোমার রেজাল্টাও খারাপ কিছু হয়নি, তুমিও একটা স্কলারশিপ পেয়ে যেতে পার বাবা বলছিলেন, তবে সিওর নন।"

"আর তুমি?"

কল্পনার গালে এবার একটু লজ্জার ঢেউ খেলে গেল। বলল, "আমি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ তোমাদের মতো ব্রিলিয়ান্ট নই তো। প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়েছি। তবে হ্যাঁ, শুনলাম, আমিও নাকি পাশ করে গেছি। তাই তো চা খাওয়াচ্ছি। একটু চাও পাবে। পাশের পক্ষে সেই কি যথেষ্ট না?" কথা শেষ করেই কল্পনা জবাবের অপেক্ষা না করে এক রকম দুলতে দুলতে ভেতরে চলে গেল, বোধহয় চায়ের আয়োজন করতে।

একটু পরেই হেডমাস্টার মশাই ফিরলেন, ওরা উঠে প্রণাম করতেই আর্শীবাদ করে বললেন, "খবর শুনেছ তো বোধ হয় কল্পনা-মা'র মুখে? ভারি খুশি হয়েছি, ভারি খুশি হয়েছি। অনেকদিন স্কুলের এমন ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট হয়নি। কল্পনাও বেশ ভাল করেছে। দু'-চার দিনের মধ্যেই বোধহয় পরীক্ষার ফলে বেরিয়ে যাবে। ভাল কথা, চা-টা কিছু দিয়েছে তোমাদের? কল্পনা! এই কল্পনা!"

কথা শেষ হবার আগেই কল্পনা দু'হাতে দু প্লেট খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল। বলল, "মা লুচি ভাজছেন। বললেন, গরম গরম না দিলে কি লুচি ভাল লাগে? এগুলো শেষ হলে চা আনছি।"

"আমাকে এখন আর লুচিটুচি দিসনা, শুধু এককাপ চা।"—ওর বাবা বললেন।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে হেডমাস্টার মশাই প্রশ্ন করলেন, "তারপর? এবার কে কোথায় পডবে? পলাশডাঙ্গা কলেজেই ভর্তি হবে না কি...?" অনিমেষ জবাব দিল।— "মনোজ কলকাতায় গিয়ে পড়বে ঠিক করেছে। আমি আপাততঃ এখানকার কলেজেই ভর্তি হব।,"

"বেশ বেশ, মনোজ কলকাতার কলেজে পড়লেই ভাল হয়। এখানে আর যাইহোক, নতুন কলেজে তো, তেমন লাইব্রেরীও নেই, ল্যাবরেটরিও নেই। তোমরা তো বুঝি দুজনেই আবার বিজ্ঞানের ভক্ত। কল্পনা-মাকেও ভাবছি এখানকার কলেজে ভর্তি করে দেব। যত দিন না বিয়ে হয় পড়ুক না!

অনিমেষ একবার বাঁকা চোখে মনোজের দিকে তাকাল। মনোজ যে কথাটা খুব খুশির সঙ্গে নিয়েছে এমন মনে হ'ল না। তবে অন্ধকারে মুখের ভাবটা ঠিক বোঝা গেল না।

এরপর প্রায় পনেরো বছব কেটে গেছে। ইংরেজ রাজত্ব তখনও শেষ হয় নি এদেশ থেকে। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধও শুরু হয় নি। কিন্তু পৃথিবীর আগে পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তন ঘটেছে পলাশডাঙ্গা গ্রামটিরও। নদীর ধার দিয়ে একটু হাঁটলেই তা টের পাওয়া যায়। সেই শুকনো ঘাসে-ছাওয়া নদীর পাড় আর নেই। সেখানে ইটের পাঁচিলঘেরা বিরাট এক কারখানা বসেছে, পলাশডাঙ্গা কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড। সাহেবী কোম্পানি, প্রচুর লোক খাটছে সেখানে। গ্রামের চাষীরাও অনেকে জমিজমা চষা ছেড়ে দিয়ে বাঁধা আয়ের চাকরি নিয়েছে ঐ কারখানায়। জমজমাট ভাবে গড়ে উঠেছে কারখানা।

অনিমেষ ও বি. এস. সি পাশ করে এই কারখানাতে ঢুকেছিল শিক্ষাণবিশ হিসেবে। কিন্তু তুখোড় ছেলে সে। অল্প দিনেই নিজের প্রতিভা দেখিয়ে বড়সাহেবদের সুনজরে পড়ে যায় এবং পদোন্নোতি হতে হতে এখন গোটা রাসায়নিক বিভাগটিরই ভার এসে পড়েছে তার ওপর। কর্তাদের খুবই ভরসা তার ওপর। সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করার জন্য যে পুরোনো চেম্বার প্ল্যানটা আছে তা দেখাশোনার ভারও তার ওপর। অবশ্য ঐ প্রথায় সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি কবা এখন আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে আর তার বদলে দেখা দিয়েছে নতুন প্রথা,—যাকে বলা হয় কনট্যাক্ট পদ্ধতি। তা এখানে একটা কনট্যাক্ট প্ল্যান্ট বসাবার তোড়জোড় চলছে। বছর খানেকের মধ্যেই বোধহয় সেটা তৈরি হয়ে যাবে। ওটার কাজ শুরু হলে চেম্বার ফ্ল্যাটটা আর রাখা হবে কি না তা এখনও ঠিক হয় নি। তবে আপাততঃ সেখানে পুরো দমে কাজ চলছে।

মনোজ এখান থেকে সসম্মানে এম. এস-সি পাশ করে বিলেতে পাড়ি দিয়েছিল। সেখানেও সে অনেকগুলো পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখিয়ে ডক্টর উপাধি অর্জন করেছে। সেও

কেমিস্ট্রির ছাত্র এবং ঐ বিষয়েই তার থিসিস। গোড়ায় গোড়ায় অনিমেষের সঙ্গে তার চিঠিপত্রের রীতিমত আদান প্রদান চলত, এবং তাতে কল্পনার প্রসঙ্গ খুব বেশি থাকত। এখন সে চিঠিপত্র লেখালেখিও খুব কমে এসেছে, দু'জনেই ব্যস্ত মানুষ তো! বছর খানেক অনিমেষ আর তার কোনো খবরই পায় নি।

এই ভাবেই চলছিল। কর্তারা কারখানার কম্পাউন্ডের মধ্যেই অনিমেষের জন্য ভাল কোয়ার্টার করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু অনিমেষ সেখানে যায় নি। নিজের পৈতৃক বাড়িটাকেই সংস্কার করে এবং যতটা সম্ভব আধুনিক করে নিয়ে সেখানেই সে বাস করছে সপরিবারে। তবে কারখানার কাজ সেরে বাড়ি ফিরতে তার প্রায়ই বেশ রাত হয়ে যায়। অবশ্য শনিবার একটু তাড়াতাড়িই ফেরে।

সেদিনটাও ছিল শনিবার। বিকেলের দিকে অনিমেষ তখনও কারখানা থেকে ফেরে নি। একজন ফিটফাট সাহেবী পোষাক পরা ভদ্রলোক এসে ওর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে এদিক ওদিক চাইতে লাগলেন। এই বাড়িই তো? হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু এ যে খোল নইচে বদলে ফেরা বাড়ি! আগন্তুক ঈষৎ ইতস্ততঃ করে গেটের ওপরকার নামের ফলকটি আর একবার ভাল করে পড়ে নিলেন, তারপর কলিং বেলের বোতাম টিপে দিলেন সজোরে।

পরক্ষণেই দরজা খুলে গেল এবং একজন সুবেশা মহিলা "কে?"—বলে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিলেন! তাঁর পেছন পেছন একটি ছোট্ট ছেলেও গুটি গুটি এসে দাঁড়াল তাঁর আঁচল ধরে।

"কাকে চাই?" মহিলা প্রশ্ন করলেন, "কোত্থেকে আসছেন?"

"আমি—আমি—আমি মনোজ। অনিমেষের বাল্য বন্ধু। বহুদিন বিদেশে ছিলাম কিনা...! কিন্তু আপনি...?"

মহিলাটি এবার খিল খিল করে হেসে ফেললেন, বললেন, "দেখে গোড়াতেই সন্দেহ হয়েছিল, অনেক বদল হয়েছে তো চেহারার। আগে তো তুমি বলতাম, এখন কি বলব, আপনি না তুমি? তুমিই বলি। ওরও বাল্যবন্ধু যখন। আমি কল্পনা, তোমাদেব হেডমাস্টার মশায়ের মেয়ে। এসো, ভেতরে এসে বসো। ও একটু পরেই ফিরবে।"

"কল্পনা! আপনার—তোমার সঙ্গেই অনিমেষের বিয়ে হয়েছে! কই, ও তো কোনো চিঠিতেই আমাকে এ খবরটা লেখে নি! বিয়ে করছে এইটুকু শুধু জানিয়েছিল। কার সঙ্গে তা তো জানানো দবকার বোধ করে নি! আচ্ছা লোক তো! অন্ততঃ একটা কনগ্রাচুলেশন পাঠাতে পারতাম তো!" কথাটা বলে মনোজ একটু কাষ্ঠ হাসি হাসবার চেষ্টা করল। কিন্তু হাসিটা ঠিক জমল না।

কল্পনা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ছেলেকে বলল, "এই টুটু, তোর কাকা, প্রণাম কর। মস্ত বড় পণ্ডিত লোক।" তারপর মনোজের দিকে চেয়ে একটু সলজ্জ ভাবে বলল, "আমার ছেলে টুটু! এই একটিই। তা তুমি তবে ফিরলে? বিয়ে করেছ তো? বৌকেও নিয়ে এলে পারতে! নাকি ওখান থেকেই একটি শ্বেতাঙ্গিনী সংগ্রহ করে এনেছ?"

"সকলেরই ভাগ্য কি অনিমেষের মতো?" একটু রসিকতার চেষ্টা করল মনোজ।

খানিক পরেই অনিমেষ ফিবল এবং মনোজকে দেখে আন্তরিক উচ্ছ্বাসে জড়িয়ে ধরল।

"কলকাতা থেকে আসছিস? তা আজ রাতে আর ফিরতে দিচ্ছি না। এখানেই থাকবি! কাল রোববার কারখানা মোটামুটি ছুটি, কয়েকটা সেকশন ছাড়া, কাল সারাদিন গল্প করব। তাড়া নেই তো তোর?"

পরদিন না, সেই রাত্রেই গল্প শুরু করল অনিমেষ। তার এখন পরিপূর্ণ জীবন। কোথাও কোনও ফাঁক নেই!—না বাইরে, না বাড়িতে। বাইরে তার যেমন খাতির, বাড়িতেও তেমনি তার জীবনকে মধুময় করে তুলেছে কল্পনা।

"সত্যি তুই আমাকে এবার সত্যি হারিয়ে দিয়েছিস অনিমেষ। বিদেশে থেকেও, অত লেখাপড়া শিখেও, আজও আমি বেকার। তুই জানিস না, পৃথিবীর সর্বত্র এখন কী ভয়াবহ ডিপ্রেশন চলছে! আমাদের দেশেই কি কম? তোর ভাগ্য ভাল, তাই ভাল একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পেরেছিস। কিন্তু আমি পারি নি। ছোট খাট করে দু' একটা মাঝে সাঝে যে অফার আসে না তা নয়, কিন্তু আমার ডিগ্রী—আমার জ্ঞান বা প্রতিভা যাই বলিস, তার তুলনায় নগন্য, গ্রহণযোগ্য নয়। প্রায় বছরখানেক দেশে ফিরেছি। কিন্তু এখনও সেই অবস্থা!

বিদেশেও যা, এদেশেও তা। মাঝে মাঝে মনে হয় এই সাধু-সন্ন্যাসীর দেশে সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। তাদের তবু নিশ্চিন্ত জীবন। ভগবানের নাম করে কেটে যায়। কিন্তু আমরা বস্তুতান্ত্রিক আবহাওয়ায় মানুষ হয়ে তারই দাপটে পড়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।"

একটু থেমে, একটু ইতস্ততঃ করে মনোজ বলল, "তোর কাছে কেন এসেছি শুনলে বিশ্বাস করবি না। শুনেছি এখানকার কেমিক্যাল ফ্যাক্টরিতে তোর প্রতিপত্তি খুব বেশি, কর্তাদের সঙ্গেও খুব দহরম মহরম। আমাকে এখানে, তোদের কারখানায় ঢুকিয়ে নিতে পাবিস না? আমার কোয়ালিফিকেশন গুলো তো নিশ্চয়ই তাচ্ছিল্য করবার মতো নয়!"

অনিমেষ একটুখানি সময় চুপ করে রইল, তারপব বলল, "হ্যাঁ, ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে তোর কথা নিশ্চয় বলব, তবে কথা হচ্ছে, এখানে তো কারখানার কাজ, হাতে কলমে-কাজ করার অভিজ্ঞতা যাদের আছে ওঁরা তাদেরকেই খাতির করেন বেশি। তোর হয়তো সে অভিজ্ঞতা তেমন নেই। তবে আমরা শিগগিরই একটা রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট খুলছি, সেখানে তোকে ওঁরা নিশ্চয় নেবেন। বিশেষ করে যখন তোর বিলিতী ছাপ আছে নামের পেছনে। বিলিতী ডিগ্রীর মোহ সাহেবদের কাছে বড় কম নয়।"

"কিন্তু আমার যে এখনই দরকার রে! এভাবে বসে বসে থেকে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাচ্ছি যে! তুই চেষ্টা করলেই একটা ব্যবস্থা করতে পাববি।"

"তা হয়ত পারব, কিন্তু এখন নিলে তো তোকে উঁচু কোনো পোস্ট ওঁরা দিতে পারবেন না। তোকে হয়ত আমারই অ্যাসিস্ট্যান্টগিরি করতে হবে। অবিশ্যি, মাইনে তাতেও খুব কম হবে না, কিন্তু তোর কি তা পছন্দ হবে?

মনোজ হঠাৎ কোনো জবাব দিল না, মনে মনে কি যেন ভেবে নিল খানিকক্ষণ ; তারপব বলল "বেশ, তাতেও বাজি আছি আমি। তুই একটু চেষ্টা করে ব্যবস্থাটা করে দে।"

ঠিক এই সময় কল্পনা রেকাবিতে দু' জনের জন্য জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকল। মনোজের মনে পড়ল সেই দিনটির কথা, যেদিন ওদের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল জানতে গিয়েছিল হেড মাস্টার মশায়েব বাড়ি। সেদিনও কল্পনা এমনি করেই প্লেটে খাবার সাজিয়ে এনেছিল ওদের জন্য। কিন্তু সেদিন আর এদিনে কত তফাৎ! সেদিন সে ছিল কিশোরী কুমারী

ওর সাহচর্যে কি একটা অপূর্ব পুলক জাগতো মনোজের মনে। আর আজ ওর সিঁথিতে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুরের রেখা। চিরজীবনের মতো হাতছাড়া হয়ে গেছে ও। অনিমেষ ওকে কেড়ে নিয়েছে মনোজের কাছ থেকে। ও এখন অনিমেষের সন্তানের জননী।

কতকটা অনিমেষের অনুরোধেই বড় সাহেব মনোজকে কারখানায় নিযুক্ত করলেন। ঠিক হ'ল আপাততঃ ও এখন অনিমেষের সহকারী হিসেবে কাজে লাগবে। অর্থাৎ অনিমেষের নির্দেশ মেনেই চলতে হবে ওকে কিছুদিন। তারপর, যদি রিসার্চ সেকশন খোলা হয়, তখন ওর কাজ কর্ম দেখে ঠিক করা যাবে ওকে কোন সেকশনে রাখা যায়। মনোজ এ ব্যবস্থা মেনে নিয়েই কাজে যোগ দিল।

সমস্ত কেমিক্যাল ডিপার্টমেন্টেরই দেখাশোনার দায়িত্ব অনিমেষের ওপর। অনিমেষ মনোজকে সঙ্গে করেই সমস্ত ফ্যাক্টরিটা চক্কর দিয়ে বেড়ায়। ভীষণ পরিশ্রমী সে। কোথাও সামান্য এতটুকু ত্রুটী থাকলেও তা তার সদাজাগ্রত নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। কারখানার কর্মীরা এজন্য তাকে ভয় করে, শ্রদ্ধাও করে। মনোজকে তারা সহকর্মী হিসাবেই দেখে, কিন্তু অনিমেষকে দেখে ওপরওয়ালা হিসেবে। স্বভাবতঃই মনোজের এটা ভাল লাগে না। সে যে বিদ্যাবুদ্ধিতে অনিমেষের চাইতে অনেক শ্রেষ্ঠ হয়েও তার অধীনে কাজ করছে, এ জ্বালা সে ভুলতে পারে না। অনিমেষ নিজেও তা জানে, বাইরে হয় তো স্বীকারও করে, কিন্তু কারখানায় যখন থাকে তখন তার অন্য চেহারা। অধীনস্থ কর্মচারীরা তার কাছে যেমন ব্যবহার পায় মনোজও তার চাইতে বেশি কিছু পায় না।

সালফিউরিক অ্যাসিডের চেম্বারগুলি পরীক্ষা করে দেখা অনিমেষের একটা নিত্যকর্ম। সীসার তৈরি অতিকায় কতকগুলি চৌবাচ্চার মধ্যে গরম সালফিউরিক অ্যাসিড ক্রমাগত তৈরি হচ্ছে আর নল দিয়ে ক্রমাগত বেরিয়ে আসছে। ঐ চৌবাচ্চা গুলির নামই হচ্ছে চেম্বার। নামে চৌবাচ্চা হলেও আসলে এক একটা ঘরের মতই বড়। উঁচু মই বেয়ে সেখানে উঠতে হয়। চৌবাচ্চার দেওয়ালের ওপর দিয়ে মাচার মতো সরু একফালি বারান্দা চলে গিয়েছে। রাজমিস্ত্রীদের বাঁধা ভাড়ার মতোই সেই বারান্দা। সেইখানে উঠে পরীক্ষা করে দেখতে হয় অ্যাসিড ঠিক মতো তৈরি হচ্ছে কিনা। অ্যাসিড তলায় দানা বাঁধলে চলবে না। যদি দেখা যায় দানা বাঁধছে তা হলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রথম দিন চেম্বার দেখতে গিয়ে মনোজ তো হেসেই কূল পায় না। "এঃ, কোথায় আছি আমরা এখনও! একশ'-দেড়শ বছর আগে যেভাবে সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি হ'ত এখনও সেই পদ্ধতিই আঁকড়ে ধরে আছি! ও দেশে এ সব কবে পাল্টে গেছে। নতুন কনট্যাক্ট পদ্ধতিরও নিত্য নূতন কত পরিবর্তন করা হচ্ছে! এখানে সে খবরও বোধ হয় পৌঁছোয় নি!"

"না, আমরাও একটা কনট্যাক্ট প্ল্যান্ট বসাচ্ছি; কাজ আরম্ভও হয়েছে। বছর খানেকের মধ্যেই এখান থেকেও ঐ পদ্ধতিতে অ্যাসিড তৈরি শুরু হবে। প্ল্যাটিনাম নয়—খোদ ভ্যানাডিয়াম পেন্টক্সাইডই ব্যবহার করব আমরা। তখন দেখে নিস।"

"হ্যাঁ, সীসের যা দাম, এই সীসেগুলো খুলে বিক্রি করে দিলেও দেখবি কত টাকা ঘরে আসবে।"

তা এ ধরণের সমালোচনা অবশ্যই করতে পারে মনোজ। বিজ্ঞানে আমরা এখনও যে কতটা পিছিয়ে আছি তা কি আর অনিমেষ জানে না? অথচ, আশ্চর্য, এই কারখানার যাবা মালিক

তারাও কিন্তু ও-দেশেরই লোক। এদেশে ব্যবসা করে পয়সা লুটছে কিন্তু সেই মান্ধাতার আমলের চালগুলো ছাড়তে পারে নি।

অন্যান্য যন্ত্রপাতি সম্বন্ধেও মনোজের কেমন একটা অবজ্ঞা ভাব। কাজ শেখার চাইতে খুঁত বার করাতেই যেন তার আনন্দ বেশি। অনিমেষের এটা ভাল লাগে না। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারে না, কারণ মনোজ যে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ওর চাইতে অনেক বেশি পরিচিত সেটা তো আর অস্বীকার করা যায় না।

তবু এই ভাবেই দিন চলছিল। মনোজদের পুরোনো বাড়ি এখন আর নেই। ও কারখানার মধ্যেই একটা ছোট দু'-কামরার ফ্ল্যাট নিয়ে সেখানে আছে। তবে তার বেশির ভাগ অবসর সময়টাই কাটে অনিমেষের বাড়িতে। অনিমেষ বাড়ি থাকুক না থাকুক কিছু এসে যায় না তাতে। কল্পনা বাড়ি থাকলেই হ'ল। কল্পনার সান্নিধ্য এখনও ওর তেমনি ভাল লাগে। কল্পনা যে এত সুন্দর—এত যে তার গুণ তা যদি সে আগে জানত ' ওঃ, অনিমেষটা কি ভাগ্যবান। সব দিক দিয়েই তাকে হারিয়ে দিয়েছে!

অনিমেষের ছেলে টুটুর সঙ্গেও তার বেশ ভাব হয়ে গেছে, ভারি মিষ্টি ছেলেটা। এ ছেলে তো তারও হতে পারত—অনিমেষ যদি ওর মাকে কেড়ে না নিত!

কল্পনা এখনও তাকে তেমনি আদর যত্ন করে, তর্কাতর্কি, খুনসুটি—যেমন ছেলেবেলায় চলত, এখনও চলে। মনোজ পতঙ্গের মতো আকৃষ্ট হয় কিন্তু পরক্ষণেই নজরে পড়ে ওর সিঁথির ওপর আগুনের মতো জলজ্বলে সিঁদুরটা। চোখে জ্বালা ধরিয়ে দেয় যেন।

অনিমেষের ব্যবহারটা ও ঠিক বুঝতে পারে না। ও যে এখনও কল্পনার প্রতি সেই তীব্র আকর্ষণ দমন করতে পারছে না একি, অনিমেষের চোখে ধরা পড়ে গেছে? মাঝে মাঝে অনিমেষের এক একটা আচরণে মনে হয় ও তাকে সন্দেহ করছে। নইলে হঠাৎ এক একদিন অকারণ রূঢ় হয়ে উঠবে কেন অনিমেষ? তবে ও তো চিরকালই ভীষণ চাপা, মনের কথা সহজে ধরা যায় না। সেই ছেলেবেলা থেকেই এই স্বভাব ওর। সেদিন কল্পনার সঙ্গে দস্তুর মতো ঝগড়া হয়ে গেল অনিমেষের। কারণটা মনোজ জানে না। হয়তো তাকে নিয়েই কোনো কথা কাটাকাটি হয়ে থাকবে। সারাদিন স্বামী স্ত্রীর একদম কথা বন্ধ, নেহাৎ সাংসারিক প্রয়োজনীয় কথাবার্তা যা চলছে তা টুটুর মাধ্যমে।

আর সেই দিনই হঠাৎ এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল যা কেউ কখনও ভাবতেই পারে নি। অনিমেষ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সন্ধ্যা বেলা শেষ বারের মতো ফ্যাক্টরী টহল দিয়ে এসেছে সে বাড়ির পথ ধরে। আজও যথারীতি টহল দিতে বেরিয়েছিল, কিন্তু তারপর আর তার কোনো হদিস নেই। বাড়িতেও ফেরেনি, ফ্যাক্টরিতেও নেই। কোথায় গেল তবে?

অনিমেষের পক্ষে এ একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাকে কখনও কেউ কাজে কামাই করতে দেখে নি—বিশেষতঃ ছুটি না নিয়ে। জল-ঝড়, শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে সে প্রত্যহ নিয়মিত সময় কাজে হাজির দেয়। তার সময়ানুবর্তিতা কারখানার লোকদের কাছে প্রবাদ বাক্যের মতো হয়ে গেছে। সেই অনিমেষ কাউকে না বলে আজ পর পর দু'দিন কাজে যোগ দেয় নি, বাড়িতেও ফেরে নি এ যে বিশ্বাসই করা শক্ত!

কিন্তু অনেক অবিশ্বাস্য ব্যাপারের মতো এটাও সত্যি ঘটেছে!

কারখানার বড় সাহেব দস্তুর মতো বিচলিত। চার দিকে খোঁজ করা হচ্ছে। থানায় খবর গেছে। পুলিশও এসে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। যদি কোনোও অ্যাকসিডেন্ট হয়ে থাকে তা হলেও গোটা মানুষটা তো আর উধাও হয়ে যেতে পারে না! কারখানাটা নদীর ধার ঘেঁষে হলেও ওর কোনো উঁচু জায়গা থেকে নদীতে পড়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। কারণ নদী আর কারখানার পাঁচিলের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। তা ছাড়া নদীতে ডুবে গেলেও পরদিন কোনো না কোনো জায়গায় মৃতদেহ ভেসে উঠতই। বছরের এসময়টা নদীতে স্রোত খুব কম। বেশিদূর ভেসে যাওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া অনিমেষ নামকরা সাঁতারু, জলে ডুবে গেলেও তার পক্ষে সামলে ওঠা কিছুই না। তবে কোথায় গেল সে?

কল্পনা কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে। মনোজ তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে শুধু ধমক খেয়েছে।—' যে ভাবেই হোক ওকে খুঁজে বার করে দাও, নয় তো কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করো না।"

দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাবেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ যখন তাদের শেষ মন্তব্য "নো ট্রেস" লিখে নিয়ে বিদায় নিল তখন কারখানায় একটা শোকের ছায়া নেমে এলো। কিন্তু কল্পনা ঐ মন্তব্যের ওপর নির্ভর করতে রাজী হ'ল না। বলল, "ওসব রুটিন মাফিক তদন্ত ছুঁড়ে ফেলে দাও, আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ দিয়ে তল্লাসী করাব। সতীনাথবাবু কলকাতার নামকরা গোয়েন্দা। আমার বাবার বন্ধু। আমাকে ভাল করেই চেনেন। বুড়ো হয়েছেন, কিন্তু এখনও অনেক শক্ত শক্ত কেস হাতে নিতে আপত্তি করেন না। এখুনি তাঁকে খবর পাঠাচ্ছি।"

পরদিন সকালেই সতীনাথবাবু এসে হাজির হলেন। মনোজ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কারখানার বড় সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। বড় সাহেব বললেন, "হ্যাঁ, আমরাও আপনার নাম শুনেছি। পুলিশ তো কিছুই করতে পারল না, আপনি দেখুন একবার চেষ্টা করে। আমরা আপনাকে সব রকম সাহায্য করব।" মনোজকে দেখিয়ে বললেন, "এই ভদ্রলোক ছেলেবেলা থেকেই অনিমেষের অন্তরঙ্গ বন্ধু। এখানেও ইনি ওর সহকারী হিসেবে সর্বদা কাছে কাছে থাকতেন। ওঁকে আপনার সঙ্গে ছেড়ে দিচ্ছি—যতক্ষণ না রহস্যের মীমাংসা হয়। অনিমেষের মতো কাজের লোক পাওয়া ভাগ্যের কথা। ওকে যে ভাবেই হোক খুঁজে বার করতেই হবে।"

সতীনাথবাবু মনোজকে নিয়ে ফ্যাক্টরিটা একবার মোটামুটি ঘুরে দেখলেন। আর সেই সঙ্গে অনিমেষের প্রসঙ্গও উঠল, কিন্তু না, অনিমেষ কোনো চিহ্নই কোথাও রেখে যায় নি। তারপর তাঁর নজরে পড়ল অনেক উঁচুতে বসানো সীসার চেম্বারগুলোর দিকে। জিজ্ঞেস করলেন, "ওগুলো কি? সালফিউরিক অ্যাসিড চেম্বার? এখানে এখনও ঐভাবে অ্যাসিড তৈরি হয় বুঝি?"

মনোজ বলল, "আর বলবেন না, সত্যি তাই। এই জন্যই তো আমরা বিজ্ঞানে এখনও এত পিছিয়ে আছি।" তা বটে! "আর সতীনাথবাবু নিচে থেকে ভাল করে চেম্বারগুলি খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, "না, নিচে থেকে কিছু বোঝা যাবে না। মই রয়েছে দেখছি, ওপরে ওঠা যাবে নিশ্চয়ই।"

"তা যাবে, উঠতে চান তো সাবধানে উঠবেন। অনেকদিনের পুরোনো মাচা তো, লদলদে হয়ে গেছে।"

সতীনাথবাবু সে কথায় ততটা কান না দিয়ে ধীরে ধীরে মই বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন, পেছন পেছন মনোজও উঠে এলো।

চেম্বারের দেয়ালের একটু উঁচুর দিকে মাঝে মাঝে বড় বড় জানালার মতো ফোকর। তা দিয়ে ভেতরটা দেখা যায়। কতটা অ্যাসিড জমল দেখবার জন্য সহজেই টেনে খোলা যায়। সতীনাথবাবু সাবধানে একটা টেনে একটু খুলে দেখলেন। ভেতর থেকে সঙ্গে সঙ্গে গরম অ্যাসিডের ধোঁয়া বেরিয়ে এলো। তাড়াতাড়ি ফোকরের মুখ বন্ধ করে দিয়ে বললেন, "বেশ বড় তো ফোকরটা, বোধহয় একটা জানালার মতোই হবে, না কি?"

'হ্যাঁ তা তো বটেই। তবে আমরা এগুলো বেশিদিন রাখবো না। নতুন কনট্যাক্ট প্ল্যান্টে কাজ শুরু হলেই এটা ভেঙ্গে ফেলব।' তা সীসে যা আছে তা বেচলে দাম বড় কম হবে না।'

"তা তো হবেই। আচ্ছা মনোজবাবু, অ্যাসিডগুলো তো দেখছি নল বেয়ে নিচে আর একটা বড চৌবাচ্চায় জমা হচ্ছে। সেখানে থেকে ওগুলো কোথায় যাচ্ছে?"

"পাম্প করে নিয়ে ঐ যে উঁচু টাওয়ারটা, আমবা ওকে বলি গ্লোভার্স টাওয়ার, তারই মধ্যে ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। ওখানেও খানিকটা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটছে। তারপর সেটা ধরে নেওয়া হচ্ছে টাওয়ারের নিচে একটা পাত্রে। ততক্ষণে অ্যাসিডটা আরও ঘন হয়ে গেছে। চেম্বারে ওর মধ্যে আছে শতকরা বড় জোর ৬৫ ভাগ অ্যাসিড, বাকিটা প্রধানতঃ জল। এখানকার অ্যাসিডে আছে শতকরা ৭৮ ভাগ অ্যাসিড। ঐ ৭৮ পার্সেন্টি অ্যাসিডকেও ঘন করবার ব্যবস্থা আছে আমাদের। দরকার মতো আমরা শতকরা ৯৮ ভাগ অ্যাসিডও করে নিতে পারি। তবে সঙ্গে সঙ্গে তা করি না। ঐ ৭৮ পার্সেন্টি অ্যাসিড নিয়েই গুদামে রেখে দিই।'

"গোলমাল হয়ে যায় না একটির সঙ্গে একটি মিশে?"

"তা হবে কেন? প্রত্যেক দিনের অ্যাসিড বিভিন্ন পাত্রে ধরে গায়ে তারিখ লিখে রাখা হয় লেবেল এঁটে।"

সতীনাথবাবু আর কিছু বললেন না, শুধু ঘুরে ঘুরে চেম্বারগুলো দেখতে লাগলেন। তারপব হেসে বললেন, "পুরোনো, হলেও আমাদের কাছে এর সবই নতুন। চলুন নিচে যাই। অনিমেষের সঙ্গে তা আপনিই সাধারণতঃ থাকতেন, যেদিন ও নিরুদ্দেশ হ'ল সেদিন আপনি কতক্ষণ ছিলেন ওখানে?"

আমরা দু'জনেই টহলের শেষে এই চেম্বারগুলো পরীক্ষা করে একে একে মই বেয়ে নেমে আসি। আমার সঙ্গেই ও নেমেছিল, ওই আগে নামে। কিন্তু আমার একটু কাজ থাকায় আমি তাড়াতাড়ি চলে আসি, ও আরও খানিকক্ষণ ফ্যাক্টরিতে থাকে যায়।"

"কতক্ষণ?"

"সে কি করে বলব। দারোয়ান বলতে পারে। বেরোবার জন্য তো একটাই গেট।"

"হ্যাঁ। আমরা নামার পরেই দারোয়ান ওটা নামিয়ে রাখে, যাতে কেউ আব ওপরে উঠতে না পারে। স্যাবোটেজের আশঙ্কায় এই ব্যবস্থাই আছে বহুদিন ধরে।"

"মইটা তো আলগা মনে হচ্ছে। ওটা কি বাত্রে নামিয়ে রাখতে হয়?"

সতীনাথবাবু দারোয়ানকেও একটু জেরা করলেন। সে বলল, সে সারাক্ষণই ওখানে ছিল। অনিমেষবাবুর সঙ্গে তার খুব জান পহচান আছে। বহুৎ আচ্ছা আদমী। কিন্তু সেদিন সে তাঁকে ফ্যাক্টরি থেকে বেরোতে দেখেনি। রাত দশটা নাগাদ সে গেটে তালা লাগিয়ে খানা খেতে যায়।

ফ্যাক্টরির এদিকটায় তখন কোনো জনপ্রাণী ছিল না। অনিমেষবাবু থাকলে সে নিশ্চয়ই জানতে পারত। তাছাড়া যখন মই নামিয়ে রাখে তখনও শুধু মনোজবাবুকেই সে দেখেছে, অনিমেষবাবুকে দেখেনি।

সতীনাথবাবু এবার মনোজকে নমস্কার করে বললেন, "আর আপনাকে কষ্ট দেব না। শুধু আপনাদের অ্যানালিটিক্যাল ল্যাবরেটরিটা কোন দিকে আমাকে একটু দেখিয়ে দিতে বলে যান, অবশ্য তার আগে আর একবার আপনাদের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখাও করে নেব।"

বড়সাহেবের ঘরে বসেই সতীনাথবাবুর সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছিল। সতীনাথবাবুর অনুরোধে বড় সাহেব ল্যাবরেটরির চিফ অ্যানালিস্টকে ডেকে পাঠালেন। অ্যানালিস্ট এলে বললেন, "বুধবার রাত্রে যে চেম্বারে অ্যাসিডগুলো তৈরি হয়েছিল সেগুলো বাইরে বেরোয় নি। আপনি চটপট গিয়ে তার খানিকটা স্যাম্পল নিয়ে পুরো অ্যানালিসিস করে ফেলুন তো! আজ রাত্রের মধ্যেই যেন আপনার রিপোর্ট পাই। যত রাত হয় হোক। এর জন্য আপনাকে স্পেশাল রেটে ওভার টাইম রেমিউনারেশন দেওয়া হবে। মনে থাকে যেন। কমপ্লিট অ্যানালিসিস চাই। আসুন, তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করুন গিয়ে। "তারপর সতীনাথবাবুকে বললেন, "আপনি তো বোধহয় অনিমেষের বাড়িতেই গেস্ট আছেন। কাল ভোরেই আপনার কাছে সীল করে রিপোর্টটা পাঠিয়ে দেব।"

সে রাত্রে কল্পনার সঙ্গে সতীনাথবাবুর অনেক কথা হ'ল। অনিমেষ আর মনোজের আবাল্য বন্ধুত্বের কথা। আবাল্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাও। অত বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও অনিমেষ কোনো ব্যাপারে মনোজকে ছাড়িয়ে গেলে মনোজের মনে যে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হ'ত, অনিমেষের কাছেই কল্পনা শুনেছে সে সব কথা। নিজেও কিছু কিছু দেখেছে, আর তার নিজের প্রতি দু'বন্ধুরই কী প্রবল আসক্তি ছিল তা তো সে নিজেই জানে। স্পষ্ট করে না বললেও সতীনাথবাবুই জেরা করে তা জেনে নিলেন। তারপর অনিমেষের সঙ্গে কল্পনার বিয়ে হ'ল। বিলেতে বসে মনোজ সে খবর পায় নি, এখানে এসে জানতে পেরে সে যে খুব খুশি হয়নি তাও কল্পনা বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু ওতে সে তেমন গুরুত্ব দেয় নি। বাল্যবন্ধুর মতোই ব্যবহার করে এসেছে তার সঙ্গে। সেদিন অবশ্য অনিমেষের সঙ্গে এই নিয়েই তার একটু মন কষাকষি হয়েছিল। অনিমেষ বলেছিল, চিরজীবন ও আমাকে হিংসে করে আসছে, তোমাকে বিয়ে করেছি বলে দাপাদাপি করছে মনে মনে। তারপর আমার চেয়ে বেশি কোয়ালিফিকেশন থাকা সত্ত্বেও আমারই অধীনে যে ওকে কাজ করতে হচ্ছে এ ও কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না। অথচ আমার দৌলতেই যে ওর এ চাকরি হয়েছে তা তো মিথ্যে নয়, ইত্যাদি অনেক কথা।

রাত অনেক হয়েছিল, হঠাৎ পাশের ঘরে টুটু কেঁদে উঠল। সতীনাথবাবু বললেন, "যাও মা ওকে শান্ত করে তুমিও শুয়ে পড় গিয়ে। আমি একটু বারান্দায় পায়চারী করি।"

ভোরবেলাই রিপোর্ট এসে গেল। সতীনাথবাবু একবার তার উপর চোখ বুলিয়েই কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর কল্পনাকে ডেকে বললেন, "আমাকে এখনই একটু থানায় যেতে হবে, মনোজ যদি আসে, একটু বসতে বলো"।

কিন্তু মনোজ আর এলো না। থানার দারোগা ঝটিতি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ভোর রাত্রেই মনোজ জরুরী দরকারে কলকাতা যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। গাড়ি আসতে আসতে থানার জীপও গিয়ে হাজির হয়েছিল সেখানে। তাঁরাই ওকে নিয়ে গেলেন জীপে করে থানায়।

বড় সাহেবের ঘরে বসেই কথা হচ্ছিল আবার। সতীনাথবাবু অ্যাসিড অ্যানালিসের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সবাইকে। দারোগাও বসেছিলেন পাশে।

"একটা মানুষের শরীর কি দিয়ে তৈরি?—হাড়, মাংস, রক্ত, চামড়া—মোটামুটি এই, তাই না? শরীরের গোটা কাঠামোটাই হাড় দিয়ে তৈবি আর এই হাড়ের মধ্যে শতকরা ৫৭ ভাগই হচ্ছে ক্যালসিয়াম ফসফেট। সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে ওর কোনোটাই থাকতে পারে না, কিন্তু রিপোর্টে দেখেছি, ওদিনকার তৈরি অ্যাসিডে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম আর ফসফরাস রয়েছে। ক্যালসিয়াম ফসফেট ছাড়াও হাড়ের সঙ্গে লাগা থাকে বেশ কিছুটা চর্বি, জিলেটিন ইত্যাদি জৈব পদার্থ। সালফিউরিক অ্যাসিডেব সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটলেও ওদের উপস্থিতি খুঁজে বার করা কঠিন নয়—রিপোর্টেও তাই দেখছি!

"তারপর ধরুন রক্ত। হিমোগ্লোবিন রক্তের একটি উৎপাদন যার একটা বড় অংশ হচ্ছে লোহা। মানুষের শরীরের রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেলেও এই লোহা তার মধ্যে থেকে যাবেই, বড় জোর সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে তার বিক্রিয়া ঘটে লোহার সালফেট তৈরি হতে পারে—যা এখানে হয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে।

বাকি রইল কার্বন বা অঙ্গার। আমাদের শরীবে এই কার্বনের পরিমাণ খুবই বেশি। একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের শরীরে অন্ততঃ ১৪।১৫ সের কার্বন থাকে। চেম্বার অ্যাসিডের মধ্যে অতটা কার্বন থাকা অসম্ভব। আরও আছে, কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট। রিপোর্ট আমরা যা পাচ্ছি তাতে দেখা যায় একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের শরীরে যে সব রাসায়নিক উৎপাদন আছে তার সবটাই মিশে রয়েছে এই সালফিউরিক অ্যাসিডের নমুনার মধ্যে, এ থেকে একটি মাত্র সিদ্ধান্তেই আসা যেতে পারে যে ওদিনকার অ্যাসিড চেম্বারে একটি পূর্ণ বয়স্ক মানুষ পড়ে গিয়েছিল এবং ধীরে ধীরে তার শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গলে গিয়ে অ্যাসিডের সঙ্গে একত্র মিশে গেছে। এমন কি পরনের জামা কাপড়—যা নাকি বেশির ভাগই সেলুলোজের আঁশ দিয়ে তৈরি—তারও অস্তিত্ব টের পাওয়া যাচ্ছে এই রিপোর্ট থেকে।

সতীনাথবাবু একুট চুপ করলেন। তারপর বললেন, এ মানুষটি যে হতভাগা অনিমেষ ছাড়া আর কেউ নয় তা বোধহয় আমরা ধরে নিতে পারি—যদিও পুরো প্রমাণ এখনও পাওয়া যায়নি। অনিমেষই হোক আর যেই হোক, একটা মানুষ যে ওর মধ্যে পড়ে গলে মিশে গেছে এটা ঠিক। আর ওখানে যাকে তাকে উঠতেও দেওয়া হয় না। এমন কি উঠবার মইটাও যে পরিদর্শনের পরই নামিয়ে রাখা হয় একথাও আমরা জেনেছি। একমাত্র অনিমেষ আর মনোজই ওখানে প্রত্যহ দেখাশোনা করবার জন্য উঠত আর কারো যাবার হুকুম ছিল না। কাজেই যুক্তিতর্কের দিক থেকে অনিমেষের পড়ে যাবার কথাই মনে আসে নাকি?

"এখন কথা হচ্ছে, এটা কি দুর্ঘটনা, না ইচ্ছাকৃত? যদি দুর্ঘটনা হ'ত তা হলে মনোজের পক্ষে কাউকে না জানিয়ে, বন্ধুকে—উদ্ধার করার চেষ্টা না করে—তা সে চেষ্টা যতই অসম্ভব হোক না কেন বুঝেও,—চুপি চুপি নেমে আসার কথা কেউ কি ভাবতে পারে? দারোয়ান বলছে, সে একমাত্র মনোজকেই নেমে আসতে দেখেছে, অনিমেষকে নয়; আর মনোজ বলছে ওরা দু'জনে একসঙ্গে নেমে এসেছে এবং অনিমেষই আগে নেমেছে। নামার সঙ্গে সঙ্গেই তো দারোয়ান মই নামিয়ে ফেলল, তাহলে অনিমেষ গেল কোথায়?

"মনোজ অনিমেষের বন্ধু হলেও আজন্ম তার প্রতি একটা হিংসা পোষণ করে আসছিল এ

আমি অনিমেষের স্ত্রীর কাছে, যে ওদেরকে অল্প বয়স থেকেই জানত,—শুনেছি। অল্প বয়সে যেটাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরাজয়ের দুঃখ বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত পরিণত বয়সে তা নাও যেতে পারে। বিষেশতঃ সম্প্রতি এমন কতকগুলি কারণেব কথা জানা যাচ্ছে যার জন্য অনিমেষের ওপর মনোজের মনে যে তীব্র বিষ সঞ্চারিত হচ্ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। অনিমেষ আঁচ পেলেও সেটা যে এত ভয়ঙ্কর তা বুঝতে পারেনি নিশ্চয়ই, বুঝলে নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে একা একা সন্ধ্যার অন্ধকারে ওই মরণ ফাঁদে পা দিত না। আমি সীসের চৌবাচ্চাগুলো নিজের চোখে দেখে এসেছি। ওকে বাইরে থেকে দেখবার জন্য যে ফোকরগুলো আছে তা দিযে অনায়াসে একটা মানুষকে ধাক্কা দিয়ে ভিতরে ফেলে দেওয়া যায়—বিশেষ করে সে লোকটা যদি ফোকরের ভিতর দিয়ে ভিতরে কি হচ্ছে দেখতে ব্যস্ত থাকে। আমার ধারণা এই ব্যাপারটিই ঘটেছে। অনিমেষ যখন ফোকর দিকে চেম্বারেব ভেতরটা দেখছিল তখনই মনোজ তাকে ধাক্কা দিয়ে ওব ভিতরে ফেলে দিয়েছে এবং একবার সালফিউরিক অ্যাসিডের চৌবাচ্চায় পডলে অল্পক্ষণ পরেই যে সে দেহের অস্তিত্ব থাকবে না—সনাক্ত করবার মতো,—তুখোড় রাসায়নিক মনোজের তা জানা ছিল।"

সতীনাথবাবু আবার একটু চুপ কবলেন। তারপর আবার বললেন, "আমি শুধু আমার ধারণার কথা, যা আমার মনে হয় অভ্রান্ত, তাই বললাম। বাকি কাজটুকু পুলিশকেই করতে হবে। তবে মনে হয় শেষ পর্যন্ত এ প্রমাণ করা কঠিন হবে না।"

"কিন্তু কেন—কেন সে এমন ভযঙ্কর কাজ কবতে গেল?" বড় সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন।

এবার উত্তর দিলেন দাবোগা—'পথের কাঁটা সরাবার জন্য নিশ্চয়ই। অনিমেষের অবর্তমানে সেই যে ওর পদে উন্নীত হবে এই ধারনাটা ওকে এ কাজে প্রলুব্ধ করে থাকবে। তাব ওপর রয়েছে কল্পনাকে হারাবার জ্বালা। আব ও যে ধরা পডবে তা বোধহয় ও কল্পনাও করতে পাবেনি।'

# এক কলসী দুধে তিন ফোঁটা চোনা

## অদ্রীশ বর্ধন

কাত হয়ে শুয়ে বই পড়ছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র, এমন সময়ে দরজায় একটি মুণ্ডুকে উঁকি মারতে দেখা গেল।

লম্বাটে শীর্ণ মুখ। মাথায় সাদা চুলের ঠিক মাঝখানে সরু সিঁথি। কানের ওপরে মাথায় চুল মুড়িয়ে ছাঁটা। কানের ঊর্ধ্বাংশ নেকড়ের কানের মতো ছুঁচোলো। রঙ খুব কালো এবং তৈল চিক্কণ। চোখে গিলটি করা ফ্রেমের বাইফোকাল চশমা। ঝানু মানুষের মুণ্ডু।

ঘঙ-ঘঙ করে কেশে উঠল মুণ্ডু। চোখ তুলে ইন্দ্রনাথ বললে—আসুন আপনিই তারাপীড় চন্দ্র?

আজ্ঞে,—পাম্পশু খুলে কুণ্ঠিত চরণে ঘরে ঢুকল তারাপীড়। সৌখিন মানুষ। গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি এবং চুনোট করা তাঁতের ধুতী। চেয়ারের দিকে পা বাড়িয়ে বললে—কেসটা ভারী রহস্যজনক, স্যার।

চিঠি পড়ে তাই মনে হ'ল।—ছেলেটি কে?

গোড়া থেকে বলি?

বলুন।

জায়গাটা কলকাতা থেকে মাইল পঞ্চাশেক দূরে। পাগলাডাঙ্গা এস্টেটের নাম শুনেছেন? হরবল্লভ মল্লিক সেখানকার বর্তমান মালিক।

আমি এখানে ম্যানেজারি করছি বছরখানেক। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ সবই করতে হয়। মল্লিক মশাই আর পারেন না। হার্টের রুগী তো। প্রথম জীবনে ম্যাজিক পার্টিতে ভেনট্রিলোকুইস্ট ছিলেন। বুকের বারোটা বাজিয়েছেন তখনি।

হরবল্লভ মল্লিকের বয়স এখন চৌষোট্টি। বিয়ে করেছিলেন পঞ্চাশ বছরে। পরিবার গত হয়েছেন বিয়ের দু'বছর পরেই। ছেলের বয়স এখন তেরো। নাম চন্দ্রবল্লভ।

চন্দ্রবল্লভকে প্রাণের অধিক ভালবাসেন হরবল্লভ। ছেলে কিন্তু বাপকে এড়িয়ে চলে। দু'বছর বয়েসে ছেলের মুখে প্রথম বুলি ফুটেছিল। কিন্তু আজও সে বাপকে বাবা বলে ডাকেনি। মা-মরা ছেলে বাপ-মুখো হয়। কিন্তু এ ছেলে বাপের কোল থেকে ছিটকে নেমে যায়। আড়াল থেকে কটমট করে চেয়ে থাকে বাপের পানে। আমি সে দৃষ্টি দেখেছি ইন্দ্রনাথ বাবু। তেরো বছরের ছেলের চোখে অমন চাহনির কথা ভাবাও যায় না। লেখক হলে বলতাম, সে চাহনি হিম-কঠিন।

মল্লিকমশায়ের প্রাণে তাই শান্তি নেই। মা-মরা ছেলে পাছে কষ্ট পায়, বুড়ো বয়সে আর সংসার বাড়ান নি। ছেলেটি কিন্তু তা বোঝে না। বাপ যেন চক্ষুশূল। হরবল্লভবাবু অনেক বড় বড় ডাক্তার দেখিয়েছেন। চন্দ্রবল্লভ পাগল নয়।

এমন সময় আপনার একটা আশ্চর্য কাহিনী পড়লাম। একটি জাতিস্মর মেয়েকে খুনের দায় থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন আপনি। তাই ভাবলাম, চন্দ্রবল্লভও জাতিস্মর নয় তো? আপনি রহস্যকে আস্ত রাখেন না। টেনে ছিঁড়ে কেটে কুটে সত্যসর্শন করে ছাড়েন। ছুটে এলাম সেই কারণেই। এ রহস্যের কিনারা করে দেবেন?

ইন্দ্রনাথ এতক্ষণ সিগারেট টানছিল টান টান হয়ে শুয়ে। এখন উঠে বসল। বলল— আগে কখনো পূর্বজন্মের কথা বলেনি চন্দ্রবল্লভ?

আজ্ঞে না। আমি পুরোনো ঝি চাকরের কাছে খোঁজ নিয়েছিলাম।

আবার কিছুক্ষণ সিগারে টানল ইন্দ্র। তারপর বলল—আমার হাত এখন খালি। শুধু কৌতূহ'ল মেটাতেই আপনার সঙ্গে যাবো?

গাড়ি নিয়ে এসেছি! এখুনি যাবেন?

আধ ঘণ্টা লাগবে তৈরি হতে।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ওপর দিয়ে ঝড়ের মতো ফ্যালফন গাড়িখানা উড়িয়ে নিয়ে এলো ইন্দ্রনাথকে পাগলাডাঙ্গা এস্টেটে।

তখন সন্ধ্যে গাঢ় হয়েছে। পশ্চিমের আকাশে যেন কালচে রক্ত মাঝখানে সেই পটভূমিকায় প্রকাণ্ড বাড়িখানা দেখে টিপু সুলতানের কেল্লার কথা মনে পড়ল ইন্দ্রনাথের। বিশেষ করে বেলারীর কেল্লাটা। বিরাট নিঝুম, কালচে।

সাবেকী আসবাবপত্রে ঠাসা বাইরের হ'ল ঘরে ইন্দ্রনাথকে বসিয়ে ভেতরে গেল তারাপীড়। বসে না থেকে ঘুরে ঘুরে সারি সাবি পাথরের আবক্ষ মূর্তি আর পারিপারিক ছবি দেখতে লাগল ইন্দ্র। বেশির ভাগ অয়েল পেন্টিং। ফাটোগ্রাফও আছে। একটি ছেলের ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করল বিশেষ পোজের জন্যে। বাঁ কাঁধে বন্দুক রেখে ডান হাতে ঘোড়া টিপছে ছেলেটি। পরনে ঘোড়সওয়ারের পরিচ্ছদ। মাথায় ভেড়ার চামড়ার টুপী। পাতলা ঠোঁটে আর উদ্ধত থুৎনিতে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়। দুইচোখে অর্জুনের একাগ্রতা। তলায় নাম লেখা—উগ্র বল্লভ মল্লিক।

জুতো মসমসিয়ে ফিরে এলো তারাপীড়। মুখ গম্ভীর। কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে বললে, ইন্দ্রনাথবাবু আমাকে মাপ করবেন।

কেন? তারাপীড়ের মেঘাচ্ছান্ন মুখ নিরীক্ষণ করতে করতে বললে ইন্দ্রনাথ।

মল্লিকমশায় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, ওঁকে না জানিয়ে আপনাকে ডেকে আনার জন্যে। অনেকগুলো খারাপ কথা বললেন। আমি ওঁর ভালর জন্যেই এত করলাম। তার বদলে কিনা এই অপমান। নাঃ এ ছাতার চাকরি কালই ছেড়ে দেব।—চলুন, এগিয়ে দিয়ে আসি।

দাঁড়ান।

চমকে উঠল তারাপীড়! দরজায় দাঁড়িয়ে একটি সুকুমার ছেলে। নিঃসন্দেহে চন্দ্রবল্লভ। হাতীর দাঁতের মতো সাদা গায়ের রঙ। বিধাতা অশেষ যত্ন নিয়েছেন চোখ-মুখ-নাক-কান গড়বার সময়ে। পরণে আঁট সাঁট গাঢ় লাল ব্যানলন গেঞ্জী আর কুচকুচে কালো কর্ডুরয়

পাৎলুন। চোখ দুটি মুখের তুলনায় একটু বড়। অতলস্পর্শী। পলক না ফেলে চেয়েছিল ইন্দ্রনাথের পানে।

খুব আস্তে, কিন্তু দৃঢ়স্বরে বললে—আপনি ইন্দ্রনাথ রুদ্র, ডিটেকটিভ?

চন্দ্রবল্লভের এ হেন আচরণের সঙ্গে তারাপীড় নিশ্চয় পরিচিত নয়। তাই বেশ ঘাবড়ে গিয়েছে দেখা গেল।

ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিল না। সেকেণ্ড কয়েক সূচীতীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল চন্দ্রবল্লভের পানে। যেন মনে মনে তৌল করল বালকের বাচালতার মধ্যে অতীন্দ্রিয় রহস্য কিছু আছে কিনা। তারপর দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে নিক্ষেপ করল দেওয়ালে ঝোলানো বন্দুকধারী ছেলেটির দিকে।

বলল—এ-ছবি তোমার?

এ-প্রশ্নের সোজা জবাব—হ্যাঁ অথবা না। কিন্তু চন্দ্রবল্লভের পাতলা ঠোঁটে খরশান হাসি ছুরির মতোই ঝলক দিল। বলল বাঁকা সুরে—এ ছবি যাঁর, তিনি নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন পনেরো বছর আগে—এই বাড়িতেই—খাবার ঘরে।

ঘর নিস্তব্ধ।

থেমে থেমে, প্রতিটি শব্দ আর উচ্চারণের ওপর সবিশেষ জোর আরোপ করে বললে ইন্দ্রনাথ—তুমি তখন জন্মাও নি।

সে আর এক জন্ম।

জাতিস্মর! চাপা কণ্ঠে বলল তারাপীড়।

—হ্যাঁ আমি জাতিস্মর। শুনবেন আমার জন্মের কথা? কিন্তু এখানে তো বলব না। চলুন, একটু থেমে—হরবল্লভ মল্লিকের ঘরে।

ঘরটা দোতলায়। লাল সাদা চতুষ্কোণ মার্বেল মণ্ডিত মেঝে। দেওয়ালে চিত্র বিচিত্র ট্যাপেস্ট্রি। সারি সারি নিচু টেবিলের ওপর কাঁচের বেলজার ঢাকা সুদেহা মর্মর সুন্দরী। ঠিক মাঝখানে পারস্য গালিচার ওপর কাষ্ঠাসনে প্রতিষ্ঠিত লম্বোদাত একটি বাঘ। হঠাৎ দেখলে বুক ঢিপঢিপ করে ওঠে। কাচের চক্ষু দুটি যেন জীবন্ত। কড়ি কাঠের কাছে এক ইঞ্চি জায়গাও বুঝি বাকি নেই, হরিণের শিংওলা মাথা, বাঘের মুণ্ডু, মহিষের শিং ছাড়া আরো কত বিগত প্রাণ জানোয়ারের দেহাবশেষ শোভা পাচ্ছে সেখানে।

ঘরের শেষ প্রান্তে সিংহাসনের মতো একটি মার্বেল চৌকিতে ডানলোপিলো গদির ওপর আড় হয়ে শুয়ে হরবল্লভ মল্লিক। কোটরে বসা পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু উত্তেজনায় বিস্ফারিত। গোঁফদাড়ি মুণ্ডিত তোবড়ানো গাল উঠছে আর নামছে মুহুর্মুহু চোয়াল সঞ্চালনের জন্যে।

বিনা এত্তেলায় প্রবেশ করায় ছিলে ছেঁড়া ধনুকের মতো সটান উঠে বসলেন মল্লিক মশায়। কিন্তু বিস্মিত হলেন সবার শেষে তাঁর বালক পুত্রকে দেখে। ক্ষুধিত চোখে একদৃষ্টে তার পানেই চেয়ে আছে চন্দ্রবল্লভ।

ঘরে ঢুকেই হুকুমের স্বরে সে বললে তারাপীড়কে—আপনার ঋণ শোধ করতে পারব না। কিন্তু এখন বাইরে যান। বিষয়টা গোপনীয়।

যুগপৎ বিস্মিত ও আহত হ'ল তারাপীড়। বিদায় নিল বিস্ময়াহ'ত মুখে। নিজের হাতে দরজা বন্ধ করে দিল চন্দ্রবল্লভ। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে বয়স্ক কণ্ঠে—এতদিন যা জানতে

চেয়েছিলেন, এবার তা শুনুন। ইন্দ্রনাথবাবু, আপনাকে একটা খুনের ধাঁধা বলছি। সমাধান আমি জানি, আর জানেন উনি।

টিক-টিক-টিক করে ডেকে উঠল একটা টিকটিকি। সেই সঙ্গে জাগ্রত হ'ল ঝটপট শব্দ। অন্তিমদশা উপস্থিত হয়েছে আরশুলার।

দরজার কাছে একরাশ অন্ধকার জড়ো হয়েছিল। ছায়ামায়ার মধ্যে পাষাণ মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল চন্দ্রবল্লভ। মুখ দেখা গেল না। শোনা গেল কেবল কড়ি-কোমল কণ্ঠ। বলার ভঙ্গিমা এবং শব্দচয়ন বালকসুলভ নয় মোটেই। এলোমেলো কথাগুলো কিছুটা সাজিয়ে দিতে হ'ল গল্পের খাতিরে।

পনেরো বছর আগে একটি অমাবস্যার রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড। অশ্বত্থ গাছের পাশ দিয়ে একটা সড়ক এসেছে মল্লিক হাউসের দিকে। এই পথেই আসছেন জগমোহন। জি. টি রোডে ফেলে এসেছেন টায়ার-ফাটা গাড়িখানা। বাড়তি চাকা নেই। তাই সড়ক ধরে গাঁয়ের দিকে এগুচ্ছেন সাহায্যের আশায়। জি. টি রোডে প্রতীক্ষা বৃথা। এত রাতে সেখানে লরি ছাড়া প্রাইভেটকার চলে না। দিনকাল যা পড়েছে—

রেডিয়াম-উজ্জ্বল হাতঘড়ি দেখলেন জগমোহন। রাত সাড়ে এগারোটা। চেহারার দিক দিয়ে জগমোহন শিং-ছাড়া বলীবর্দ বিশেষ। বুশসার্ট ফাটিয়ে কাঁধ আর বাহুর মাংসপেশী বেরিয়ে আসতে চাইছে। ঘোর কালো গাত্রবর্ণ। ছোটোখাট নেশাও অনুপস্থিত তার চরিত্রে। একখণ্ড লোহা কামারশালায় নিয়ে গিয়ে পেটাপেটি কবলে তবে যদি এমন লোহার মানুষ তৈরি করা যায়। থ্যাবড়া নাক আর ভোঁতা চিবুকে একরোখা ছাপ। কর্মজীবনে সার্থক গোয়েন্দা ছিলেন জগমোহন। পুলিশের চাকরি। অবসর নিয়ে স্বাধীন ব্যবসায় মন দিয়েছেন।

অনেকক্ষণ থেকে পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড ছায়াটা লক্ষ্য করছিলেন জগমোহন। কেল্লা নাকি? জি. টি রোডের দুধারে অতীতের এমনি কত স্মৃতিই না ছড়িয়ে আছে।

হঠাৎ কড়মড় আওয়াজ শোনা গেল পায়ের তলায়। নুড়ি নিশ্চয়। পা ফেললেই সরে সরে যাচ্ছে।

আচম্বিতে যেন একটা আলোর বোমা ফেটে পড়ল অদূরে। আলোর সাজে নিঃশব্দে হেসে উঠল নিকষ তমিস্রার চতুষ্কোণ পুঞ্জটা। আলো...আলো...আলো! বিরাট বাড়ির সর্বত্র আলো! জানালায় আলো, দরজায় আলো, কার্নিশে আলো! খোলা জানালায় পর্দা পর্যন্ত নেই—পাল্লা দুহাট করে খোলা। ঘরে ঘরে আলো! এত আলো ছিল কোথায়? এতক্ষণ অন্ধকারের সমুদ্রে নিমজ্জিত থেকে সহসা দপ করে জ্বলে উঠলোই বা কেন?

শিউরে উঠে ঝাঁ করে গাছের আড়ালে সরে গেলেন জগমোহন। বার্গলার অ্যালার্ম নয় তো? অন্ধকারে নিশ্চয় বৈদ্যুতিক তার ছুঁয়েছেন তিনি। তাই চকিতে সুইচ অন হয়ে গিয়েছে।

সজাগ হয়েছে আঁধার পুরী।

কিন্তু কই! হাঁকডাক সাড়াশব্দ-কথাবার্তা-উঁকিঝুঁকি-দৌড়াদৌড়ি---কিছুই তো নেই! অন্ধকারের আলয়ে শুধু আলোই জ্বলেছে। মানুষ তো নেই! নিদেন পক্ষে একটা ডালকুত্তাও তো তেড়ে আসবে!

আলোর সমুদ্রে ভাসছে যেন ইন্দ্রপুরী। আকারে দানবিক কাঁকড়ার মতো। অলীক সায়ান্স-

ফ্যানটাসির পৃষ্ঠায় বর্ণিত অসম্ভব আতঙ্ক। থেবড়ে বসে আছে চার ঠ্যাং ছড়িয়ে। চার কোণ থেকে বেরিয়েছে চারটে প্রত্যঙ্গ। বৃত্তাকার বারান্দা দিয়ে জোড়া প্রতিটি মহ'ল। বারান্দা বরাবর নিচু ছাদ বিস্তৃত মূল বাড়িব জানালার নিচ পর্যন্ত। খোলা জানালায় চোখে পড়ছে দেওয়াল জোড়া দর্পণ।

কিন্তু কোনো জানালাতেই কেউ দাঁড়িয়ে নেই!

জগমোহন অবাক হলেন না। কেন হবেন? বাড়িতে ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ঢুকলে এমনটাই হয। এতক্ষণ যেন সুইচ নিভিয়ে মেবামত করছিল। এখন জ্বেলেছে।

তাই নির্ভয়ে বেরিয়ে এলেন গুঁড়ির আড়াল থেকে। গাড়িবারান্দার নিচে এসে কিন্তু অবাক না হয়ে পারল না।

দু'মানুষ উঁচু পাল্লা দুটো দুহাট করে খোলা!

সেকেন্ড কয়েক হাঁ করে তাকিয়ে বইলেন জগমোহন।

দেখলেন, খোলা দরজার ওদিকে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা কবোষ্ণ হ'ল ঘর। চোখে পডছে ঝলমলে ঝাড়বাতি, ইতালিয়ান মার্বেল আব সোনালী গিল্টিব কাজ।

দরজার ফ্রেমে হাত বুলোলেন কলিংবেলের সন্ধানে। পুশ বেল নেই বটে, কিন্তু একটা রেশমী দড়ি ঝুলছে। দড়ির নিচে পেতলের ফলকে খোদাই করা একটা ঘণ্টার ছবি। একেবারেই সাবেকী ব্যাপার।

দড়ি ধরে টান মারলেন জগমোহন। ঘণ্টা বেজে উঠল নিস্তব্ধ পুরীর ভেতরে—ঢংঢং...ঢংঢং...ঢংঢং।

কিন্তু কেউ কোনো সাড়া দিল না! কারো টনক নড়ল না।

বহস্যপ্রিয় জগমোহনকে আব আটকানো গেল না। চৌকাঠ পেরিয়ে পদার্পণ করলেন ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল, কাবা যেন প্যাট প্যাট করে দেখছে তাকে।

চোখ তুলেই হেসে ফেললেন জগমোহন। হ'লঘবেব দুপাশে দু'সারি মর্মব মূর্তি।

প্রস্তরচক্ষু মেলে প্রাসাদ-পুরুষবা অনিমেষে দেখছেন আগন্তুককে। ঘণ্টাধ্বনিব কোনো জবাব আসেনি। একটা বেড়াল পর্যন্ত উঁকি দেয়নি। তাই গলা চড়িয়ে হাঁক পাড়লেন জগমোহন—বাড়িতে কেউ আছেন?

উচ্চকণ্ঠের নিনাদ নিস্তব্ধ পুরীর দেওয়ালে দেওয়ালে প্রতিহ'ত হয়ে ঘবে ঘরে ঘুরপাক খেয়ে ছড়িয়ে গেল অনেক দূরে। যেন একটা পিংপং বল ঠুক ঠুক করে লাফাতে লাফাতে উধাও হ'ল নিরুদ্দেশের পথে!

কিন্তু তবুও কেউ সাড়া দিল না। মর্মর মূর্তিদের কঠিন চোখে যেন আরো কঠিন হ'ল আগন্তুকের অসভ্য চীৎকারে।

জগমোহন এবাব সত্যিই ধাঁধায় পডলেন। পুলিশ ডাকবেন নাকি?

কিন্তু ফোনটা কই?

ফোনের সন্ধানেই হলঘরের শেষ প্রান্তে পৌঁছোলেন জগমোহন। এখানে একটা দরজা। পর্দা ঝুলছে। পর্দা ঠেলে পা দিলেন একটা অদ্ভুত ঘরে।

এ রকম আকারের ঘর কখনো দেখেন নি জগমোহন। যেন একটা আকাশের তারা। ঘরে

দশটি দেওয়াল। দশ দেওয়ালে প্রতিষ্ঠিত দশ মহাবিদ্যাব দশ মূর্তি। কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা।

এ ঘরের কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে একটি মাত্র লোহিত বিদ্যুৎ বাতি। লালাভ কিরণে থমথম করছে ঘরের পরিবেশ। আর পুড়ছে একগুচ্ছ ধূপবাতি।

কিসের আয়োজন? কাব প্রতীক্ষা? শিহরিত হলেন জগমোহন। চকিত পদে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন একটা লম্বা গলিপথে। খাঁ খাঁ করছে সুদীর্ঘ করিডর। আলো জ্বলছে। কিন্তু জনপ্রাণী নেই।

গলির মাঝখান থেকে পেতলের কিনারা দেওয়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। একরকম দৌড়েই উঠে এলেন জগমোহন। দারুময় সোপানে বুট জুতোব সংঘর্ষে যেন কাঠের মুগুরের শব্দ শোনা গেল। কিন্তু কেউ হেঁকে উঠল না—কে?

দোতলায় টানা বারান্দা। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই প্রথম ঘরটা খাবার ঘর। মাঝে ডিম্বাকৃতি টেবিল। এক সাথে বিশ তিরিশ জন অতিথি বসতে পারেন। কিন্তু খাবার সাজানো বয়েছে মাত্র একজনের।

হ্যাঁ, একজনের। অর্ধবৃত্তাকাবে সাজানো কাঁচেব জামবাটি দিয়ে ঢাকা ঠাণ্ডা খাবাব। ইলেকট্রিক হট-প্লেট স-ঠ্যাঙ মুরগীর কোর্মা। পাথরের গেলাসে জল আর ববফের মধ্যে বসানো এক বোতল স্যাম্পেন!

ক্ষিদেয় পেট চুঁই-চুঁই করছিল জগমোহনেব। প্রায় সারাদিন গাড়ি চালিয়েছেন আজ। পাঞ্জাবি ধারায় রুটি মাংস দিয়ে উদারনলকে ধামাচাপা দিয়েছিলেন কোনো মতে। খাদ্য এবং পানীযর বাজসিক আয়োজন দেখে তাই রসনা সরস হ'ল তাঁব।

অধর লেহন করে গেলেন পাশের ঘরে। খাবার ঘরের পাশেই রান্নাঘর এবং ঝি-চাকবের আড্ডাখানা থাকা উচিত। আছেও। কিন্তু রান্নাঘরে নেই বাঁধুনি—চাকর ঘরে চাকর!

বিমূঢ় হলেন জগমোহন। বহু রহস্যের বিস্তর রন্ধ্রপথে বিচবণ করেছেন তিনি। কিন্তু এ হেন অতলস্পর্শী অন্ধকার কদাচ দেখেন নি।

বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। অনতিদূরে আব একটা বড়ঘর: মাস্টার বেডরুম। বিশাল ঘব। আশেপাশে ছোটখাট বিবিধ প্রকোষ্ঠ। শয়নকক্ষেব ঠিক কেন্দ্রে রুপোর পালঙ্ক। রুপোর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। বকের পালকের মতো সাদা চাদর টান-টান করে পাতা পালঙ্কে। ওপরে পাট করে রাখা একটি মাত্র সিল্কের পায়জামা!

বুদ্ধিশুদ্ধির রাজ্যে এবার ভারী হট্টগোল আরম্ভ হয়ে গেল। কার সমাদব হেতু এত আড়ম্বর? এত প্রয়োজন? হটপ্লেটে গরম মুরগী, বরফের মধ্যে স্যাম্পেন, ঠাকুরঘরে ধূপ, রূপোর পালঙ্কে রাত্রি বাস?

নিভাঁজ চাদরের তলায় কি যেন উঁচু হয়ে রয়েছে না? তীব্র সন্দেহ হ'ল জগমোহনের। চাদবের তলায় হাত ঢুকিয়ে টান দিতেই বেরিয়ে এলো বস্তুটা। হট-ওয়াটার ব্যাগ এবং জলটা বেশ গরম।

গোয়েন্দা জগমোহনেব রক্ত ছলাৎ করে উঠল পরবর্তী ঘটনায়। এতক্ষণ যে বাড়িতে বাতাসের ফিসফিসানি শোনা যায়নি, তক্ষক ডাকেনি, টিকটিকি ভবিষ্যদবাণী করেনি—সহসা সেই বাড়িতে শোনা গেল চাপা কণ্ঠস্বর!

কারা যেন কথা বলছে ঃ

আড়ষ্ট হয়ে গেলেন জগমোহন। উৎকর্ণ হলেন। না। ভুল নয়। সত্যই কারা কথা বলছে। কিন্তু কি আশ্চর্য। শব্দটা বাড়ির ভেতর থেকে তো আসছে না। বাইরে থেকে আসছে!

কারা যেন চাপা স্বরে ফিসফিস করছে। ঘসঘসে স্বর। খিস্তি অভ্যস্ত চোয়াড়ে উত্তেজিত গলা। জানালার সামনে দৌড়ে গেলেন জগমোহন। সঙ্গে সঙ্গে ঠন করে কি যেন ঠিকরে পড়ল পাথরেব মেঝেতে। অশ্রাব্য খিস্তি দিল অদৃশ্য আততায়ীরা। পরক্ষণেই ভেসে এলো ধাবমান পায়ের শব্দ।

জানালার সামনে ততক্ষণ পৌঁছে গেছেন জগমোহন। সামনে সেই খোলা ছাদ। বিশ গজ দূরে বারান্দা। কিন্তু কেউ নেই।

গা ছম ছম করে উঠল জগমোহনের।

পরক্ষণেই হৃদপিণ্ডটা উল্টো ডিগবাজি খেয়ে ঠেকল গলার কাছে।

মেঘমন্দ্র কণ্ঠস্বর শোনা গেল পেছনে---সুস্বাগতম উগ্রবল্লভ!

বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালেন জগমোহন।

দ্বারপথে দাঁড়িয়ে শ্বেতবসন এক বৃদ্ধ। মাথার চুল থেকে পায়ের নাগরা পর্যন্ত ধবধবে সাদা। সাদা চোখের ভুরুর অঙ্গের পিরান এবং চোস্ত পায়জামা অনামিকার আংটিতেও বসানো সাদা মুক্তো।

ঝকমকে সাদা বাঁধানো দাঁত বার করে হাসলেন শ্বেতকায় বৃদ্ধ। আনন্দময় নির্মল হাসি। বয়েসের ভারে ঈষৎ কুব্জ দেহটাকে চৌকাঠ পার করে এনে বললেন—এত বছরেও বিশেষ পালটাও নি।

ঢোক গিলে বললেন জগমোহন—আপনি?

তোমার কাকা। চিনতে পারছো না?

আজ্ঞে না। নাম?

কি আশ্চর্য। বিশ বছরে এ বিস্মৃতি? নওল কিশোরের ব্রেন কিন্তু এখনো অত ডাল হয়নি. উগ্রবল্লভ। হায়, হায় হায়।

নওল কিশোরবাবু আপনি ভুল করছেন। আমি আপনার ভাইপো নই।

হায় হায় হায়। আবার সেই পাগলের হাসি। সত্যিই পাগল নাকি নওল কিশোর। বাতাসে মাথা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে এলেন সামনে। উগ্র এখনো আমার চোখে ছানি পড়েনি। মেমারিতেও না। বলে কাছে এসে তীক্ষ্ণ চোখে ঠাহর কবলেন জগমোহনকে।

এবার নিশ্চয় ভুলটা বুঝতে পারছেন? কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললে জগমোহন। আমার নাম জগমোহন! রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার। আপাততঃ পাইভেট ডিটেকটিভ। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। টায়ার ফেটেছে। তাই একটা বাড়তি চাকা বা রাতের আশ্রয়ের জন্যে এসেছিলাম।

জগমোহন! বিড় বিড় করলেন নওলকিশোর।

আজ্ঞে, দরজা খোলা দেখে ভাবলাম ডাকাডাকি করি। কিন্তু ঘণ্টা বাজালাম, ডাকলাম—কারও সাড়া পেলাম না। তাই ভেতরে ঢুকে দেখছিলাম বিপদ আপদ হয়েছে কিনা। ফোন খুঁজছিলাম পুলিশকে ডাকব বলে। এমন সময়ে—

পুলিশকে ডাকবেন! কেন?

খান কয়েক ঘব দেখেই বুঝেছি এ বাড়িতে দামী জিনিস ঠাসা। চোর আসতে কতক্ষণ? খোলা দরজা দিয়ে আমি যদি ঢুকে পড়ি তো চোর কেন—

দুঃখিত। আমার উচিত ছিল অভ্যর্থনা জানানো। কিন্তু—

না, না, অত সংকোচ করবেন না। চোরডাকাত ঘেঁটে ঘেঁটে অপরাধের গন্ধ আগে থেকেই পাই কিনা। তাই ভাবলাম—

গন্ধ! হঠাৎ নাক তুলে বাতাস শুঁকলেন নওলকিশোর। গন্ধ! কিসের গন্ধ বললেন?

আজ্ঞে অপরাধের।

আবার বাতাস শুঁকলেন বৃদ্ধ—বারুদ বারুদ গন্ধ পাচ্ছি না?

বারুদের গন্ধ! চনমন করে উঠল জগমোহনের গন্ধেন্দ্রিয় কই না তো।

কিন্তু আমি পাচ্ছি! উগ্র যে বারুদ নিয়েই থাকে দিন-রাত-মাস-বছর। ফুটফাট গুমগাম—এই হ'ল ওর ব্যবসা। তাই ওর গায়ে এত বারুদের গন্ধ হাঃ হাঃ হাঃ!

হাঁ করে চেয়ে রইলেন জগমোহন। নওলকিশোর নিঃসন্দেহে পাগল।

এসেছে, উগ্র এসেছে, তাই তো পাচ্ছি বারুদের গন্ধ।

ওঁরই বুঝি আজ আসবার কথা আছে?

আরে হ্যাঁ! তাইতো ঘরদের সাজিয়ে বসে আছি। মুহূর্তে ম্লান হয়ে গেল বৃদ্ধের মুখচ্ছবি। বিশ বছব ধবে এমনি ভাবে বসে আছি।

বিশ বছর! রোজ এইভাবে আলো জ্বালিয়ে খাবার সাজিয়ে বসে আছেন?

না, না, রোজ কেন। শুধু ওর জন্মদিনে।

কেন?

কি মুস্কিল! এ তল্লাটেব কাকপক্ষীরাও তো জানে উগ্রবল্লভ বলেছে অজ্ঞাতবাস থেকে দেশে ফিবরে তাব যে কোনো একটা জন্মদিনে রাত একটার সময়ে?

আজ্ঞে, আমি পরদেশী। কি করে জানব বলুন? অজ্ঞাতবাস কেন?

সূচ্যগ্র চোখে তাকিয়ে বললেন বৃদ্ধ—অত কথা জানার আগ্রহই বা কেন?

চোখের মাত্র ছ'ইঞ্চি দূরে সেই পাগল চাহনি দেখে ঈষৎ সরে এলেন জগমোহন। কাঁধেব ওপর দিয়ে তাই দেখতে পেলেন আস্তে আস্তে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দরজার পাল্লাটা।

সেই সঙ্গে নাকে ভেসে এলো একটা কড়া খোসবাই!

নাক কুঁচকে বাতাস শুঁকতে শুঁকতে চেয়ে রইলেন জগমোহন।

দেখাদেখি বাতাস শুঁকতে শুঁকতে খুশি-খুশি গলায় বললেন নওল কিশোর ঠিক বারুদের গন্ধ—তাই না?

আজ্ঞে না।

রেগে গেলেন নওল কিশোর—বলছি বারুদের গন্ধ!

না আতরের গন্ধ।

বলেই বৃদ্ধের পাশ দিয়ে বেগে দরজার দিকে ধাবিত হলেন জগমোহন। ঝট করে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। নিমেষের জন্যে শুনতে পেলেন বাঁদিকেব একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। চোখ ফিরিয়েই দেখতে পেলেন একটা সাদা শাড়ির আঁচল আটকে রয়েছে অদূরে বন্ধ দরজাব ফাঁকে।

ছুটে গেলেন জগমোহন। কিন্তু হঠাৎ ভেতর থেকে কে যেন টেনে নিল আঁচলটা। দরজা খুলে ফেললেন এক ধাক্কায়।

কিন্তু কেউ নেই। বাতাসে ভাসছে সেই সুরভি।

কড়া আতরের ভারি গন্ধ!

স্থানুর মতো শোবার ঘরে ফিরে এলেন জগমোহন। নওল কিশোর ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন জানালার সামনে।

বাড়িতে সাদা শাড়ি কে পরেন?

সম্বিৎ ফিরল নওলকিশোরের—সাদা শাড়ি? কেউ না। বাড়িতে কেউ থাকে না। আমিও থাকি না। ঝি-চাকর-রাঁধুনি-বামুন—কেউ না।

সে কি? এই মাত্র যে সাদা শাড়ি পরে কেউ দরজা ফাঁক করে আড়ি পেতেছিল এই ঘরে।

নওলকিশোর কিছু শুনতে পেয়েছেন বলে মনে হ'ল না। আপন মনেই বলে চললেন—কেউ থাকে না। রাঁধুনি আমার। আমার বাড়ি থেকেই রেঁধে বেড়ে নিয়ে আসে বছরে একবার—উগ্রবল্লভের জন্মদিনে। আজ সেই দিন। আমিও তাই এসেছি ওকে বরণ করব বলে। যার সম্পত্তি তাকে দেব বলে। এত বড় বাড়ির একমাত্র মালিক সে। ছেলে নেই, সংসার নেই—ওকি!

হঠাৎ কথা থামিয়ে কান খাড়া করলেন নওলকিশোর—শুনতে পাচ্ছেন?

উৎকর্ণ হলেন জগমোহন—কই না তো?

গাড়ির শব্দ হ'ল না? ব্রেক কষার আওয়াজ না?

ফের কান খাড়া করলেন জগমোহন। সত্যি সত্যিই এবার একটা শব্দ ভেসে এলো নিশীথ রাতের বুক চিরে। স্টার্ট নিল মোটর গাড়ি। ফার্স্ট গীয়ার থেকে সেকেন্ড গীয়ারে, স্পীড তুলল থার্ড গীয়ারে।

গাড়িই বটে। চলে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, চলে যাচ্ছে। উৎফুল্ল স্বর নওলকিশোরের। ট্যাক্সি ছেড়ে দিল উগ্র।

চকিত কণ্ঠে বললেন জগমোহন—উনি তাহলে সত্যিই এলেন? আমি ট্যাক্সিটা যদি কোথাও দাঁড়ায়, পেলেও পেতে পারি।

কেন? কেন? কেন? বিশ বছর পরে ভাইপো এলো সব বুঝে নিতে, আপনি চলে যাবেন কেন? আপনি অতিথি, আপনি সাক্ষী, আপনি ডিটেকটিভ—হাঃ হাঃ হাঃ! পুলিশ ডাকতে চাইছিলেন না?

পাগলের কথা শোনবার তখন সময় ছিল না। পাগল নওলকিশোর জানালার সামনে থেকে সরে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছেন জগমোহনকে বেরোতে দেবেন না বলে। তাই উল্টোপথ ধরলেন জগমোহন। গবাদবিহীন খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লেন নিচু ছাদে।

শূন্যপথে অবতীর্ণ হলেন একটি উব্ হয়ে থাকা মনুষ্যদেহের পৃষ্ঠদেশে। বুটের গোঁতা খেয়ে অঁক করল মানুষটি। চকিতে জগমোহন তাকে জাপটে ধরে ছুঁড়ে দিলেন জানালা দিয়ে ঘরের মধ্যে।

মেঝেতে আছাড় খেয়েও তারস্বরে ককিয়ে উঠলেন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী।—নওলকিশোর, নওলকিশোর, এ ভারি অন্যায়। বড্ড লেগেছে আমার।

যাচ্চলে! মুখ দিয়ে বেবিয়ে গেল জগমোহনের। আমি তো ভাবলাম আপনি চোর। ফাঁকা বাড়িতে চুরির ফিকিবে আছেন।

নওলকিশোব মাথা চুলকোতে চুলকোতে এসে বললেন---প্রণবানন্দ, তুমি ওখানে কি করছিলে?

প্যাকাটি চেহারার ছোটখাট বৃদ্ধটি মুখ বেঁকিয়ে শুয়ে শুয়েই বললেন--ইয়ার্কি হচ্ছে।? আমি চোর? নেমন্তন্ন কবার সময়ে খেযাল ছিল না?

নেমন্তন্ন!

মনে নেই? সকালবেলা তোমার লোক গিয়ে বলে এলো না আজ উগ্রবল্লভের জন্মদিন? রাত একটায় সে যদি আসে, মঠের তরফ থেকে আমি যেন তাকে অভ্যর্থনা জানাই? শুধু তোমার ডাকেই এসেছিলাম উঃ, হাড ভেঙে গেল কি না কে জানে! বিষদৃষ্টি জানালার বাইবে দণ্ডায়মান জগমোহনের পানে তাকালেন প্রণবানন্দ।

ট্যাক্সির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে জগমোহন বললে—কিন্তু জানালার নিচে ঘাপটি মেরে বসেছিলেন কেন?

চোব ধরব বলে।

চোব! দেখেছেন?

শুনেছি। আসবার সময়ে বাগানেব মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করছিলাম। এমন সময়ে শুনলাম দু'তিনটে লোক চাপাগলায় ষডযন্ত্র করছে। খুব সম্ভব সঙ্গে সাইকেল এনেছিল। ঠং করে প্যাডেলটা ঘসটে গেল বোধ হয়। অথবা হাত থেকে বাসনপত্র পড়ে গেল। আমি কে রে চেঁচিয়ে উঠতেই ছুটে পালিয়ে গেল। ছুটতে ছুটতে এসে এই দিকে কথাকাটাকাটির আওয়াজ শুনে ভাবলাম—

চোর ধববেন! জগমোহন কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন বৃদ্ধের তপঃকৃশ দেহখানির পানে। চোবই আপনাকে ধরে নিয়ে যেত।

অত সোজা নয়। থিয়েটারি ঢং-এ বললেন নওলকিশোব। ওকে জানেন? কঙ্কালী মঠের অধ্যক্ষ। ওর চাহনীতে ভুত পালায---চোব বেহুঁশ হয়।

শুনে সুখী হ'লাম, হাসি গোপন করে বললেন জগমোহন---হাড়ের ব্যথা এখন তাড়াতাড়ি গেলে হয়। আচ্ছা গুড নাইট।

আচমকা কুলে গেল দরজা। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে একজন দাড়িওলা লোক। না-লম্বা না-বেঁটে। না-কালো না-ফর্সা। ফতুয়ার ওপর ধুতি গাছ-কোমর কবে বাঁধা। কাঁধে তোয়ালে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। গালে দাড়িব দণ্ডকারণ্য। মুখ গম্ভীর। নেশাখোরের চোখের মতো লাল-লাল চোখ দুটিতে কিন্তু অপবিসীম বিস্ময—ভুলুণ্ঠিত প্রণবানন্দ আর জানালার বাইরে জগমোহনকে দেখে।

চিঁ চিঁ করে উঠলেন প্রণবানন্দ—এই তো তোতারাম। সাত সকালে গিয়ে নেমন্তন্ন করে আসোনি, উগ্রবল্লভ এলে যেন হাজিব থাকি?

গম্ভীর গলায় তোতারাম বললে---উনি এসে গেছেন।

যেন একটা শ্বাসরোধী নাটকের ক্লাইমাক্স। চবম উৎকণ্ঠা।

নওলকিশোর, প্রণবানন্দ এবং জগমোহন—তিনজনেই শুধু চেয়ে রইল—কথা ফুটল না মুখে।

দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে থেকে শোনা গেল তোতারামের ভারি গলা—হুজুর এসে গেছেন। টেবিলে বসে আছেন।

হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এলো চড়া গলার ডাক—তোতারাম! বোতলটা খুলবে কে?

যাই হুজুর। ঘাড় ফিরিয়ে সাড়া দিয়েই অন্তর্হিত হ'ল তোতারাম।

অমনি প্রণবানন্দ বললেন নওলকিশোরকে—এইবার তোমার আসল পরীক্ষা।

পরীক্ষা কেন?

তোমার চোখের অবস্থা মোটেই ভাল না। আমি কিন্তু এই বয়সেও চশমা ছাড়া কাগজ পড়ি। তার ওপর তুমি বিশ বছর উগ্রবল্লভকে দেখনি। তোতারাম হালে চাকরী নিয়েছে তোমার—সেও চেনে না উগ্রকে। সাত পাঁচ ভেবেই তো মাঝরাতে ছুটে এসেছি কেলেঙ্কারী বন্ধ করার জন্যে, অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালেন প্রণবানন্দ। ভদ্রলোক বয়ঃবৃদ্ধ হলেও কণ্ঠস্বর বেশ দৃঢ়।

কেলেঙ্কারী! বিমূঢ় কণ্ঠে বললেন নওলকিশোর।

মূর্খ! আজকের তারিখটা মনে আছে? পয়লা এপ্রিল। তাছাড়া, বিশ বছর ধরে আলোর মালা দিয়ে মল্লিক হাউস সাজিয়ে অনেক ঢ্যাঁড়া পিটোচ্ছো। সাত গাঁয়ের লোক জেনে গেছে রাত দুপুরে ফিরবে উগ্রবল্লভ। যদি ওর বদলে আর কেউ আসে?

নওলকিশোর সাদা ভুরুর চুল ধরে নির্মমভাবে আকর্ষণ করলেন—জুৎসই জবাব খুঁজে পেলেন না।

সর্পিল পথে আর একটা কুটিল সম্ভাবনা সহসা উঁকি দিল জগমোহনের মস্তিষ্কে। বললে জানালা দিয়ে ঘরে মুখ বাড়িয়ে—আর যদি না আসে?

তার মানে? বললেন প্রণবানন্দ।

ধরুন উগ্রবল্লভ আর কোনোদিনই এলেন না—তাহলে তাঁর সম্পত্তির মালিক হবে কে?

ঠোঁট কেঁপে উঠল নওলকিশোরের। অব্যক্ত আবেগে থিরথিরিয়ে উঠল গালের মাংসপেশী। কিন্তু কিছু বলার আগেই নিঃশব্দে চৌকাঠে এসে দাঁড়াল তোতারাম। কি যেন বলতে চায়।

কিন্তু তা শোনার আগেই ফুস করে নিভে গেল সারা বাড়ির আলো। নিমেষের মধ্যে তাল তাল অন্ধকার গ্রাস করল মল্লিক হাউসকে।

পরক্ষণেই শোনা গেল উগ্রবল্লভের ক্রুদ্ধ হুঙ্কার—হুঁশিয়ার! ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল একরাশ কাচের সামগ্রী।

রক্তজল করা চীৎকার করে উঠল একটি নারী কণ্ঠ।

পিস্তল নির্ঘোষ শোনা গেল তার পরেই। মাত্র একবার। সারাবাড়ি গমগম করে উঠল সেই আওয়াজে।

তারপর সব নিস্তব্ধ।

লাফ দিয়ে জানালা টপকে ঘরে প্রবেশ করলেন জগমোহন।

অন্ধকারেই হাঁক দিলেন—তোতারাম।

হুজুর?

মোমবাতি আছে?

জবাব দিল না তোতারাম। তবে শোনা গেল ধাবমান চরণধ্বনি। ফিরে এলো পায়ের আওয়াজ। ফস করে জ্বলল দেশলাই এবং মোমবাতি।

কাঁপা শিখায় দেখা গেল ভেটকি মাছের মতো মুখ করে নওলকিশোর চেয়ে আছে ড্যাবডেবে চোখে। প্রণবানন্দ ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন। তোতারাম ভুরু কুঁচকে আছে।

জগমোহন বললেন—কেউ মেনসুইচ অফ করে দিয়েছে। তোতারাম তুমি গিয়ে সুইচ অন কর। চেনো তো?

আজ্ঞে। একদম পেছন দিকে—পাতাল ঘরে।

উধাও হ'ল তোতারাম। মোমবাতিটা দিয়ে গেল জগমোহনের হাতে।

নওলকিশোরবাবু, গলার স্বর শান্ত রেখে বললেন জগমোহন—উগ্রবল্লভবাবু খাবার ঘরে ছিলেন। নিয়ে চলুন।

খাবার ঘরে উগ্রবল্লভের পদযুগলই কেবল দেখা গেল। বাকি দেহটা রয়েছে লাগোয়া ঘরে। মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছেন। ঘাড়ের পেছন দিয়ে গুলি বেবিয়ে যাওয়ার গোল গর্ত। ডানহাত সামনে প্রসারিত। হাতের মুঠোয় স্যাম্পেনের বোতল। সুরার ধারায় মিশেছে সামান্য রক্ত। রক্ত আর কোথাও নেই।

খাবাব টেবিলের খাবার ছিটকে পড়েছে মেঝের ওপব। কাচের বাসন চুরমার।

খুন! চাপা স্বর প্রণবানন্দর। উগ্রবল্লভ খুন হয়েছে।

উগ্রবল্লভই তো? ভাবলেশহীন প্রশ্ন জগমোহনের।

হ্যাঁ।

নওলকিশোরবাবু?

নওলকিশোর হু-হু করে কেঁদে ফেললেন। তাঁর বাকরোধ ঘটেছে।

হাঁটু গেড়ে বসে মৃত ব্যক্তির মুখটা ঈষৎ ঘুরিয়ে মোমবাতিটা কাছে নিয়ে এলেন জগমোহন। বীভৎস দৃশ্য। খুব কাছ থেকে গুলি করার দরুন সারা মুখটা ঝলসে কালো হয়ে গেছে।

আলতো করে মুণ্ডুটা স্বস্থানে রেখে বললেন জগমোহন—আপনার আশঙ্কাই সত্যি হ'ল। এমনভাবে খুন করা হয়েছে যাতে ওকে সনাক্ত করা না যায়।

উত্তেজনায় বাঁ চোখটা ছোট হয়ে এলো প্রণবানন্দর—খুনের মোটিভ তাহলে—

সম্পত্তি, বললেন জগমোহন।

ফোঁপাতে ফোঁপাতে নাক মুছলেন নওলকিশোর—কিন্তু চোর ঢুকেছিল বাড়িতে ঐ দেখুন।

মোমবাতির আলোয় দেখা গেল লাগোয়া ঘরে যেন ঝড় বয়ে গেছে। রাশি রাশি কিউরিও সাজানো ছিল সে ঘরে। দেশ বিদেশের দুষ্প্রাপ্য বস্তু। কিন্তু এখন তা তছনছ অবস্থায় বিক্ষিপ্ত ঘরময়।

একটা সোনালী ফ্রেমের অয়েল পেন্টিং নিক্ষিপ্ত সোফার তলায়, জানালার পাল্লা দুহাট করে খোলা এবং একটি চৈনিক ট্যাপেস্ট্রীর অর্ধেক লুটোচ্ছে গোবরাটের ওপব।

উগ্রবল্লভ চোর ধরতেই দৌড়াচ্ছিলেন। স্যাম্পেনের বোতল হাতে। কিন্তু গুলি খেয়েছেন সামনা সামনি।

একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন জগমোহন। তারপব বললেন মাথা নাড়তে নাড়তে—আশ্চর্য! লাশটা মুখ থুবড়ে পড়ল কেন?

তবে কি রকম ভাবে পড়বে? শুধোলেন প্রণবানন্দ।

চিৎপাত হয়ে! মুখের সামনে থেকে গুলি করলে সেই ভাবেই পড়া উচিত।

বলার সঙ্গে সঙ্গে দপ করে জ্বলে উঠল সারা বাড়ির আলো।

উগ্রবল্লভ মল্লিককে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করলেন জগমোহন।

মধ্যবয়েসী। দোহাবা চেহারা। নিখুঁত বিলাতি পরিচ্ছদ। হিপি ছাঁদের চুল, গালপাট্টা এবং গোঁফ। ফর্সা এবং ভারী মুখ। বেশ মার্জিত, উচ্চবংশীয় মূর্তি।

হলঘরের বন্দুকধারী ছেলেটির ছবির সঙ্গে সাদৃশ্য অতিশয় স্পষ্ট। পাতলা ঠোঁট আব উদ্ধত থুৎনিতে সুগভীর আত্মপ্রত্যয়।

প্রচণ্ড শক খেয়েছেন নওলকিশোর! মৃদু মৃদু মাথা নাড়ছেন এবং অস্ফুট কণ্ঠে মানসিক জল্পনায় নিমগ্ন রয়েছেন। ঘোলাটে দৃষ্টি উদভ্রান্ত।

জগমোহন ওঁকে হাত ধরে নিয়ে এলেন বারান্দায়—টেলিফোনটা কোথায়?

নওলকিশোর আপন মনেই ঘাড ঝটকান দিলেন। শুনতে পেলেন না।

কাঠেব সিঁড়িতে দুমদাম পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। বেগে আবির্ভূত হ'ল তোতারাম।

তোতা, হাঁক দিলেন জগমোহন। টেলিফোন কোথায়?

লাইন কাটা, হুজুব। এইমাত্র দেখে এলাম।

সাইকেল আছে?

আজ্ঞে।

আগে ডাক্তারবাবুকে খবব দাও। তারপর যাও থানায়। বলবে বাডিতে চোর পড়েছে। উগ্রবল্লভ মল্লিক খুন হয়েছেন।

খু-খুন!

জলদি যাও। অসহিষ্ণু কণ্ঠ জগমোহনেব।

চক চক কবে উঠল তোতারামের রক্তচক্ষু। লোকটা নেশা-ভাং করে বোধ হয়! তাই চোখের সাদা অংশে অত রক্তোচ্ছ্বাস। স্খলিত চরণে বারান্দার বেলিং ধরে এগোলো সিঁড়ির দিকে।

পেছন থেকে ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন জগমোহন। অভিনয় নয় তো?

উগ্রবল্লভ মল্লিককে জীবিত অবস্থায় দেখেছে শুধু একজনই—তোতারাম!

নওলকিশোর ততক্ষণে অনেকটা সামলে উঠেছেন। স্বগতোক্তি এবং স্কন্ধ সঞ্চালন বন্ধ হয়েছে। কিন্তু ঘোর কাটেনি।

বলীবর্দ জগমোহন কর্কশ কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললেন—পুলিশ না আসা পর্যন্ত চলুন নিচে গিয়ে বসা যাক।

প্রণবানন্দ পদ্মাসনে বসে পড়েছিলেন মৃত উগ্রবল্লভের পাশে। অপঘাতে মৃত্যু তো। ধ্যানস্থ হয়ে আত্মার শান্তি কামনা করছিলেন।

সহসা চোখ খুলে বললেন—অদ্ভুত! অদ্ভুত!

—কি অদ্ভুত? বললেন জগমোহন।

আগে অন্ধকার হয়েছে, তারপর গুলি চলেছে। অন্ধকারেও লক্ষ্য ঠিক থাকে কি করে?

মুখভঙ্গী করে জগমোহন বললেন—সেটা আমিও ভেবেছি। আপাততঃ নিচে চলুন।

নিচের হলঘরে আসন গ্রহণ করে প্রথমেই জগমোহন শুধোলেন—একটা প্রশ্নের জবাব এখনো পাইনি। উগ্রবল্লভ মল্লিক মারা গেলে সম্পত্তির ওয়ারিশ কে? নওলকিশোরবাবু, আপনি?

নওলকিশোর এবার ধাতস্থ হয়েছিলেন। ঘোলাটে চোখে বিদ্যুৎ ছুটিয়ে বললেন—তার মানে আমিই ওকে খুন করেছি সম্পত্তির লোভে?

আহা-হা, শশব্যস্তে বললেন প্রণবানন্দ—তার মানে কি তাই হয়? আমি নিজের কানে শুনেছি বাগানে চোরেদের ষড়যন্ত্র...।

আমি তার আগেই শুনেছি, সায় দিলেন জগমোহন।

তাহলে তুমি খুনী হবে কেন? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তাছাড়া তুমি তো তখন আমাদের সামনেই।

একজন কিন্তু আমাদের সামনে ছিল না, উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন জগমোহন।

কে বলুন তো?

সাদা শাড়ি পরা একজন মহিলা। গায়ে কড়া গন্ধ মাখেন। আড়ি পাতেন। খুনের সময়ে নিশ্চয় তিনিই চেঁচিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—

চললাম তাঁকে খুঁজতে। বলেই গণ্ডারের মতো মাথা নিচু করে ছুটে গেলেন জগমোহন। খাবার ঘরের আশে পাশের সবক'টা ঘর আঁতিপাঁতি করে খুঁজে অবশেষে শোবার ঘরে পৌঁছোলেন জগমোহন। রূপোর পালঙ্কের ঠিক মাঝখানে চাদরের তলায় যেন একটা পাশবালিশ গোঁজা। অথচ কিছুক্ষণ আগেও চাদর পাতা ছিল টান টান করে। বাতাসে ভাসছে কড়া আতরের খুশবু।

পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন—বেরিয়ে আসুন।

চাদর ঢাকা পিণ্ডটি সহসা প্রাণবন্ত হ'ল। তার বেশি কিছু নয়।

চাদর খামচে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনলেন জগমোহন।

গুটিসুটি শুয়ে শ্বেতবসনা নারী হেসে উঠলেন খিল খিল করে—কেমন জব্দ দুয়ো ধরতে পারে না! বলেই গড়িয়ে গেলেন পালঙ্কের অপর দিকে।

প্রস্তুত ছিলেন জগমোহন। নিমেষে পালঙ্ক বেষ্টন করে হাজির হলেন অপর দিকে এবং দুবাহু পেতে মহিলাকে লুফে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেন মেঝেতে।

বললেন কড়া গলায়—কে আপনি?

মহিলার মুখশ্রী অতীব সুন্দর। যদিও যৌবন বিদায় নিয়েছে। কিন্তু যুবতী অবস্থায় নিশ্চয় তিনি তিলোত্তমা ছিলেন। চুলে পাক ধরেছে এখন। কানে এবং নাকে হীরের গয়না; পরণে সাদা জর্জেটের শাড়ি এবং গলাবদ্ধ ব্লাউজ।

কটাক্ষ হাসলেন মহিলা—আমি? চেনেন না আমাকে? হি-হি-হি! আমি এ বাড়ির বারবউ গো! ঐ যে উনি...এই মাত্তর যিনি স্বগগে গেলেন...আমি যে ওঁর রক্ষিতা!

সূচ্যগ্র হ'ল জগমোহনের কঠোর চাহনি—উগ্রবল্লভ মল্লিকের মৃত্যু আপনি দেখেছেন?

দেখেছি মানে? চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ফের কাচভাঙা হাসি হেসে উঠলেন মহিলা—দেখেছি কি গো? মেরেছি। নিজের হাতে মেরেছি! পেটের মধ্যে ছেলে ঢুকিয়ে দিয়ে পালিয়ে ছিল না?

একরাশ কাচের বাসন ভেঙ্গে পড়লে যেমন তীক্ষ্ণ ঝনঝনানি শোনা যায়, অবিকল সেই রকম হাসি হেসে উঠলেন রাতের রহস্যময়ী। হাসতে হাসতে দুপাট ভাঁজ হয়ে লুটিয়ে পড়লেন রূপোর পালঙ্কে।

নিথর দেহে দাঁড়িয়ে রইলেন জগমোহন। পাগলের কারখানায় প্রবেশ করেছেন তিনি। কে এই মহিলা?

প্রশ্নটা মনেই ছিল, কিন্তু জবাবটা এলো দোরগোড়া থেকে।

—গার্গী! এই গার্গী! কি হচ্ছে এত রাতে?

বক্তা নিঃসন্দেহে চিকিৎসা ব্যবসায়ী। শুকনো খট খটে ককলাস বপু। বয়স হয়েছে। গলাবন্ধ ব্রাউন কোটের পকেটে স্টেথিসকোপ। প্যান্ট নয়, মালকোছা মেরে ধুতি পরেছেন। পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার তো—বোধহয় সাইকেল চালিয়ে এসেছেন। মাথায় টাক। গালে খোঁচা দাড়ি। অসময়ের শয্যাত্যাগের দরুণ ফুলো চোখে একরাশ বিরক্তি। পাশে দাঁড়িয়ে উৎকণ্ঠিত প্রণবানন্দ।

হেঁচকি তোলার মতো শব্দ করে হাসি থামিয়ে ফেললেন গার্গী—কে? অ, ডাক্তারবাবু। আসুন, মিনসেকে যমের বাড়ি পাঠিয়ে এলাম। যান, ফিরিয়ে আনুন। পরক্ষণেই সেই ঝনঝনে হাসি।

ব্যাজার মুখে এগিয়ে এলেন ডাক্তার। পেছনে প্রণবানন্দ। দুজনে দুদিকে থেকে গার্গীর দু বাহু চেপে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন বাইরে।

কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? পুলিশ আসছে যে! পেছন পেছন গিয়ে বললেন জগমোহন।

ঘুম পাড়াতে! ছোট্ট জবাব ডাক্তারের।

হলঘরে ঠোঁট কামড়ে বসেছিলেন নওলকিশোর। প্রণবানন্দকে নিয়ে নেমে এলেন জগমোহন। ডাক্তার ওপরের ঘরে ছুঁচ ফুঁড়ছেন উন্মাদিনী গার্গীকে।

গার্গী কি সত্যিই উগ্রবল্লভের রক্ষিতা? স্পষ্ট গলায় শুধোলেন জগমোহন।

ঢোক গিললেন নওলকিশোর। প্রণবানন্দ আমতা আমতা করে যা বললেন তা এই ঃ

উগ্রবল্লভ চিরকালই উগ্র। প্রচণ্ড একগুঁয়ে। রাগী। বদমেজাজী। ছেলেবেলা থেকেই তীর-ধনুক, বন্দুক বল্লম নিয়ে খেলা করেছে বাগদী, ভীল আর বাপের কাছে।

বাবা পুরন্দরবল্লভের দুই বিয়ে। প্রথম পক্ষের একমাত্র ছেলে উগ্র। বিপত্নীক হওয়ায় বছরখানেক পর যাকে বিয়ে করেন, তাকে মল্লিক হাউসে আনেন নি পাছে উগ্রবল্লভ সতীনের বিষদৃষ্টিতে কষ্ট পায়। মাইল দশেক দূরে বৈশালী মঞ্জিল বাগান বাড়িতে থাকত দ্বিতীয় পত্নী। দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেকে সেই বাড়ি উইল করে দিয়েছেন পুরন্দরবল্লভ।

এই বাড়ি দিয়েছিলেন উগ্রকে। কিন্তু বাড়ি ভোগ করতে পারল না সে। প্রথম যৌবনেই

স্থানীয় স্কুল মাস্টারের ষোড়শী মেয়ে গার্গীর সঙ্গে প্রচণ্ড প্রণয় হ'ল। গার্গী আসামান্য সুন্দরী। স্কুলমাস্টার বাধা দিতে সাহস পেলেন না।

মেয়েকেও আটকাতে পারলেন না। কলকাতায় পালিয়ে গেল দুজনে। ফিরে এলো দিনসাতেক পরেই। বাঘের বাচ্চা বাঘই হয়। তাই দোর্দণ্ড প্রতাপ পুরন্দর বল্লভের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে উগ্র বললে—গার্গী, আমার বিয়ে করা বউ। ওকে ঘরে তুলতে হবে!

পরুন্দর সাফ বলে দিলেন—তুমি যেদিন প্রমাণ করবে ঐ মেয়ে তোমার বউ, সেইদিনই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে তুমি।

তারপর তিনি কলকাঠি নাড়লেন, ঈশ্বর জানেন, রাতারাতি গাঁ ছেড়ে চলে গেলেন স্কুলমাস্টার। তারপর খবরটা ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো।

গার্গী সন্তানসম্ভবা হয়েছে।

পুরন্দর কিন্তু মচকালেন না। তুমুল অশান্তি শুরু হ'ল সংসারে। গার্গীর বর্তমান আস্তানা বার করবার জন্যে অনেক কাণ্ড করল উগ্র। কিন্তু মেয়েটা যেন উবে গেল পৃথিবী থেকে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও জবাব এলো না।

ইতিমধ্যে উগ্রবল্লভের জন্যে পাত্রী অন্বেষণ শুরু করলেন পুরন্দর। বাপের মতলব বুঝে চরম পথ নিলে ছেলে। হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল মল্লিক হাউস থেকে।

চিঠি লিখে গেল বাপকে—গার্গীকে পেলে তবে বাড়ি ফিরবে। না পেলেও ফিরবে—পুরন্দরের মৃত্যুর পর। মুখাগ্নিও করবে না।

পুবন্দর তাতেও ভাঙলেন না। উইলও পালটালেন না। উনি আশা করেছিলেন, কিছুদিন টো টো করে ঘুরে পয়সার খাঁকতি দেখা দিলেই ফিরে আসবে উগ্র। কিন্তু ভুল করেছিলেন।

উগ্র আর ফিরল না। বুক ভেঙে গেল পুরন্দরের। হার্ট ফেল করে মারা গেলেন। তারপরেই একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটল।

আচম্বিতে ফিরে এলো গার্গী। সঙ্গে স্বামী এবং একটি ছেলে। স্বামীও স্কুলমাস্টার। দয়ালু ব্যক্তি। গার্গীর বাবা তাঁর শিক্ষক ছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুশয্যায় মেয়ের ভার নিয়েছিলেন সব জেনেও।

গার্গী তখন পুরো পাগল।

উগ্রবল্লভের ছেলেকে নিজের ছেলে বলে চালিয়ে ছিলেন এই সদাশয় ব্যক্তিই। কিন্তু গাঁয়ের লোক দেখল, বীরবল্লভের চোখ মুখ অবিকল উগ্রবল্লভের মতোই। কিছুই আর গোপনে রইল না। গার্গী নিজেও মাঝরাতে চীৎকার করে পাড়া মাথায় করত। সে নাকি উগ্রবল্লভের রক্ষিতা, আর ঐ বীরবল্লভ তার পাপের ফুল। মরিস না কেন! মরিস না কেন!

বীরবল্লভ কিন্তু মরল না। পিতৃহীন হ'ল হঠাৎ।

তারপর থেকেই কঙ্কালী মঠের দাক্ষিণ্যে মা-বেটার দিন কাটছে। চিরদুঃখিনীব সব ভার নিয়েছেন প্রণবানন্দ।

বীরবল্লভের বয়স এখন বিশ।

উগ্র আর ফেরেনি! বাপের মৃত্যুসংবাদ জেনেছিল। খুড়ো নওলকিশোরকে মল্লিক হাউস দেখাশুনোর ভার দিয়েছে পত্র মারফৎ। আর লিখেছে কোনো এক পয়লা এপ্রিল রাত একটায় সে ফিরে আসবে স্বগৃহে। উন্মাদিনী গার্গী আর জারজপুত্রকে দেখবে তখনি।

নিজের ঠিকানা কিন্তু দেয়নি। কারণ তার ঠিকানা নেই। তবে কানাঘুসোয় অনেক কথাই শোনা গেছে। ভারতের বিস্তীর্ণ পশ্চিম উপকূল বরাবর স্মাগলিংয়ের কারবার খুলেছে উগ্র। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে মাল আনছে ভারতের বাইরে থেকে। শ'খানেক স্পীড বোট, ইলেকট্রনিক আর র‍্যাডার যন্ত্রপাতি নিয়ে শুধু সোনা আমদানিই করেছে পঁচিশ কোটি টাকার মতো। এখন আরম্ভ করেছে কোকেন আর এল. এস. ডি আমদানী। একশ কোটি টাকার বিদেশী মুদ্রার মার্কেট নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে সে একাই। দিশী আর বোম্বাইয়ের বহু ফিল্ম নাকি তারই টাকার নির্মিত। বহু রাজনৈতিক নেতা তারই টাকায় নির্বাচনে নামছে। কাস্টমস অফিসাররা তার বেতনভুক গোলাম।

উগ্রবল্লভ তাই ঠিকানাবিহীন। তাই রাত বারোটা হ'ল তার স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট সময়।

গার্গীর সুস্থতা মাঝে মাঝে ফিরে আসে। সেইরকম একটা মুহূর্ত সে জেনেছে! ফি-বছর পয়লা এপ্রিল রাত একটায় বীরবল্লভের দুর্দান্ত বাপ বাড়ি ফিরবে। ফি-বছর তাই ঐ তারিখে ঐ সময়ে উগ্রবল্লভের দেওয়া হীরের নাকছাবি আর দুল পরে ছুটে আসে মল্লিক হাউসে!

কে জানত উগ্রবল্লভকে খুন করবার বাসনাই এতদিন সুপ্ত ছিল তার উন্মাদ চেতনায়!

নীরব হলেন প্রণবানন্দ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের মতো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল এক সুদর্শন তরুণ। এক দৌড়ে ছুটে এসেছে নিশ্চয়। বেদম হাঁপাচ্ছে।

প্রনবানন্দ বললেন—"এই হ'ল বীরবল্লভ।"

বীরবল্লভ! না বললেও চেনা যায়। উগ্রবল্লভের রবার স্ট্যাম্প তার চোখে মুখে। সেই রকমই রূপবান। ঘাড়ফাটা বুশসার্ট আর তলা-ছেঁড়া পায়জামা তার নিদারুণ আর্থিক কষ্টের সাক্ষী!

জগমোহনের নরুন-চেরা চাহনি অগ্রাহ্য করে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল বীরবল্লভ—"দাদু, মা-কে দেখেছেন?

দম নিয়ে বললেন প্রণবানন্দ—"দেখেছি। একটা ভাল খবর আর একটা খারাপ খবর শোনবার জন্যে প্রস্তুত হন বীর।"

কাঠ হয়ে গেল বীরবল্লভ।

প্রণবানন্দ বললেন—"যার জন্যে তোর এত দুর্গতি, সে ফিরে এসেছে।"

নিমেষে পালটে গেল তরুণের মুখচ্ছবি। শাণিত অধরোষ্ঠ ছুরির মতো বেঁকিয়ে স্টীল কঠোর কণ্ঠে বললে দাঁতে দাঁত পিষে—"এসেছে উগ্রবল্লভ?"

"হ্যাঁ। —এসেই খুন হয়েছে।"

খুন!

তোর মা বলছে, সে-ই খুন করেছে।

মা...খুন করেছে!

হঠাৎ প্রতিবাদ মুখর হলেন নওলকিশোর—"অসম্ভব! গার্গী পিস্তল পাবে কোথায়?"

হতভম্ব মুখে বারকয়েক ঠোঁট নাড়ল বীরবল্লভ। মুখে কথা সরল না। মৃদুস্বরে বললেন

প্রণবানন্দ—"বাড়িতে চোর পড়েছে, বীর। আমি শুনেছি। তোর ইয়ে; উগ্রবল্লভ তাদের হাতেই মরেছে। গার্গী পাগলের মতো চেঁচিয়ে মরছে—"

জগমোহন বলে উঠলেন—"বীরবল্লভ, সংযত হও। একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করব?

কে আপনি?

বেসরকারী গোয়েন্দা। প্রশ্নটা শোনো। উগ্রবল্লভ মল্লিকের ওয়ারিশ কি তুমি?

না, বিনা দ্বিধায় বলল বীরবল্লভ। কারণ দেশশুদ্ধ লোক জানে। মুখ লাল হয়ে গেল শেষকথায়—"আমি ওঁর জাবজ পুত্র।"

কাষ্ঠ হেসে বললেন জগমোহন—ভাল। ওঁকে খুন করে তোমার তাহলে লাভ নেই।

কঠিন হ'ল বীবল্লভের চোয়ালের হাড়—লাভ ছিল বই কি। টাকার নয়—অন্য কিছু।

জানি, আবার শুকনো হাসলেন জগমোহন—উগ্রবল্লভ কিন্তু পুরন্দরবল্লভকে বলেছিলেন, গার্গী আমার বিয়ে করা বউ।

প্রমাণ কী?

প্রমাণ করলেই তো সম্পত্তি চ্যুত হতে হ'ত—শাসিয়ে ছিলেন পুরন্দরবল্লভ। ঠিক কিনা?

ধাঁধায় পড়ল বীরবল্লভ।

জগমোহন দ্রুতকণ্ঠে বললেন— তোমার মা সেই ভয়েই হয়ত কাউকে তা বলতে পারেনি। তারপর পাগল হয়ে গিয়ে—

দাঁড়ান! প্রাণপণে কি যেন মনে করবার চেষ্টা করছে বীরবল্লভ। একটু দাঁড়ান...ভাবতে দিন. .ও হ্যাঁ...মনে পড়েছে.. অনেকদিন আগে ঘুমের মধ্যে মা বক বক করছিল ..ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কথা বলছিল...আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল...স্পষ্ট শুনেছিলাম মা বলছে—বিয়ের কাগজটা দাও না গো. .খোকাকে যে সবাই খারাপ বলছে। ...কিছুক্ষণ পরে ফের চেঁচিয়ে উঠল—ছিন্নমস্তা...ছিন্নমস্তা...! সর্বনাশী। আর কত রক্ত খাবি?

জগমোহন তোৎলা হয়ে গেলেন উত্তেজনায়—কি . কি বললে?

বিয়েব কাগজ?

হ্যাঁ। স্পষ্ট শুনেছি। ভুলতে পারিনি মায়ের ফোঁপানির জন্যে।

বিয়েব কাগজ...মানে ম্যারেজ সার্টিফিকেট... মানে উগ্রবল্লভ গার্গীদেবীকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে তাহলে সিভিল ম্যারেজ করেছিলেন?

কঙ্কালী...কঙ্কালী...এ কি খেলা খেলছিস মা। অকস্মাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রণবানন্দ।

আচম্বিতে কডমড় কড়মড় আওয়াজ শোনা গেল বাইরে। কে যেন আলগা নুড়ির ওপর দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল উর্ধ্বশ্বাসে।

একলাফে হলঘর পেরিয়ে গাড়িবারান্দায় হাজির হলেন জগমোহন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না।

ঘরে ফিবে এলেন তর্জনী আব বুড়ো আঙুল দিয়ে রগ দুটো টিপে ধরে ঘরেটি ফিরে এলেন জগমোহন।

বললেন—চোরের দল এখন যায়নি। পুলিশ না আসা পর্যন্ত কেউ ঘর ছেড়ে বেরোবেন না। পিস্তল নিয়ে ঘুরছে তো।—কিন্তু তোতারাম গেল কোথায়?

তাইতো! যেন প্রাণ ফিরে পেলেন নওলকিশোর। গেল কোথায় তোতারাম?

থানা এখান থেকে কদ্দুর?

মাইল দুই।

পুলিশের ব্যাপার তো। দেশ পাড়াগাঁয়ে খুন হলে গ্রাহ্য করে না। বলে কি ভাবতে লাগলেন জগমোহন। অনেকক্ষণ পরে বললেন চিন্তাঘন স্বরে—ম্যারেজ সার্টিফিকেটটা জোগাড় করতে পারলে কিন্তু বীরবল্লভের একটা হিল্লে হয়ে যেত।

তা হ'ত, সটান হয়ে বসলেন প্রণবানন্দ! কিন্তু তা কোথায়? জানত কেবল উগ্র—

আর তাঁর বউ। বললেন জগমোহন।

গার্গী? অসম্ভব। জানলে বলত বইকি।

বললেই তো স্বামী সম্পত্তি চ্যুত হ'ত। প্রেম কত গভীর হলে এতবড় প্রমাণকে লুকিয়ে রাখা যায় ভাবতে পারেন? নিজে সমাজে হেয় হয়েছেন, ছেলেকে হেয় করেছেন—তবুও স্বামীকে দেওয়া কথার খেলাপ করেন নি। শেষকালে অন্তর্দ্বন্দ্ব সইতে না পেরে পাগল হয়ে গিয়েছেন! জগমোহনের গলায় যেন হাতুড়ি পড়ছে। কিন্তু ঘুমোলে অবচেতন মনের ওপর খবরদারি থাকে না। তাই মনের মধ্যে বলেছেন ম্যারেজ সার্টিফিকেটের ঠিকানা।

আপনি গিয়ে শুনে এসেছেন বোধ হয়? ব্যঙ্গের সুরে বলল বীরবল্লভ।

গায়ে মাখলেন না জগমোহন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—বোকা ছেলে! এসো আমার সঙ্গে।

ঠাকুর ঘর।

তারকা-আকৃতি ঘরের দশ দেওয়ালে দশ মহাবিদ্যার দশমূর্তি। মাথার ওপর একটি মাত্র লাল আলো।

সদলবলে এই ঘরে ঢুকলেন জগমোহন। চকিতের জন্যেও থমকালেন না। হন হন করে গিয়ে দাঁড়ালেন ছিন্নমস্তার সামনে। মস্তকহীনা প্রতিমার কণ্ঠ হতে ফোয়ারার মতো রুধির স্রোত বহু ধারায় উত্থিত হচ্ছে উর্দ্ধমুখে। দেবী স্বহস্তে আপনার মস্তক ছেদন করে বাম করতলে ধারণ করে আছেন। মৃৎশিল্পী প্রায় জীবন্ত করে তুলেছে সেই দৃশ্য। লাল আলোয় সেদিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকা যায় না।

বিনা দ্বিধায় রক্তফোয়ারার উৎসমুখে হাত দিলেন জগমোহন। হাতের পাঁচ আঙুল অদৃশ্য হ'ল একটি ফোকরে।

নিমেষে মুখ কালো হয়ে গেল জগমোহনের। পাগলের মতো আঙুল নেড়ে নেড়ে কি যেন খুঁজলেন। পেলেন না।

শূন্য মুঠি নামিয়ে এনে ভাঙা গলায় খেঁকিয়ে উঠলেন ছিন্নমস্তাকে—মাগো! এতদিন আগলে রাখলি সতীর প্রমাণ—শেষ রক্ষা করতে পারলি না!

কাঠচেরা গলায় কে যেন বলে উঠল পেছন থেকে—এ সব কি হচ্ছে?

বোঁ করে ঘুরে দাঁড়ালেন চারজনে। দরজার ফ্রেমে আবির্ভূত হয়েছে না-লম্বা না-বেঁটে না-কালো না-ফর্সা এক পুরুষ। কোট-প্যান্ট-টাই মানিয়েছে ভাল। লালাভ দ্যুতির মধ্যেও দেখা যাচ্ছে। দাড়ি গোঁফ সদ্য কামানো। আফটার-শেভ লোশনের পেটেন্ট গন্ধ ভাসছে বাতাসে। চোখ দুটি পিঙ্গলবর্ণ এবং পারার মতো পিচ্ছিল। টান করে আঁচড়ানো ছিমছাম চুল।

কে আপনি? প্রণবানন্দ আগে সামলে নিলেন নিজেকে।

আমি? এক পা এগিয়ে এসে বলল আগন্তুক। আমি হরবল্লভ। এই বাড়ির বর্তমান মালিক। উগ্রবল্লব খুন হয়েছে শুনলাম? কণ্ঠস্বরে অসীম তাচ্ছিল্য।

কে বলল?

তোতারাম। বৈশালীমঞ্জিলে গিয়ে সে-ই তো ঘুম থেকে টেনে তুলল আমাকে। লাশ কোথায়?

আমতা আমতা করে বললেন জগমোহন—আপনি.. মানে ।

আপনি আবার কে মশায়? খ্যাঁক করে উঠলেন হরবল্লভ।

আ —আমি—

মুখের কথা মুখেই রইল। আচমকা শোনা গেল পেছনের হলঘরে কে যেন হুড়মুড় করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে চোয়াড়ে গলায় খিস্তি—শালাকে মারব এক তাবড়ি— পরক্ষণেই ছুটন্ত পদ শব্দ সরে গেল দূরে।

ঘাড় ফিরিয়ে শুনছিলেন হরবল্লভ। পায়ের আওয়াজ দূরে সরে যেতেই লাফিয়ে উঠে বললে—চোর! চোর! বলেই দৌড়োলেন হলঘরের দিকে। খপ করে নওলকিশোর চেপে ধরলেন প্রণবানন্দকে—আমাকে একা ফেলে যেও না। জগমোহন আর বীরবল্লভ ক্যাঙারু লাফ মেরে ছুটলেন হরবল্লভের পেছনে।

গাড়িবারান্দায় এসে জগমোহন দেখলেন, ঝাউগাছের তলায় ঝটাপটির শব্দ হচ্ছে। তারস্বরে চেঁচাচ্ছে হরবল্লভ—পাকড়াও! পাকড়াও!

তীরবেগে সেই দিকে ছুটলেন দুজনে।

ঠাকুরঘরে দাঁড়িয়ে পর পর দুবার পিস্তলের নির্ঘোষ শুনলেন প্রণবানন্দও নওলকিশোর।

একটু পরেই ঝড়োকাকের বিপ্রস্ত বসনে টলতে টলতে হলঘরে ঢুকলেন হরবল্লভ।

সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে! চোরেরা পিস্তল চালিয়ে খুন করেছে জগমোহন আর বীরবল্লভকে! একা হরবল্লভ ধরে রাখতে পারেনি তিনজনকে!

পুলিশ এলো ভোরবেলা।

সরেজমিন তদন্ত করে তারা দেখল, চোর পড়েছিল বাড়িতে। সশস্ত্র চোর। বাধা পেয়ে খুন করেছে তিনজনকে এবং তিন জনেরই দেহে ফুঁড়ে গিয়েছে একই পিস্তলের গুলি। প্রণবানন্দ স্বকর্ণে দু'দুবার শুনেছেন অন্দের পিঠটান দেওয়ার শব্দ। একবার আসার সময়ে বাগানে — আর একবার ঠাকুরঘরে দাঁড়িয়ে হলঘরে।

তোতারাম পালিয়েছে। সম্ভবত চোরেদের সাগরেদ ছিল সেও। কিন্তু খুন জখম সে চায়নি। তাই উগ্রবল্লভ খুন হয়েছে শুনে চম্পট দিয়েছে প্রাণের ভয়ে।

শেষ হ'ল চন্দ্রবল্লভের কাহিনী। অন্ধকার ঢেকে রাখল তার মুখকে— শোনা গেল কেবল নির্মম কণ্ঠ—ইন্দ্রনাথবাবু এবার বলুন তো খুনী কে?

ইন্দ্রনাথ চাইল হরবল্লভের পানে। হাপরের মতো শব্দ করে শ্বাস টানছেন ভদ্রলোক। ঘরে এত অক্সিজেন—কিন্তু তাঁর ফুসফুসে যেন এককণা অক্সিজেনও পৌঁছোচ্ছে না। পিঙ্গল চোখ দুটো ফাঁসি বদ্ধ মৃত্যুপথ যাত্রীর মতো ঠেলে বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে। পিঠখানা ধনুকের

মতো বেঁকিয়ে চেয়ে আছেন অন্ধকারের পানে—সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর বংশের শেষ পিদিমখানি।

ইন্দ্রনাথ বুকভরা শ্বাস নিয়ে বললে—চক্রান্তটা অনেকদিনের। ফি-বছর পয়লা এপ্রিল একইভাবে চক্রান্তের জাল বিছিয়ে বসা হ'ত। সেই জালে উগ্রবল্লভ খুন হয়ে গেলেই লোকে জানত বাড়িতে চোর পড়েছিল—বাধা দিতে গিয়ে খুন হয়েছেন তিনি। সাক্ষী থাকতেন প্রণবানন্দ—চোরদের কথাবার্তা আর পালানোর আওয়াজ তাঁকে শোনানো হয়েছিল ঐ কারণেই। টেপরেকর্ডে চোরেদের ফিসফিসানি আর পালানোর আওয়াজ তোলা ছিল। ম্যাগনেটিক টেপ আর টাইম সুইচ দিয়ে নাটকীয়ভাবে মেনসুইচ অফ করে দিয়ে খুনের দৃশ্য কল্পনায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নিটোল চক্রান্ত। কিন্তু তবুও এক কলসী দুধে তিনফোঁটা চোনা থেকে গিয়েছিল। থামল ইন্দ্রনাথ। চন্দ্রবল্লভ হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছেন।

বলল ইন্দ্রনাথ—এক কলসী দুধে একফোঁটা চোনা-ই যথেষ্ট। তিন ফোঁটায় যাচ্ছিল সব গুবলেট হয়ে।

এক—উগ্রবল্লভের ছেলেবেলার ছবিতে দেখা গিয়েছিল, তিনি ল্যাটা। তাই বাঁ কাঁধে বন্দুক রেখে ছুঁড়ছেন। অথচ মৃত্যুকালে তিনি ডানহাত বাড়িয়ে মারতে যাচ্ছিলেন। আগে থেকে খুন করে এনে ঐভাবে যে তাকে শুইয়ে রেখেছিল, সে জানত না। উগ্রবল্লভ ল্যাটা। অন্যত্র নিহত হয়েছিলেন বলে অত কম রক্ত পড়েছিল খাবার ঘরে। তাছাড়া সামনে থেকে গুলি খাওয়া লাশকে উচিত ছিল চিৎ করে শোয়ানো। জগমোহন গোড়া থেকেই বুঝেছিলেন খুনটা সাজানো।

দুই—জগমোহন যখন বাড়িতে, তখন শুনেছিলেন, চোরেদের ফিসফিস ষড়যন্ত্র, ঠং করে একটা শব্দ এবং ছুটে যাওয়া আওয়াজ। হুবহু একই শব্দ পরম্পরা শুনলেন প্রণবানন্দ। প্রথমে রিহার্সাল হচ্ছিল। মেন সুইচ নিভিয়ে সারা বাড়ি অন্ধকার করে দেওয়ার মহড়া চলবার সময়ে জগমোহন প্রবেশ করেছিলেন। তাই ওর ঘণ্টাধ্বনি আর হাঁকডাক অতবড় বাড়ির একদম পেছনদিকে পাতাল ঘরে সুইচ বক্স পর্যন্ত পৌঁছয়নি। দু'দুবার একই শব্দ পরম্পরা শুনে জগমোহন বেশ বুঝলেন, চুরির ব্যাপারটাও সাজানো। কাঁচের বাসনগুলো কেবল ভেঙেছে উন্মাদিনী গার্গী।

তিন—গভীর রাতে হরবল্লভ আর্বিভূত হলেন মল্লিক হাউসে দাড়িগোঁফ পরিষ্কারভাবে কামিয়ে। আফটার শেভ লোশনের কড়া গন্ধই তার প্রমাণ। কেন? না, তোতারামই হরবল্লভ। পিঙ্গল চোখ ঢাকবার জন্যে লালচে কনট্যাক্টলেন্স পরে থাকতেন। মাথায় ঝাঁকড়া চুল আসলে সিনথেটিক ফাইবারের পরচুলা। পাঁচশ টাকা দিলেই পাওয়া যায়। দাড়ি গোঁফ রেখেছিলেন আরো একটি কারণে। সেটা পরে বলছি। জগমোহনটি যদি এই বিষয়টি আগে আঁচ করতে পারতেন, বেঘোরে মরতে হ'ত না।

হরবল্লভ ষড়যন্ত্র করেছিলেন খুড়োমশায় নওলকিশোরের সঙ্গে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে উগ্রবল্লভকে সরিয়ে ভাগাভাগি করে নেবেন মল্লিক হাউস।

নওলকিশোর কিন্তু সত্যিই পাগল নন। ভাল অভিনেতা। কথাবার্তার নাটুকে ঢঙ তার প্রমাণ।

দুজনের কেউই কিন্তু জানতেন না, উগ্রবল্লভের বিবাহ আইন সম্মত এবং বীরবল্লভ তাঁর

উত্তরাধিকারী। দাড়ি গোঁফ চেঁচে ফেলে তোতারাম যখন হরবল্লভ সেজে আসছেন, দৈবাৎ কানে গেল বীরবল্লভের কথা। বিয়ের সার্টিফিকেটটা ছিন্নমস্তার হেপাজতে আছে বুঝতে পেরেই ছুটে গিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন বারান্দা দিয়ে। ছিন্নমস্তার গোপন ফোকর থেকে কাগজ সরিয়ে নিয়ে ঐ পথেই বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

সার্টিফিকেটা নষ্ট করে ফিরলেন হলঘর দিয়ে। জগমোহনকে খুন করা দরকার—তিনি আঁচ করে ফেলেছেন ষড়যন্ত্র। খুনের সাক্ষী রাখবেন না বলে খুন করতে হ'ল বীরবল্লভকেও। দুজনকে ভুলিয়ে নিয়ে গেলেন বাগানে চোরেদের কথা নকল করে—ঠিক যেভাবে তোতারাম সেজে সবার সামনে দাঁড়িয়ে উগ্রবল্লভের হাঁক নকল করে শুনিয়ে ছিলেন প্রণবানন্দকে।

হরবল্লভ মল্লিক, আপনি অতিশয় ধূর্ত। কিন্তু জগমোহন আপনার আর একটা গুণের খবর রাখতেন না। আপনি ম্যাজিক পার্টিতে ভেনট্রিলোকুইস্ট ছিলেন। মুখ চেপে বুকের মধ্যে থেকে কথা বার করতে পারতেন নাকের ফোকর দিয়ে। এই স্বরকে দূরে নিক্ষেপ করতে পারতেন। মনে হ'ত যেন দূর থেকে কেউ কথা বলছে, ফিসফিস করছে। এ বিদ্যা যারা জানে, মনে হয় তারা ভূত নামাতে পারে—ভূতকে দিয়ে কথা বলায়। কিন্তু আদৌ তা নয়। বিশেষ কয়েকটি শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম নিয়মিত অভ্যেস করলে যে-কেউ এ বিদ্যে রপ্ত কবতে পারে।

আপনি দূরায়ত স্বর নিক্ষেপ মোটামুটি জানতেন। পাছে ঠোঁটের সামান্য নড়াচড়াও কেউ দেখে ফেলে; তাই দাড়ির জঙ্গল রেখেছিলেন। এইভাবেই নকল কবেছিলেন উগ্রবল্লভেব হাঁক। দ্বিতীয়বাব ঠাকুরঘরের লাল আলোয় সুবিধে হয়ে গেল। হুড়মুড় করে পড়ে যাওয়ার শব্দটা মুখ না ফিবিযেই নাক দিয়ে বার করলেন—কিন্তু চোরেদের কথাবার্তা গুলো শুনিয়ে দিলেন ঘাড় ফিরিয়ে—যাতে ঠোঁট না দেখা যায়। ভেনট্রিলোকুইজম ভালভাবে জানা থাকলে কিন্তু ঠোঁট পর্যন্ত নড়ত না আপনার—এত সাবধানতাবও দবকার হ'ত না।

বুক ভরা শ্বাস নিয়ে শেষ করল ইন্দ্রনাথ—জমিদার হরবল্লভ মল্লিক, আপনি তখনো জানতেন না, মৃত্যুই সব শেষ নয়। তাই বিধাতা বড় বিপাকে ফেলেছেন আপনাকে। সম্পত্তি দেবেন না বলে যাকে শেষ করেছিলেন, সে তো শেষ হয়নি। ঐ দেখুন বীরবল্লভ ফিরে এসেছে এস্টেটের দখল নিতে, পারবেন এখন ওকে খুন করতে?

শুধু দুবার বিশ্রী হেঁচকি তুলে কাত হয়ে পড়লেন হরবল্লভ। চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল ফোঁটা ফোঁটা রক্ত।

ছায়ামায়া থেকে বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিল চন্দ্রবল্লভ—ডাক্তার ডাকুন ম্যানেজারবাবু, কাকা হার্টফেল করেছেন।

# হাতের রেখায় খুন

## কবিতা সিংহ

দার্জিলিং-এ তখন সিজন চলছে।

অনুপম হঠাৎ বলে বসল, চল অসিত, দার্জিলিং যাওয়া যাক।

আমি বললাম, হোটেলে জায়গা পাবি?

অনুপম আমার হাতটা ধরে বলল, দেখি হাতটা, তারপর খুব নিরীক্ষণ করে দেখছে এইভাবে খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করে, দেখে বলল, যা হোক একটা জুটে যাবে, দেখিস!

এতএব বাক্স বিছানা বেঁধে দার্জিলিং।

বলতে ভুলেছি, অনুপম ভাগ্য-গণনা করে। আর ভাগ্য-গণনার সূত্রে বহুরকম মানুষের সঙ্গে তার চেনা-জানা, আলাপ-পরিচয়। দুর্বল মুহূর্তে বহু মানুষ তাদেব মনেব কথা অকপটে বলে ফেলে অনুপমকে, গোপন বাসনা জানিয়ে ফেলে।

আর সত্যিকথা বলতে কি, যদিও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু অনুপমকে আমি দারুণ বিশ্বাস করি। যারা তাকে হাত দেখায় তাদের মতে, অনুপম নাকি দারুণ ভবিষ্যৎ-গণনা করতে পারে।

দার্জিলিং গিয়ে যখন কোনো হোটেলে জায়গা পাওয়া গেল না, তখন অনুপমকে ক্লান্ত শ্রান্ত গলায় কথা শোনাতে ছাড়লাম না। বললাম, কি খুব যে হাত দেখে বলেছিলি একটা কিছু জুটে যাবে!

যাঃ, সে তো ঠাট্টা করেছিলাম। কিন্তু সত্যি বলতে, এখন কোথায় যাই? যেমনি খিদে পেয়েছে, তেমনি ঘুম!

হেটেলেব গেটের বাইরে স্যুটকেশ আর বেডিং রেখে আমরা দুজন ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছিলাম। একজন স্যুট পরা ভদ্রালোক অনুপমকে দেখে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে বললেন, আরে? অনুপম না?

অনুপম লাফিয়ে উঠে বলল, অনিল চৌধুবী!

হোটেলে জায়গা পাস নি তো, বেশ হয়েছে। থাক ঠাণ্ডায় বসে। সারারাত বাইরে বসে জমে শক্ত হয়ে যা!

অনুপম এবার নিজের মেজাজ ফিরে পেয়েছে। হেসে বলল, তুই এখানে আছিস? তাহলে আর হোটেল খুঁজবোই বা কেন?

নে চল তোব আস্তানায় উঠি।

# হাতের রেখায় খুন

পথে যেতে যেতে অনিল চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় করেয়ে দিল অনুপম। পদস্থ সরকারী কর্মচারী দার্জিলিং-এ পোস্টেড।

অনুপমের কলেজ-জীবনের বন্ধু। মনে হ'ল এককালে খুব দহরম মহরম ছিল দুজনের। অনুপমকে দেখে দারুণ খুশি হয়ে গেছেন ভদ্রলোক।

ফাউ আমাকে দেখেও অখুশি হন নি।

আমার দিকে ফিরে অনুপম গর্ব ভবে বলল, দেখলি হাত দেখতে জানি, কি জানি না? জায়গা জুটে গেল কিনা বল?

আমি বাধ্য হয়ে বললাম, জানিস বাবা জানিস, হ'ল!

আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন অনিল চৌধুরী। এবার সরব হয়ে বললেন, ধোৎ, ও কিছু জানে না। কলেজ লাইফে আমরা ছিলাম ওর জ্যোতিষ বিদ্যাচর্চার গিনিপিগ। হাত দেখে যত সব হাবিজাবি বলত। আমার সম্বন্ধেও অনেক বাজে কথা বলেছে, একটিও মেলে নি।

অনুপম উত্তেজিত হয়ে বলল, এই, মেলে নি, বল আমি বলি নি তুই রাজকার্য করবি?

হ্যাঁ।

তোব অনেক টাকা হবে, পিতৃকুলের বিষয় পাবি অনেক!

তা অবশ্য পেয়েছি!

বলি নি, তোর বিদেশ যাত্রা হবে?

হ্যাঁ তাও হয়েছে অবশ্য!

তবে?

অনিল চৌধুরী এবাব সলজ্জভাবে বললেন, যাঃ, সে সব কি আব বলা যায়, আরো যে সব বলেছিলি! অসিতবাবুর সামনে, প্রথম আলাপেই বলতে কি বকম যেন সঙ্কোচ হচ্ছে!

সঙ্কোচের কিছু নেই, ও আমার প্রাণেব বন্ধু, তুই যেমন ছিলি কলেজ লাইফে। ওব কাছে আমি কিছুই গোপন করি না।

অনিল চৌধুরী এবাব একটু অপ্রস্তুতের মতো হাসলেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত সুপুরুষ। সুন্দর সাজানো দাঁত। এমন সাজানো, হাসলে ভাবি সুন্দব দেখায়।

না, মানে আমার লাভ-লাইফ, ম্যারেড-লাইফ সম্বন্ধে তুই যা বলেছিলি!

কেন? মেলে নি বলতে চাও? অনুপম কটমট করে অনিল চৌধুরীব দিকে তাকিয়ে ছদ্মরাগে ফেটে পড়ে বলল, নাঃ ধোয়া তুলসী পাতা তুমি বুকে হাত দিয়ে বলো, স্ত্রীঘটিত কোনো প্যাঁচে পড়ো নি তুমি? বিলেতে, কলকাতায় চাকরির জায়গায়?

সে অমন অনেকেই পড়ে, কিন্তু আমার স্ত্রী!

হ্যাঁ তোমার স্ত্রী! বলো! বলো!

বলতে আর হ'ল না। সামনেই চমৎকাব গেট। বাগান, মরশুমি ফুলে সাজানো মস্ত বাংলো প্যাটানেব বাড়ি। একেবারে গেটের কাছে উৎকণ্ঠিত মুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন যিনি, তিনিই অনিল চৌধুরীব স্ত্রী।

স্ত্রীকে দেখে মুহূর্তেই মুখেব চেহারা বদলে গেল অনিল চৌধুরীর। মুখের রেখাগুলো কেমন ভালোবাসায়, শান্তিতে, নির্ভরতায় নরম হয়ে গেল।

*মিনতি, অনুপম রায় আর অসিত মিত্র, আমার বন্ধু, হোটেলে জায়গা পান নি। খুব শিক্ষা হয়েছে, তাই তোমার কাছে নিয়ে এলাম।*

গেট খুলে হেসে মিনতি বললেন, বেশ করেছো, আসুন, ভিতরে আসুন! তাঁর মুখখানিতে লাবণ্যের আলো মাখানো। ভারি কোমল চেহারা। হাতীর দাঁতের মতো ফর্সা গায়ের রঙ। দাঁতগুলি ঝক ঝকে সাজানো। পাতলা দুটি ঠোঁটে হাল্কা গোলাপীর ছোঁয়া। দেখলে প্রথমটা মনে হয় ঠোঁটে রঙ দিয়েছেন। পরে সদ্যস্নাতা মিনতিকেও দেখেছি। অমনি পাতলা রঙিন ঠোঁট, গোলাপী গাল। ঠোঁটের গালের স্বাভাবিক রঙ অম্লান রয়েছে।

চাপা গলায় অনিল চৌধুরী অনুপমকে বললেন, ইউ আর রঙ মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, ইজ নট এ ফিয়াড, বাট এন এ্যাঞ্জেল!

এ্যাঞ্জেল তো বটেই। পরনে হাল্কা হলুদ রঙের শালের শাড়ি। শাড়ির ওপর গরম কোট। কোটের ওপর পশমের চাদর। লম্বা বিনুনী, কোমর ছাড়িয়ে আরো নিচে নেমেছে। গায়ে গোলাপী নাইলনের মোজা আর মখমলের নেপালি চটি।

বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমাদের আরো ভাল লাগল। চমৎকার সাজানো ড্রাইংরুম, ডাইনিং রুম, এমনকি গেস্ট রুম দুটিও সুন্দর সাজানো। যেন মিনতি চৌধুরী জানতেন আজ সন্ধ্যায়, অবেলায় আমরা এসে পড়বো।

আমরা মিনতির প্রশংসায় সবর না হয়ে পারলাম না। দুজনে মিলে একটি গেস্ট রুমেই আশ্রয় নিলাম। আর একটি খোলা হলেও সেটিতে গেলাম না।

রাতে মিনতির রান্না করা পোলাও আর মুরগির মাংস খেয়ে উদগার তুলতে তুলতে আমরা তিনজন পুরুষ ড্রইংরুমে বসলাম। মিনতি আর এলেন না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, এবার আপনাদের স্টাগ পার্টি চলুক আমি শুতে যাচ্ছি।

মিনতি চলে যেতেই অনিল চৌধুরী বললেন, ব্রাণ্ডি চলবে?

খাওয়ার পর সত্যিই বেশ শীত করছিল। অনুপম বলল, হোক না, একটু মেডিকেটেড ডোজ।

অনিল চৌধুরী উঠে বেয়ারাকে ব্রাণ্ডি দিতে বলতে গেলেন। সেই ফাঁকে নিচু গলায় আমি অনুপমকে প্রশ্ন করলাম, ওর বৌ সম্বন্ধে ওকে কি ভবিষ্যতবাণী করেছিলি?

কি আবার বলবো? বলেছিলাম, তোমার বৌ হবে মার্ডারেস, খুনী!

আমি চমকে উঠে বললাম, কি বলছিস তুই!

ঠিকই বলছি, অনিলের হাতে ভীষণ স্ট্রং সাইন আছে। কোষ্ঠীতেও। ও চিহ্ন বদলাবার নয়।

কিন্তু তুই মিনতি চৌধুরীর হাত দেখেছিস?

দেখেছি।

কখন?

যখন খাবার পরিবেশন করছিলেন। হাত পেতে হাতে চিনি ঢালছিলেন, দেখেছি।

কি দেখেছিস?

সি ইজ এ মার্ডারেস, খুনী!

যাঃ আমি বিশ্বাস করি না।

আমি করি। তবে চিহ্নটা ম্লান হয়ে এসেছে। হয়তো ও খুন করেছে অলরেডি!

আমি আরো প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম, অনিল চৌধুরী ঢুকলেন, সঙ্গে বেয়ারা। আর ট্রেতে তিন গ্লাস সত্যিই মেডিকেটেড ডোজে, ব্রাণ্ডি।

ব্রাণ্ডিতে চুমুক দিতে দিতে সোফায় ডুবে গিয়ে অনিল চৌধুরী বললেন, মন খারাপ করিস না অনুপম, সব গণনা তো আর মেলে না। বল, এতক্ষণ দেখলি তো মিনতিকে, বল কত ভাল বৌ পেয়েছি আমি! তোর গণনা-টনটা মিলল না আর। বুঝলি!

অনুপম চুপচাপ ব্রাণ্ডিতে চুমুক দিতে দিতে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

অনিল চৌধুরী চাপা গলায় বলল, জানিস এই একটি মেয়ে, মিনতি, আমার সমস্ত জীবনটাকে কি ভাবে বদলে দিয়েছে?

ক্লান্ত গলায় অনুপম বলল, বৌ-এর প্রশস্তি করার আর সময় পেলি না অনিল! তার চেয়ে বরং এখন জমিয়ে একটা ভূতের গল্প কর।

আরে তাই-ই করছি। সত্যি, ভূত-টুত আমি বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু আজকাল করি। জানিস মিনতির জীবনের সঙ্গে একটা অদ্ভুত অলৌকিক রহস্য ছড়িয়ে আছে। সেই রহস্যের ঘটনাটাই শাপে বর হয়ে আমাদের দুজনের জীবন বদলে দিয়েছে, জানিস!

ঘটনাটা শুনলে বুঝবি মিনতি কত ভাল। যে সব অতিন্দ্রীয় লোকের খবর আমরা জানি না, সেখান থেকেও মিনতির জন্য সাহায্য আসে।

অনুপম এবার সোজা হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, ঠিক আছে হাউ আই অ্যাম ইন্টারেস্টেড বল।

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে অনিল চৌধুরী বললেন, মিনতি ছিল বাপ মা হারা গরীব একটি মেয়ে। মামার বাড়ি মানুষ। আমি তখন রৌরকেলায় পোস্টেড। সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টে একটা মোটামুটি চাকরি করি। আমি যে ফ্ল্যাটে থাকতাম, তার পাশের ফ্ল্যাটের একটি মেয়ের সঙ্গে তখন আমার পুরোদমে প্রেম চলছে। আমার প্রথম স্ত্রী রুচি ঘটনাটা সচক্ষে দেখে। মানে আমার আর অতসীব প্রেম। মাঝরাতে নিজের বিছানা থেকে উঠে আমি পড়াশোনার ছুতো করে পাশের ঘরে যেতাম, অতসী দুটো ফ্ল্যাটের মাঝের দরজা খুলে আমাব কাছে চলে আসত।

ব্যাপারটা ধরা পড়ার পর রুচির কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি। শপথ করি, আর অমনটা হবে না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি আমার প্রতিজ্ঞা আমি রাখতে পারি নি। আবার একদিন, অতসীর সঙ্গে...সেই দিন রাতেই রুচি শাড়িতে কেরোসিন ঢেলে আত্মহত্যা করে। তবে সে মরার সময় আমাকে জড়ায় নি।

ব্রাণ্ডিতে চুমুক দিয়ে অনিল চৌধুরী বললেন, অসিতবাবু, অপনি হয়তো আমাকে খুব ঘেন্না করছেন, তা করুন, ভাবতে আমার নিজেরই অবাক লাগছে যে, সেই লোকটি কি সত্যিই আমি? এই আমি? একদিন যে নোংরা কাজ আমি করেছি, আজ সেই কথাগুলো কেবল মুখে আনতেই আমার নিজেকে এত অশুচি মনে হচ্ছে, কি বলবো? জানবেন এ সবই কিন্তু মিনতির জন্যে, ও সত্যিই দেবী!

অনুপম বলল, তারপর।

যে অতসীর জন্যে এত কাণ্ড, সেই অতসী কিন্তু কিছুতেই আমায় বিয়ে করতে রাজী হ'ল না। আমি যখন স্ত্রী বিয়োগ যন্ত্রণা আর অতসীর জন্য তীব্র পরকীয়ার আকর্যণ অনুভব করছি,

তখন অতসী আর এক আমেরিকা ফেরত ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে ঘুরতে আরম্ভ করেছে। আমাকে আর পাত্তা দিচ্ছে না।

মাস ছয়েকের মধ্যে মা বাবা বৌদিরা আবার পেড়াপেড়ি শুরু করলেন। বিয়ে করতে হবে। আমারও অনিচ্ছা ছিল না। তাছাড়া অতসীকেও তো দেখিয়ে দেওয়া হবে, যে দাগী আর খুঁতে হওয়া সত্ত্বেও আমারও বিয়ে হচ্ছে।

এবার কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'ল, কেবল পাত্রীই বিবেচ্য। কোনো দাবী দাওয়া নেই। প্রকৃত সুন্দরী কন্যা চাই।

একরাশ ফটো থেকে তিনচারটে ফটো বাছলেন মা। খোঁজখবর নেওয়া হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত যাকে সবচেয়ে পছন্দ হ'ল মায়ের, আরো খবর নিতে নিতে জানা গেল. সে, অর্থাৎ মিনতি, রুচিরই মামাতো বোন। গরীব মামার গলগ্রহ, শরীর ভরা রূপ ছাড়া, বেচারীর আর কিছুই নেই। মামা আবার পয়সা রোজগারের জন্য মিনতিকে অফিসপাড়ার থিয়েটারে নামাতো। ভাল অভিনেত্রী বলে সুনাম হয়েছিল খুব। কিন্তু ওর গাম্ভীর্যের রক্ষাকবচ ভেদ করে কেউ ওর দিকে এগোতে সাহস করত না।

আমি তো মিনতিকে দেখেই মুগ্ধ। বিয়ের কথা যখন চলেছে, হাতে মাত্র মাসখানেক সময়, তখন রৌরকেলায় ফিরে বিয়ের জন্য ছুটি আর টাকা পয়সার ব্যবস্থা করতে গেলাম। সেখানে গিয়ে শুনলাম অতসী সেই ইঞ্জিনীয়ার ছোকরার কাছে ঘা খেয়েছে। আবার মধ্যরাত্রে, আমাদের সেই পুরোনো অভিসার শুরু হ'ল। অতসী আবদার করল বিয়ে ভেঙে দিতে হবে। আমি অতসীর আকর্ষণে তখন এমন মুগ্ধ যে কলকাতায় ফিরে এলাম মাকে বাবাকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বলবার জন্য।

ফিরে এসে শুনলাম কনের বাড়ি নাকি আমার নামে যাতা বদনাম দিয়ে চিঠি এসেছে। আমার নাকি চরিত্র খারাপ। অতসী বলে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার প্রেম আছে। এই সব চিঠি পড়ে কনের দরিদ্র মামা পর্যন্ত বিয়ে ভেঙে দিতে চান। কিন্তু বিয়ে ভাঙতে চায় না স্বয়ং মেয়ে।

আরও শুনলম, মেয়েটি নাকি বলেছে, আমিই তার জন্ম জন্মান্তরের স্বামী। আমার সঙ্গে নাকি তার গাঁটছড়া বাঁধাই আছে। তা ছাড়া সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমি তার সঙ্গে সত্যিই একদিন দেখা করলাম। মনে আছে, ভিক্টোরিয়ায়। দুপুরবেলা।

অনিল চৌধুরী পাশের বোতল থেকে আর একটু মেডিকেটেড ডোজ নিজের গ্লাসে ঢেলে নিলেন। বেয়ারা কবি.ডোরের আলো নিভিয়ে দিল। অনিল চৌধুরীর পাশে শুধু একটি শেড দেওয়া দাঁড়ানো আলো জ্বলছে, আর বিদ্যুতের রুম-হিটারের লাল কয়েলের আগুন ছাড়া ঘরে আবছা অন্ধকার। অনিল চৌধুরী দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর পিছনের দরজার পর্দা ঈষৎ তুলে দাঁড়ালেন একজন বয়স্কা মহিলা। মাথার চুল কাঁচা পাকা। চওড়া শতরঞ্জ পাড় ধনেখালি শাড়ি ঘরোয়া করে পরা। চিবুকে আঁচিল। মাথায় ঘোমটা টানা। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আস্তে পিছনে সরে গেলেন মহিলা। এঁকে খাবার টেবিলে তো দেখিনি। অনিলের মা-ই হবেন হয়ত। আমরা আবার অনিলের কথায় মনোযোগ দিলাম।

অনিল বলছিলেন, মিনতির মামা বিয়ে ভেঙে দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু মিনতি চলে তার মায়ের কথায়। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, শুনেছি আপনার মা নেই।

মিনতি অদ্ভুত হেসে বলেছিল, আমার মা না থেকেও আছেন। তার বিপদে আপদে নাকি

তার মা ঠিক আসেন। তার সমস্যার সমাধান করে দেন তিনি। সেই মা নাকি তাকে বলেছেন আমি নাকি তার জন্ম-জন্মান্তরের স্বামী।

মিনতি রৌরকেলার পোস্টাল ছাপ লাগানো উড়োচিঠিটাও দেখাল। বলাই বাহুল্য হাতের লেখাটা অতসীর। তারমধ্যে ঘৃণিত অভিযোগ করা হয়েছে। শুধু পরকীয়াই নয়, আমি নাকি আমার স্ত্রী রুচিকেও হত্যা করেছি। এই কথাটাই অতসীকে চিনিয়ে দিল। বুঝলাম, অতসী আমার কতদূর ক্ষতি করতে পারে। মিনতি হেসে বলেছিল, মামা বলছিলেন, চিঠিটা পুলিশের হাতে তুলে দিতে। আমি মামাকে বারণ করলাম। বললাম, ভদ্রলোক বিপদে পড়ে যাবেন শুধু শুধু। আমি বিশ্বাস করি না যে রুচিকে উনি খুন করেছেন। আমি এত সব শোনবার পর মিনতিকে বিয়ে না করে আর পারলাম না।

বিয়ের পর মিনতিকে নিয়ে রৌরকেলায় ফিরে গেলাম। শুনলাম অতসী রাগে দুঃখে তার মাসির বাড়ি জব্বলপুরে চলে গেছে। আসলে সেখানেও সে শিকার ধরতেই গিয়েছিল। মাসির এক কচি পাইলট দেওরকে। এবং যথানিয়মে আবার সেখান থেকেও আনসাকসেসফুল হয়ে ফিরে এলো।

এবারও মাঝের দরজা খুলে রাতে চলে আসতে আরম্ভ করল অতসী। আমিও দুচারদিন নিজেকে সামলালেও, আর পারলাম না শেষের দিকে।

অতসী সম্বন্ধে যে কি ভয়ানক দুর্বলতা ছিল আমার।

মিনতির ঘুম ছিল খুব গভীর। ভাগ্যিস গভীর ঘুম ছিল, নাহলে পাশের ঘরে আলো নিভিয়ে অন্ধকারে আমাদের কথোপকথন, নড়াচড়া সে ঠিক রুচির মতোই টের পেয়ে যেত।

একদিন মিনতি বলল, অতসীর সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে গেছে। ভারি ভাল মেয়ে অতসী। উড়োচিঠি নিয়েও খুব আলোচনা হয়েছে দুজনের। মিনতির দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের কোনো শত্রুই এইসব মিথ্যে বদনাম রটিয়েছে। এমন মিষ্টি মেয়ে অতসী, সে কি এসব খারাপ কাজ করতে পারে? অতসীর সঙ্গে ওর এত ভাব হয়েছে যে ওর মায়ের ছবি, বাপের বাড়ির অ্যালবাম, সব দেখিয়ে দিয়েছে অতসীকে। সেদিন রাতেই আমি আর অতসী প্রথম মিনতির মাকে দেখি। আমরা কথা বলছি, বাইরের ঘরে অন্ধকারে! মহিলার আবছায়া মূর্তিটা ঘরে এসে দাঁড়াল। চোখ দুটো, বিশ্বাস কর অনুপম, ধক ধক করে জ্বলছে।

আমি আর্তস্বরে কে? কে? চিৎকার করে উঠলাম। অতসী ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল। মহিলাও অদৃশ্য হলেন। আমি ঘরে এসে দেখলাম মিনতি বিছানায় মুড়িসুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। তাকে আর বিরক্ত না করে, বাথরুম, রান্নাঘর, বক্সরুম চারিদিক খুঁজলাম। নাঃ, সেরকম চেহারার কেন, কোনোরকম মহিলাই সারা ফ্ল্যাটের কোথাও নেই। আমার গা ছম ছম করে উঠল। ফিরে গিয়ে মিনতিকে ডাকলাম।

ধড়মড় করে ঘুম চোখে উঠে বসল মিনতি। ওর পবিত্র মুখখানি দেখে আমি যেন মরমে মরে গেলাম।

লজ্জায় অপমানে নিজেই নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়ে বললাম, মিনতি তোমার মা কেমন দেখতে ছিলেন?

মিনতি উঠে ওদের ফ্যামিলি অ্যালবামটা পেড়ে নিয়ে এসে ওর মায়ের ছবি দেখল।

আমি চমকে উঠলাম। অবিকল ওই মহিলাকে দেখেছি আমরা। আমি আর অতসী।

মিনতি বিহ্বল স্বরে আমাকে বলল, জানো আজ রাতে মা স্বপ্নে এসেছিলেন। বললেন রুচিকে যে মেরেছে, আমি তাকে ছাড়ব না। আমিও তাকে মারব। মা বললেন, রুচির অতৃপ্ত আত্মা নাকি আমাদের এই বাড়িতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিশ্বাস কর অনুপম, আমি আত্মা অলৌকিক এসব কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না। ভয়ে আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।

পরদিন রাতে অতসীর চিৎকারে আমাদের দু'বাড়ির সকলের ঘুম ভেঙে যায়। অতসীকে পাওয়া গেল দুবাড়ির মাঝের দরজার কাছে।

বোধহয় সে রাতের অভিসারে আসছিল। তার ঘাড় ভাঙা। দু চোখে বিস্ফারিত ভয়।

হাসপাতালে খুব অল্প সময়ের জন্য অতসীর জ্ঞান হয়। তখন সে শুধু মিনতির দিকে তাকিয়ে বলেছিল, বৌদি, তোমার মা। তোমার মা।

মিনতির এত নরম মন, যে ওই অতসীর জন্যেও কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে কতদিন।

তারপর আমরা বদলি হলাম কলকাতায়। কলকাতায় এসে চাকরি বদল করে এই দার্জিলিং-এ। এই যে দেখছিস বড় চাকরি, এই পরিবর্তিত জীবন, এ সবই ভাই ওই বৌ ভাগ্যে!

অনুপম বলল, আচ্ছা অনিল, বৌদির মায়ের চেহারা ঠিক কেমন ছিল বল তো?

কাঁচা পাকা চুল, চিবুকে আঁচিল, অনেকটা মিনতির মুখের ছায়া আছে। যখন দেখা যায় তখন পরনে থাকে শতরঞ্জ পাড় শাড়ি সাধারণভাবে পরা। অতসীর মৃত্যুর পর একবছর চলে গেছে, এখনও ক্বচিৎ কখনও তাঁকে দেখা যায়। আমাদের এই দার্জিলিং-এর বাড়িতেও দেখেছি।

অনুপম লাফিয়ে উঠে বলল, মিনতির মায়ের কোনো ছবি দেখাতে পারিস আমায়!

কেন পারব না, এই তো।

কফিটেবলের তলার থাকে গোছকরা অ্যালবাম থেকে একটা পুরোনো অ্যালবাম বেছে একটা পাতা খুলে ধরল অনিল চৌধুরী।

এই তো!

আমি আর অনুপম ঝুঁকে পড়ে দেখে মুখ চাওয়াচায়ি করলাম।

বোঝা গেল একটু আগেই আমরা দুজনেই এঁকে দেখেছি।

হঠাৎ অনুপম অনিল চৌধুরীকে বলল, বৌদির কোষ্ঠী আছে?

না!

এক্ষুনি হাত দেখতে পারি?

দেখিস তাড়া কিসের?

না, দেখলে এখুনি দেখতে চাই, আর একটি শর্তে। বৌদির হাত আমি একা দেখব। তুমি বা অসিত কেউ থাকতে পারবে না সে ঘরে।

অনিল চৌধুরী খুব কৌতূহলী হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি বাধা দিয়ে বললাম, আজ থাক না!

না।

অনুপমের শরীরে যেন কিসের ভর হয়েছে। সে বলল, ব্যাপারটা জরুরি, তোকে পরে বলব অনিল, বুঝছিস না ভাল হোক খারাপ হোক, মেয়ের মায়ায় বদ্ধ হয়ে একটি আত্মার এভাবে বার বার দেখা দেওয়াও তো ঠিক নয়। তোদের ক্ষতি হতে পারে।

অনিল চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, বেশ, তোর শর্ত মেনে নিচ্ছি, আমি ওপরে যাচ্ছি। মিনতিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি কিন্তু তুমি আমার সব কৌতূহল মেটাবে কাল সকালে।

আমিও উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। অনুপম আমাকে জোর করিয়ে বসাল। থাক না, যাচ্ছিস কোথায়? অনিল ওপরে উঠে গেছে। ও তো আর দেখতে আসছে না। তুই আছিস কি নেই?

অল্পক্ষণ পরে মিনতি চৌধুরী এলেন। সাদা শাড়ির ওপর সাদা লাল জড়ানো। চুল এলো করা। মুখে ঘন করে ক্রীম মেখেছেন। চোখে ঘুমের ছোঁয়া।

আপনি হাত দেখতে পারেন অনুপমবাবু! চোখ দুটি হেসে উঠল মিনতির।

অনুপম বলল, পারি, কিন্তু এখন আপনার হাত দেখব না, আপনার মায়ের ছবি দেখব।

অবাক হয়ে মিনতি চৌধুরী সামনের অ্যালবামটা খুলে ওঁর মায়ের ছবি দেখালেন।

অনুপম ভাল করে ছবিটা দেখে বলল, এটা আপনার মায়ের ছবি নয়।

মিনতি এবার চমকে সাদা হয়ে গেলেন।

মানে?

আপনার সঙ্গে আপনার মায়ের মুখের সাদৃশ্য থাকতে পারে, কিন্তু আপনার হাতে যেখানে কাদা দাগ, আপনার মায়ের ঠিক সেখানে কাটা দাগ থাকে কি করে? আমি এবার চোখ নামিয়ে দেখলাম, আশ্চর্য মিনতি চৌধুরীর কনুই-এর কাছে যে দাগটা জ্বলজ্বল করছে, সেটা ওঁর মায়ের ছবির কনুইতেও আছে।

আঠা দিয়ে সাঁটা ছবিটা চড়চড় করে ছিঁড়ে ফেলল অনুপম।

এই অ্যালবামের সব ছবি কর্নার লাগিয়ে বসানো। শুধু এই একটি ছবি আঠা দিয়ে সাঁটা কেন মিসেস চৌধুরী? এইজন্যে কি? আপনার ভাগ্য খুব ভাল যে, অনিল এটা খেয়াল করেনি। এ ছবি অ্যালবামে রাখা উচিত নয়। ছবির উল্টো পিঠে আবছা অক্ষরের যেটুকু ছেঁড়া কাগজের আঁশ থেকে উদ্ধার করা গেল, তাতে লেখা, স্নেহময়ীর রূপসজ্জায় মিনতি রায়।

অনুপম বলল, আপনি যে এককালে অ্যামেচার থিয়েটারে অভিনয় করতেন মিসেস চৌধুরী সে আমি শুনেছি অনিলের কাছে। যেজন্য মায়ের রূপসজ্জা সে কাজ তো হয়ে গেছে, এখন আর কেন? তাছাড়া আপনার মা মারা গেছেন আপনার অল্প বয়সে, তখন কি তাঁর পাকা চুল, আর বয়স্ক চেহারা হয়েছিল?

মিনতি চৌধুরী মুখ নামিয়ে নিলেন।

না শুধু ছবিটা নয়, ওই শাড়ি, পরচুলা, আঁচিলটা পর্যন্ত নষ্ট করে ফেলতে হবে. আর রিস্ক নেওয়া উচিত নয়। কবে অনিল দেখে ফেলবে, সব বুঝতে পারবে, তার ঠিক আছে?

অনুপম আর আমি দেখলাম, মিনতি চৌধুরীর চোখ ছেপে জল পড়ছে।

অনুপম বলল, আপনাকে দেখবার আগেই আমি জানি আপনি কাউকে হত্যা করেছেন। সে অতসী, তাই না?

মিনতি মাথা নোয়াল।

মায়ের গল্পটা বানালেন কেন?

চাপা গলায় মিনতি বললেন, উপায় ছিল না। মামা আমাকে ক্রমাগত কুপথে ঠেলছিলেন। আমার তখন একটা বিয়ে করে সবে যাওয়া জরুরী ছিল।

আপনি রৌরকেলায় গিয়ে সব বুঝতে পেরেছিলেন?

পারব না! মিনতি চৌধুরী অদ্ভুত হাসলেন।

আমার ঘুম ছিল পাতলা, অবশ্য অভিনয় করতাম যেন গাঢ় ঘুমে অজ্ঞান হয়ে আছি। আমি সব দেখেছি। সব শুনেছি। আর রাগে ঘৃণায় শুধু জ্বলেছি আর জ্বলেছি।

অতসীকে মারলেন কি করে?

ওকে মায়ের ওই ছবি দেখিয়েছিলাম। মাঝে মাঝে মায়ের দেখা দেওয়ার কথা গল্প করেছিলাম। একদিন দেখাও দিয়েছিলাম ওই বেশে। আর শেষদিন, চুলের মুঠি ধরে ওকে আছড়ে ফেলে দিই।

কথাটা শুনে অনুপমের কোনো রকম ভাব বৈকল্য দেখলাম না। কিন্তু আমার সারাটা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল।

অনুপম এবার মিনতি চৌধুরীর হাতখানি হাতে তুলে নিয়ে ভাল করে দেখে বলল, সত্যি বলছি আপনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, সাধ্বী, কল্যাণী। কৃতী সন্তানের জননী হবেন আপনি।

পুরোনো সব কথা ভুলে যান। সব প্রেত আর ছায়া মূর্তির কথা। অনিল জিজ্ঞেস করলে বলবেন আপনার মায়ের ছবি অ্যালবাম থেকে আমি ছিঁড়ে ফেলেছি। ছদ্মবেশ আর পরচুলার প্যাকেটটা আজ রাতেই আমাকে দিয়ে দেবেন। আমি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলব। যান শুতে যান এবার। আমি আর আপনাকে মিসেস চৌধুরী বলব না। বৌদি বলব।

এতক্ষণে মিষ্টি একটি হাসি ফুটল মিনতি চৌধুরীর মুখে। বাষ্প মুক্ত কণ্ঠে তিনি বললেন প্যাকেটটা গেস্ট রুমের দেরাজের নিচের তলায় রাখা আছে। আজকের রূপসজ্জার পর তাড়াহুড়োয় বেশিদূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি।

তারপর আমাদের নমস্কার করে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

# মিউং দ্বীপে ব্লেক

## শ্রীস্বপনকুমার

আঠারোটা মানুষ দাঁড়িয়ে।

প্রত্যেকের মুখে ভয় আর উৎকণ্ঠা।

এমন অবস্থায় যে তাদের পড়তে হবে, তা তারা কদাচ ভাবতে পারেনি।

একদিকে মৃত্যুর ভয় অন্যদিকে বাঁচার হাতছানি।

একদিকে ধ্বংসের বিভীষিকা, অন্যদিকে নতুন আনন্দময় জীবনের স্বপ্ন।

শেষ পর্যন্ত তাদের কি হবে?

তারা দাঁড়িয়ে। চুপচাপ। নিস্পন্দ। সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। তারা প্রতীক্ষা করছে।

এমন সময় একটা কালো গাড়ি এসে থামল। তা থেকে যে নামল, তাকেই সকলে জানে ডাঃ বীর সিং বলে। অপরাধ জগতের সম্রাট ডাঃ বীব সিং।

সকলে স্যালুট করল।

না, এটা তাদের কেউ শিখিয়ে দেয় নি; মনের বিরাট শ্রদ্ধা তাদের এমনি করতে বাধ্য করল।

ডাঃ বীর সিং গাড়ি থেকে নেমে বললেন, তোমাদের সকলেই এসেছ। এখন তোমরা বল, তোমরা কি বিনা শর্তে আমার কথা মেনে চলবে?

সকলে নির্বাক।

একজন শুধু বলল, কি করতে হবে আমাদের?

বাঁচতে হবে। নতুন জীবন গড়ে তুলতে হবে। তোমরা প্রত্যেকে অপরাধী। পুলিশের কালো খাতায় এই তোমাদের পরিচয়। তাই নয়?

হ্যাঁ সর্দার।

তোমরা পুলিশের হাতে ধরা পড়লে, হয় ফাঁসিকাঠে ঝুলবে, না হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে। তোমরা নিশ্চয়ই তা চাও না। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে তোমাদের জন্ম হয় নি।

একটু থামল বীর সিং।

তারপর বলল, তাই আমি চাই, তোমাদের নতুন এক জীবন শুরু করতে। তোমরা বাঁচবে। গড়ে তুলবে নতুন এক উপনিবেশ। নতুন জীবন লাভ করবে। কিন্তু তার আগে আমার একটা শর্ত আছে।

কি শর্ত সর্দার?

তোমরা কেউ যদি অন্যায় কর, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের আমি আমার দ্বীপ, আমার রাজ্য থেকে বের করে দেবো। তখন পুলিশের হাতে, ভারতীয় পুলিশের হাতে পড়তে হবে তোমাদের। কথাটা মনে রেখো। আমি একদিকে যেমন অপরাধীদের ভালবাসি, তেমনি অন্যদিকে অবাধ্য লোককে ঘৃণা করি। আমার কথার অবাধ্য হলে তোমাদের হয় হলদে পোকার কামড়ে মরতে হবে, না হয় জেলখানায় ঘানি টেনে অথবা ফাঁসির দড়িতে মবতে হবে। এটা আমার শেষ কথা।

সকলে নির্বাক।

এবার বলো, তোমরা মিউং দ্বীপে থাকতে রাজি?

হ্যাঁ সর্দার।

বঙ্গোপসাগরের বুকে ছোট্ট মিউং দ্বীপ। যেন অপূর্ব একটা প্রকৃতির রাজ্য। যে রাজ্যের আমি হ'ব রাজা। আমি অপরাধী পুরুষ ও নারীদের বাঁচিয়ে রাখব ওই দ্বীপে। ভারতীয় বা বিদেশী কোনও পুলিশ সেখানে ঢুকবে না, ঢুকতে পারবে না। সে ক্ষমতা আমার আছে।

কিন্তু সর্দার, আমরা মোটে আঠারোজন। একজন ধীর কণ্ঠে বলল।

না, এর আগে দেশ-বিদেশ থেকে চল্লিশজন গেছে। এবার তোমরা যাবে। তারপর আরও যাবে। সারা পৃথিবীর অপরাধীদের আমি সেখানে বাঁচার পথ করে দেবো। গড়ে তুলবো নতুন একটা উপনিবেশ।

আমার ভারতে থাকতে ভাল লাগছে না। ভারতের হাওয়া আমার বিষাক্ত মনে হচ্ছে। কেন জান? আমার পেছনে উপদ্রব শুরু করেছে ওই শয়তান, ধূর্ত বিলেতি গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেক। দীপক চ্যাটার্জিকে আমি এর আগে ভয় করতাম। তবে তার চেয়েও শয়তান ওই ব্লেক। ওরা যেন আমার দিনের কাজ, রাতের স্বপ্ন সব ভেঙে চুরমার করে দিতে চায়। না, তা আমি হতে দেবো না। তাই এদেশে যে প্রচুর টাকা আমি উপার্জন করেছি, তা দিয়ে কিনেছি সাবমেরিন। বিদেশী সাবমেরিন। ঠিক যেন জলের তলায় অতিকায় তিমি, ওতে করে বিভিন্ন দেশে আমি ঘুরবো। মিউং দ্বীপ হবে আমার মূল ঘাঁটি।

মিউং দ্বীপের কাছে, জলের তলায় লুকোনো আছে জলদস্যুর গুপ্তধন। তারা প্রায় সকলে মারা গেছে। কিন্তু সেই গুপ্তধন তেমনি আছে। সেটি আমাকে উদ্ধার করতেই হবে।

তারপর বিদেশী সহযোগিতায় আমার দ্বীপে আমি মাঠে মাঠে সোনা ফলাব। গড়ে তুলবো সুন্দর কলোনির পর কলোনি। তোমরা সেখানে বাঁচবে।

কিন্তু যদি পুলিশ কখনও হানা দেয়?

মিউং দ্বীপকে আমি এমনভাবে গড়ে তুলেছি যে শত পুলিশের সাধ্য নেই সেখানে প্রবেশ করে। চারধারে পাতা আছে চুম্বক মাইন। আমার সাবমেরিন ছাড়া, অন্য কোনও জাহাজ বা জলজাহাজ ঢুকতে পারবে না সেখানে। সেটা দুর্ভেদ্য এক দুর্গ।

আর পুলিশ বিভাগের হাতে এমন সময় নেই, তারা সাগরের বুকে ছোট্ট অজানা দ্বীপে কাউকে খুঁজতে যাবে। তোমরা তাই নির্ভয়ে থাকতে পার সেখানে।

অপরাধীদের ছাড়াও, সাধারণ মানুষ, বেকার যুবক-যুবতী সকলকে সুযোগ দেবো সেখানে যাবার ও থাকবার। তাবজন্যে ব্যবস্থা করছি। আমরা চাই অন্তত দু'হাজার লোক। তাহলেই

আমি যে রাজত্ব ও সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলবো, তা হবে সারা পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর। তার কারণ হ'ল, আধুনিক যে অস্ত্র আমি সেখানে তৈরি করব, তা হবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মারণাস্ত্র।

তোমরা জান, আমি শুধু ডাক্তার নই, আমি আজীবন বিজ্ঞানের উপাসনা করেছি। বিজ্ঞান জগতে এক চরম বিস্ময়কর আবিষ্কার আমি দেখাব ওই দ্বীপে বসে। সারা পৃথিবীর সব রকেট ও অ্যাটম বোমা তার কাছে তুচ্ছ। কিন্তু তার জন্যে চাই টাকা। চাই জলদস্যুব সেই গুপ্তধন, যা লুকিয়ে আছে সাগরের তলায়।

তোমরা ছাড়াও কিছু আদিম, অসভ্য লোক আছে মিউং দ্বীপে। তারা ক্ষেপে গেলে ভয়াবহ। কিন্তু তাদের মন আমি জয় করেছি। বহু দূরারোগ্য রোগ চিকিৎসা করে ভাল করেছি। তাই তারা আমাকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে। তাদের সঙ্গে তোমবা মিশবে না। কখনও তাদের মনে আঘাত দেবে না। তারা যেমন একদিকে অতি সরল, অন্যদিকে তেমনি ভয়ঙ্কর।

আচ্ছা তাহলে আমি চলি। তোমরা চলে যাও সাবমেরিনে। ঠিক বেলা দশটায় সেটা রওনা হবে মিউং দ্বীপের পথে।

ডাঃ বীর সিং আবার গিয়ে মোটরে উঠলেন। মোটর চলল এগিয়ে।

আর আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে ভরা মন নিয়ে আঠারোটি লোক চলল সাবমেরিনের দিকে। তাদের সঙ্গী হ'ল বীর সিং-এর ডান হাত দস্যু মোহনলাল।

বেলা দশটা।

ডালহৌসি অঞ্চলের একটা অফিসে দেখা গেল লোকের ভিড়।

বহু যুবক-যুবতী এসে ভিড় কবেছে পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখে।

তারা বেকার জীবন যাপন করতে করতে ক্লান্ত। জীবনের প্রতি তাদের ঘৃণা।

তাই এমন বিজ্ঞাপন দেখে তারা আসবেই।

বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল ঃ "বেকার যুবক-যুবতী ভাই বোনেরা! যাঁরা বেকারত্বের গ্লানিতে, নিম্নতার ধিক্কারে জীবনকে ঘৃণা করছেন, মরণকে কাম্য মনে করছেন, তাঁদের ভয় নেই। আসুন আমাদের কাছে। আমরা দেখাব নতুন জীবনের পথ।"

তার নিচে লেখা ছিল কোম্পানির নাম ভারত ট্রেডিং আর তার ঠিকানা।

প্রায় তিন চারশো যুবক-যুবতী এসেছিল দেখা করতে। তাদের একটা লাইনে দাঁড় করানো হয়েছিল।

একে একে প্রবেশ করছিল ভেতরে।

আপনার নাম?

মিস মালা।

বাবা মা আছেন?

না, কেউ নেই। মামার বাড়িতে থাকি।

বিয়ে করেন নি?

না। বিয়ে দেবার মতো টাকা মামার নেই।

আগে কোথাও চাকরি করেছেন?

না।

মামার বাড়িতে ভাল ব্যবহার পাচ্ছেন না?

না। দিনরাত সেই দুমুঠো ভাত। তার সঙ্গে অনেক লাঞ্ছনা আর বিরক্তি।

যদি দেশ ছেড়ে গিয়ে নতুনভাবে বাঁচার সুযোগ পান, ভাল জীবন পান, যাবেন?

কোথায়?

একটি নতুন উপনিবেশ আমরা গড়ে তুলেছি। সেখানে ঘর পাবেন, জমি পাবেন, চাকরি পাবেন, এমন কি প্রয়োজন হলে মনের মতো স্বামীও পেতে পারেন। যাবেন?

আপনাদের কথায় বিশ্বাস কি?

আপনার তো কিছুই নেই। বিশ্বাস করে দেখুন কোনো ভাল পথ যদি পান। ভয় কি?

মালা তাকাল সামনে উপবিষ্ট পাঞ্জাবী ভদ্রলোকের দিকে। বলিষ্ঠ চেহারা মুখে দাঁড়ি গোঁফ। মাথায় পাগড়ি। পরনে দামী স্যুট। দুটি চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি।

দুটি চোখের দৃষ্টি যেন হৃদয় স্পর্শ করে।

মালা বলল, যাব।

ঠিক আছে। সেখানে আপনি ভারতীয়, বার্মিজ, আরব, ইরানী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, বৃটিশ, আমেরিকান, সব জাতের পুরুষ ও নারীদের দেখবেন। ইচ্ছে হলে তাদের যে কোনো পুরুষকে বিয়ে করতে পারেন। কোনো টাকা লাগবে না। আর ইচ্ছে হলে কুমারীও থাকতে পারেন। কেউ বাধা দেবে না। আচ্ছা, আপনি যান। কাল বেলা দশটায় আসবেন। কাল আমাদের ডুবো জাহাজ ছাড়বে। যাবে সেই দ্বীপের দিকে, যেখানে আপনি বাঁধবেন নতুন নীড়।

মালা উঠে দাঁড়াল। নমস্কার জানিয়ে চলে যাচ্ছিল।

শুনুন!

আবার ডাক এলো।

বলুন।

আপনি যে কোথায় যাচ্ছেন, তা কাউকে জানাবেন না। চলে যাবার সময় বা পরে একটা চিঠি লিখে রেখে যাবেন, কেমন?

আচ্ছা।

মালা চলে গেল।

ভেতর থেকে ডাক এলো, নেকস্ট ম্যান।

ঢুকল একটি যুবক। বয়স বাইশ-তেইশ।

মিঃ ব্লেক খুব চিন্তিত।

পর পর তিন চারটি বড় বড় ডাকাতি করেছে বীর সিং ভারতের নানা জায়গাতে।

তারপর থেকে সে নিরুদ্দেশ।

সে যে কোথায় হঠাৎ অদৃশ্য হ'ল মিঃ ব্লেক অনেক চেষ্টা করেও তার কিনারা করতে পারেন নি।

ইতিমধ্যে কেটে গেছে তিনটি মাস। বীর সিং যেন হাওয়াতে মিলিয়ে গেছে।

ব্লেক ভাবছিলেন।

এমন সময় প্রবেশ করল রহস্য সন্ধানী দীপক চ্যাটার্জি।

কি খবর মিঃ ব্লেক?

খবর আর কি বলব দীপকবাবু, বীর সিং যেন ঠিক হাওয়াতে মিলিয়ে গেছে।

বলেন কি ?

সত্যি তাই। অনেক চেষ্টা করেও তার কোনো সন্ধান পাচ্ছি না। আশ্চর্য।

বোধ হয় আপনার ভয়ে বাইরে পালিয়ে গেছে সে।

তা হতে পারে।

কিন্তু এদিকে আমার জীবন যে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে মিঃ ব্লেক।

কেন?

আমার হাতে এক বিচিত্র কেস এসেছে। দিনের পর দিন যুবক-যুবতীবা হঠাৎ উধাও বা নিরুদ্দেশ হচ্ছে। অধিকাংশ বেকার যুবক-যুবতী। তারা যে কোথায় যাচ্ছে, তার কোনো কিনারা করতে পারছি না আমি।

আপনার কি মনে হয়?

মনে হয়? কিছুই মনে করতে পাবছি না। এইতো কাল একটি মেয়ে উধাও। তার নাম মিস মালা সিনহা। বেশ বড় ঘরের মেয়ে। বাবা মা নেই। মামার বাড়িতে মানুষ। বি. এ. পাস, সে গেল কোথায় কেউ বলতে পারছে না। যাবার সময় একটা মাত্র বাক্স হাতে নিয়ে গেছে। তাতে ছিল তার কাপড়-চোপড়, একটা চিঠি দিয়ে গেছে শুধু।

কি চিঠি ?

এই দেখুন।

ব্লেক পড়লেন চিঠিটা।

তাতে লেখা ঃ 'আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমরা কেউ আমার খোঁজ করো না। মামাকে প্রণাম। ইতি—মালা।'

আশ্চর্য চিঠি।

হ্যাঁ, প্রত্যেক যুবক-যুবতী এইভাবে নিরুদ্দেশ হচ্ছে। সব মিলে যুবক পঁচিশ জন, যুবতী তিরিশ জন এখন পর্যন্ত অদৃশ্য। এর কারণ কি ?

আপনি কোনো কেস এনকোয়ারি করেছেন?

না, আজ করতে যাব।

চলুন যাই মালা দেবীর বাড়িতে প্রথম।

ঠিক আছে। ধন্যবাদ।

দুজনে উঠে দাঁড়াল।

মালা সিনহার মামা জয়ন্ত সিনহা ।

তিনি হঠাৎ সামনে দুজন রহস্য অনুসন্ধানীকে দেখে ঘাবড়ে গেলেন।

কি জানতে চান?

মালা সিনহা সম্পর্কে।

বলুন! আমিই লালবাজারে জানিয়েছিলাম। তাই বলে আমাকে দোষী ভাববেন না। আমার স্ত্রী পেটের অসুখে ভোগে। চারটে বাচ্চা হয়েছে। একটু বদরাগী, তাই মানে—

সব বুঝলাম। তিনি একটু খিট খিট করতেন। এই তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা জানতে আমরা আসি নি।

না, মানে আমাকে দোষী করবেন না। মালা যে হঠাৎ এভাবে চলে যাবে, আমরা ভাবি নি। আমি ভীষণ ভালবাসতাম এই বাপ-মা হারা ভাগ্নীকে, তা আমার স্ত্রী, সে তো আগেই বলেছি। তাই বলে এভাবে নিরুদ্দেশ হবে? আমার কত আশা ছিল!

কি আশা?

মালা বি. এ. পাশ করেছিল। আমি ভেবেছিলাম যে, সে চাকরি করবে। আমার নাম উজ্জ্বল করবে। আমি বড় ঘরে তার বিয়ে দেব। জামাই এসে প্রণাম করবে, কিন্তু সব গেল, মুখ পুড়িয়ে এমন কাজ করবে তা আমি—

সে-সব কথা এখন থাক, আসল কথা শুনুন! মালা একা হলে ভয় ছিল না। ভারতের মতো বিরাট দেশে দু-একটা মেয়ে সংসারে আঘাত পেয়ে এমন করতে পারে। কেউ বা আত্মহত্যাও করে। তাতে চিন্তা নেই।

তবে? –

প্রধান চিন্তা হ'ল, এই ভারতের বুকে গত তিন-চার মাসে অজস্র যুবক-যুবতী নিখোঁজ হয়েছে। শুধু তাই নয়, আরও আছে। বহু বড় বড় মার্ডার বা ওই ধরনের কেসের আসামী হঠাৎ উধাও। তারা তাদের আত্মীয়-স্বজনকে লিখে গেছে পোস্টকার্ড বা খামে পত্র। আমরা আইনের জগতের বাইরে বিদায় নিলাম। আমাদের খোঁজ করো না। সব মিলে যেন একটা বিরাট হিস্ট্রি। তাই নয়?

ঠিক কথা।

তাই আমরা জানতে চেয়েছি কি করে হঠাৎ মিস মালা নিরুদ্দেশ হলেন?

সত্যি কথা বলতে গেলে, একদিন আমাকে বললে আমি আর বেকার থাকব না। চাকরি নিতে যাচ্ছি।

তারপর?

তারপর একেবারে নিরুদ্দেশ। একটা সুটকেশ নিয়ে উধাও!

সঙ্গে টাকা পয়সা নিয়েছেন কিছু?

না, কিছু না। পরদিন আমরা পেলাম ওই একটা চিঠি। সেটা তো লালবাজারে দিয়েছি।

হ্যাঁ সেটা আমরা দেখেছি। আচ্ছা, কোথায় চাকরি নিতে গিয়েছিলেন তা জানেন?

না! তবে বলেছিল বটে ডালহৌসিতে একটা কাজ সে পাবে। ঠিকানা জানি না। আমাকে বলেছিল, একটা কোম্পানি বহু বেকার ছেলেমেয়েকে চাকরি দিচ্ছে। রবিবারের কাগজে বিজ্ঞাপনটা বের হয়েছিল।

ব্লেক বললেন, রবিবারের কাগজ আছে আপনার কাছে?

তা আছে।

জয়ন্তবাবু খুঁজে কাগজটা বের করলেন।

ব্লেক খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে দীপককে বললেন, বোধহয় এই বিজ্ঞাপন। এতেও দেখতে পাচ্ছি ডালহৌসি স্কোয়ারের ঠিকানা।

হ্যাঁ, এটা হতে পারে।

এই তো নম্বর।

ঠিক আছে।

দীপক বলল, চলুন যাই, আর কিছু জিজ্ঞাসা করার নেই।

ব্লেক নিজের অফিসে বসে চিন্তামগ্ন।

দীপক বলল, কি ভাবছেন?

ভাবছি আমাকেও যেতে হবে কর্মপ্রার্থী হয়ে।

কেন?

তাছাড়া কে যাবে বলুন?

যদি আমি যাই?

তা মন্দ নয়। ব্যাপারটা বেশ রহস্যের মনে হচ্ছে। কিন্তু কড়া মেক-আপ চাই।

তা তো বটেই। তা না হলে কেউ চিনে ফেলতে পারে। আমি গায়ের রং ফর্সা করে অ্যাংলো সেজে যাবো। আর আপনি রংটা কালো করে একজন গরীব পাঞ্জাবী সেজে যাবেন। পাঞ্জাবী সাজাতে সুবিধে আছে, দাড়ি গোঁফ সব লাগানো যাবে। তাই না?

তা বটে।

দুজনে হেসে উঠলেন।

দীপক বলল, তবে বেকার আর নেবে কিনা তার ঠিক কি?

তা তো বটেই। হয়ত নেওয়া শেষ হয়ে গেছে!

দেখা যাক কি হয়।

দীপকের আশঙ্কা কিন্তু সত্য হ'ল না।

লোক নেবার আগ্রহ তাদের ছিল। তাই ছদ্মবেশী দীপক অর্থাৎ মিঃ আয়ার ও ছদ্মবেশী ব্লেক অর্থাৎ ধরম সিং সুযোগ পেলেন।

দীপক বলল, তার বাবা মা মারা গেছে। সে দীর্ঘদিন বেকার। ক্লাস নাইন-টেন অবধি বিদ্যে। চাকরি পাচ্ছে না। দূর সম্পর্কের এক মামা খেতে পরতে দেয়। তিনিও গরীব, তাই অর্ধেকদিন রুটি জোটে না।

আর ব্লেক বললেন, তিনি একজন ক্রিমিন্যাল। এক ভাগ্নের সঙ্গে খুব বিবাদ ছিল। তাকে খুন করে বাড়ি থেকে পলাতক। এখন চাকরি বাকরি নেই। একটা কিছু পেলে বেঁচে যান।

দুজনেই সুযোগ পেলেন।

এক পাঞ্জাবী বেশী ভদ্রলোক বললেন, কালকের সাবমেরিনে আপনারা যান। আমাদের দ্বীপে নতুন জীবন গড়ে তুলবেন।

কিন্তু তিনি, অর্থাৎ পাঞ্জাবী ভদ্রলোক যে ছদ্মবেশী বীর সিং, তা দীপক বা মিঃ ব্লেক অনুমান করতে পারেন নি।

কিন্তু বীর সিং-ও ছদ্মবেশী দীপক ও ব্লেককে দেখে একটুও চিনতে পারে নি। চিনতে পারলে নিশ্চয় তাদের এই সুযোগ দিত না।

সত্যি, প্রকৃতির অপূর্ব এক লীলাক্ষেত্র যেন দ্বীপটা।

গাছ-পালা, ফুল-ফল, নদী-পুকুর, সব যেন একটা জীবন্ত ল্যান্ডস্কেপ।

সেদিন সকাল হ'ল, দেখা গেল দলে দলে লোক কাজ করছে।

তারা চারবেলা পেটভরে খেতে পায়। তার পরিবর্তে তারা গড়ে তুলছে নিজেদের থাকবার জায়গা। ঘর-বাড়ি তৈরি করছে নিজেরা। বাইরে থেকে প্রচুর মাল-মশলা আসছে, কে আনছে কেউ জানে না। কিভাবে আসছে কেউ জানে না।

দীপক এখানে পরিচিত মিঃ আয়ার নামে; ব্লেকের নাম এখন ধরম সিং।

সেদিন সকালবেলা কাজ করতে করতে হঠাৎ ধরম সিং-এর সঙ্গে এক পুরোনো দস্যু রঘুয়ার হঠাৎ খুব ঝগড়া বেধে গেল।

রঘুয়া ছিল ডাকাত। বহু ডাকাতি সে করেছে, সে ধরা পড়লে হয়ত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হবে।

কিন্তু সে ছিল দস্যু সর্দার।

তাই এখানে এসেও সে কথায় কথায় যেন একটু সর্দারী করতে চায়।

সেদিন সে ঘণ্টাখানেক কাজ করে ধরম সিং-এর দিকে চেয়ে বলল, এই ধরমা, ইধার শোন।

ধরম সিং তাকাল। কি বলছ?

একটু পা-টা টিপে দে তো। বড্ড ব্যাথা, শালা এইসব কাম কি পোষায় আমাদের?

পা টিপলে কর্তা রাগ করবে। আমার কাজ আছে না?

এই শালা উল্লু।

মুখ সামলে কথা বলবি রঘুয়া।

রঘুয়া রেগে তার হাতের কোদালটা তুলে হঠাৎ আঘাত করতে গেল ধরম সিং-এর মাথায়।

ধরম সিং সরে গেল একপাশে। আঘাতটা লাগল না ঠিক মতো। তবে সে লাফ দিয়ে পড়ে এমন একটা ঘুসি মারল রঘুয়াকে, রঘুয়া দুবার পাক খেয়ে উল্টে পড়ে গেল মাটিতে।

সঙ্গে সঙ্গে এলো সোলেমান। যে তাদের সর্দার। যে সব দেখাশোনা করে।

সে এসে বলল, ধরমা একে মারলি কেন?

ধরম সিং ঘটনাটা সব বলল।

সোলেমান বলল, রঘুয়া, তুই কি ভেবেছিস? এটা তোর সর্দারি করার জায়গা নাকি? ভাগ ব্যাটা উল্লু—

সঙ্গে সঙ্গে সোলেমান তার গালে মারল প্রচণ্ড একটা চড়। তারপর তিন-চারজন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো। তারা বেঁধে ফেলল রঘুয়াকে।

সোলেমান বলল, চল, কর্তার কাছে নিয়ে চল ব্যাটা শয়তানকে।

সকলে তাকে টেনে নিয়ে চলল কর্তার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে গেল ধরম সিং সাক্ষী দিতে।

সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল দুজনে। বীর সিং আর মালা। মালা এখানে সব হিসেব-পত্র রাখে। খাতা লেখে। সব ঘটনা থাকে তার নখদর্পণে।

এখানে এসে অনেকে মনের মতো মানুষকে বিয়ে করলেও, মালা তা করে নি।

সে বলে, তার চেয়ে কাজ করা ভাল। এতে জীবনে সুখ আছে। বিয়ে করার অনেক দুঃখ।

সোলেমান সব ঘটনা বলল বীর সিংকে।

ধরম সিং ওরফে ব্রেকের চক্ষু তখন যেন ট্যারা। একি আশ্চর্যকাণ্ড দ্বীপের কর্তা স্বয়ং বীর সিং। যাকে খুঁজে খুঁজে সে এতদিন পায় নি।

বীর সিং ব্রেককে চিনতে পারে নি। সে বলল, কি ব্যাপার?

সোলেমান সব ঘটনা খুলে বলল।

সব শুনে বীর সিং বলল, রঘুয়া, তুমি কি শর্তে এসেছ, তা সব মনে আছে তো ?

আছে, তাতে কি ? আমি দিনরাত মাটি কাটব, বাড়ি তৈরি করব, এসব শর্ত তো ছিল না।

না পারলে চলে যাও। নিজের কাজ নিজে না করলে কে করবে শুনি? আরও তো লোকজন কাজ করছে। তারা তো পালাচ্ছে না।

ওরা করুক, আমি পারব না।

ঠিক আছে। সোলেমান, ওকে কাল নিয়ে যাও। বোম্বে পুলিশের হাতে দিয়ে এসো।

কথাটা শুনে রঘুয়া কেঁদে ফেলল। বলল, এবারের মতো মাপ করুন সর্দার।

না, মাপ নয়। ঠিক আছে, তিনদিন ঘরে আটকে রাখ। খাবার বন্ধ।

সোলেমান তাকে নিয়ে চলে গেল।

মালা বলল, স্যার, এর আগেও এমনি দু-একবার ও ঝগড়া করেছে।

বীর সিং হাসল। ঠিক আছে মালা। চিন্তা নেই। যাবে কোথায়। না খেলেই সর্দারী কমে যাবে।

তা বটে।

বীর সিং বলল, চলি মালা।

কোথায়?

জলদস্যুদের গুপ্তধন-খুঁজতে হবে না? সেজন্য আজই আমি বের হচ্ছি।

কিন্তু শুনেছি সেটা রাক্ষসে পাহারা দেয়।

ওসব বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে হয়, দ্বীপের দক্ষিণ দিকে খুঁজলে ওটা পেতে পারি। এটা না পেয়ে রিসার্চ বন্ধ আছে।

একটা কথা স্যার।

বল।

ধ্বংস স্তূপের গবেষণা না করে মানুষকে বাঁচাবার ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেন না?

হাঃ-হাঃ-হাঃ.......

বীর সিং হেসে উঠল.

মানুষকে বাঁচাব?

ক্ষতি কি তাতে ?

আমাদের দুনিয়াতে কাকে তুমি বাঁচাবে মালা? সব শয়তান। যারা ধরা পড়ে তারা অপরাধী। আর যারা গোপনে কাজ চালায়, তারা হয় লক্ষপতি, কোটিপতি। এইতো পার্থক্য। এদের বাঁচিয়ে কি হবে? এরা মরুক। এই চাই আমি।

কিন্তু—

না, কোনো কিন্তু নেই। আমার মনকে দুর্বল করো না মালা। প্লিজ—

বীর সিং বেরিয়ে যায় দীপ্ত ভঙ্গিতে।

চারটি নৌকা ভাসছিল।

পাশে ভাসছিল সাবমেরিন।

বীর সিং-এর সঙ্গে ছিল সোলেমান, মালা, ধরম সিং আরও দু-একজন বিশ্বাসী লোক।

বীর সিং বলল, অনেকদিন আগের কথা। প্রায় তিরিশ চল্লিশ বছর আগে।

এই ছোট্ট মিউং দ্বীপে থাকত জলদস্যুরা। তারা ডাকাতি করত, জাহাজ লুট করত। তাদের টাকা পয়সা সব তারা পরিণত করত মোহরে। তারপর তা সিন্দুকে বোঝাই করে তারা রেখে দিত জলের তলায়। সেখানে দু-তিনটে বড় বড় লোহাব সিন্দুকে আছে তাল তাল সোনা।

পরে এই জলদস্যুরা ধরা পড়ে, অনেকে মুখোমুখি যুদ্ধে প্রাণ দেয়। কেউ ছিল না বোধ হয়। তাই এই সব সোনা আজও জমা হয়ে আছে জলের তলায়। কেউ তা উদ্ধার করতে পারে নি।

এইভাবে দিন যায়।

অবশেষে মানুষের মুখে মুখে একটা গল্প ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে এইসব সোনা পাহারা দিচ্ছে ভূত-যক্ষ-কুট্‌লাম। তার ভয়ে কেউ আর এদিকে এগোয় না। তাই তেমনই পড়ে আছে।

পরে খবর পেলাম জলদস্যুদের একজনের মৃত্যু হয়নি। সে দলবল নিয়ে নাকি চেষ্টা করছে ধন উদ্ধার করতে। কিন্তু সেও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। সেও যক্ষের ভয়ে এগোয় নি।

আমরা আজ তাই সেটা খুঁজব। প্রত্যেকে ডুবুরির পোশাক পরে নাও। আমরা নামব। আমার মনে হয়, এই খুব কাছে কোথাও এটা আছে।

জলদস্যুদের ধন-দৌলত উদ্ধার করার জন্য সকলে পোশাক পরে তৈরি হতে লাগল।

এদিকে আমরা অন্য একটা দৃশ্যের যবনিকা তুলে ধরছি।

আদিম জাতিব ছেলেদের মধ্যে দুজন ছিল বন্য উদ্দাম।

তারা ঘরে যায় না। বাবা মা'র কথা শোনে না। তারা বিদ্রোহী।

তাদের দুজনের সঙ্গে সম্প্রতি ভাব হয়েছিল একজন লোকের, তার নাম রহমৎ খাঁ।

রহমৎ খাঁ বলল, আমার বাবা ছিলেন একজন বিরাট জলদস্যু। তিনি পুলিশের হাতে মারা যান। তাই এই গুপ্ত সম্পদের ওপর আমাদের দাবি আছে।

শুনেছি, বর্তমানে কতকগুলো সভ্য মানুষ এসে এই গুপ্ত সম্পদ নিতে চায়। তা আমরা হতে দেব না। তারা তোমাদের লোককেও হাত করেছে চিকিৎসা করে।

একজন আদিম যুবক বলে, তা আমাদেব কি করতে হবে বলুন?

করতে হবে সামান্য কাজ। তোমবা তা পাববে।

জলে ডুবতে হবে? তা পাবব না।

না না, তা নয়।

তবে?

শোন, যক্ষেব ভয় আমিও কবি। যাবা গুপ্তধন খুঁজছে, তাবা যক্ষেব হাতে মবলে তো ভাল। কিন্তু যদি তাবা না মবে, তবে একটা কাজ কববে।

কি কাজ?

তাবা গুপ্তধন তুললে তোমবা তোমাদেব লোককে সব ক্ষেপিযে দেবে।

তাবা তাতে বাজি হবে না। ডাঃ বীব সিংকে তাবা দেবতা মনে কবে।

তা করুক। তোমবা বলবে, লোকটা ভীষণ শযতান।

তাব মানে?

মানে, সে ভূত-প্রেত্নীব বাহক। তাই সে সহজে বোগ সাবায। ওই শযতান থাকলে এ দ্বীপ একদিন ধ্বংস হবে।

তা ক্ষেপিযে লাভ?

লাভ আছে। তাবা আক্রমণ কববে। সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ বাধবে। এই ফাঁকে তোমবা ওইসব সিন্দুক আব ওই মালা মেযেটাকে নিযে পালাবে। শোন, তোমবা টাকাব সিকি অংশ কবে পাবে। বাকিটা আমাব। আব ওই সুন্দবী মেযেটাকে আমি বিযে কবব।

বেশ তো কব। আমবা মেযে-টেযে চাই না। চাই শুধু টাকা।

ঠিক আছে।

তাহলে এই শেষ কথা। মনে থাকে যেন।

মনে থাকবে।

এখন দূববীন দিযে দেখ ওবা কি কবছে। ওকি মেযেটাও জলে নামছে? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।

ধবম সিং-বেশী ব্লেক, আযাব-বেশী দীপক, বীব সিং, সোলেমান, মালা সকলেই ডুবুবিব পোশাক পবে জলে নামল।

নানা দিকে তাবা খুঁজতে লাগল। একবাব উঠে নৌকায আশ্রয নেয়, আবাব খোঁজে।

এইভাবে প্রায় তিন-চাব ঘণ্টা ডুবেও তাবা কোনো সন্ধান পাচ্ছিল না।

হঠাৎ একসময ব্লেকেব মনে হ'ল, যে দূবে কি যে একটা নডছে।

ওবে বাপ, বিবাট একজোডা অক্টোপাশ।

ব্লেক বুঝলেন, তাদেব নামই হযেছে যক্ষ। তাবাই এখানে থাকে। তাই লোকে বলে যক্ষেব ধন।

একটি এগিযে এলো ব্লেকেব দিকে। ব্লেক তাব ওযাটাবগান বেব কবে তৈবি হ'ল।

হাত কুডুল দিযে চমৎকাব কাযদায় ব্লেক তাকে ঘাযেল কবলেন।

দ্বিতীয়টি পালাচ্ছিল। ব্লেক তাব দিকে এগিয়ে গেলেন। তাকেও তিনি ঘায়েল কবলেন।

তারপর দেখতে দেখতে জলটা লাল হয়ে গেল। একটু পরে দুটোই ওপরে ভেসে উঠল। ব্লেকও ওপরে উঠলেন।

একটু বিশ্রাম করে ব্লেক বললেন, কর্তা!

কি বল তো।

ওই যে দুটো ঘায়েল হ'ল, দেখছেন তো?

হ্যাঁ। কিন্তু তাতে কি লাভ ?

ওই দুটোই যক্ষ নামে অভিহিত। এদের কবলে লোকে পড়ে, মারা যায়। তাই দুর্নাম রটেছে যক্ষ বলে।

তা হতে পারে।

এটাই ধ্রুব সত্য সর্দার। তাই আমার ধারণা এখন এখানে খুঁজলেই মিলবে গুপ্তধন।

ঠিক আছে। দেখছি।

বীর সিং নিজে ডুব দিল সেখানে। একটু পরে সে যখন উঠল, তার হাতে একটা ছোট সিন্দুক। সেটি সে তুলল নৌকোতে।

বীর সিং বলল, আরও তিন চারটে আছে ওখানে।

সোলেমান ডুব দিল। একটু পরে সে উঠল। হাতে একটা সিন্দুক!

এইভাবে মোট চারটে সিন্দুক তোলা হ'ল। প্রতিটি সোনার মোহরে বোঝাই।

সকলে খুশি হ'ল।

হঠাৎ বীর সিং বলল, মালা? মালা কোথায় গেল?

তাই তো! সোলেমান বলল।

সে ডুবেছিল?

হ্যাঁ। কিন্তু আর তো তাকে উঠতে দেখি নি আমি। সত্যি কথা, মালা কোথায় গেল।

সকলে ডুব দিল।

তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু মালাকে কেউ দেখতে পেল না কোথাও।

ধরম সিং-রূপী ব্লেকও অবাক হলেন। সত্যি তো মালা কোথায় গেল? কোনো জল-জন্তুর কবলে পড়ল কি সে?

মালা প্রথমবার জলে ডুবেই চারিদিকে খুঁজেছিল। জলের তলায় কত মাছ, কত জলজ গাছ, কি সুন্দর সব দেখতে।

কিন্তু না, কোনো সিন্দুক সে দেখতে পায় নি।

হঠাৎ সামনে।

ও কি!

একজন লোক ডুবুরির পোশাক পরা, তার দিকে এগিয়ে আসছে।

মালা ভাবল, হয়ত তাদের দলের কেউ হবে এই লোকটা।

কিন্তু না, তা তো নয়।

লোকটা তার দিকে এসেই তাকে টেনে নিয়ে চলল।

মালা বাধা দিতে গেল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে ছোরা দেখাল।

মালাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল তীরের দিকে। সেখানে উঠে ঘন ঝোপের আড়ালে তাকে নিয়ে গেল।

লোকটা বলল, খবরদার, চিৎকার করো না। তাহলে খুন করব।

মালা কি করবে!

লোকটা তাকে বেঁধে নিয়ে চলল। তারপর কিছু দূরে একটা ঘরের মধ্যে তাকে এনে ফেলল।

বলল, আজ থেকে তুমি বন্দী। পালাবার কোনো পথ নেই।

মালা কথা বলল না।

লোকটা বলল, পালাবার চেষ্টা করলে আমার সব অনুচর তোমাকে মেরে ফেলবে। তাই সাবধান।

মালা কোনো কথা বলল না।

ওদিকে বীব সিং ফিরল তার বাড়িতে বিজয় গৌরবে। তবে মনটা তার একটু খারাপ, মালা কোথায় গেল? জলজন্তুর পাল্লায় পড়ল নাকি সে?

হঠাৎ। বীর সিং অবাক হ'ল।

তখন সন্ধ্যে হয় হয়। এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল অসভ্য আদিম অধিবাসীদের মাদল বাজছে। ড্রিমি ড্রিমি ড্রিমি ড্রিমি।

বীর সিং জানে এটা তাদের যুদ্ধের বাজনা।

হঠাৎ তারা যুদ্ধের বাজনা কেন বাজাল!

বীর সিং চিন্তা করল।

সে গুপ্তধন পেয়েছে বলেই কি ওরা এভাবে ক্ষেপে গেল নাকি?

বীর সিং বের হ'ল। সে তার দলের লোকদের বলে দিল, তোমরা সব বন্দুক নিয়ে তৈরি হও।

সকলে তৈরি হ'ল।

তবে ধরম সিং-রূপী ব্রেক আর আয়ার-রূপী দীপককে দেখা গেল না।

কিন্তু সেকথা ভাববার মতো সময় তখন বীর সিং-এর ছিল না।

সে তখন খুব চিন্তিত।

হঠাৎ সকলে এভাবে ক্ষেপে উঠল কেন? তারা কি সকলে ক্ষেপে গেছে, না আনন্দ করছে?

একটু পরে সে নিশ্চিন্ত হ'ল।

না, সকলে ক্ষেপে যায় নি।

তাদের দলের তিরিশ-চল্লিশজন লোক মাত্র দল বেঁধে এগিয়ে আসছে। সকলে বের হয় নি।

কিন্তু তারাই বা অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসছে কেন? কি চায় তারা তার কাছে?

লোকগুলি এগিয়ে আসছিল।

হঠাৎ বীর সিং একটা মতলব করল। সে চারটি সিন্দুকের মাত্র একটি সিন্দুক হাতে এগিয়ে চলল।

সঙ্গে অন্য সকলে।

প্রত্যেকের হাতে বন্দুক।

লোকগুলি এগিয়ে এলো। বীর সিং চিৎকার করে বলে উঠল, হেই, কি চাও তোমরা?

তুমি শয়তান। তাই রোগ ভাল কর।

কে বলেছে একথা?

তোমাদের দুজন লোক বলেছে।

মিথ্যে কথা।

মিথ্যে নয়। তাহলে তুমি যক্ষের ধন কি করে উদ্ধার করলে।

এটা আমার জন্যে করি নি। করেছি তোমাদের জন্যে। তোমরা গরীব। তোমাদের সাহায্যের জন্যেই উদ্ধার করেছি ওই গুপ্ত সম্পদ। যা শুনেছ, সব বাজে কথা।

তোমার কথায় বিশ্বাস কি?

এই নাও।

বলে বীর সিং সিন্দুকের সমস্ত টাকা তাদের দিকে মুঠো মুঠো ছুঁড়ে দিল।

তারা কুড়াতে লাগল সেগুলি।

এই নাও, তোমরা সব নিয়ে যাও।

তারা মুঠো মুঠো সোনার টাকা নিয়ে পকেটে পুরে ফেলল।

তখন বীব সিং বলল, তোমাদেব মিথ্যে কথা বলে কে ক্ষেপিয়েছে!

এই দুজন।

দুজনকে বাঁধ! ·

তারা সকলে মিলে দুজনকে বেঁধে ফেলল।

বীর সিং বলল, তোমরা আমার নামে মিথ্যে কথা কেন বলেছ?

আমাদের শিখিয়েছিল বলতে।

কে?

রহমৎ খাঁ।

কে সে?

তারা বলে সে কোনো জলদস্যুর ছেলে।

মিথ্যে কথা। সে কোথায় থাকে জান?

জানি ওই দিকের গুহায় থাকে।

ঠিক আছে. চল তাকে দেখছি।

সঙ্গে সঙ্গে সকলে চলল রহমতের খোঁজে।

এদিকে রহমৎ তখন প্রাণ ভয়ে পালাচ্ছে।

সে বুঝতে পারল, গুপ্তধনের টাকা দিয়ে বীব সিং অসভ্যদের হাত করে ফেলেছে।

তখন পালানো ছাড়া অন্য কোনো পথ তার সামনে খোলা নেই।

এদিকে অসভ্য লোকেরা আর বীর সিং-এর দলবল এসে ঢুকলো গুহাতে।

ঢুকেই তারা অবাক।

হাত পা বাঁধা অবস্থায় মালা পড়ে আছে সেখানে।

বীর সিং তার হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিল।

মালা উঠে বসল।

মালা! শোন!

বলুন সর্দার?

তুমি ভাল আছ তো?

হ্যাঁ। কোনো ক্ষতি করতে পারে নি শয়তানটা।

তুমি কি কবে এখানে এলে?

মালা সব খুলে বলল।

বীর সিং বলল, শয়তান গেল কোন দিকে?

দক্ষিণ দিকে পালিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে অসভ্যদের দল ছুটল দক্ষিণে। তাদের বিষাক্ত তীর ছুটল আগে আগে।

একটু পবে জঙ্গলের মধ্যে তাকে আহত অবস্থায় পাওয়া গেল।

বিষাক্ত তীব লেগেছিল। তাই বাঁচবাব কোনো আশা ছিল না তার।

বীব সিং বলল, রহমৎ, তুমি তো আমাব দলেই ছিলে একসময়।

হ্যাঁ সর্দার।

তবে আজ আমাব পেছনে এভাবে কেন লাগতে এলে?

লোভ কর্তা, অর্থেব লোভ। আমি জানতাম, আপনি এসেছেন গুপ্তধনের পেছনে। তাই লোভ সামলাতে পারলাম না আমি। এ খবর আমিও জানতাম। তাই ভয় করতাম যক্ষের। ওঃ, একটু জল।

জল চেয়ে রহমৎ বলল, একটা কথা সর্দাব! আপনাকে এখান থেকে পালাতে হবেই। বেশিদিন থাকতে পারবেন না আপনি।

কেন?

ব্রেক, ব্রেককে আমি দেখেছি।

কোথায়?

জবাব দিতে পারল না রহমৎ। সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

হ্যালো, হ্যালো—ব্রেক স্পিকিং।

হোয্যার?

মিউং দ্বীপ। আমি ব্রেক। দীপক চ্যাটার্জী সঙ্গে আছে।

কোথায় সে দ্বীপ?

তেরো পারেন সাত ডিগ্রি বাই একশো তিন পারেন দুই ডিগ্রি।

ভেরি ওয়েল! ওখানে কি ব্যাপার?

বীর সিং।

কোথায় সে?

এখানে। আপনারা সত্বর আক্রমণ করুন। তবে একটা কথা স্যার।

বলুন?

দ্বীপের চারদিকে ম্যাগনেট মাইন পাতা। জাহাজ বা অন্য কোনো জলযান আসতে পারবে না।

সর্বনাশ।

এয়ার অ্যাটাক করতে হবে! প্রয়োজন হলে প্যারাসুটে মিলিটারি নামাতে হবে।

বলেন কি?

ঠিক বলছি। বীর সিং সুসজ্জিত। তার দলে এখন প্রায় পাঁচ-ছ'শো লোক। আর প্রত্যেকে লড়তে জানে।

ও কে!

ব্লেক ট্রান্সমিটার বন্ধ করলেন। দীপককে বললেন, খবর পাঠানো হ'ল।

ওরা কখন আসবে?

তা তো বলল না কিছু। দেখা যাক কি হয়।

তা ঠিক।

রাত তখন দুটো।

আচমকা আলোয় আলোয় সারা আকাশ যেন ভরে গেল।

বোঁ—ও—ও

প্লেন উড়ছে। দুম্ দুম্ করে বোমা পড়ছে প্লেন থেকে।

মিউং দ্বীপের সকলে ভয়ে দিশাহারা। মাঝে মাঝে কট্ কট্ কট্ করে চলেছে মেশিনগানের গুলি সমান তেজের সঙ্গে।

দলে দলে লোক নামছে প্যারাসুট থেকে।

সকলে বিস্ময়ে ভয়ে দিশাহারা। এ ধরনের আক্রমণ যে হতে পারে, তারা ভাবতেও পারে নি।

দলে দলে সৈন্য এগিয়ে চলে।

কয়েকজন লোককে ধরে ফেলে। তল্লাসি চলতে থাকে একের পর এক বস্তি।

অবশেষে হঠাৎ দীপককে দেখে একটা লোক ছুটে পালাচ্ছে।

কে?

দীপক চিৎকার করে ওঠে।

ব্লেক বললেন, বীর সিং।

কোথায় চলছে ও?

জানি না।

বোধহয় সাবমেরিনে। চলুন দেখা যাক।

কিন্তু বেশিক্ষণ দেখা গেল না। বীর সিং আর সোলেমান দুজনকে নিয়ে সাবমেরিন ছুটে চলল। তারপর ডুব দিল অগাধ জলে।

দীপক ও ব্লেক ছুটল মিলিটারি বাহিনীর দিকে।

পুলিশ ও মিলিটারিতে মিউং দ্বীপ যেন ভরে উঠেছে।

ব্লেক ও দীপক এলো।

মিঃ সেনও এসেছেন লালবাজার থেকে।

মিঃ সেন বললেন, সকলকে তো পেলাম। কিন্তু বীর সিং কোথায়?

সে পালিয়েছে।

কখন?

আপনারা এয়ার এ্যাটাক করার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে ছুটে পালাতে দেখেছি সাবমেরিনের দিকে।

ওঃ, আমরা লেট করেছি।

লেট নয়। সে সব সময় অ্যালার্ট থাকত। তাকে ধরা সহজ নয়।

কিন্তু এইসব লোকেরা কারা?

এদের অর্ধেক হ'ল, নানা দেশের বড় বড় ক্রিমিন্যাল। বাকি অর্ধেক নানা ধরনের বেকার যুবক।

কিন্তু এদের জোগাড় করল কি করে?

সে বিরাট হিস্ট্রি। পর্বে বলব সব, এখন বেছে বেছে ক্রিমিনালদের অ্যারেস্ট করুন, আর বেকাররা যদি থাকতে চায় থাক। না হয়, ফিরে চলুক!

ঠিক বলেছেন। কিন্তু লোকটার ক্ষমতা আছে বটে। এত তাড়াতাড়ি এত কাণ্ড করল।

সত্যি লোকটা যেন জাদুকর!

মিঃ সেন বললেন, আপনিই বা কম কিসে? যেভাবে ছদ্মবেশে এসে এ কাণ্ড করলেন।

মিঃ ব্লেক উত্তর দিলেন না।

# শিয়রে মৃত্যু

## শ্রীপার্থ

দীনেন খুব মনযোগ দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল। তার হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, খবরটা পড়তে গিয়ে ক্রমশ সে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। হর্ষ আড়চোখে খবরের বিষয়বস্তুটা একবার দেখে নিয়ে মনে মনে হাসল। আর ভাবল, এই তো সবে শুরু, এর শেষ কোথায় কে জানে!

ইতিমধ্যে পুরো খবরটা দীনেনের পড়া হয়ে গিয়েছিল। খবরের কাগজের ওপর থেকে চোখ তুলে এবার সে হর্ষকে উদ্দেশ্য করে উত্তেজিত সুরে বলল, দেখেছ হর্ষ, আবার একটা কারখানা পশ্চিমবঙ্গ থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আচ্ছা, সত্যি কি এর কোনো প্রতিকার নেই? বেকার সমস্যাটা যেখানে ভয়াবহ একটা রূপ নিয়েছে, সেখানে চালু কারখানাগুলো অন্য রাজ্যে তুলে নিয়ে যাওয়ার কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে, বলতে পার!

উদ্দেশ্য আর যাই হোক, হর্ষ খুব চিন্তিত স্বরে বলল, তবে মনে হয়, পশ্চিমবঙ্গকে সুস্থিরভাবে কাজ চালাতে দিতে চায় না। এর পিছনে মনে হয় কোনো একটা রহস্য আছে, বিরাট একটা চক্রান্ত আছে। আর বাঙালীদেরও দোষ কিছু কম নয়। কাজ করব না, অথচ মাসে মাসে ঠিক পুরো বেতনটা চাইই! এভাবে কতদিনই বা চলতে পারে বলো! তাই স্বাভাবিক নিয়মেই আজ বিজনেসম্যানদের অন্য পথ খুঁজে দেখতে হচ্ছে। নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে তারা পথ খুঁজছে নতুনের। কারখানা স্থানান্তর করাই হ'ল গিয়ে তাদের কাছে সব চেয়ে সোজা পথ। এবং এই পথটাই আজকাল প্রত্যেকে বেছে নিচ্ছে। এবং নেবে আস্তে আস্তে।

ওদের আলোচনায় বাধা পড়ল হঠাৎ রামুর সেখানে আগমন হওয়ার দরুন।

বাবু! রামু ভয়ে ভয়ে কি যেন বলতে চায়। কিন্তু হর্ষর ভয়ে সেই কথাটা বলতে পারছে না।

তাই কিছু একটা অঘটন যে সে ঘটিয়ে বসে আছে, হর্ষ তার মুখের চেহারা দেখেই বুঝে গিয়েছিল। হর্ষ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, কি ব্যাপার, তোমার নতুন কীর্তির কথাটা না হয় বলেই ফেল তাড়াতাড়ি।

সেই ভদ্রলোক আবার এসেছেন।

কোন্ ভদ্রলোক ?

সেই যে, কোনো একটা বিরাট কারখানার মালিক। নতুন কারখানার জন্যে আপনার কাছে—

আমি বাড়িতে আছি বলেছিস নাকি!

আজ্ঞে বাবু সত্যি কথাটাই বলে এসেছি, আপনি যে শিখিয়ে দিয়েছেন, কখনও মিথ্যে কথা বলা উচিত নয়। তাতে আপনার তদন্তের অসুবিধে হয়।

যুধিষ্ঠির মহারাজ এবার থাম দয়া করে। হর্ষ বাধা দিয়ে মৃদু হেসে বলল, যাও ভদ্রলোককে ডেকে নিয়ে এসো।

রামু চলে যাবার পর দীনেন মুখ খুলল এবার, কে এই ভদ্রলোক হর্ষ?

কলকাতার বিখ্যাত বিজনেস ম্যাগনেট অশোক রায়ের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ!

হ্যাঁ, তার নাম কে না জানে? দীনেন আরও বলল, সে বাংলার গৌরব।

গৌরব কি অগৌরব জানি না, হর্ষ বলল, তার এখনকার প্ল্যানের কথা শুনলে তোমার ধারণা পাল্টে যাবে।

কী রকম? দীনেন বিস্ময় প্রকাশ করল।

একটু আগে তুমি অভিযোগ করেছিলে না, এই বাংলা থেকে অন্য রাজ্যে অবাঙালীদের মূলধন স্থানান্তর করাটা অন্যায়। তাই শুনলে তুমি আশ্চর্য হবে, এক্ষেত্রে বাঙালীরাও কম যায় না। বাংলার প্রতি অবাঙালীদের টান না থাকাটা স্বাভাবিক, কিন্তু বাঙালীদের নিজ দেশের প্রতি বিরূপ ভাবটা কি করে যে হয় সেটাই বড় আশ্চর্য লাগে। শুনলে তুমি আরও আশ্চর্য হবে, এই অশোক রায়ই তার বর্তমান কারখানার সম্প্রসারণের নামে হরিয়ানার ফরিদাবাদে নতুন ইউনিট স্থাপন করতে চলেছে। তাই সে এসেছে আমার কাছে।

কেন, ফাইনান্সের জন্যে?

না, সে জন্যে নয়।

তাহলে?

নতুন কারখানা স্থাপনে সে নাকি প্রচণ্ড বাধা পাওয়ার আশঙ্কা করছে। এমন কি তার প্রাণের আশঙ্কাও রয়েছে।

তা বাধাটা কোথা থেকে আসছে? দীনেন জিজ্ঞেস করল, শ্রমিক কর্মচারীদের কাছ থেকে, না কি স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে!

না, সে সব কিছুই নয়।

তবে? বাধাটাইবা কোথায়!

তাও সে খুলে বলতে চাইছে না। মনে হয় তার এই কারখানা সম্প্রসারণের পিছনে অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে, অন্য কোনো ইতিহাস আছে। সেই কথা সে বলতে চাইছে না।

তাহলে সে বলছেইবা কি শুনি!

ঠিক সেই মুহূর্তে অশোক রায় ঘরে ঢুকল।

তাকে আজ যেন আগের চেয়ে আরও বেশি চিন্তিত বলে মনে হ'ল হর্ষর। তা লক্ষ্য করে হর্ষ বলল, বসুন মিঃ রায়। তারপর দীনেনের দিকে ফিরে হর্ষ বলল, ওঁর মুখ থেকেই শোনো। তাহলেই সব বুঝতে পারবে।

কিন্তু মিঃ সেন—

অশোক মাঝ পথে বাধা দিয়ে কেমন যেন ভয় ভয় চোখে হর্ষর দিকে তাকিয়ে রইল।

ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে হর্ষ সঙ্গে সঙ্গে বলল, ভয় নেই মিঃ রায়, ও আমার বন্ধু

এবং সহকারী। ওর সামনে আপনি নিঃসংকোচে সব খুলে বলতে পারেন।

বেশ। অশোক আশ্বস্ত হয়ে বলল আমি কিন্তু আজ আপনাকে শুধু বলতেই আসিনি। আপনার কাছ থেকে কথা নিতেও এসেছি, ফরিদাবাদে কবে যাচ্ছেন?

আমার যাওয়াটা কি খুবই জরুরী মিঃ রায়?

হ্যাঁ মিঃ সেন। আপনার সেখানে উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। আমার ভীষণ ভয় করছে মিঃ সেন। এই ভয়ের হাত থেকে আমাকে আপনি বাঁচান। আমি জানি আপনি আমার পাশে পাশে সব সময় থাকলে কোনো বিপদই আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না, এ বিশ্বাস আমার আছে।

তা না হয় বুঝলাম। দীনেন এই প্রথম কথা বলল, কিন্তু আপনার যে সামনে একটা মস্ত বড় বিপদ আসছে, একথাটাই বা আপনার মনে হ'ল কেন মিঃ রায়?

সে অনেক কথা।

দীনেন বলল, বেশ তো সংক্ষেপে বলুন।

হ্যাঁ, তাই বলব। সব খুলে বলতেই আজ এসেছি মিঃ সেনের কাছে। বলে একটু সময় সে থামল।

সেই অবসরে দীনেন তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে নিল।

ভদ্রলোকের বয়স আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ হবে। তবে পঞ্চাশের বেশি নয়। কানের দুপাশে কিছু কিছু রূপোলি আভা। ব্যাক-ব্রাশ করা চুল সযত্নে আঁচড়ানো। পরনে দামী টেরিউলের সুট, গলায় আধুনিক ডিজাইনের মিনি রঙীন টাই। দেখলে মনে হয় ভদ্রলোক যৌবনে অত্যন্ত সৌখীন ছিল। এবং সেই ট্রাডিশনটা সে আজও বজায় রেখে যাচ্ছে। তবু এ সব সত্ত্বেও মনের উদ্বেগটা সে কিছুতে ঢেকে রাখতে পারছিল না যেন। যেন সে মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে ভুগতে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। বিশেষ করে তার শেষ কথায় মানসিক উদ্বেগটা যেন বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

ফরিদাবাদের নতুন ফ্যাক্টরির কাজটা যতই শেষ হয়ে আসছে, অশোক আবার বলতে শুরু করল, ব্যাপারটা আমার কাছে ততই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মনে হয়, কেউ যেন আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে। আরও মনে হচ্ছে, আমাকে হত্যা করার স্থান হিসেবে ফরিদাবাদ জায়গাকেই খুনী বেছে নিয়েছে। ওখানেই সে ওৎ পেতে বসে আছে, আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। সেই সুযোগটা খুনী যাতে না পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে মিঃ সেন। আপনার নাম শুনেছি অনেক। যত টাকা চান আমি দেবো। খুনী যাতে আমাকে একটুও স্পর্শ করতে না পারে তার ব্যবস্থা আপনি করুন। আমাকে বাঁচান মিঃ সেন। এভাবে দিনের পর দিন মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার ভাল লাগছে না।

আপনি না চাইলে কি হবে, হর্ষ কথার মাঝে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, জোর করে যুদ্ধ আপনার ঘাড়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হলে প্রতিরোধ তো আপনাকে করতেই হবে মিঃ রায়। আর আপনি তো জানেনই এ যুদ্ধে কোনো আপোষ নেই, কোনো ক্ষমা নেই। কোনো পক্ষ একেবারে শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপরপক্ষ থামবে না, থামতে পারে না। তাই বলছি, প্রতিরোধ আপনাকে করতেই হবে, না করে আপনার উপায় নেই।

বাট হাউ, আমি একলা কিভাবে প্রতিরোধ করব বলুন? ওরা যদি সংখ্যায় অনেক হয়, তখন আমি কি করব বলুন!

কার কার ওপর আপনার সন্দেহ হয়, কাকে আপনার শত্রু বলে মনে হয়, বলুন, সব খুলে বলুন। হর্ষ বলল, পারেন তো আপনার ফ্যামিলি হিস্ট্রিটা সংক্ষেপে বলুন।

বলছি।

তারপর অশোক রায় যা বলল, ঠিক মতো গুছিয়ে লিখতে পারলে, একটা সম্পূর্ণ উপন্যাস হয়ে যেতে পারে, চাই কি একটা রহস্য উপন্যাসেব পর্যাযও লিখে ফেলতে পারা যায়। প্রেম-ভালবাসা, মনোমালিন্য, রেষারেষি, তারপর এ সবেব শেষ পরিণতি যা হয়ে থাকে, অর্থাৎ খুন-জখম এ সবই তার জীবনে ঘটে গেছে। তবে সে যাত্রায় প্রাণে বেঁচে গেছে সে। কিন্তু তার জীবন একেবারে নিশ্চিত কোনোদিনও হয়নি। সেই বকম অনিশ্চিত জীবনপ্রবাহ চলছে আজও যেন। সে জানে না, এর শেষ কোথায়? কিংবা আদৌ শেষ হবে কি না।

অথচ শুরুতে এ সব কথা কখনও মনে হযনি। বেশ শান্তিতে এবং শান্ত পরিবেশেই সে তার জীবন শুরু করেছিল। আজ এই সব ঘটনাগুলো একে একে ঘটে যাচ্ছে, যেগুলো তার কাছে প্রধান বাধা বলে মনে হচ্ছে, জীবনাবম্ভে এসব কিছুই অনুভূত হয়নি, কোনো কিছুই সমস্যা বলে তখন মনে হয় নি।

আজ যেন সে সবদিনগুলি স্বপ্ন বলেই মনে হয। সেই সব দিনগুলোতে সুখের চেয়ে দুঃখের ভাগই হয়তো বেশি ছিল। তবু সে সব দিনগুলো খাবাপ বলে মনে হয় নি অশোকের কখনও।

তখন শীত ফুরিয়ে আসছিল। ঝরা পাতার মাস। ঝির ঝিব বৃষ্টি শুরু হয়েছিল দুপুর থেকে। পথ-ঘাট কাদায় চটচটে। একটা বিশ্রী জলো-হাওয়া বইছিল। সময়টা ফাল্গুনের শেষ। হাওয়ায় শীতেব তীব্রতা একেবারে নিঃশেষ হযে যায় নি তখনও। কাজেই সেই জলো ঠাণ্ডা হাওয়াটা ক্রমশ যেন বেশ পীড়াদাযক হযে উঠেছিল। ওদিকে আবাব অন্ধকার হয়ে আসছিল। অমাবস্যাব বাত।

জি. টি. বোড দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে রাস্তার দু'পাশের সাবি সারি গাছগুলো দেখছিল অশোক। গাড়ি দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। তখন অশোকের বয়স কতই বা হবে? তেইশ থেকে চব্বিশের মধ্যে হবে হয়তো। যৌবনের উদ্দাম গতিতে সে তখন ছুটছিল এখনকার হরিয়ানা এবং তখনকার পাঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে দিয়ে। তখন ভারতবর্ষ সবে দু'ভাগ হয়েছে। পাকিস্তানের জন্ম মুহূর্ত থেকে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ করে তখন পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে দলে দলে শরণার্থীরা পূর্ব পাঞ্জাবে চলে আসছিল। জি. টি. রোডেব দু'ধারে সরকারের তাঁবু পড়েছিল। ক্যাম্প, উদ্বাস্তুদের থাকার জন্যে সাময়িক ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তারই মধ্যে দিয়ে অশোক দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ ফরিদাবাদের কাছে এসে তার গাড়ি বিগড়ে গেল। শ্লেটের মতন কালো অন্ধকার চারিদিকে। যেদিকে তাকাও ধূ ধূ মাঠ-প্রান্তর। জনবসতি একেবারে নেই বললেই চলে। অনেক দূরে একটা আলোর নিশানা দেখতে পেয়ে অশোক হাঁটা পথে সেদিকে এগিয়ে চলল। প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটার পর সে একটা মেটে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আলোর নিশানা অশোক এই বাড়ি থেকেই দেখতে পেয়েছিল।

এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের বাড়ি। বাড়ির চারদিকে খেত-খামার। বাড়ির কর্তা

বীরেন্দ্রকুমার কাউর অশোককে দেখে প্রথমে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। প্রাণচঞ্চল, বলিষ্ঠ চেহারার যুবকটিকে দেখে ভদ্রলোকের কেমন যেন একটা কৌতূহল হ'ল তার সম্বন্ধে খুঁটিয়ে সব কিছু জানার জন্যে। ইতিমধ্যে অশোক তার গাড়ি হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়ার কথাটা বলে রেখেছিল।

বীরেন্দ্রকুমারের বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো নেই। আজকের মতো গ্রামে তখন ইলেকট্রিক আলো যায়নি। বীরেন্দ্রকুমার লণ্ঠনটা অশোকের মুখের কাছে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কলকাতা থেকে আসছ? তাহলে নিশ্চয়ই বাঙালী!

হ্যাঁ। অশোক মাথা নাড়ল।

বসো। দেহাতী খাটিয়ার ওপর অশোককে তিনি বসতে বললেন অতঃপর।

তারপর চলল কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদের পালা। কলকাতার কোথায় বাড়ি। কি জাত। বাবা মা আছেন কি না, ইত্যাদি।

তারপর মনে হয়, অশোকের ঠিক ঠিক উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে বীরেন্দ্রকুমার খুশি হলেন। খুশি হয়েই তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা কমলজিতের নাম ধরে ডাকলেন।

আমাকে ডেকেছেন?

কমলজিত সঙ্গে সঙ্গে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল।

বীরেন্দ্রকুমারের অত বড় সম্পত্তির অংশীদার বলতে ঐ একমাত্র কন্যা কমলজিতই! কমলজিতই একাধারে তাঁর ছেলে ও মেয়ে দুয়েরই অভাব পূরণ করে থাকে। কমলজিতের স্বাধীনতা এখানে পরিপূর্ণ। মেয়েকে তিনি ছেলের মতো করেই মানুষ করছেন। মেয়ের নামেই বাড়ির নাম রেখেছেন, কমলজিত-নিবাস।

বীরেন্দ্রকুমারের স্ত্রী মেয়েকে জন্ম দিয়েই এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। সে আজ প্রায় চৌদ্দ পনেরো বছর হবে।

কমলজিতের বয়স এখন পনেরো ষোলো হবে।

সেই অল্প বয়সেই দীর্ঘ চেহারা। পিঙ্গল চোখ। উন্নত নাসা। মোম-নরম গাল। গায়ের রঙ অত্যন্ত ফর্সা, সব চেয়ে সুন্দর ওর কিশোরীসুলভ মুখখানি। পরনে যদি বাঙালীদের মতো শাড়ি থাকত তাহলে বোধ হয় ওকে বাঙালী ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যেত না। আশ্চর্য। সুদূর এই উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অমন রুক্ষ পরিবেশে বাঙালীর কমনীয়তা নিয়ে কি করে যে কমলজিত জন্ম নিল, সেটা অশোকের কাছে এখনও যেন একটা বিরাট রহস্য বলে মনে হয়।

কমলজিত বাংলায় কথা বলে অশোককে আর এক দফা চমকে দিয়েছিল।

আপনি তো কলকাতা থেকে আসছেন, তাই না!

হ্যাঁ, অশোক অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। এত চমৎকার বাংলা বলতে পাবে কমলজিত? বাঙালী মেয়ের মতো মুখ। চমৎকার বাংলা ভাষা জানা কিশোরী মেয়ে। প্রবাসে এসে এত পরিচিত মুখের সন্ধান পেয়ে অশোক যত না খুশি হ'ল তার চেয়ে বেশী হ'ল কমলজিতের সহজ সরল ব্যবহার দেখে। তাই প্রথমে সে অনেকক্ষণ কথা বলতে পারল না। তারপর এক সময় সম্বিত ফিরে পেয়ে অশোক জবাব দিল, হ্যাঁ, এই দেখুন না পথের মাঝে গাড়িটা হঠাৎ বিগড়ে গেল। তা না হলে—

তাতে কি হয়েছে, আপনার এতে কিন্তু হবার কিছু নেই। গাড়িটা যতক্ষণ না আবার সারিয়ে

তুলতে পারছেন, এখানে থেকে যান। কিছু দূরেই মোটর-গাড়ির ওয়ার্কশপ আছে, কাল সকালে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবেখন। এখন আরম্ভ করুন।

অগত্যা থেকে যেতে হ'ল 'কমলজিত নিবাসে'।

আমিও মনে মনে এমনটিই চাইছিলাম।

কমলজিত আমার মনের কথাটা জানতে পেরেছিল কি না জানি না, তবে, সে যাই হোক, ও যে সেই অন্ধকার রাত্রে বিদেশ-বিঁভূইয়ে আমার একটা মস্ত বড় উপকার করেছিল, ওর বাড়িতে সেই রাতের মতো থাকতে দিয়ে।

হর্ষ জিজ্ঞেস করল, তারপর?

তারপর?

আবার অশোক বলে চলল।

গাড়ি রিপেয়ার করতে করতে দিন সাতেক কেটে গেল। গাড়ির একটা দামী পার্টস খারাপ হয়ে গিয়েছিল। দিল্লী থেকে আনিয়ে তবে গাড়িটা রাস্তায় চলার মতো অবস্থা হ'ল আবার। ইতিমধ্যে—

ইতিমধ্যে কি? হর্ষ আবার জিজ্ঞেস করল।

কমলজিতের রহস্য আমার কাছে উদঘাটিত হতে থাকল ক্রমশঃ। কমলজিতের বাবা বীরেন্দ্রকুমারই সব এক এক করে বললেন।

কমলজিত না কি কলকাতাতেই বেশির ভাগ সময় থাকত। লরেটোর ছাত্রী। ছুটিতে বাবার কাছে বেড়াতে এসেছিল। তাছাড়া ওর মা ছিলেন বাঙালী। পাঞ্জাবে মেয়ের সংখ্যা খুব কম। বীরেন্দ্রকুমার তাঁর ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে কলকাতায় গিয়েছিলেন। সেখানে এক বাঙালী দোস্তের বাড়িতে কমলজিতের মা অমলার সঙ্গে আলাপ হয়ে যায়। বীরেন্দ্রকুমার তখন অবিবাহিত। অমলা ছিলেন বাপের সাত মেয়ের মধ্যে সব চেয়ে বড়। দেখতে অপরূপ সুন্দরী ছিলেন অমলা। দীর্ঘাঙ্গী। কিন্তু এ সব সত্বেও অমলার বিয়ের বয়স প্রায় পেরিয়ে গিয়েছিল। এখনকার মতো তখন মেয়েদের এত বেশী বয়সে বিয়ে হওয়ার রেওয়াজ ছিল না। কুড়ি পেরোলেই মেয়ের বাপ-মা ভীষণ চিন্তায় পড়ে যেত। সে জায়গায় বাইশ-তেইশ বছরের অমলা তখন তাঁর মা-বাবার কাছে যথেষ্ট চিন্তা হওয়ার কারণ হয়ে উঠেছিলেন বৈকি। অমলার বাবা ছিলেন সরকারী করণিক মাত্র। অতগুলো মেয়েদের খাইয়ে পরিয়ে মেয়ের বিয়ের জন্যে বাড়তি টাকা তাঁর ছিল না। তাই যখন তিনি বীরেন্দ্রকুমারের কাছ থেকে অমলাকে বিয়ের প্রস্তাব পেলেন, তখন খুশি না হয়ে থাকতে পারলেন না।

তারপর একদিন শুভদিনে বীরেন্দ্রকুমারের সঙ্গে অমলার বিয়ে হয়ে গেল। অমলা বাংলাদেশ ছেড়ে সুদূর হরিয়ানায় ফরিদাবাদের সেই স্বল্পখ্যাত গ্রামে চলে এলেন স্বামীর ঘর করতে। অমলার ভাগ্যে সেই সুখ বুঝি বেশী দিন লেখা ছিল না। কমলজিতের জন্ম দিয়ে বছর খানেকের মধ্যেই মারা গেলেন।

সেই থেকে কমলজিত কলকাতায় তার মামাবাড়ির লোকেদের তত্বাবধানে লরেটো স্কুলে মানুষ হতে থাকে। সেই বছরই কমলজিতের জুনিয়র কেম্ব্রিজ দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরীক্ষা তার দেওয়া হ'ল না। আর এক বছরের আগে অশোকেরও কলকাতায় ফেরা হ'ল না।

তার মানে ফরিদাবাদেই আপনি কিছুদিনের জন্যে থেকে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ ঠিক তাই মিঃ সেন। দুর্ধর্ষ প্রশ্নের জবাবে অশোক বলল। অশোক আবার বলতে শুরু করল ঃ

কমলজিত একটু একটু করে আমার বেড়ানোর সাথী হয়ে উঠল। আমার অলিভ-গ্রীণ রঙের অস্টিন গাড়িতে চড়ে এক একদিন ঘুরতে ঘুরতে অনেক দূরে চলে যেতাম। আমার পাশে বসে থাকত কিশোরী কমলজিত। কোনো কোনোদিন নির্জন কোনো এক পাহাড়ী ঝর্ণার নিচে গাড়ি থামিয়ে আমরা পাহাড়ের ওপরে উঠে যেতাম। কমলজিত ছেলেমানুষের মতো পাহাড়ের জঙ্গলে ছুটে ছুটে বেড়াত। কখনও কখনও গভীর জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে আড়াল থেকে আমার নাম ধরে ডাকত। কিশোরী কমলজিতের মিষ্টি গলা পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসত বার বার আমার কানে। আমি তখন হন্যে হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াতাম। কিন্তু কোথায় কমলজিত? তারপর ব্যর্থ হয়ে যখন সেই গভীর অরণ্যে দিশেহারা পথিকের মতো পথ ভুলে রাস্তা খোঁজার জন্যে ছটফট করতাম, ঠিক তখনি ও কোথা থেকে আমাকে জড়িয়ে ধরে কলকলিয়ে ঝর্ণাধারার মতো হেসে উঠত।

তখন কেউ কোথাও থাকত না কাছে পিঠে। নির্জন নিস্তব্ধ। ঘন অরণ্য। শুধু আমি আর কমলজিত।

তোমার ভয় করে না কমলজিত ?

কিসের ভয়! কমলজিত আমার বুকের মধ্যে মুখ রেখে জবাব দেয়।

কেন, আমাকে।

তোমাকে আবার ভয় করতে হবে কেন?

বাঃ আমি যে পুরুষ।

হলেই বা! কমলজিত কেমন সহজ সরল ভাবে জবাব দিয়ে বলত—আমার বাবাও তো পুরুষ মানুষ ' শুনেছি বাবার সঙ্গে মা-ও এখানে প্রায়ই বেড়াতে আসতেন। বাবাকে ভয় পেলে মা নিশ্চয়ই বার বার এখানে আসতে চাইতেন না।

কমলজিত !

ওকে বুকের মধ্যে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে বলি, কমল, তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ কেন, তাঁরা ছিলেন বিবাহিত। তাই তোমার মা'র ভয় পাবার কিছু ছিল না। কিন্তু তুমি তো অবিবাহিতা। তাই আমাকে তোমার ভয় করা উচিত। আমি যদি এখন তোমাকে—

কমলজিত আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, তোমাকে আমি ভীষণভাবে ভালবেসে ফেলেছি অশোক। তাই তোমাকে আমি বিশ্বাস করতে পাবি। এখন এর পর তুমি আমাকে যে ভাবেই ব্যবহার করতে চাও না কেন, আমাকে সেটা মেনে নিতেই হবে।

আমাকে তুমি এত ভালবাসো কমল?

হ্যাঁ অশোক। বলে কমলজিত ফিরে আবার জিজ্ঞেস করছিল, কেন, আমার মতো তুমিও ভালবাসো না?

হ্যাঁ, বাসি বইকি। কমলজিতের চোখে চোখ রেখে বলি, তুমি তা বুঝতে পার না?

হ্যাঁ, পারি বলেই তো তোমার সঙ্গে যেখানে সেখানে ছুটে আসি, দেখ না।

হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

তোমার ঘুম পাচ্ছে? কমলজিত জিজ্ঞাসা করে।

হ্যাঁ, ভীষণ। কিন্তু কি করি বল তো!

বেশ তো, কমলজিত মৃদু হেসে বলল, এখানে একটু ঘুমিয়ে নাও না।

তুমি বলছ?

অশোক তাকালো কমলজিতের মুখ পানে।

কমলজিতের ভীরু চোখ দুটি একটু কেঁপে ওঠে। পর মুহূর্তেই ও সামলে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, এসো আমার কোলের ওপর মাথা রেখে শোবে।

তারপর থেকে লক্ষ্য করতে থাকলাম, অশোক বলতে থাকল, কমলজিত কত যেন সহজ হয়ে যেতে থাকল আমার কাছে একটু একটু করে। শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়াল যে, আমার কাছে অদেয় কিছু ওর রইল না আর। সে ওর দেহ-মন সব কিছু আমার কাছে সমর্পণ করে দিল। এক কথায় আমরা উভয়ে গভীরভাবে ভালবেসে ফেললাম কিছুদিনের মধ্যেই।

শেষ পর্যন্ত নিশ্চয়ই একটা শুভদিন দেখে—কথাটা অসমাপ্ত রেখে হর্ষ অর্থপূর্ণভাবে হেসে অশোকের দিকে তাকাল।

না, মানে—

শেষ পর্যন্ত আপনাদের বিয়েটা হয় নি।

একজ্যাক্টলি সো।

কেন?

সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিছু মনে করবেন না। ঠিক এই মুহূর্তে এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারছি না।

বললে অবশ্য আমার পক্ষে একটু সুবিধে হ'ত। যাকগে, যখন আপনি বলতে চাইছেন না, দরকার নেই। এখন বলুন, কমলজিতের কথা আরও থাকলে বলুন।

হ্যাঁ, কমলজিতের কথা এখনও ফুরোয়নি। ওর কথা আপনাকে আরো কিছু জানানো দরকার।

বেশ তো বলুন না! হর্ষ অশোকের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সেই সময় হঠাৎ কমলজিতের এক আত্মীয় যুবক বম্বে থেকে এসে উপস্থিত হ'ল। বছর বাইশ তেইশ বয়স হবে। বম্বেতে থাকত বলে তার চেহারা ও বেশভূষাও যেন বম্বের ফিল্মের হিরো মার্কা। যেন সে আজকের রাজেশ খান্না! ঠিক রাজেশের মতোই চলন-বলন, এমনকি চাউনিটা পর্যন্ত অবিকল রাজেশের মতো। কেন যে সে বম্বের ফিল্ম জগত ছেড়ে ফরিদাবাদের মতো অমন নিরস রুক্ষ না-শহর না-গ্রাম মার্কা জায়গায় এসে হাজির হ'ল, প্রথমে বুঝতে পারি নি। সেটা পরে আমার খেয়াল হ'ল, তখন জল অনেক ঘোলা হয়ে গেছে, কমলজিত তার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে শুরু করে দিয়েছে। ওদের সেই হাবভাব দেখে একদিন কমলজিতকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, একটা সত্যি কথা বলবে কমল?

কি সত্যি কথা!

তুমি কি আগের মতো এখন আর আমাকে ভালবাসো না?

কেন বাসব না! কমলজিত সেই আগের মতো ওর স্বভাব-সুলভ ভঙ্গীতে বলল, হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?

না, এমনি।

না, এমনি নয়। কমলজিত বলে, আমার মনে হয় তুমি আমার ওপর ঠিক বিশ্বাস রাখতে পারছ না আগের মতো। আর—

আর কি বল। ওর মুখ দিয়েই আমার অভিযোগটা বার করে নিতে চাইছিলাম।

তুমি অর্জুনকে সহ্য করতে পারছ না। জান, সে আমাদের পরিবারের একজন আত্মীয়। তাকে খাতির করতেই—

কিন্তু তাই বলে তোমাকে অমন গায়ে পড়া ভাব দেখাতে হবে?

সেরকম ভাব তো তোমাকেও দেখাই। তাতে কি হয়েছে!

বাঃ তোমার অদ্ভুত যুক্তি। তোমার কাছে আমি আর অর্জুন এক হয়ে গেলাম, এখন তুমি এই কথা বলতে চাইছ!

তা কেন! কমলজিত কৈফিয়ত দেওয়াব সুরে বলল, আমি এমনি একটা কথার কথা বলছিলাম, এই আর কি।

না, এটা তোমার কথার কথা নয় কমলজিত। আমার ধারণা—

কি তোমার ধারণা শুনি?

দু'টো নৌকায় পা রেখে তুমি চলতে চাইছ।

কি বললে?

অর্জুন সিংকেও তুমি হাতে রাখতে চাইছ।

ছিঃ ছিঃ, তুমি এত নীচ অশোক ? তোমার মনটা এত ছোট ' ছিঃ ছিঃ, এ কথা তুমি কি করে ভাবতে পারলে! তোমার প্রতি আমার ভালবাসাটাকে তুমি এত ছোট করে দেখতে পারলে?

তুমি দেখাতে পারলে আমিই বা দেখাব না কেন বলো! আমার তখন ভীষণ জিদ চেপে গিয়েছিল। রাগের মাথায় যা নয় তাই বলে ফেললাম, মেয়েরা জন্ম-অভিনেত্রী, তোমাদের সব কিছুই অভিনয়। আস্‌লে কোনোটাই আসল নয়, সবই নকল।

তার মানে আমি নকল? আমি তোমার সঙ্গে এতদিন ধরে কেবল ভালবাসার অভিনয় করে এসেছি! কমলজিত রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল, ঠিক আছে, তোমার যদি তাই মনে হয়, এর পর থেকে আমার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রেখো না।

হ্যাঁ, রাখবই না তো!

এই পর্যন্ত বলে অশোক থামল।

তারপর? হর্ষ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল আবার অশোকেব দিকে।

তারপর আর কি। কমলজিতের ওখানে থাকার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হ'ল না। তাই পরদিনই কলকাতায় ফিরে এলাম।

তাই বুঝি! হর্ষ জিজ্ঞেস করল, কমলজিতের বাবা বীরেন্দ্রকুমার আপনাকে আসতে দিলেন?

তিনি তখন ফরিদাবাদে ছিলেন না। জলন্ধরে গিয়েছিলেন কি একটা কাজে। তবে—

তবে কি?

মাস পাঁচ ছয় পরে কমলজিত একটা চিঠি লিখেছিল।

কি লিখেছিল?

আমাকে যেতে লিখেছিল খুব একটা জরুরী প্রয়োজনে। প্রয়োজনটা যে কি, তা অবশ্য ও লেখে নি।

তা আপনি সেখানে গিয়েছিলেন?

না।

কেন?

ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক তো এক রকম শেষ করেই এসেছিলাম। তাই ওর কাছে গিয়ে কি লাভ হ'ত বলুন।

তাহলেও তার প্রয়োজনটা কি ছিল, তা আপনার জানা উচিত ছিল মিঃ রায়, বিশেষ করে আপনার উপস্থিতিটা যখন তার কাছে খুব প্রয়োজনীয় ছিল।

কিন্তু তখন আর আমার কাছে ওর কোনো প্রয়োজন ছিল না।

তাহলে তো বলার কিছু নেই। কিন্তু এখন আপনার অসুবিধেটাই বা কি তাহলে?

মনে হয় ফরিদাবাদের নতুন ইউনিটটা চালু করতে দেবে না ওরা।

ওরা বলতে কাদের মিন করতে চাইছেন আপনি?

অর্জুন সিং-এর দলের লোকেরা।

বেশ তো এ ব্যাপাবে পুলিশের সাহায্য নেওটাই তো যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়। কিংবা আইনেব আশ্রয়—

না, পুলিশ কিংবা আইনের কোনো ফাঁক ওরা বাখছে না।

তাহলে?

ওবা আমাকে খতম করে দিয়ে আমার প্রচেষ্টা বানচাল কবে দিতে চায়।

তাই না কি?

ইয়েস মিঃ সেন। জীবনেব দিক থেকে আমি কোনো ভরসা পাচ্ছি না আর। আর এতদিনেব পবিশ্রম, আশা আকাঙ্খা এ সব ওরা মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে স্তব্ধ কবে দিতে পাবে। তাই আপনাকে আমাব একান্ত অনুরোধ আপনি কিছুদিনের জন্যে আমাব পাশে পাশে থেকে ওদের সেই জঘন্য প্রচেষ্টাটাকে ব্যর্থ করে দিন। আমার বিশ্বাস আপনি তা পারবেন, কেন, পারবেন না?

ওয়েল মিঃ রায়, আমি যাব। হর্ষ তাকে আশ্বস্ত কবে জিজ্ঞেস কবল, ফরিদাবাদের ইউনিট আপনি কবে স্টার্ট কবতে চান বলুন?

সব রকম ব্যবস্থাই প্রায় শেষ এখন। আপনার কাছ থেকে নির্দিষ্ট তারিখটা পেলেই ইউনিট চালু কবে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। বলুন, কবে নাগাদ আপনি যেতে পারবেন সেখানে?

আজ হ'ল ডিসেম্বরের পঁচিশ। আটাশ তারিখে যাব, যাতে করে আপনি পয়লা জানুয়ারিতেই আপনার নতুন ইউনিটের উদ্বোধন কবতে পারেন।

বেশ, এখান থেকে আপনার জন্যে সেই রকম ব্যবস্থা আমি করে যাব।

নো, মিঃ রায়, এখন আপনার সেখানে একা যাওয়া উচিত হবে না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে আপনার যেতে হবে। আমার সঙ্গে দীনেনও যাবে।

তাহলে তো খুবই ভাল হয়। অশোক উৎফুল্ল হয়ে বলল, তাহলে আগামী তিবিশ তারিখের ইভনিং ফ্লাইটে—

ও কে, তাই কথা রইল।

হর্ষর সম্মতি আদায় করে নিয়ে অশোক রায় চলে গেল। তাকে বেশ খুশি বলেই মনে হ'ল।

অশোক রায় চলে যেতে হর্ষ ক্যাপস্টেন মিক্সচারের কৌটাটা থেকে কিছু টোব্যাকো মিক্সচার বার করে নিয়ে নতুন করে সিগারেট তৈরী করতে লেগে গেল। এটা গোয়েন্দা হর্ষ সেনের বিশেষ একটা চাল। সিগারেট তৈরী করার ফাঁকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা সে চিন্তা করে নেয়। তাই মনে হয়, তার চিন্তাটা এখন গ্রেট বিজনেস ম্যাগনেট অশোক রায়কে ঘিরেই সীমাবদ্ধ।

অশোক রায় না কি খুন হতে চলেছে। মনে হয় হত্যাকারী দিন গুনছে। তাই স্বভাবতই সেই দিনটা অশোকের কাছে সব চেয়ে অশুভ এবং ভয়ঙ্কর বলে মনে হবারই কথা। এবং স্বাভাবিক কারণেই ভয় পেয়ে একটু নার্ভাস হয়ে যাওয়ারই কথা। কিন্তু এ সবই অশোকের অনুমানের ওপর ভিত্তি করা। তার কথাবার্তায় এ পর্যন্ত এমন কোনো কাবণ খুঁজে পাওয়া যায় নি, যা তার জীবনের পক্ষে হানিকর হতে পারে। মনে হয়, সে যেন কোনো কিছু গোপন কবে গেছে, সে যেন আসল ব্যাপারটা চেপে গিয়ে একটা বিরাট রহস্যের মধ্যে ফেলে দিয়ে গেছে আমাদের।

কি, কি সেই রহস্য হতে পারে? আর কেনই বা অশোক সেটা গোপন করতে গেল! সর্ব প্রথম সেটাই জানা দরকার। হর্ষ মনে মনে তাই ভাবল।

ইতিমধ্যে হাতে পাকানো সিগারেটটাও তৈরী হয়ে গিয়েছিল। হর্ষ মিক্সচারের কৌটটা দীনেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, তোমারটা তৈরী করে নাও।

দীনেন নিজের জন্যে সিগারেট তৈরী করতে ব্যস্ত হ'ল। সেই ফাঁকে হর্ষ সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল। সিগারেটের ধোঁয়াটা কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘরের সিলিং ছুঁল। সিলিং-এর নিচে জমতে শুরু করল মেঘের মতো। সেই মিনি মেঘের দিকে তাকিয়ে হর্ষ অবার গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'ল।

অশোক রায় বিবাহিত। সুন্দরী স্ত্রী। ধনী দুহিতা বিখ্যাত ইন্ড্রাস্ট্রিয়ালিস্ট স্যার অমরেন্দ্র চৌধুরীর একমাত্র কন্যার সঙ্গে অশোকের বিয়ে হয়েছিল। তাদের একটি পুত্র ও একটি কন্যা। ছেলে মেয়ে দু'জনেই দার্জিলিং-এ কনভেন্টে পড়াশোনা করছে।

ছেলের বয়স বাইশ। আর মেয়ের বয়স আঠারো।

ছেলে মেয়েদের জন্য কোনো চিন্তা নেই অশোকের। ওরা ঠিক সময়ে মানুষ হয়ে নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে যাবে বলে সে বিশ্বাস রাখে। কিন্তু ভাবনা তার সুন্দরী স্ত্রী মাধবীকে নিয়ে।

মাধবীর বয়স খুব বেশী হলে আটত্রিশ-উনচল্লিশ হবে। খুব অল্প বয়সেই অশোকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। বলতে গেলে একরকম কিশোরী বয়সেই বিয়ে হয় তার। তবু এখনও যে রূপ ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী মাধবী, দেখলে মনে হয় না যে, সে দুটি ছেলে-মেয়ের মা। তার বয়স আটত্রিশ-উনচল্লিশ। দেখলে মনে হয়, তেইশ-চব্বিশ বছরের সুন্দরী যুবতী। যেন তার বিয়ের বয়স এখনও আছে। অশোকের ভয় সেখানেই। তার ভয় আরও একটা কারণে, সংসারেব প্রতি তার যেন মোটেই টান নেই। কেমন যেন উড়ো-উড়ো ভাব। ইদানিং

ফরিদাবাদে অশোকের সঙ্গে নতুন ইউনিট দেখে এসে তার সেই ছাড়া-ছাড়া ভাব, সংসারের প্রতি অনীহাটা যেন আরও বেড়ে গিয়েছে। তাই অশোক রায় দুঃখ করে বলছিল, এত তাড়াতাড়ি মাধবীকে ওখানে না নিয়ে গেলেই বোধহয় ভাল ছিল। তাহলে তার পরিবর্তনটা এত তাড়াতাড়ি বোধহয় এগিয়ে আসত না।

তাছাড়া—

তাছাড়া অশোক আরও একটু উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিল, একটা তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী সেই অর্জুন সিং এক রকম গায়ে পড়ে ভাব করেছিল মাধবীব সঙ্গে। ফরিদাবাদে অশোকের ফ্যাক্টরীর কাছেই অর্জুনের ফ্যাক্টরী। সেই সূত্রেই সে আলাপ করতে এসেছিল প্রথমে মাধবীর সঙ্গে। তারপর সেই আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। অর্জুন সিং তার বাড়িতে পার্টি দিয়েছিল মাধবীর অনারে। তার স্ত্রী সুলোচনার সঙ্গে মাধবীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। অশোক থাকত সব সময় ব্যস্ত তার নতুন ফ্যাক্টরী গড়ার কাজে। আর মাধবী ঘুরে ঘুরে বেড়াত ফরিদাবাদে নতুন গড়ে ওঠা শিল্প নগরীর চারপাশে।

অশোক অবশ্য জানে না, অর্জুন সিং মাধবীকে কমলজিতের সম্বন্ধে কোনো কথা বলেছে কি না, কিংবা বলে থাকলে মাধবী ওর ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখিয়েছে কি না!

তবে অশোক না কি তার নতুন ফ্যাক্টরীর ব্যাপারে ফরিদাবাদে গিয়ে কমলজিতের খোঁজ করেছিল, কিন্তু কেউ ওর হদিশ দিতে পারে নি। কেউ বলতে পারে নি কমলজিত আদৌ বেঁচে আছে কিনা, কিংবা বেঁচে থাকলে ও এখন কোথাযই বা' কেন না ফবিদাবাদে যে শিল্প নগরী এখন গড়ে উঠেছে সেই জায়গাটা কমলজিতদেব ছিল। মনে হয় জমি-জমা বিক্রী কবে দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে ওরা।

সোমা ঘবে ঢুকতেই হর্ষর চিন্তায় বাধা পড়ল। সোমার পিছন পিছন রামুও ঘরে ঢুকল। তার হাতে কফির ট্রে। ট্রের ওপর খাবারে প্লেট। টেবিলের উপর ট্রেটা রামু রাখলে পর সোমা কফি তৈরী করতে মনোযোগ দিল।

সোমা হর্ষর বেটার হাফ্। বলতে গেলে একরকম ও তার সহধর্মিণীর মতো সহকর্মিণীও বটে। দীনেনের মতো সোমাও সময় সময় তাকে তার কোনো জটিল কেস সম্বন্ধে মতামত জানায়, ক্লু ধরিয়ে দেয়।

হর্ষকে চিন্তিত অবস্থায় বসে থাকতে দেখে সোমা জিজ্ঞেস করল, সাত সকালে অত কি চিন্তা করতে বসলে শুনি। দেখে মনে হচ্ছে, কোনো জটিল খুনের কেসের ব্যাপারে মাথা ঘামানো হচ্ছে! তা খুনটা কবে কোথায় হ'ল?

হয়নি, তবে হতে বেশী দেরীও আর নেই বোধহয়।

সে কি? সোমা চমকে উঠল।

হ্যাঁ সোমা, কথাটা একেবারে খাঁটি সত্য।

তা তোমার মতো গোয়েন্দা থাকতে একটা জলজ্যান্ত মানুষ খুন হয়ে মরবে?

নিয়তি, এ সবই নিয়তি সোমা, বুঝলে! নিয়তি না হলে নিজের দেশ ছেড়ে অপরের দেশে গিয়ে অশোক রায়ই বা ব্যবসা করতে যাবে কেন বলো।

কিন্তু নতুন জায়গায় ব্যবসা করতে যাওয়ার সঙ্গে তার খুনের কি সম্পর্ক থাকতে পারে হর্ষ? দীনেন প্রশ্নটা সোমার মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে হর্ষর দিকে ছুঁড়ে দিল।

আছে, আছে বলেই তো বললাম।

তুমি কি কমলজিতের ওপর সন্দেহ করছ?

না। ওর প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে ওঠে না, কেন না ওর হদিশ অশোক পায়নি ফরিদাবাদের শিল্প নগরীর কোথাও। তাই ও পিকচারে আসতে পারে না কোনমতেই।

তবে? কার ওপর তোমার সন্দেহ হচ্ছে হর্ষ!

কারোর ওপরই নয়, আবার অনেকের ওপরই, যেমন অর্জুন সিং, মিসেস্ মাধবী রায়। কিংবা অশোকের ব্যবসার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী, যে কি না তার সুখ সমৃদ্ধি সহ্য করতে পারে না। ফরিদাবাদে গিয়ে নতুন ফ্যাক্টরী চালিয়ে অশোক আরও উন্নতি করুক, তা সে হয় তো চায় না। কিন্তু অশোক রায়ও দমবার পাত্র নয়। নতুন ফ্যাক্টরীর প্রোডাকশান সে শুরু করবেই। চিরকালের জেদি ছেলে অশোক, যখন যা মনে করবে সেটা কাজে পরিণত না করা পর্যন্ত থামবে না। সেই চিরকালের জেদি, ডানপিটে ছেলে আজকের প্রৌঢ় বয়স ছুঁই ছুঁই অশোক রায়ও কেমন যেন হঠাৎ একটু ভীতু ভীতু ধরনের হয়ে পড়েছে। অবশ্য ভয় পাবারই তো কথা। হর্ষ এও ভাবল, মৃত্যুকে ভয় করে না, এমন মানুষ পৃথিবীতে বোধহয় খুব কমই আছে। মৃত্যু-ভয়কে উপেক্ষা করা খুবই কঠিন।

যতই সে ডানপিটে হোক না কেন, সে-ও তো মানুষ! সে-ও তো ভয় পেতে পারে। তারও জীবনহানির আশঙ্কা থাকতে পারে। তবে এই ধরনের আশঙ্কাটা যে একেবারেই এড়ানো যায় না, তা নয়।

কিন্তু কি, কি উপায়ে হর্ষ?

সোমা ও দীনেন দুজনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করে হর্ষর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সব কিছু অকপটে স্বীকার করে নেওয়া আর— হর্ষ একটু থেমে আবার বলল, আর স্বীকৃতি দেওয়া।

অশোক রায় যে অকপটে সব কিছু স্বীকার করে যায় নি তা না হয় বুঝলাম। দীনেন জানতে চাইল, কিন্তু কাকে স্বীকৃতি দেওয়ার কথা তুমি বলছ হর্ষ?

হর্ষ কি যেন বলতে যায়, ঠিক সেই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল।

কফি তৈরী করা বন্ধ রেখে সোমা এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল। নিচু গলায় একটু সময় কি যেন বলে তারপর হর্ষর দিকে ফিরল,—তোমার ফোন।

হর্ষ রিসিভারটা কানের কাছে তুলে ধরে বলে, প্রাইভেট ডিটেকটিভ হর্ষ সেন স্পিকিং। কি নাম বললেন? ও হ্যাঁ, বুঝেছি। আমি জানতাম আপনি ফোন করবেন। আমারও আপনাকে ভীষণ জরুরী প্রয়োজন ছিল, ভালই হ'ল। এখন বলুন কখন গেলে আপনার সঙ্গে দেখা হতে পারে! এনি টাইম? বেশ, বেশ। শুভস্য শীঘ্রম। তাহলে এখুনি আপনার কাছে যাচ্ছি। না, না ভয়ের কিছু নেই। আর থাকলে কিই বা করতে পারি বলুন। এখন আমার এমন অবস্থা যে, অন্ধকারে কেসটার ক্লু খুঁজে বেড়ানোই সার হবে শেষ পর্যন্ত। মনে হয় আসামীকে ধরার আগেই সেই নিষ্ঠুর কাজটা সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে। না, না আমার সাধ্য মতো চেষ্টা নিশ্চয়ই করব। আপনার মতো, আপনার স্বামীর মতো আমিও সমান উদ্বিগ্ন এই কেসটার ব্যাপারে। এই জটিল কেসটার ব্যাপারে নিজেকে জড়াব না ভেবেও শেষ পর্যন্ত মনে হয় এর সঙ্গে অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে পড়ব। তাই আপনি আমার ওপর নির্ভর করতে পারেন। আপনাকে

এ ব্যাপারে একটু সাহায্য করতে হবে। মিনিট পনেবোর মধ্যেই আপনার কাছে গিয়ে পৌঁছুচ্ছি, কেমন? বাই—

টেলিফোনের রিসিভারটা ক্রেডেলের ওপর রেখে দিয়ে হর্ষ তাকাল দীনেনের দিকে। সে-ও তাকিয়েছিল হর্ষর দিকে উৎসুক হয়ে।

মিসেস মাধবী রায়ের কল ছিল। আমাদের যেতে বলল। চল, দেখা যাক নতুন আলোর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় কি না সেখানে!

চল। দীনেন সম্মতি জানিয়ে বলল।

বালিগঞ্জে ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সে অশোক রায়ের বিরাট বাড়ি। বাড়ি তো নয় যেন একটা বিরাট প্যালেস। চাবিদিকে বাগানে ঘেরা বাড়ি। মাঝখানে সেই বিরাট প্যালেস সমান বাড়ি। যেন সমুদ্রের মাঝে একটি দ্বীপ দাঁড়িয়ে।

বাড়ির নাম 'মাধবীকুঞ্জ'।

মাধবী গেটের সামনে দাঁড়িয়ে হর্ষর জন্যে অপেক্ষা করছিল। হর্ষব ফিয়াট ১১০০ গেটের সামনে এসে দাঁড়াতেই মাধবী এগিয়ে এলো।

আসুন। আপনিই তো মিঃ সেন। হর্ষর দিকে তাকিয়ে মাধবী আন্দাজে কথাটা ছুঁড়ে দিল।

হর্ষ মৃদু হেসে সমর্থন জানাল।

চলুন।

গাড়ি থেকে নেমে হুর্ষ ও দীনেন অনুসরণ কবল মাধবীকে।

ড্রইংরুম পেরিয়ে মাধবী তার নিজের ঘরে এনে বসাল তাদের।

আপনার সঙ্গে খুব গোপন পরামর্শ আছে মিঃ সেন, আমার স্বামী যেন না জানতে পারেন। তাই আমার ঘরে নিয়ে এলাম। অশোক অবশ্য এখন বাড়ি ফেরে নি। হঠাৎ যদি ফিরে আসে সেই জন্যে এই ব্যবস্থা।

কিন্তু আমাব গাড়িটা যে রয়েছে, সেটা দেখে যদি—

তার ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি আপনারা আসার আগেই। আপনারা আমার ঘরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার গাড়িটা বাড়ির পিছন দিকের রাস্তায় নিয়ে গিয়ে রেখে দিয়েছে আমাব নিজস্ব ড্রাইভার। পিছন দিকের দরজা দিয়েই ফিরে যেতে হবে আপনাদের।

আচ্ছা, কেন এই গোপনীয়তা বলতে পারেন?

মাধবী খানিকটা সময চুপ করে রইল। সেই সময়টা হর্ষ তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সুন্দরী, খুব সুন্দরী মাধবী এখনও এই বয়সে। না জানি যৌবনে, কিশোরী বয়সে সে আরও কত সুন্দরী ছিল। মনে হয় এইমাত্র সে স্নান করে এসে দাঁড়িয়েছিল। অর্ধ-সিক্ত কুন্তলবেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়াচ্ছিল গালের ওপরে। ফর্সা সুন্দর মোম-নরম গালের ওপর জলের ফোঁটাগুলো দেখে মনে হচ্ছিল যেন শ্বেতপদ্মের ওপর শিশিরবিন্দু টলটল করছিল। হর্ষ অবাক হয়ে দেখছিল সেই রূপ। মাধবীর কথায় তার চমক ভাঙল।

আমার স্বামীর মঙ্গলের জন্যেই এই গোপনীয়তা রক্ষা করা মিঃ সেন।

ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না মিসেস রায়। আপনার স্বামী তো আমাকে চেনেন। খানিক আগেই তিনি আমার বাড়িতে গেলেন, তার প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্যে আমাকে একান্ত অনুরোধ করে এলেন। সেই মিঃ রায় এখানে আমাকে দেখতে পেলে এমন কি অমঙ্গল হতে পারে?

বলছি! বলে কি যেন বলতে যায়, ঠিক সেই সময় ললিতা এসে ঘরে ঢুকল, মা—

কি ? কতকটা বিরক্ত ভাব দেখিয়ে মাধবী তাকাল ললিতার দিকে।

অর্জুন সিং এসেছে।

কে এসেছে?

ফরিদাবাদ থেকে অর্জুনবাবু এসেছেন।

বল গিয়ে এখন দেখা হবে না। আমি বাড়িতে নেই।

মুহূর্তেই অর্জুন সিং হাজির হ'ল।

ঝি-চাকরদের কেন মিথ্যে কথাটা শেখাচ্ছেন মিসেস্ রায়? নিজেকে লুকোবার চেষ্টা না করলেই কি নয়! কোনো কিছুই গোপন থাকবে না, থাকতে পারে না। তাই বলছি ধীরে সুস্থে প্রকাশিত হয়ে আমার বক্তব্যটা শোনার চেষ্টা করুন দয়া করে।

আপনার আবার কি বক্তব্য আছে? মাধবী ভ্রূ কুঁচকে তাকাল অর্জুন সিং-এর দিকে।

বাঃ এরই মধ্যে সব ভুলে গেলেন?

না, ভুলি নি।

তাহলে জিজ্ঞেস করছেন কেন, আমার আবার কি বক্তব্য আছে বলে!

তা নয়। আমার জানতে ইচ্ছে করে, বার বার একই বক্তব্য নিয়ে কেন আপনি আসছেন?

এ জিনিস কখনও আবার পুরোনো হয় নাকি! অর্জুনের ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি।

আপনাকে আগেও বলেছি, আবার আজও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই ওসব কথা আপনাকে ভুলে যেতে হবে চিরদিনের জন্যে।

ভুলব মনে করলেই ভোলা যায় নাকি ?

হ্যাঁ, ভুলতে আপনাকে হবেই! মাধবীর কথায় দৃঢ়তার সুর।

আমি না হয় ভুললাম। কিন্তু আর পাঁচজন, যারা আপনার স্বামীর কুকীর্তির সাক্ষী, তারা—

মিঃ সিং—

কি, আমাকে চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাবেন নাকি ?

না।

তাহলে আমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান।

কি আপনার প্রস্তাব বলুন তাড়াতাড়ি। মাধবী স্মরণ করিয়ে দিল, আমার স্বামীর ফেরার সময় হয়ে এলো, সময় নষ্ট না করে বলে ফেলুন, কি করলে এ বাড়ির ছায়া আর মাড়াবেন না। বলুন কত টাকা পেলে আপনি আমাদেব রেহাই দেবেন!

টাকা? টাকা তো আমি নিতে আসি নি।

তবে কি চান? কি পেলে আপনি খুশি হবেন বলুন!

আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে আপনাকে মামলা করতে হবে।

কিসের মামলা?

ডিভোর্সের।

হোয়াট! মাধবী রুখে দাঁড়াল।

আপনাদের বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আনতে হবে।

বাট হোয়াই। কেন, কেন অশোককে আমি ছেড়ে দেবো। অশোক আমার স্বামী। আমি ওকে একান্তভাবে ভালবাসি। এমন সুখের সংসার ছেড়ে কেন আমি চলে যাব!

এ সংসার আপনার নয়!

তবে কার এ সংসার।

কমলজিতের। কমলজিতই অশোকবাবুর প্রথমা স্ত্রী।

না, না—

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

আমি আদালতের শরণাপন্ন হ'ব।

আদালত আপনার বিরুদ্ধে যাবে।

কমলজিত যে অশোকের স্ত্রী তার কি প্রমাণ আছে? আমি বিশ্বাস করি না, আদালতও বিশ্বাস করবে না, অশোকের সঙ্গে তার কোনোদিন বিয়ে হয়েছিল।

ঠিক আছে, চললাম, যথা সময়ে প্রমাণ আর সাক্ষী-সাবুদ নিয়ে আদালতে হাজির হবো'খন।

অর্জুন সিং ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়ে ফিরে দাঁড়ায় মাধবীর ডাকে।

কিছু বলবেন?

হ্যাঁ। মাধবী এবার একটু নবম সুরে কতকটা অনুনযেব ভঙ্গীতে বলল, ডিভোর্সের পব আমার অবস্থা যে কি হবে, সেটা ভেবে দেখেছেন!

তাতে কি হয়েছে। অর্জুন সিং-এর মুখে এবাব হাসি ফোটে। তাব সেই হাসিটা কেমন যেন ক্রুর বলে মনে হ'ল। তাবপব তো আমি বয়েছি। বলে সে একটা চোখ একটু ছোট করে তাকাল মাধবীর দিকে। দৃশ্যটা মাধবীর কাছে ভীষণ কুৎসিত বলে মনে হ'ল। তবু তাকে চটাতেও সাহস পাচ্ছিল না মাধবী। এ ক'দিনে মাধবী অর্জুন সিং-এর যে পরিচয় পেয়েছে, তাতে তার এই ধারণাই হয়েছে যে, সে একজন সাংঘাতিক প্রকৃতির লোক। হেন কাজ নেই যে, সে পারে না। তাই তাকে ঠিক এই মুহূর্তে চটাতে চাইল না মাধবী। হর্ষর দিকে ফিরে মাধবী বললে, এক্সকিউজ মি মিঃ সেন, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আবার আমি ফিরে আসছি। বলে সে অর্জুন সিংকে সঙ্গে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। খানিক পবে হর্ষ নিচে নামার সিঁড়ির মুখ থেকে মাধবী আর অর্জুন সিং-এর সম্মিলিত চাপা হাসির শব্দ শুনতে পেল। মনে হয়, মাধবী বোধ হয় অর্জুনের প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। তাই তারা খুশিতে অমন উচ্ছ্বসিত, ডগমগ। মাধবী অর্জুনের শিকার হয়ে গেল তাহলে! হর্ষ ভাবল, তাছাড়া তার কিই বা কবাব থাকতে পারে।

কি রকম মনে হচ্ছে হর্ষ? দীনেন নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল।

কাকে?

মাধবীকে।

হেঁয়ালিতে পরিপূর্ণ। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

বিচিত্র এই নারী। দীনেন বলল।

তার চেয়েও বিচিত্র তার মন। হর্ষ মন্তব্য করল, দেখলে না, ভদ্রমহিলার কথাবার্তা শুনে মনে হ'ল, কখনও সে হিংস্র সর্পিণী, কখনও বা ভিরু হরিণী। তা না হলে অর্জুনের মতো অমন বিপজ্জনক লোকের কথায় রাজী হয়ে গেল! এ সব মেয়ে ভীষণ দুর্বল চরিত্রের।

এবা সব পারে। দীনেন বলল, অশোক রায়ের সম্ভাব্য হত্যাকারীর লিস্টে মাধবীর নাম লিখে রাখতে পার।

না, সে রকম দুঃসাহস তার নেই। হর্ষ উত্তরে বলল, বললাম না, এ সব দুর্বলচিত্তের মেয়েদের দৌড় ঐ হৃদয় পরিবর্তন করা পর্যন্ত। তার বেশী এরা এগোতে পারে না। এগোবার সাহস এদের নেই।

কে জানে। বলে দীনেন দরজার দিকে তাকাতেই দেখল, মাধবী ঘরে ঢুকছে। ঘরে ঢুকে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মাধবী বলল, আপনাদের দেরী করে দেওযার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

ও কিছু নয়। হর্ষ জিজ্ঞেস করল, এখন বলুন, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?

ধন্যবাদ। মাধবী মৃদু হেসে বলল, কিন্তু আপনার সাহায্যের আর দরকার হবে না বোধ হয় মিঃ সেন। আপনাকে অহেতুক কষ্ট দিলাম।

না, তার জন্যে আমি কিছু মনে করছি না। হর্ষ প্রত্যুত্তরে বলল, কিন্তু আমি ভেবে অবাক হচ্ছি যে, আপনার মতের পরিবর্তনে কি এমন কারণ হয়ে উঠল হঠাৎ!

হ্যাঁ, হঠাৎই বলতে পারেন। মাধবী বলে, খানিক আগে হঠাৎই ঠিক করে ফেললাম, অর্জুনকে বিয়ে করব।

অর্জুন সিংকে বিয়ে করবেন আপনি? হর্ষ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আবার বলল, আপনার এখানকার সামাজিক প্রতিপত্তি, কলকাতার বিজনেস ম্যাগনেট মিঃ অশোক রায়ের ঘর, সর্বোপরি আপনার সেই নিষ্পাপ দুটি পুত্র-কন্যা, এ সব ছেড়ে আপনি ভিন্ রাজ্যের অমন একটা বিপজ্জনক লোককে বিয়ে করতে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ, অর্জুন বিপজ্জনক হতে পারে। তবে সে অশোকের মতো অমন মাতাল, মদ্যপ, চরিত্রহীন নয়, সে নারীকে যথেষ্ট মর্যাদা দিতে জানে।

আপনি বুঝি সেই রকম গ্যারান্টি তার কাছ থেকে পেয়েছেন? হর্ষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল মাধবীকে, কি উত্তর দেয় তা জানার জন্যে।

হ্যাঁ। অন্য সব মেয়েদের মতো আমি জীবনের সিকিউরিটি চাই মিঃ সেন।

তাহলে আমার বলার কিছু নেই। বলে হর্ষ উঠে দাঁড়াল, আজ চলি। আবার দেখা হবে।

এ বাড়িতে আর নয়।

কে জানে, হয়তো এ বাড়িতেই, আর খুব শীগ্‌গীরই আবার দেখা হয়ে যেতে পারে আমাদের। বলে হর্ষ যখন 'মাধবীকুঞ্জ' থেকে বেরিয়ে এলো, তখন ঘড়িতে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক বারোটা।

সব আয়োজনই প্রায় পাকা হয়ে গেছে।

কথামতো হর্ষব বাড়িতেই দীনেন সকাল থেকে এসে উঠেছে তার মিনি লাগেজপত্র নিয়ে।

রাত ন'টার ফ্লাইটে তারা ফরিদাবাদে যাচ্ছে অশোক রায়ের সঙ্গে তার নতুন ফ্যাক্টরীর উদ্বোধন উৎসব দেখতে।

ফরিদাবাদে এই 'রয়সন ইন্ডাস্ট্রিজ' না কি এশিয়াব মধ্যে সব চেয়ে বড় এবং সারা পৃথিবীতে তৃতীয় ইলেকট্রনিক ফ্যাক্টরী স্থাপিত হতে যাচ্ছে। অনেকদিন পরে বাঙালী জাত আবার যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখছে।

দিল্লী থেকে প্রধানমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী ও আরো অনেক ভি. আই. পি-রা আসছেন ফরিদাবাদে অশোক রায়ের ফ্যাক্টরী উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে। অনেক বিদেশীরাও আসছে। কেবল আসছে না অশোক রায়ের ঘরের একান্ত আপনজন তার স্ত্রী মাধবী। মাধবী না কি সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে, তার কোনো ইন্টারেস্ট নেই এ ব্যাপারে। অশোক রায়ের স্ত্রী হিসেবেই সে যখন থাকছে না আর কিছুদিন পরে, তখন কি দরকার তার বৈষয়িক বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে!

এ ক'দিনে মাধবী অনেক বদলে গেছে, আবার বদলে যাবে ধীরে ধীরে ডিভোর্সের মামলাটা শুরু হলেই। মাধবী এখন ঘন ঘন তার বাপের বাড়ির অ্যাটর্নির বাড়িতে যাতায়াত করছে। তাকে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করছে অর্জুন সিং।

অর্জুন সিং মাধবীর ভাবী স্বামী।

অশোক রায়ও ছাড়বার পাত্র নয়।

ফরিদাবাদে নতুন ফ্যাক্টরী উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করার ফাঁকে সে-ও ইতিমধ্যে তার অ্যাটর্নির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে মাধবীর কেসের ব্যাপারে। তার অ্যাটর্নি তাকে পরামর্শ দিয়েছে, স্বামীর হেপাজতে থাকা সত্ত্বেও সে যে এক পরপুরুষের সঙ্গে অবৈধভাবে মেলামেশা করছে, এ এ্যালিগেশানই মাধবীর বিরুদ্ধে যাবে। তার কেস তখন কেঁচিয়ে যাবে। এই ভাবেই তাকে বেকায়দায় ফেলতে হবে। তাহলে নিশ্চয়ই সে ডিভোর্সের কেস তুলে নিতে বাধ্য হবে।

অশোক রায় তার পরিকল্পনা মতো এগোচ্ছিল। ফরিদাবাদ থেকে ফিরে এসেই সে এ ব্যাপারে ফাইনাল ডিসিশন নেবে বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। অশোক রায় তার এই পরিকল্পনার কথা সব খুলে বলেছে হর্ষকে। গোয়েন্দার কাছে কোনো কিছুই গোপন করতে নেই, সেই ভেবেই অশোক তাকে সব খুলে বলেছিল। এবং সে এও বলেছিল, মাধবীকে সে এখন ভালবাসে, তাকে এখন সে স্ত্রী রূপেই পেতে চায়।

কিন্তু যত সব গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলছে ঐ অর্জুন সিং। অথচ তাদের দাম্পত্য জীবনের ভেতর অহেতুক নাক গলানোর কোনো অর্থ হয় না অর্জুন সিং-এর। অর্জুন মাঝে মাঝে কমলজিতের প্রসঙ্গ তুলে একটা বাড়তি সুযোগ নিতে চাইছে। অশোকের অতীত জীবনের ঘটনা-দুর্ঘটনার সব ছবি তুলে ধরে তাকে যেন ব্লাকমেইল করতে চাইছে। অথচ যাকে নিয়ে এত মাথা ব্যথা, সেই কমলজিত আদৌ বেঁচে আছে কি না, কিংবা বেঁচে থাকলেও ওর কি মতামত, অশোকের সম্বন্ধে এখন ওর কি ধারণা, সে সব কিছুই জানা যায় নি এখনও পর্যন্ত। এ ব্যাপারে অশোক অনেক প্রশ্ন করছে অর্জুনকে, কিন্তু কোনো বারই সদুত্তর পায় নি। অশোক নিরাশ হয়ে অর্জুন সম্বন্ধে এই ধারণাই করে নিয়েছে যে, তার এখন প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল তাকে

ব্লাকমেইল করে এবং মাধবীর মনে অশোক সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করে তাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া। এবং হতেও চলেছে তাই। মাধবী যেন অশোকের কাছ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে।

সন্ধ্যে তখন সাতটা হবে। হর্ষ তার জিনিসপত্র গুছিয়ে সবে ক্যাপস্টেনের মিক্সচারের টিনটা খুলতে যাবে একটা সিগারেট তৈরী করার জন্যে ঠিক সেই সময় টেলিফোনে ঝন্‌ঝন আওয়াজ হ'ল। হর্ষ ছুটে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিয়ে কয়েক সেকেন্ড কথা বলার পরই চমকে উঠে প্রশ্ন করল,—কি বললেন? আপনার জীবন বিপন্ন! ঠিক আছে, আমি এখুন যাচ্ছি ঘাবড়াবেন না।

রিসিভারটা ক্রেডেলের ওপর রেখে দিয়েই হর্ষ চিৎকার করে বলে উঠল দীনেনের উদ্দেশ্যে, গেট রেডি দীনেন, অশোক রায়কে বোধহয় আর বাঁচিয়ে রাখা গেল না। খুনীকে ফরিদাবাদ পর্যন্ত কষ্ট করে যেতে হ'ল না। তার আগেই সে এখানে বোধহয় তার ঈপ্সিত কাজটা এতক্ষণে হাসিল করে নিল। মিঃ রায়ের ফোন ছিল। কোন রকমে ফোনে সে আমাকে এই মাত্র জানিয়ে দিল, তার জীবন নাকি বিপন্ন, শীগ্‌গীর চলে আসুন।

সে কি! অবাক হয়ে দীনেন আবও কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হর্ষ ইশারায় তাকে থামতে বলে বলল, আর এক মুহূর্তও এখানে আমাদের থাকা উচিত হবে না দীনেন। চল, এখুনি বেরিয়ে পড়া যাক।

হ্যাঁ চল।

হর্ষর ফিয়াট ১১০০ দ্রুত এগিয়ে চলল বালিগঞ্জ ম্যাণ্ডেভিলা গার্ডেন্সের দিকে।

নিস্তব্ধ 'মাধবীকুঞ্জে' তখন একটা ঝড়ের পূর্বাভাস শোনা যাচ্ছিল।

খট্-খট্খট্—

ভারী জুতোর আওয়াজটা ক্রমশঃ ওপরের দিকে উঠে আসছে যেন। শব্দটা ক্রমশঃ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছিল একতলা, দোতলা, তিনতলা—

খট্-খট-খট্—

চারতলায় নিজের শয়নকক্ষে অশোক রায় টেবিলের ওপর মাথা রেখে তেমনি চিন্তিত মুখে বসে আছে। তার চোখের দৃষ্টি উদভ্রান্ত এবং চঞ্চল। খানিক আগে তার ফোন এসেছিল। ফোনে কথা বলতে বলতে এক সময় অশোককে বেশ উত্তেজিত হতে দেখা গিয়েছিল। শেষ দিকে বলতে শোনা গিয়েছিল, মাধবীকে আমি ছাড়তে পারব না। না, না কমলজিতের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। ও আমার কেউ নয়। ও আমার কেউ ছিল না কোনোদিন। কি বললেন, মিথ্যে কথা বলছি? ঠিক আছে, আপনি যা খুশি করতে পারেন। আর আমিও দেখে নেব, কার জোর বেশী, আমার না আপনার।

সেই শেষ উত্তেজিত হয়ে কথা বলা অশোকের। সেই শেষ বাইরে থেকে তার ফোন আসা। কেন না তারপরেই সে শব্দ করে রিসিভারটা নামিয়ে রেখেছিল ক্রেডেলর ওপর। তারপর টেবিলের ওপর মাথা রেখে ভাবতে বসেছিল। এর পর তাব কি করা উচিত, কি করলে চিন্তাটাকে এড়ানো যায়। তার অপর প্রান্তের লোকটা তাকে নিশ্চয়ই কোনো চিন্তায়

ফেলে দিয়ে থাকবে। তাই সে স্বাভাবিক হতে পারছিল না, কথা বলতে পারছিল না। তার অবস্থা এখন এমনি যে, চিৎকার করে উঠে চাকর হরিকে যে ডাকবে, সেই শক্তিটুকুও বুঝি সে হারিয়ে বসে আছে একটু আগে।

অত কি সব চিন্তা করছে অশোক ? আর ভাববারই বা কি থাকতে পারে অত !

খট্-খট্খট্—

ঠিক সেই সময়ই ভারী জুতোর আওয়াজটা তিনতলার ওপর এসে থামল একটু সময়ের জন্যে। তারপর আবার সেই শব্দটা ওপরে উঠতে শুরু করল।

আর মাত্র কয়েকটা সিঁড়ির ধাপ। এবং তারপরেই—

মনেহয় লোকটা বোধ হয় খুব কাছ থেকে কোনো পেট্রোলপাম্প কিংবা ওষুধের দোকান থেকে ফোন করেছিল। তবু ত' সত্ত্বেও এত অল্প সময়ের মধ্যে যে, সে এসে পড়তে পারে তা বুঝতে পারে নি অশোক। আচ্ছা, হর্ষ সেনই বা আসছে না কেন এখনও! গোলপার্ক থেকে ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সে গাড়িতে আসতে মিনিট চার পাঁচ লাগা উচিত, সে জায়গায় প্রায় দশ মিনিট হতে চলল, তবু সে এখনও এলো না কেন! অশোক ছট্ফট্ করতে থাকল। হাতে আর সময়ও বেশী নেই। ঐ ভাবী জুতোর শব্দটা আর কয়েক মুহূর্ত পরেই তার ঘরের সামনে এসে থামবে। তারপর!

অশোক আর ভাবতে পারছে না। সব যেন কেমন ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে। যেন মনে হয়, তার পায়ের তলাকার মাটি একটু একটু করে সরে যাচ্ছে। এই যে এখন তার পায়েব নীচে যেটুকু মাটি অবশিষ্ট আছে, আগন্তুক তার সামনে এসে যখন দাঁড়াবে, বোধহয় তখন সেটুকুও আর থাকবে না।

না, না—

অশোক চমকে উঠল। না, তার আগেই আর একবার চেষ্টা করে দেখতে হবে, বাঁচাব শেষ উপায়টা খুঁজে বার করা যায় কি না।

খট্-খট্-খট্—

অশোক শেষ চেষ্টা করতে এবার মাথা তুলে উঠে দাঁড়াল। টেবিলল্যাম্পের আলোটা তার মুখের ওপর এসে পড়েছিল। সেই আলোয় দেখা গেল, অশোক আগের চেয়ে আরও বেশী চিন্তিত যেন, আরও বেশী গম্ভীর যেন। বুঝি তার শক্ত-সমর্থ দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারাটাও একটু যেন কেঁপে উঠল যখন সে উঠে দাঁড়াল। এবং তেমনিভাবে কাঁপতে কাঁপতে সে ঘরের মধ্যে কয়েকবার পায়চারি করে টেবিলের সামনে এসে ফিরে দাঁড়াল। তারপর এক সময় সে রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল করল, হ্যালো লালবাজার?

অপর প্রান্ত থেকে কি উত্তর এলো, তা শোনা গেল না। তবে অশোককে আবার বলতে শোনা গেল, আমি অশোক রায়, ম্যান্ডেভিলা গার্ডেন্সের 'মাধবীকুঞ্জ' থেকে বলছি, শীগগির চলে আসুন, আমার জীবন—

খট্-খট্-খট্—

ভারী জুতোর আওয়াজে অশোকের গলার স্বরটা চাপা পড়ে গেল।

খানিক পরেই হর্ষ সেন এলো। তার সঙ্গে এলো দীনেন। কিন্তু তখন সব শেষ। তখন আর করার কিছু ছিল না। হর্ষ দেখল, অশোকের দেহটা মেঝের ওপর পড়ে রয়েছে। রক্তে ভেসে

যাচ্ছে তার সর্বাঙ্গ। পিঠের ঠিক মাঝখানটায় একটা তীক্ষ্ণ ধারালো ছোরা জাতীয় কোনো অস্ত্র আমূল বিদ্ধ অবস্থায় আটকে রয়েছে। এবং সেই ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরে পড়ছিল তখনও। সেই রক্তের ধারাটা ছোট-খাটো একটা নদী পথ সৃষ্টি করছিল।

রক্ত নদী। রক্ত স্রোত। যেন সেই রক্তের ধারাটা স্রোতের মতো বয়ে চলেছে শ্বেতশুভ্র মার্বেল পাথরের মেঝের ওপর দিয়ে।

উপুড় হয়ে পড়ে থাকার দরুন অশোকের মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। হাতদুটো দোমড়ানো অবস্থায় বুকের নিচে ঢোকানো রয়েছে।

ওদিকে রিসিভারটা ঝুলছে টেবিলের প্রান্ত বেয়ে। মনে হয়, সেটা ঠিক মতো জায়গায় রাখবার অবসরটুকুও পায় নি অশোক। রাখার আগেই আততায়ী তাকে নিশ্চয়ই অতর্কিতে আক্রমণ করে থাকবে পিছন দিক থেকে।

হর্ষকে ফোনে অশোক শুধু তার জীবন বিপন্নর কথাই জানিয়েছিল, কিন্তু কে যে তার জীবন বিপন্ন করতে পারে তার আভাস সে দেয় নি, মানে দেওয়াব সুযোগ সে পায়নি।

কিন্তু কে, কে সে হতে পারে?

কে, কে হতে পারে অশোকের সম্ভাব্য হত্যাকারী?

কেবল এই প্রশ্নটাই হর্ষেব মনের মধ্যে অনবরত ঘুরপাক খেতে থাকল। কে, কে সেই অজ্ঞাত-নাম্না হত্যাকারী।

মিসেস, মাধবী রায় দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে নাকি ছুটে এসেছিল। হর্ষ তাকে মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল স্থির হয়ে। আশ্চর্য, তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর সে লক্ষ্য করেনি তখন। স্বামীর অমন আকস্মিক মৃত্যুর জন্যে কোনো আক্ষেপ নেই, একটুও কান্না নেই। এমন কি সাধারণ মানুষের জন্যে তার অমন মারাত্মক বিপদের জন্যে দুঃখ প্রকাশ করার সৌজন্য বোধটুকুও বুঝি সে হারিয়ে ফেলেছিল। না কি শুধু তাচ্ছিল্যের প্রকাশ এটা। ডিভোর্সের প্রারম্ভে বুঝি এ রকমই সম্পর্ক গড়ে থাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে? কে জানে।

ওটা তার অভিনয়। দীনেন চুপিচুপি হর্ষকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, আমার মনে হয়, ঐ ভদ্রমহিলাই তার স্বামীর হত্যাকারী। মনে হয়, অর্জুন সিং বেশী সময় অপেক্ষা করতে পারছিল না। ডিভোর্সের মামলার রায় যে কবে বেরুবে, তা অনিশ্চিত। তাছাড়া ডিভোর্সের আগে একটি বছর সেপারেশন থাকতে হবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তার অর্ডার বার করতেই হয়তো পুরো একটি বছর কাটিয়ে দেবে কোর্ট নানান অজুহাতে। তাই মনে হয় এত সব ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে মাধবী সোজা পথ অর্থাৎ অশোককে অপসারণ করার পথটাই বেছে নিয়েছিল। আর মনে হয় যদি সে নিজে অমন নিষ্ঠুর কাজটা সম্পন্ন না করে থাকতে পারে, তবে অর্জুন সিং তাকে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে সাহায্য করে থাকবে। এবং সেটাই সম্ভব তার পক্ষে। দীনেন আরও বলল, মিসেস রায়কে তুমি গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা কর এখুনি। ওঁকে জেরা করলেই দেখবে আসল খুনীর পরিচয়টা পেয়ে যাবে।

মিসেস রায় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। হর্ষ কি ভেবে যেন বলল, শুধু মাত্র সন্দেহের বশেই কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না। তার জন্যে উপযুক্ত প্রমাণ চাই।

কিন্তু ততক্ষণে যদি খুনী পালিয়ে যায়? দীনেন তবু সন্দেহ প্রকাশ করল।

তার জন্য পুলিশ রয়েছে। হর্ষ বলল, তাছাড়া আমি তোমায় গ্যারান্টি দিচ্ছি, মিসেস রায় পালাবে না, পালাতে পারে না, দেখে নিও।

তারপর হর্ষ সময় অপচয় না করে প্রাথমিক তদন্তের কাজে লিপ্ত হ'ল। এবং প্রথমেই সে মেঝের ওপরে ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করে দেখল, অশোকের শ্বাস-প্রশ্বাস তখনও পড়ছে কি না। যদিও সে দূর থেকে একবাব দেখেই বুঝে গিয়েছিল যে, তার দেহে প্রাণের কোনো চিহ্ন থাকতে পারে না। তারপর সন্দেহ মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল হর্ষ ধীরে ধীরে।

ইতিমধ্যে লালবাজার থেকে স্পেশ্যাল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টেব ইনচার্জ সত্য দত্ত তার দলবল নিয়ে হাজির হয়েছিল। সঙ্গে ডাঃ সঞ্জয় বোসও এসেছে।

হর্ষ সেনকে দেখে সত্য দত্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনি? হর্ষকে সত্য দত্ত আগে থেকেই চিনত।

মিঃ রায় আমার ক্লায়েন্ট। তাঁর কাছ থেকে হঠাৎ ফোন পেয়ে চলে এসে দেখি এই অবস্থা।

আমিও তো তাই, সত্য দত্ত জিজ্ঞেস করল্ল, কি ব্যাপার বলুন তো? আপনি কিছু জানেন এ ব্যাপারে!

কিছু কিছু জানি। হর্ষ ম্লান হেসে বলল, আর যেটুকু জানি না, আশা করি সেটা বেশী দিন অপ্রকাশিত থাকবে না আমার কাছে।

থ্যাঙ্ক য়্যু মিঃ সেন। সত্য দত্ত কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলল, আমি নিশ্চিত হলাম।

তারপর হর্ষব নির্দেশে ডাঃ সঞ্জয় বোস অশোক রায়কে পবীক্ষা করে জানাল, স্যরি, হি ইজ ডেড।

ডেড ! হর্ষ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল ডাঃ বোসের দিকে।

ইয়েস মিঃ সেন, ডাঃ বোস প্রত্যুত্তরে বলল, আমাদের এখানে আসার অনেক আগেই মিঃ রায়ের মৃত্যু হয়েছিল।

তাই বুঝি ! বলে হর্ষ পববর্তী তদন্তর কাজে লিপ্ত হ'ল।

আশ্চর্য! আপাত-দৃষ্টিতে কোথাও এতটুকু খুঁত পাওয়া গেল না খুনের। খুনী অত্যন্ত চতুর। কোনো ক্লু সে রেখে যায় নি। মানে সঠিক এই মুহূর্তে সে রকম কিছু পাওয়া গেল না। যেন একটি নিখুঁত খুন এটা। এ রকম খুনের সমস্যায় হর্ষর মনে হয়, জীবনে এই প্রথম বুঝি সে পড়ল। তবে খুন যেই করুক না কেন, খুনটা অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় করেছে। ইংরিজীতে যাকে বলে 'কোল্ড ব্লাডেড মার্ডার'।

কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে, খুন করে সে এত তাড়াতাড়ি পালালোই বা কোথা দিয়ে, এত বড় বাড়ি থেকে? অশোকের বাড়ির প্রায় সকলকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে এর সঠিক কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। সবাই যেন কেমন একটা নীরবতা পালন করার ভান করে রইল। অদ্ভুত ! এটা যেন একটা অদ্ভুত ঘটনা হয়ে দাঁড়াল এখন। মনে হয়, খুনী যেন কোনো অশরীরী মূর্তি, কিংবা কর্পূরের মতো উবে গেল পুলিশ আসার আগেই। যেন এটা অলৌকিক? ঘটনা ঘটে গেল এই মাত্র। তা না হলে মাধবীকুঞ্জের অতগুলো লোকের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সে চলে যেতে পারল? তবে সে মানুষ নয়, অমানুষ। পিশাচ। পিশাচ না হলে এমন পৈশাচিক ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করতে পারে নাকি।

বেচারা অশোক রায়! তার আশঙ্কাটাই সত্য হ'ল শেষ পর্যন্ত।

অশোক নিজের খুন হওয়ার কথাই কেবল বলেছিল। কিন্তু কি জন্যে যে, সে খুন হতে পারে তা কখনও বলে নি। উদ্দেশ্য অবশ্য একটা আছে এ খুনের। কিন্তু কি, কি সেই উদ্দেশ্য? কিই বা হতে পারে এই খুনের উদ্দেশ্য। হর্ষর মনের মধ্যে বার বার এই প্রশ্নটা উঁকি দিতে থাকল।

অতঃপর হর্ষ সেন একে একে অশোক রায়ের বাড়ির সবার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করল। সব শেষে এক সময় অশোক রায়ের একান্ত সচিব হরবিন্দর কাউরের ডাক পড়ল।

হরবিন্দর কাউরকে ঘরে ঢুকতে দেখেই হর্ষ চমকে উঠল। বছর বাইশ-তেইশ বয়স হবে তার। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা পাঞ্জাবী যুবকরা যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু তার মুখের ওপর ফিরে ফিরে হর্ষর দৃষ্টি স্থির হয়ে যাচ্ছিল। নাম না বললে তাকে বিশ্বাসই করা যায় না যে, সে বাঙালী নয়!

আপনি বাঙালী নন? হর্ষ যেন বিশ্বাস করেও বিশ্বাস করতে পারছিল না।

না, আমি পাঞ্জাবী। সলজ্জ হেসে হরবিন্দর আরও বলল, আমার বাড়ি ফরিদাবাদে।

ফরিদাবাদে? হর্ষ চমকে উঠে প্রশ্ন করল।

হ্যাঁ ফরিদাবাদে জন্ম হলেও কলকাতায় আছি জন্মের প্রায় পর থেকেই।

তাই বুঝি! একটু থেমে হর্ষ জিজ্ঞেস করল, বাবা মা আছেন?

মা আছেন, বাবা নেই।

বাবা নেই?

না। খুব ছেলেবেলাতেই বাবাকে হারাই।

স্যরি মিঃ কাউর, না জেনে আপনাকে দুঃখ দিয়ে ফেললাম।

না না, তাতে কি হয়েছে। হরবিন্দর ম্লান হেসে বলল, নিষ্ঠুর সত্যটা তো কখনও অস্বীকার করা যায় না।

তা ঠিক। হর্ষ মনে মনে কি যেন ভাবল। আর ফিরে ফিরে তার দিকে তাকাতে থাকল। হরবিন্দর বলেছে, তার বাবা নেই, ফরিদাবাদে বাড়ি, বাঙালীর মতো মুখ। আর মুখটা যেন চেনা চেনা। ভীষণ চেনা মুখ তার যেন খুব কাছের বলে মনে হয়। অদূরে মৃত অশোক রায়ের মুখের দিকে ফিরে তাকিয়েই হঠাৎ, হ্যাঁ হঠাৎই একটা সম্ভাবনার কথা মনে হ'ল হর্ষর। এবং কথা মনে হতেই হর্ষ জিজ্ঞেস করল, ওয়েল মিঃ কাউর, কতদিন চাকরি করছেন মিঃ রায়ের কাছে?

বছর দুই হবে।

অশোকবাবুর দুর্ঘটনার সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

নিচে, অফিসরুমে। হরবিন্দর জবাবে বলল, আমাদের বিজনেসের ব্যাপারে এক ক্ল্যায়েন্টের সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। তারপর হঠাৎ চিৎকার শুনে ছুটে এসে দেখি এই ব্যাপার।

আর আপনাদের সেই ক্লায়েন্ট ভদ্রলোক, তিনি, তিনি গেলেন কোথায়?

ওপরে আসার আগে তাকে আমি বিদায় করে এসেছিলাম।

কি নাম তার?

তার নাম! হরবিন্দর চমকে ওঠার মতো করে বলল।

হ্যাঁ, তার নাম কি বলুন? হর্ষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

অ-অমিত দাশগুপ্ত।

কোথায় থাকেন ভদ্রলোক? হর্ষর পরের প্রশ্ন।

একটু সময় কি ভেবে হরবিন্দর অমিতের ঠিকানা বলল। হর্ষ সেটা তার ডাইরিতে নোট করে রাখল। তারপর হরবিন্দরের দিকে ফিরে বলল, ওয়েল মিঃ কাউর, এখন আপনি যেতে পারেন। তবে পুলিশকে না জানিয়ে ফরিদাবাদে কিংবা কলকাতার বাইরে অন্য কোথাও যাবেন না।

এই নির্দেশ হর্ষ দিল অশোকের বাড়ির প্রত্যেককে। তারপর সত্য দত্তকে অশোকের মৃতদেহ পোস্টমর্টেমের জন্যে রিমুভ করানোর ব্যবস্থা করতে বলে হর্ষ নিচে অশোক রায়ের অফিসরুমে এলো।

হরবিন্দর সেখানে ছিল। একটু পরেই সে ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। তার আগেই হর্ষ তার প্রয়োজনীয় এবং অভাবনীয় একটা জিনিস পেয়ে গিয়েছিল হরবিন্দরের এ্যাটাচিকেসের ভেতর থেকে।

একটি ফটো! তবে যেন হাজার প্রশ্ন জড়িয়ে ঐ ফটোটার সঙ্গে, ঐ ফটো দু'টি যুবক যুবতীকে ঘিরে। মনে হয় দীর্ঘদিন আগে তোলা ফটোটা। সেই দীর্ঘদিন আগের যুবকটিকে চিনতে একটুও অসুবিধে হয় না হর্ষর। কিন্তু অশোক রায়ের সঙ্গিণী ঐ যুবতীটি কে, কে ঐ যুবতীটি? আর হরবিন্দরই বা কেন এই ফটোটা এমন যত্ন সহকারে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে! একটু আগের সেই সম্ভাবনার কথাটা এর পর আর উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে মনে হ'ল হর্ষর। কিন্তু সে তার মনের কথাটা কাউকে খুলেও বলতে পারছিল না।

অথচ।

মিঃ কাউর?

আমাকে কিছু কি বলছেন!

হ্যাঁ। হর্ষ জিজ্ঞেস করল, বাড়ি যাবেন না?

হ্যাঁ, এইবার যাব।

আমার সঙ্গে যেতে পারেন। আপনাদের ওদিকেই থাকি। আপনাকে পৌঁছে দেব। চলে আসুন তাড়াতাড়ি। অনেক রাত হয়ে গেছে।

হর্ষর কথার মধ্যে কি ছিল কে জানে, তার কথাটা ফেলতে পারল না হরবিন্দর কাউর। তাকে অনুসরণ করল।

হরবিন্দর অনেক অনুরোধ করল হর্ষকে, অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যেও তার মা'র সঙ্গে আলাপ করে যেতে। কিন্তু কি যেন ভেবে সে রাজী হ'ল না। বলল, আজ থাক। এখন অনেক রাত হয়ে গেছে। বরং অন্য আর একদিন এসে আপনার মা'র সঙ্গে আলাপ করে যাব'খন।

অন্য আর একদিন নয়, পরদিনই সন্ধ্যায় হর্ষকে আসতে হ'ল হরবিন্দর কাউরের বাড়িতে। হরবিন্দরের কাছে তার আসাটা যেন একান্ত জরুরী ছিল। এবং একা নয়, সঙ্গে দীনেন ও লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ইনচার্জ সত্য দত্তও এলো।

হরবিন্দর যেন একটু অবাক হয়েই আগমন দৃশ্য দেখছিল। হর্ষ এত তাড়াতাড়ি তার বাড়িতে আসবে তা সে ভাবে নি। তার সেই মনের ভাবটা হর্ষর দৃষ্টি এড়াল না। তাই ঘরে ঢুকেই বলল, অন্য দিনের জন্যে অপেক্ষায় থাকতে পারলাম না, আজই চলে এলাম।

বেশ তো। বলে হরবিন্দর তাদের আহ্বান করল। আসুন, মা'র ঘরে আসুন।

হরবিন্দরের মা'র ঘরে ঢোকার মুখেই হর্ষ একটা চাপা কান্নার শব্দ শুনতে পেল। হর্ষ উৎকর্ণ হ'ল।

হরবিন্দরই নিজের থেকে বলল, মা ভীষণ ভেঙ্গে পড়েছেন অশোকবাবুর অমন আকস্মিকভাবে মৃত্যু হওয়াতে।

কেন? হর্ষ বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, মিঃ রায়ের সঙ্গে আপনার মা'র কি কোনো আত্মীয়তা কিংবা কোনো সম্পর্ক ছিল?

তা জানি না। তবে মনে হয় মিঃ রায়ের অবর্তমানে আমার অমন সুখের চাকরিটা আজকের এই দুর্দিনে চলে গেল, সেই ভেবেই বোধহয় মা আরও বেশী ভেঙে পড়েছেন।

তাই বুঝি!

ইতিমধ্যে কথা বলতে বলতে তারা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছিল। হর্ষ ও সত্য দত্তকে সোফার ওপর বসতে বলে হরবিন্দর ডাকল, মা!

ছেলের ডাক শুনে আরও জোরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। পিছন ফিরে জানালার দিকে তাকিয়েছিল বলে তাব মুখ দেখা যাচ্ছিল না। পরনে তার নতুন সাদা থান-ধুতি। রুক্ষ চুল। নিরাভরণ দেহ। বৈধ্যব্যের সব চিহ্নগুলিই যেন বর্তমান।

মা, হরবিন্দর আবার ডাকল, এঁরা এসেছেন তোমার সঙ্গে আলাপ করতে।

কে?

হরবিন্দরের মা এবার ফিরে তাকাল। কান্না ভেজা চোখ। ওদিকে তার মুখটা দেখা মাত্র হর্ষ চমকে উঠল। হরবিন্দরের এ্যাটাচিকেসের ভেতর থেকে সংগ্রহ করা সেই ফটোটার যুবতী নারীর সঙ্গে এখন বয়স হলেও হরবিন্দরের মা'র চেহারার সঙ্গে অদ্ভুত একটা মিল রয়েছে। পাশে অশোক রায় ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে স্বামী-স্ত্রী কিংবা প্রেমিক-প্রেমিকার ভঙ্গীমায়। তাহলে তাহলে, কি তার অনুমানটাই সত্য হ'ল শেষ পর্যন্ত? হরবিন্দরের মা-ই কি ঐ ফটোটার সেই যুবতী নাবী ছিল!

হর্ষ ফিরে ফিরে দেখল হরবিন্দরের মাকে। সেই মুখ, সেই চোখ। কোথাও এতটুকু তফাৎ নেই যেন। আর অশোক রায়ও এই রকমই বর্ণনা দিয়েছিল তার। তার ওপর নির্ভর করেই হর্ষ ডেকে ফেলল, কমলজিত দেবী!

হরবিন্দরের মা চমকে উঠল। হর্ষ যে তাকে ও নামে ডাকতে পারে, এ তার ধারণার অতীত ছিল। চোখের জল মুছে কমলজিত জবাব দেয়, বলুন।

আমরা পুলিশের লোক। হর্ষ বলল, অশোকবাবুকে আপনি নিশ্চয়ই চিনতেন! তাঁর খুনের তদন্ত করতে এসেছি আমরা আপনার কাছে।

তা আমি কি বলতে পারি এ ব্যাপারে!

হ্যাঁ, আপনি অনেক কিছুই বলতে পারেন কমলজিত দেবী।

কি বললেন?

আপনি যা জানেন তাই বলুন।

বেশ তো কি জানতে চান বলুন?

আপনি তো পাঞ্জাবী, কিন্তু বাঙালীর মতো বৈধব্যের এ বেশ কেন ধরলেন?

এমনি।

এমনি? সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল হর্ষ কমলজিতের পানে।

হ্যাঁ, বললাম তো এমনি।

ওয়েল কমলজিত দেবী, আপনার স্বামী কবে মারা গেছেন, বলতে পারেন?

আমার ঠিক মনে নেই।।

তবু!

বললাম তো মনে নেই।

আশ্চর্য! হিন্দু বিধবা হ'য়েও আপনি আপনার স্বামীর মৃত্যু কবে হয়েছিল, তা খেয়াল করতে পারছেন না?

না জানলে কি করব বলুন!

হ্যাঁ আপনি জানেন, হর্ষ এবার তীক্ষ্ণস্বরে বলল, কিন্তু আপনি তা বলতে চাইছেন না। ঠিক আছে, তাহলে আমাকেই বলতে দিন। আপনার স্বামী মারা গেছেন গতকাল সন্ধ্যায় খুন হয়ে।

খুন হয়ে আমার স্বামী মারা গেছেন গতকাল সন্ধ্যায়? কমলজিত চমকে উঠে স্বগতোক্তি করল।

হ্যাঁ, ঠিক তাই কমলজিত দেবী। হর্ষ জোর দিয়ে বলল, শুনলে আপনি আরও আশ্চর্য হবেন, আপনার স্বামীর নামও আমি জানি। তিনি হলেন নিহত অশোক রায়।

কে, অশোক রায়? না, না—

হ্যাঁ, এটাই নির্মম সত্য। লজ্জায় ঘৃণায় আর কতকটা অভিমানের জন্যে আপনি তাঁর নাম নিতে পারছেন না। তবে তাঁর মৃত্যুর পরে বাঙালী বিধবার যা যা করণীয় তার সব নিয়মই আপনি পালন করছেন। বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, গতকালের আপনার সিঁথির সিঁদুর এখনও মুছেও মোছে নি, মানে একদিনে ঠিক মোছা যায় না এ জিনিস। চেষ্টা করে আপনিও তা পারেন নি। বলুন, পারেন তা অস্বীকার করতে?

এরপর কমলজিত আর একটা কথাও বলতে পারল না। সেই যে সে নীরব হ'ল, তারপর আর সে মুখ খুলল না। আর কিই বা বলার থাকতে পারে তার!

কমলজিতের জীবনে অশোক রায় হ'ল ধূমকেতু। অশোক হ'ল তার জীবনে পাপ। আর সেই পাপের ফসল হ'ল হরবিন্দর। হরবিন্দরের কাছে ব্যাপারটা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পর থেকেই তার যত রাগ গিয়ে পড়ে অশোকের ওপর। মা'র কাছ থেকে অশোকের ঠিকানা সংগ্রহ করে নিয়ে সে একদিন যোগাযোগ করল তার সঙ্গে। অবশ্য অশোক এ সবের কিছুই জানত না। এবং সে এই জানত না যে, কমলজিত বেঁচে আছে কি না! আর বেঁচে থাকলেও তাদের সেই সব দিনগুলোতে অবৈধ মিলনের কোন ফসল তুলতে হয়েছিল কিনা, এ সব কিছুই জেনে যেতে পারে নি সে। কেবল অর্জুন সিংকে অশোকের ভীষণ ভয় করত। অর্জুন সিং একদিন তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল। আবার যদি মুখের গ্রাস, মানে মাধবীকে ছিনিয়ে নেয় সেই ভয় আর কি! যাই হোক, হরবিন্দরকে তার ভীষণ ভাল লেগে গিয়েছিল। তাছাড়া সে ফরিদাবাদে থেকে আসছে শুনে অশোক তাকে তার সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োগ করেছিল সঙ্গে সঙ্গে ফরিদাবাদের নতুন ইউনিটের দেখাশোনা করার ভার দেওয়ার জন্যে। হরবিন্দরের

কিন্তু কাজে একদম মন ছিল না। সে কেবল সুযোগ খুঁজছিল অশোক রায়ের ওপর চরম আঘাত হানার জন্যে। সত্যি সত্যি সে সুযোগ সন্ধানীই বটে! হর্ষর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চায়। হর্ষর দৃষ্টি এড়ায় না।

হরবিন্দরবাবু! হর্ষ গম্ভীর স্বরে ডাকল, বৃথা পালাবার চেষ্টা করবেন না। য়্যু আর আন্ডার অ্যারেস্ট, অশোকবাবুকে হত্যা কবার অপরাধে।

আ-আমি মিঃ রায়কে হত্যা করেছি?

হ্যাঁ, আপনিই তাকে ছোরা জাতীয় ধারাল অস্ত্র দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছেন।

না, না, আমি তাকে খুন করি নি। কি যা-তা বলছেন!

যা-তা নয়, মিঃ কাউর, যা বলছি এ সবই নির্মম সত্য। আপনি তা অস্বীকার করতে পারেন না।

কিন্তু তার প্রমাণ?

প্রমাণ! বলে হর্ষ বলতে থাকে, প্রথমেই খবর নিয়ে জেনেছি, গতকাল অমিত দাশগুপ্ত বলে কোনো লোকের সঙ্গেই বিজনেস সংক্রান্ত ব্যাপারে আপনার আলোচনা হয় নি। আপনি মিথ্যে স্টেটমেন্ট দিয়েছিলেন গতকাল যাতে করে আপনার ওপর থেকে পুলিশের সন্দেহটা অপসারিত হয়, সেই জন্যে।

বেশ তো, তা না হয় হ'ল, হরবিন্দর মরিয়া হয়ে উঠে বলল, কিন্তু এর সঙ্গে অশোক রায়ের খুন হওয়ার কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

শুনুন মিঃ কাউর, আরও আছে। বলে হর্ষ বলল, ফিঙ্গার প্রিন্ট রিপোর্টে আপনার হাতের ছাপ পাওয়া গেছে সেই ধারালো ছোরার ওপরে।

আ-মার হাতের ছাপ?

হ্যাঁ, আপনারই হাতের ছাপ হরবিন্দরবাবু!

তাহলে সতিই কি আমি তাকে হত্যা করেছি? হ্যাঁ, মিথ্যে তো নয়। যে আমার মায়ের সতীত্ব নষ্ট করেছে, তার দয়ায় আমি বাঁচতে চাই না মিঃ সেন। তাই তো আমি নিজের হাতে তাকে, বলে এইখানে থামল হরবিন্দর কাউর। হর্ষও আর কোনো প্রশ্ন করল না তাকে। তার জানা সব শেষ। কোনো কিছুই এখন আর তার কাছে অজানা নয়। সব জানার এখানেই ইতি যেন।

তারপর হর্ষ সত্য দত্তকে হরবিন্দর কাউরের গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করতে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় হরবিন্দরের দিকে ফিরে শেষবারের মতো তাকিয়ে দেখতে গিয়ে দেখল, কমলজিতের দিকে তাকিয়ে আছে সে। দৃষ্টি তার স্থির, নিশ্চল! যেন তার সেই দৃষ্টি থেকে মুঠো মুঠো ঘৃণা ঝরে পড়ছিল। যেন সেই দৃষ্টি দিয়ে সে ব্যাভিচারিণী মাকে তিরস্কার করতে চাইছিল। সেই দৃশ্যটা হর্ষ বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারল না। তাই সে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে।

বাইরে তখন আলোর ছড়াছড়ি। হর্ষর মনে হ'ল কমলজিতের ঘর থেকে বাইরেটা তখন অনেক বেশী স্পষ্ট, অনেক বেশী স্বচ্ছ।

# হত্যারহস্য

## কণা বসু মিশ্র

সুখেনের মৃত্যুর খবর দিতে এসেছিল যে যুবকটি সে-ই গ্রামের মধ্যে অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। থানার ও. সি. সন্তোষবাবু লোকটির এজাহার নথিভুক্ত করলেন। দু-তিনজন কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন সেই গ্রামে।

ছোট স্টীমার স্টেশন গোমেরী ঘাট। স্টীমারের মাল ওঠানামার জন্যে জলের ওপর ভাসা স্টীমারের সঙ্গেই চেন দিয়ে বাঁধা একটি ফ্ল্যাট। একজন সুখানি সেই ফ্ল্যাটের মালের চার্জে থাকে। কয়েকজন খালাসি থাকে। একজন সারেঙ সেই ফ্ল্যাটের দিক নির্ণয় করে।

এই গোমেরীঘাটের পাশে মুদির দোকানের মালিক ছিল সুখেন। মোটামুটি শিক্ষিত বেকার যুবক। চাকরি জোটাতে না পেরে চলে এসেছিল গৌহাটী ছেড়ে।

গ্রামের শেষপ্রান্তে একটি মাঠের মধ্যে ছিল তার দোকান। কাছাকাছি সব চাষী, গরীব মানুষের বাস। চা বাগানের মালবাবু, গুদামবাবুর টিনের ঘর। যারা দু চারদিনের জন্যে ছুটি কাটাতে যান।

সুখেনের চালাঘরের পাসে এসে ও. সি. দেখলেন রীতিমত ভিড। টিনের দরজাটা খোলাই ছিল। কিন্তু গাঁওবুড়ো মানে মোড়ল দরজা আগলে রেখেছে।

বালিশের ওপর পড়ে রয়েছে সুখেনের মৃতদেহ। ও ডানপাশ ফিরে শুয়েছিল। সেই অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে ওর। সুখেন বিষ খেয়েছে। ও আত্মহত্যা করেছে এটাই গ্রামের লোকের ধারণা।

ইনজেয়েস্ট রিপোর্ট তৈরি করলেন ও. সি।

প্রথম রিপোর্ট দিয়েছিল যে যুবকটি, সেই এজাহারকারী আবার এসে উপুড় হয়ে পড়ল সন্তোষবাবুর পায়ের ওপর। সুখেন ওর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। বন্ধুর মৃত্যু সে সহ্য করতে পারছে না। সে বার বারই বলতে লাগল, 'হুজুর আপনার তদন্ত যেন জোরদার হয়।'

ধমকে ওঠেন সন্তোষবাবু, 'ধৈর্য ধর। আমি যা জানতে চাই তার জবাব দাও। তোমরা বলছ ওর অনেক টাকা ধার হয়েছিল। তা ওর পাওনাদারদের নাম ঠিকানাগুলো বলতে পার?'

'হ্যাঁ, বাবু।' ও সুখেনের বন্ধু, রাজেন কান্না জড়ানো গলায় বলল, 'এই গাঁয়েরই লোক। ওই তো গাঁওবুড়োর কাছেই সে অনেক টাকা ধার নিয়েছিল।

ও. সি. তাকালেন মোড়লের দিকে। খুঁটিয়ে দেখলেন ওঁর আপাদমস্তক। গাঁওবুড়োর বয়স হয়েছে। একমাথা পাকা চুল। মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ওর চোখ দুটো জবাফুলের মতো

লাল। জলে ভরা। গাঁওবুড়ো বলল, 'আমি ওকে খুব স্নেহ করতাম বাবু। সুখেন আমার ঘরের ছেলের মতো ছিল।' কথা বলতে বলতে গলা ধরে এলো গাঁওবুড়োর।

এই বুড়োমানুষটির দিকে তাকিয়ে সন্তোষবাবুরও খুব মায়া হ'ল।

'কে কে আছেন আপনার ঘরে?' উনি প্রশ্ন করলেন।

'আমার বউ আছে। মেয়ে আছে বাবু।'

'কতদিন থেকে সুখেনের সঙ্গে পরিচয়?'

'যতদিন থেকে সে এখানে দোকান করছে। মানে তিন বছর।'

'খুব যাতায়াত ছিল বুঝি?'

'তা তো ছিল।'

'কাল রাতে আপনার বাসায় গিয়েছিল?'

'না। ও রোজই যেত। তবে গত কয়েকদিন থেকে মোটেই যায়নি। কাল রাত্তিরে আমার ঘরে খেতে ডাকি। তাও আসেনি।'

ডায়েরিতে নোট করলেন ও. সি।

'আপনি টাকার জন্যে ওকে তাগাদা দিতেন?'

'তা বাবু, মাঝে মাঝে দিতাম। গরীব মানুষ। খেত-খামার করে খাই। টাকার তো দরকার হুজুর। তা সুখেন—' লোকটি থামল।

ও. সি. তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন। 'বলুন।'

গাঁওবুড়ো বলল, 'কয়েকদিন ধরে সুখেন টাকার জন্যে বোধহয় খুব ঘুরছে। এই সোমবার সকালে সে সব টাকা শোধ করবে বলেছিল।'

'মানে আজ? আজই তো সেই সোমবার।'

গাঁওবুড়ো মাথা নাড়ল।

সুখেনের দোকানঘর তছনচ করলেন সন্তোষবাবু। টাকা পয়সার কোনো হদিশ মিলল না। তবে কি আত্মহত্যাই করল সুখেন? কিন্তু সন্তোষবাবুর ধারণা কেউ তাকে খুনই করেছে।

এজাহারকারীকে জিজ্ঞেস করলেন সন্তোষবাবু, 'কাল কত রাত্তিরে সুখেন ফিরেছিল জান?

'সঠিক বলতে পারব না বাবু। তবে মনে হয়, অনেক রাত্তিরে।'

'তুমি কি কাল রাত্তিরে ওর কাছে এসেছিল?'

'না, বাবু। ভোরবেলা এসেছিলাম।'

'তবে কি করে জানলে ও অনেক রাত্তিরে ফিরেছে?'

'ফ্ল্যাটের ওই খালাসি বলছিল সুখেন তাদের ফ্ল্যাটে গিয়েছিল। তাড়ি খেয়ে ফিরেছে অনেক রাত্তিরে।'

'খালাসিকে ডাক।'

হঠাৎ সন্তোষবাবুর নজরে পড়ল সুখেনের চাবিটার দিকে। চাবিটা পড়ে রয়েছে চৌকির তলায় একটা অন্ধকার কোণে। আশ্চর্য! এতক্ষণ টর্চ জ্বেলে সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ক্যাশ বাক্সের চাবিটা পাননি সন্তোষবাবু। চাবি বন্ধ ক্যাশ ব্যাক্সটা সুখেনের মাথার কাছেই রয়েছে।

সন্তোষবাবু বাক্সটা খুললেন। একটা নোটের বাণ্ডিল। উনি গুণে দেখলেন, পুরোপুরি দু' হাজার টাকা।

তবে কি যে ওকে খুন করেছে, সে টাকাটার কথা জানে না? অথবা ক্যাশ ভাঙার কথা তার মনে হয়নি কেন? চাবিটা খুঁজে পাওয়াই কি তার পক্ষে খুব অসম্ভব ছিল?

জাহাজের খালাসিরাও নাকি তাকে ভালবাসত খুব। গ্রামের মানুষরা সবাই। তার কোনো শত্রু ছিল না। অথচ সে খুন হ'ল। টাকার লোভেও খুন করল না খুনী। তবে সুখেন খুন হ'ল কেন?

ফ্ল্যাটের ওই খালাসি এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল। সে এগিয়ে দাঁড়াল ও. সি'র সামনে।

কাল কত রাত্তিরে সুখেন তোমাব কাছ থেকে ফিরেছেন?

'রাত গোটা দুয়েক।'

'খুব তাড়ি খেয়েছিল?'

'খুব না।'

'সেই তাড়ির বোতলটা আছে?' 'হ্যাঁ, হুজুর।'

'নিয়ে এসো।'

বোতলের তলায় সামান্য কিছু তলানি পড়েছিল। পরীক্ষার জন্যে ওটা সঙ্গে নিয়ে নিলেন সন্তোষবাবু।

ময়না তদন্ত হ'ল সুখেনের লাশটির। বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে। তাড়িতেও কিছু পাওয়া যায়নি। তার স্টমাকে ফলিডল পাওয়া গেছে। কে তাকে ফলিডল খাওয়ালো? কেন খাওয়ালো? সে যদি নিজে খেয়ে থাকে, তা কেন খেল? সেই ফলিডলের শিশিটাই বা কোথায়? হত্যাকারী বোকা সন্দেহ নেই। সন্তোষবাবুর মনে হ'ল। তদন্ত করতে করতে পরিশ্রান্ত হলেন ও. সি। ঘটনার কোনো সূত্রই ধরতে পারলেন না। সুখেনের ধারেকাছে কোথাও কোনো ফলিডলের শিশি ছিল না। অথচ সে ফলিডল খেল।

স্টীমারের ফ্ল্যাটটা সার্চ করা হয়েছে। খালাসি, সারেঙ কেউই পুলিশের জেরার হাত থেকে রেহাই পায়নি। কোনো সূত্র ধরতে পারছেন না ও. সি।

হঠাৎ একদিন ও. সি. এলেন গাঁওবুড়োর বাড়িতে। যদিও এর আগেও এসেছিলেন। কিন্তু গাঁওবুড়োর মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁর। সে থাকে মঙ্গলদই। শিক্ষিতা যুবতী। মঙ্গলদই মহকুমার কোনো একটি প্রাইমারী স্কুলে পড়ায়। সপ্তাহের শেষে গাঁয়ে আসে।

রোববার খুব ভোরে গাঁওবুড়োর দরজায় টোকা মারলেন ও. সি।

গাঁওবুড়োর মেয়ে লপং-এর চোখ মুখের ভাব সন্তোষবাবুকে চিন্তিত করল। লপং-এর মধ্যে কেমন একটা মনমরা ভাব। বেশ কয়েকদিন না ঘুমিয়ে চোখ দুটো বসে আছে। ও. সি-কে দেখেই লপংও যেন চমকে উঠল, ভয় পাওয়া চোখে বলল, 'আমাকেও দরকার আপনার?'

'সুখেনকে তুমি ভালবাসতে?'

বিব্রত বোধ করল লপং।

'আমার কথার জবাব দাও। সন্তোষবাবু সহানুভূতির সুরেই বললেন কথাটা।

লপং-এর ঠোঁট কেঁপে উঠল। দু চোখে জলের ধারা বয়ে চলল। জবাবটা গাঁওবুড়োই দিল।

'সুখেন লপংকে সাধি করবে বলেছিল, হুজুর।'

'এ খবরটা তুমি আগে দাওনি কেন?' সন্তোষবাবু ধমকালেন গাঁওবুড়োকে।

গাঁওবুড়ো মাথা চুলকে বলল, 'এই খবরের সঙ্গে ওর মৃত্যু রহস্যের কি যোগ আছে বাবু?'

সন্তোষবাবু কোনো উত্তর দিলেন না। উনি রিপোর্ট লিখে চললেন।

'সুখেনের সঙ্গে তোমার কতদিন ধরে ঘনিষ্ঠতা চলছিল?' সন্তোষবাবু পুলিশি চোখে তাকালেন। গাঁওবুড়োই জবাব দিতে যাচ্ছিল, ও. সি. চোখের ইশারায় তাকে থামতে বললেন।

লপং-এর সঙ্গে কথা বলতে বলতে ও. সি'র হঠাৎ নজরে পড়ল বন্ধুকে যে গত একমাস ধরে বন্ধুর মৃত্যুর জন্যে শোকে কাতর এই মুহূর্তে উনি আবিষ্কার করলেন তার চোখে বাজ পাখির ছায়া।

এই ঘটনা যখন ঘটেছিল, তখনও ট্রেনিং দেওয়া কুকুরের মাধ্যমে অপরাধীকে সাব্যস্ত করার রেওয়াজ হয়নি।

ও. সি'র চোখ দুটো বার বার ঘুরতে লাগল সুখেনের বন্ধুটির ওপরে।

'এ বাড়িতে তোমার কতদিন আসা যাওয়া? ও. সি'র প্রশ্ন ঘুরে গেল সুখেনের বন্ধুর দিকে। থতমত খেল যুবকটি, আমতা আমতা করে কি একটা বলতে যাচ্ছিল। ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লপং তাড়াতাড়ি বলল, সুখেনের ও বন্ধু। সুখেনের সঙ্গেই এ বাড়িতে আসত।

ও. সি. তির্যক চোখে তাকালেন লপং-এর দিকে। তারপর ফের প্রশ্ন করলেন সুখেনের বন্ধুকে, কতদিন থেকে সুখেনের সঙ্গে তোমার মনোমালিন্য চলছিল বলো?

'সুখেনের সঙ্গে?' এবার যেন ওরা দুজনেই চমকে গেল লপং আর সুখেনের বন্ধুটি।

লপং কি বলতে যাচ্ছিল। ও. সি. হাতের ইশারায় তাকে থামতে বললেন। তারপর ফের প্রশ্নটা করলেন বন্ধুকে। বন্ধুর মুখটা অ্যানিমিক রোগীর মতো ফ্যাকাশে দেখাল। ও ভয় পাওয়া চোখদুটো লুকোতে গিয়েও পারল না। ধরা পড়া গলায় বলল, 'তেমন কিছু না।'

'উত্তরটা ঠিক মতো হ'ল না।' ও. সি'র কড়া গলা। লপং ভেতরে যাচ্ছিল। ও. সি. কড়া গলায় বললেন, 'তুমি এখানে দাঁড়াও।'

'আপনার জন্যে চা করতে যাই স্যার।'

না, না। চায়ের দরকার নেই। তুমি এইখানেই বসো। তোমার আরও কিছু প্রশ্নের জবাব দেওয়া বাকি।

'আচ্ছা, রাজেন'! সন্তোষবাবু তাকান সুখেনের বন্ধুর দিকে। পুলিশের চোখে তুমি কিন্তু ধুলো দিতে চেষ্টা কর না। যা বলবে সত্যি বলবে। 'রাজেন মাথা নাড়ল। সন্তোষবাবু বললেন, লপং-এর সঙ্গে তুমি কতদিন থেকে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছ?'

'লপং-এর সঙ্গে?' গাঁওবুড়ো যেন আকাশ থেকে পড়ল। সুখেনের বন্ধু রাজেনের সঙ্গে মুহূর্তে চোখাচোখি হ'ল লপং-এর। রাজেন রাগী চোখে তাকাল। বলল, 'এসব কি আপনার তদন্তের মধ্যে পড়ে?'

'নিশ্চয়ই। সন্তোষবাবু আড়চোখে তাকালেন লপং-এর দিকে। লপং-এর চোখ দুটো মৃত মানুষের মতো দেখাচ্ছিল। রুক্ষ গলায় সন্তোষবাবু বললেন, 'রাজেন, আমি কিন্তু আমার কথার উত্তর পাইনি।

'যদি বলি না, তাহলে আপনি কি করতে পারেন?'

ওর কথার জবাব না দিয়ে সন্তোষবাবু রিপোর্ট লেখায় মন দিলেন।

'লপং, তুমি এবারে বলতো' তোমাকে কেন্দ্র করে সুখেন ও রাজেনের মধ্যে কতদিন থেকে তিক্ত সম্পর্ক চলছিল?'

রাজেন ধূর্ত শেয়ালের মতো তাকালো সন্তোষবাবুর দিকে। বলল, 'কোনদিনই না। সুখেনের সঙ্গে আমার তিক্ত সম্পর্ক ছিল না।'

সন্তোষবাবু ধমকে বললেন, 'তুমি থাম। প্রশ্নটা আমি লপংকে করেছি।' লপং-এর চোখ দুটো হঠাৎ জলে ভরে উঠল। ঠোঁট কাঁপতে থাকল। ও. সি. একটা সিগারেট ধরিয়ে ফের প্রশ্ন করলেন রাজেনকে, 'ঘটনার দিন রাত্রে তুমিই বন্ধুকে মদ বলে ফলিডল খাইয়েছ।'

তাঁর প্রমাণ? রাজেনের গলার স্বরে খাদে নেমে গেল।

সন্তোষবাবু বললেন, সুখেনের স্টমাকে ফলিডল পাওয়া গেছে। ময়না তদন্তে তাই বলেছে। কে তাকে ফলিডল খাওয়ালো? রাজেন স্মার্ট হতে চাইল। ও. সি. গোয়েন্দার ভঙ্গিতে পায়চারি করতে করতে বললেন, নদীর ধারে তুমি যে ফলিডলের শিশিটা ফেলে রেখে এসেছিলে, তাতে আঙুলের ছাপ রয়েছে।

ভয়ার্ত চোখে রাজেন তাকাল। ''আমার আঙুলের ছাপ পেলেন কোথায় আপনি? আর ওটা যে আমার আঙুলেরই ছাপ তার প্রমাণ কি?' সবাইকে অবাক করে দিয়ে ও. সি. এবারে গাঁওবুড়োকে বললেন, 'সুখেন যখন টাকা ধার নেয় তখন সাক্ষী হিসাবে রাজেনের আঙুলের টিপসই ছিল তোমার খাতায়।'

ও. সি. তাঁর হাতের পোর্টফলিও থেকে লাল খেড়োর খাতাখানা বের করলেন, যেটা তিনি ঘটনার দিন গাঁওবুড়োর কাছ থেকে নিয়েছিলেন। উনি পকেট থেকে বের করলেন আর একখানা ফটো, ফটোটা বোতলের গায়ে আঙুলের ছাপ।

রাজেন তবু গর্জে উঠল, 'শুধু একটা আঙুলের ছাপ দিয়েই আপনি মশাই বাহাদুরি দেখাচ্ছেন?'

ও. সি. ঠোঁট ভেঙে হাসলেন, 'আপনার বাকি আঙুলের ফটোগুলোও নেওয়া হবে. তার চেয়েও বড় প্রমাণ লপংকে লেখা এই দেখুন আপনার সেই চিঠি যেটা পোস্ট অফিসে থেকে গিয়েছিল। এই চিঠিই কি আপনার সমস্ত ষড়যন্ত্রের প্রমাণ নয়?

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল হলদে ছোপ ধরা একটা পুরোনো খামের দিকে।

লপং তখন মাথা নিচু করে বসে রয়েছে। ও. সি. বললেন, 'ছিঃ লপং, সুখেনকে বিয়ে না হয় না-ই করতে, কিন্তু রাজেনের এতবড় একটা জঘন্য কাজে তুমি কি করে মত দিয়েছিলে, ভাবা যায় না?'

রাজেনের গলার স্বর নরম হয়ে এলো। বলল, 'আমাদের দুজনকে হাজতের একই ঘরে রাখুন বাবু।'

'বটে! বটে!' ক্রুদ্ধ চোখে তাকালেন ও. সি. ওদের দুজনের দিকে।

গাঁওবুড়ো মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

# স্বপ্ন-ভিলার বউ

## শ্রীধর সেনাপতি

ঘুমটা স্বাতীর ভেঙে যায় হঠাৎ। কীসের একটা আওয়াজ শুনেই ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। পরক্ষণে স্বাতীর মনে হয়েছে, জ্যোতি যেন কার সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলছে।

স্বাতী উঠে বসে। বিছানার পাশটা খালি। পাশে জ্যোতি শুয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে সে উঠে গেছে। টর্চ জ্বেলে মাথার বালিশের তলা থেকে হাত ঘড়িটা বের করে নিয়ে স্বাতী সময় দেখে রাত তিনটে।

এমন সময়ে হঠাৎ বাইরে কোথা থেকে অনামী ফুলের মিষ্টিগন্ধ ভিজে বাতাসে ভেসে আসে। কিছুক্ষণ আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। খোলা জানালা দিয়ে দেখা যায়, আকাশ পরিষ্কার এখন। চাঁদটা ডুবুডুবু।

এহেন সময়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে কার সাথে চেঁচিয়ে কথা বলছিল জ্যোতি! ও এখন কোথায়? টর্চের আলো ঘরের দরজার দিকে ফেলতে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে যায়। দরজার খিল খোলা, পাল্লা জোড়া এমনি ভেজানো রয়েছে।

জ্যোতি তাহলে কোনো কারণে বাইরে বেরিয়েছে নিশ্চয়ই। সঙ্গে সঙ্গে একটা বিচিত্র চিন্তা স্বাতীর মনের কোণে উঁকি দিয়ে গেল। ঘুমের মধ্যে উঠে কোথাও চলে যাওয়ার ঘটনা জ্যোতির জীবনে এর আগে কোনোদিন হতে শোনা যায়নি। অন্তত ওদের বিয়ের পর তো তেমন ঘটনা ঘটেনি আদৌ! তেমন একটা অসুখ ওর থাকলে জ্যোতির বাবা মা অর্থাৎ স্বাতীর শ্বশুর-শাশুড়ী হাজারিবাগে ওদের দুজনকে যখন অল্প ক'দিনের জন্যে বেড়াতে আসবার অনুমতি দিয়েছেন, তখন ওর সম্পর্কে ঘুমের মধ্যে হেঁটে বেড়ানোর অভ্যাসের কথা মনে আনার এখন কোনো মানে হয় না। তাহলে তারা আগেই স্বাতীকে সাবধান করে দিতেন।

স্বাতী বিছানা ছেড়ে উটে দাঁড়াল। ঘরের দরজা খুলে বাইরে এলো জ্যোতির খোঁজে। বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার ফলে বাইরের ঠাণ্ডাটা বেশ জমাট। বাইরের প্রকৃতি শেষ রাতের সুপ্ত চাঁদের আলোয় আলোকিত।

স্বাতী দেখল, বাড়ির বাইরের রকে জ্যোতি একা দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি দূরের দিকে ছড়ানো।

'এই!' স্বাতী হালকা সুরে বলে, 'হাজারিবাগে শেষ রাতের হিমে ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির সুধারস পান করছো নাকি? ডবল নিউমোনিয়া হয়ে যাওয়ার ভয় নেই?

জ্যোতির এ মুহূর্তের অবস্থা দেখে ধারণা করা যায় ও এখানে দাঁড়িয়ে জোর গলায় হয়তো কোনো কবিতা আওড়াচ্ছিল। সেই আওয়াজই কানে গিয়ে স্বাতীর ঘুম ভাঙিয়েছে।

কিন্তু সেটাও তো হবার নয়! কাব্য প্রেমিক বলে আজ পর্যন্ত কেউ জ্যোতির বদনাম দিতে পারেনি। বন্ধুদের ঠাট্টা স্বাতীর কানে এসেছে। জ্যোতি কথাও বলে কম। তবে একটা বিষয়ে জ্যোতি প্রায় পাগল। কিন্তু এমন জায়গায় এই সময়ে জ্যোতির সেই বিশেষ নেশার কথাও চিন্তা করা অবান্তর। জ্যোতি স্বাতীর কথায় ঘাড় ফিরিয়ে ওকে একনজরে দেখে নিয়ে আবার দৃষ্টিটা পথের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলে, আঃ, আর একটু আগে তুমি যদি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে, স্বাতী তাহলে এক আশ্চর্য খেলোয়াড় আর তার খেলা দেখতে পেতে।

'খেলা? খেলোয়াড়? কী সব বকছ?' স্বাতী হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলে, ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছ তুমি নিশ্চয়ই! তা স্বপ্নে তোমার প্রিয় দাবা খেলাই দেখেছ তো?

জ্যোতির গলায় প্রতিবাদের সুর, 'স্বাতী, তুমি এমন স্বপ্ন স্বপ্ন করবে না। আজ আমি একেবারেই ঘুমোতে পারিনি।'

স্বাতী সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকের সুরে বলল, 'তাই—পেট গরম হয়েছে, স্বপ্ন দেখেছ।'

'বৃষ্টিটা থামবার পর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি...থাক, ঘরের ভেতরে চল। এটা আমার স্বপ্নের কথা নয়, তোমাকে তা শুনতেও হবে না।'

একটা কৌতূহল জাগিয়ে দিয়েছে, সেটা দূর না করা পর্যন্ত স্বাতী মনটাকে শান্ত করে কী করে? জ্যোতির একখানা হাত চেপে ধরে অনুনয়ের সুরে এবার বলে, 'না গো। রাগ কর না। প্লীজ। তুমি বলো কী বলতে চাইছিলে।'

জ্যোতির রাগ পড়ে যায়। বলে, 'ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি, একটি সুন্দরী তরুণী আমাদের বাড়ির এই রকে মাথা নিচু করে বসে আপন মনে কী যেন করছে। কৌতূহল হ'ল। আমি পা পা করে এসে দাঁড়ালাম তার কাছে। তরুণীটির পরনের শাড়ি জামা গোলাপি রঙের। গায়ের রঙ দুধে আলতা। এক ঢাল কালো চুল খোলা অবস্থায় পিঠের ওপর ছড়ানো। একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এসে লাগে আমার, কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দিল।'

'হুঁ! বটে! বটে! ...তারপর?'

'দেখি, একটি দাবার ছক তার সামনে পাতা। ঘুঁটি নিয়ে এটাই আপন মনে সে ঘাড় নাড়ছে আর চাল দিয়ে চলেছে।'

স্বাতীর অনুমান ভুল হয়নি! ব্যস! এখানেই ইতি হোক! মনে মনে বলে স্বাতী। এই দাবা খেলার জন্যেই তো জ্যোতি পাগল! দুদিন হ'ল হাজারিবাগে বেড়াতে এসেছে। আমার আগে জ্যোতি আক্ষেপ করে বলেছিল, 'দূর! খেলাটা তোমার একটু শিখে রাখা দরকার, স্বাতী। তা নাহলে বেড়াতে বেরিয়ে আমার সুখ নেই। সব সময়ে তো আর টো টো কোম্পানির সভ্য হয়ে থাকা যাবে না। ঘরে যখন বসে থাকব, তখন সময় কাটবে কীভাবে?

জ্যোতির মনের কথা এই তরুণী কি তাহলে হাজারিবাগে বসেই শুনে ফেলেছিল? দাবাখেলার প্রতি যার অমন প্রচণ্ড নেশা, যে খেলার চিন্তা প্রায় সারাক্ষণ যার মগজে বাসা বেঁধে রয়েছে, তারপক্ষে এমন একটা স্বপ্ন দেখা আদৌ বিচিত্র নয় বলে স্বাতীর মনে হ'ল। তবু একটু মজা উপভোগ করার জন্যে স্বাতী আগ্রহ দেখিয়ে বলে, 'বাঃ বাঃ! বলে যাও! আঃ থেমো না। তারপর? জ্যোতি বলে, 'আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারিনি! বসে পড়েছি তার সামনে। চাল দিতে শুরু করে দিয়েছি।'

'তরুণী কিছু বলল না?'

বলবে আবার কী? মুখে কথা বলে কি এ খেলায়, চাল দেওয়া দেখেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারপর—বুঝলে স্বাতী, সেই আশ্চর্য খেলা শুরু হ'ল। আমাকে একেবারে হাঁফ ছাড়তে দেয় না। প্রায় ফি চালেই মাৎ। জ্যোতি দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে উজ্জ্বল মুখে আবার বলে, ওঃ! কী বলব? বিশ্ব দাবা খেলার আসরে আমরা স্প্যাসকি আর ফিসারের মাতামাতি করি এখন। কিন্তু হাজারিবাগে ক'টা দিনের জন্যে বেড়াতে এসে এ আমি কার দেখা পেলাম?'

হাড় পর্যন্ত ঠাণ্ডায় কাঁপতে শুরু করেছে! আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। জ্যোতিকে প্রায় জোর করে স্বাতী ঘরের ভেতরে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

সত্যি। আশ্চর্য। এখন ঘরের ভেতরে চল। বাইরে বড্ড ঠাণ্ডা।

শূন্যপথের দিকে তাকিয়ে জ্যোতি বলে, 'তার প্রতিটি খেলায় আজ আমি হেরে গেছি। দাবার ছক ঘুঁটি গুটিয়ে নিয়ে ঘাড় উঁচিয়ে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে সে চলে গেল! তার পায়ের হাইহিলের শব্দ এখনও আমার কানে এসে বাজছে।

'লক্ষণ তো ভাল বুঝছি না।' স্বাতী গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলে, যা হবার হয়ে গেছে। আর বেশিদূর এগিয়ো না বাপু। পরিণামে ওই হাইহিল তোমার পিঠে পড়তে পারে। তখন কেলেঙ্কারির একশেষ হবে।

স্বাতীর মুখের দিকে জ্যোতি ক্ষণকাল বোকার মতো চেয়ে থাকে।

স্বাতী শুধোয়, আবার কখন সে আসবে বলেছে?

মাথা নেড়ে জবাব দেয় জ্যোতি, 'তাই তো। এখন মনে হচ্ছে, আমাদের দু'জনের ভেতরে একটি কথারও আদান-প্রদান হয়নি। চাল আর পাল্টা চাল। কিস্তিমাৎ। শুধু এই হয়েছে। আমি শুধুই হেরে গেছি। মুখ চুন করে খেলেছি শুধু! ব্যস! শেষে হঠাৎ তাড়াতাড়ি ছক ঘুঁটি তুলে নিয়ে বগলদাবা করে চলে গেল!'

জ্যোতি যে স্বপ্ন দেখেছে এটা যে নিছক একটা স্বপ্ন বৃত্তান্ত, সে বিষয়ে স্বাতী যেন নিঃসন্দেহ হয়ে জ্যোতিকে অতঃপর ঘরের ভেতরে টেনে আনে। ও নিঃসন্দেহ হয়েছে...কারণ—স্বাতী যতদূর সম্ভব তন্ন তন্ন খুঁজে দেখেছে, বিচার করেছে মনে মনে, শেষে মনে মনেই বলেছে, নাঃ, জ্যোতি একটা স্বপ্নই দেখেছে!

স্বাতীর চোখে আর ঘুম আসে না। অন্ধকারে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এমন একটা কথা ওর মনে উদয় হয়, যা ওর পক্ষে বেশ একটু অস্বস্তির কারণ হয়ে ওঠে।

জ্যোতির এক কাকা আছেন। সে ভদ্রলোক ইঞ্জিনীয়ার। খুবই করিৎকর্মা লোক ছিলেন, স্বাতী শুনেছে। তিনি নাকি খুবই কাজ পাগল। বছর দুয়েক হ'ল তিনি ঘরে আটকানো। কাগজে হিজিবিজি ছবি আঁকেন শুধু। যাকে দেখতে পান, জানালা দিয়ে তাকেই ডেকে নিজের প্ল্যানের কথা বলেন। তার কাছ থেকে কাগজ পেন্সিল সরিয়ে নেওয়া হয় মাঝে মাঝে, আবার নতুন করে কাগজ পেন্সিল দিতেও হয়। ঘটনাটা খুবই করুণ।

জ্যোতিও তো ওই বাড়িরই ছেলে। ওর দাবা খেলা নিয়ে এই ধরনের মাতামাতি করাটা ভবিষ্যতে ওর পক্ষে কোনো গুরুতর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে না তো!...

এ বাড়িতে খানচারেক ঘর। বাড়ির মালিক কলকাতায় থাকেন। জ্যোতির বাবার অফিসের

এক বন্ধু দু পাঁচ দিনের জন্যে এ বাড়ির একখানা ঘর ওদের ব্যবহার করতে দিয়েছেন। কাছেই একটা ভাঙা পোড়ো বাড়ি। অসংখ্য বট অশ্বত্থের চারা বাড়ির দেওয়াল জুড়ে কায়েমি অধিকার নিয়ে বসেছে। উঠোন জুড়ে বন-জঙ্গল! সেই বুনো ঝোপ ঠেলে মাথা উঁচু করে রয়েছে দুটো নিমগাছ।

ওই পোড়োবাড়ির পরে কিছুটা দূরে আর একটি ছোট বাড়িতে স্বাতীদের এই বাড়িব কেয়ারটেকার সিয়ারাম থাকে। প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বয়স হবে সিয়ারামের।

স্বাতী মনে মনে অত্যন্ত ছটফট করছিল। সকাল হতেই ভাবল, একবার সিয়ারামের সঙ্গে দেখা করি। জ্যোতি যে তরুণীটির কথা বলেছে তার সম্পর্কে একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে আপত্তি কী?

ভোরের দিকে জ্যোতি ঘুমিয়ে পড়েছিল। স্বাতী কিন্তু উঠে পড়েছে বিছানা ছেড়ে।

ঘরের বাইরে রকের ওপরে এসে দাঁড়াল স্বাতী। কিন্তু কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। গাঢ় কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে সব কিছু! দু'হাত তফাতের জিনিসও কেমন যেন অস্পষ্ট বহস্যঘেরা হয়ে চোখে ধরা দিচ্ছে।

স্বাতীকে দেখে একগাল হেসে সিয়ারাম বলে, 'রাতটা কেমন কাটালেন এখানে? কোনো ঝঞ্ঝাট ঝামেলা নেই, তাই না? এদিকে মানুষজন কম আসে। মাঈজী, কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলবেন।'

স্বাতী সিয়ারামকে ভাল করে লক্ষ্য করে করে শুধোয়, 'আচ্ছা সিয়ারাম, এই কাছাকাছি এমন কোনো জেনানা কি, ঘোরাফেরা করে, যার দাবা খেলার নেশা প্রচণ্ড? সঙ্গে কোনো খেলুড়ে না পেলেও একাই সে যেখানে সেখানে খেলতে বসে যায়। বৃষ্টি ছাড়া কিছুই সে গ্রাহ্য করে না।'

সিয়ারামের কোনো ভাবান্তর নেই। বলে বুঝেছি! একটা গল্প আপনি শুনতে চান মাঈজী! গল্প না, সত্য ঘটনা। আমি বাড়ি থেকে ঘুরে আসি তাহলে। আপনি চা-টা খেয়ে নিন—

'না, সিয়ারাম।' স্বাতী জেদ ধরে, 'গল্পটা আমি এখনি শুনতে চাই।

সিয়ারাম বলল, 'বাইরে এখনও বেশ ঠাণ্ডা। চলুন তাহলে, ঘরের ভেতরে গিয়ে বলব।'..

বাড়িটার নাম ছিল স্বপ্ন-ভিলা।

তখন জমিদারি আমল। স্বপ্ন-ভিলার মালিক বাংলা মুলুকের এক জমিদাব তনয়। এখানে কুমার বাহাদুর। তিনি মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে গাড়ি হাঁকিয়ে সোজা এসে ওঠেন ওই স্বপ্ন-ভিলায়। সঙ্গে থাকে ইয়ারবন্ধু চাটুকারের দল, সুন্দরী মেয়েমানুষ আর দামী বিলিতি মদের পেটি। ক'দিন ধরে ফুর্তি হৈ-হুল্লোড় করে তারা চলে যায়। স্বপ্ন-ভিলা তখন আবার স্তব্ধ ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ে থাকতে থাকতে নিজেই যেন সুখের কোনো স্বপ্ন দেখে।

বচপন থেকে সিয়ারাম ওই স্বপ্ন-ভিলা সম্পর্কে একথা জানে। প্রচণ্ড এক কৌতূহল সিয়ারামকে আকর্ষণ করেছে ওই স্বপ্ন-ভিলা। স্বপ্ন-ভিলার ভেতর থেকে ভেসে আসা গানের সুর নাচের তালে তালে সমধুর নূপুর নিক্কন শোনার রোমাঞ্চকর স্মৃতি সিয়ারামকে মাঝে মাঝেই যেন অস্থির করে তুলত। বাবুরা চলে গেলে সিয়ারামের মনটাও খারাপ হয়ে যেত। আরও একটা বড় কারণ অবশ্যই রয়েছে।

'জয় সিয়ারাম' বলে সে মাঝে মাঝেই প্রার্থনা জানাত, বাবুরা যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। ওই স্বপ্ন-ভিলা যেন গানে নাচে আনন্দ উচ্ছ্বাসে কদিনের জন্যে আবার জেগে ওঠে। সিয়ারামের দিনগুলোও তখন তাহলে তর তর করে কেটে যাবে। ক্ষেতে খামারে কাজ করে ওর বাবা। বাড়িতে মা ভাই বোন অনেকগুলো। সকলেব পেট ভরানোর মতো খাবার ওর বাবা যোগাড কবে আনতে পারে ন'।

মাঝে মাঝে তাই স্বপ্ন-ভিলা ওইভাবে জেগে উঠলে বাবুদের উচ্ছিষ্ট মাংস রুটির একটা অংশ কেয়াবটেকার বাস্তাব কুত্তা বা কাকপক্ষীকে না দিয়ে সিয়ারামের হাতেই তুলে দেয়। স্বপ্ন-ভিলার কেয়ারটেকারের মতো দয়াশীল মানুষ তাই সিয়ারামের মনের গভীরে দাগ রেখে গেছে।

কিন্তু একদিন বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য কবা গেল। কলকাতা থেকে কুমার বাহাদুর স্বপ্ন-ভিলায় আসছেন ঠিকই, তবে সঙ্গে ইয়ারবন্ধু চাটুকারদের দল আর নেই। পেটি ভর্তি মদের বোতল নেই। সেই নতুন নতুন মেয়েমানুষ। স্বপ্ন-ভিলার নাচগান সব বন্ধ হয়ে গেল

সিয়ারাম একদিন সাহস করে জিজ্ঞাসা করল কেয়ারটেকারকে, 'ভাইয়া, এখানে আগের মতো আর আনন্দ উৎসব হয় না কেন?'

সে বলল, 'তেমনটি আর কোনোদিন হবে না বোধহয়। বাবুদের জমিদারি বিক্রি হয়ে গেছে। এখন দাবা খেলা নিয়ে তিনি ভীষণ মেতে উঠেছেন। মদ আর বাঈজীর নেশা তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে ওই দাবাব নেশা। বাবুর সাদী হয়ে গেছে। বউ পরমা সুন্দরী। মনে হয়. এখন থেকে মাঝে মাঝে তিনি বউকে নিয়েই এখানে বেড়াতে আসবেন।'

সিয়াবাম অতঃপব একদিন দৃশ্যই দেখল। সুন্দরী বউকে নিয়ে কুমার বাহাদুর দু চারদিন করে স্বপ্ন-ভিলায় এসে থেকে যাচ্ছেন।

মাস কয়েক কেটে গেল।

সিয়াবামের বাবা ছেলেকে ক্ষেত মজুরের কাজে লাগিয়ে দিল।

সে বছব দেশে ভীষণ খরা। পুকুর ডোবায় জল নেই। নদী নালা শুকিয়ে যাচ্ছে। ক্ষেতেব মাঠ সব ফুটিফাটা। এমন অবস্থায় ক্ষেতে খামারে আর কাজ থাকবে কী?

সন্ধ্যের পর সিয়াবাম স্বপ্ন-ভিলাব সামনে দিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল। খোলা জানালার ভেতর দিয়ে একটি সুন্দরী তরুণী ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

স্বপ্ন-ভিলার ভেতরে ঢুকল সিযাবাম। ও বুঝতে পারল, এই স্বপ্ন-ভিলা থেকে পাওয়া আগেকাব সেই রোমাঞ্চ ও একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। সিযারাম তখন সবে কৈশোর পেরিয়েছে। ক'দিন ধবে পেটে প্রায় কিছুই পড়েনি। দুর্বল দেহ। মাথা ঝিমঝিম করছিল।

সিযারাম ভেতরে ঢুকে দেখল, তরুণীর সামনে দাবা খেলার ছক পাতা। ঘরে মোমবাতি জ্বলছে। তরুণী সিয়ারামকে এক সপ্তাহের জন্যে সেখানে কাজে নিযুক্ত করলেন। সিয়ারামের গররাজি হওয়ার কোনো কারণ ছিল না। ও যেন হাতে স্বর্গ পেল! সত্যি বলতে কী, স্বপ্ন-ভিলা ওকে কোনোদিনই নিরাশ করেনি! মনে মনে সিয়ারাম কৃতজ্ঞতা জানাল স্বপ্ন-ভিলাকে।

এমন সময়ে অপর একটি মহিলা ঘরে ঢুকে বললেন, 'সন্ধ্যা, আজ খেলা থাক। তোমার শরীর খারাপ বলছ। কিছু খেয়ে শুয়ে পড়গে।'

সন্ধ্যা বললেন, 'মালতীদি. এই ছেলেটি আমাদের এখানে সপ্তাহ খানেকের জন্যে কাজ করতে রাজি হয়েছে।'

মালতী বললেন, 'ভাল।' সিয়ারামকে বিশেষ এক নজর দিয়ে দেখে নিয়ে একটু আদেশের সুরে পুনরায় বললেন, দাবার ছকঘুঁটি রেখে দাও।

সন্ধ্যা বললেন, 'তুমি আমার কাছে হেরেছ। আবার হারিয়ে দেবই। দাবা খেলা আমি এখনও শিখতে পারিনি? খেলা বুঝি না, তাই না? এসো, সাহস থাকে বসো আমার সঙ্গে খেলতে।

মালতী বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'আঃ, দাবা দাবা করে তুমি যে পাগল হয়ে উঠছ দেখছি।'

সন্ধ্যা জবাব দিলেন, তাহলে তো কুমার বাহাদুরকে এক নম্বর পাগল বলতে হয়। খেলাতে আমি তো তার সঙ্গে এখনও পাল্লা দিতে পারি না। সেটা তুমিই শুধু পারতে। কিন্তু এখন আমি তোমাকে এ সময়ে হারিয়ে দিতে শুরু করেছি, মালতীদি। এসো, বসে যাও। দেখ, আমি খেলা শিখতে পেরেছি কিনা।'

মালতী বললেন, 'বেশ। কাল সকাল থেকেই শুরু করা যাবে। আজ তোমার শরীরটা ভাল নেই বলছ। যা হোক কিছু মুখে দিয়ে এখন শুতে যাও। কী খাবে?'

সন্ধ্যা শুধোলেন, 'তুমি কি খাবে?'

'আমারও খিধে নেই তেমন। শুধু গরম এক গ্লাস দুধ খাব।'

'আমিও তাই খাই। কিন্তু মালতীদি, তুমি আমাকে কথা দিয়েছ, কাল সকাল হলেই তুমি আমার সঙ্গে খেলতে বসবে। ঘর গেরস্থালির কাজের ভাবনা নেই, লোক ঠিক করে ফেলেছি।'

'আরে বাবা, তাই হবে।'

সন্ধ্যা আহ্লাদে গদগদ গলায় বললেন, 'আমি আজ রাতে ঘুমোবো নাকি মনে করেছ!'

'ঘুমোবে না তো সারারাত ধরে কী করবে?'

'দাবা খেলাটা একাই বসে চালিয়ে যাব। প্র্যাকটিস করব।'

'পাগল।' মালতী প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বললেন, আমি পাশের ঘরে যাচ্ছি। ওখানেই দুধটা গরম করে নিয়ে আসতে পারবে তো এ ছেলেটি?

সিয়ারাম বলল, পারবে। অতঃপর সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

দু'গ্লাস গরম দুধ সন্ধ্যাই দু'হাতে নিলেন। সিয়ারামকে বললেন, 'ঘরে পাঁউরুটি আছে। একটু দুধ চিনি দিয়ে তাই খেয়ে আজকের রাতটা যেখানে পার শুয়ে কাটিয়ে দাও। কাল থেকে নির্দিষ্ট একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে।'

অনেকদিন সিয়ারাম শরীরে এমন গভীর তৃপ্তি পায়নি। দুধ পাঁউরুটি খেয়ে রান্নাঘরের ভেতরে একটা কোণে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ার পরই চোখে তার ঘুম নেমে এসেছিল। তারপর কতক্ষণ সে ওভাবে ঘুমিয়েছিল জানে না। এক সময়ে হঠাৎ একটা পোড়াগন্ধ নাকে লাগায় তার ঘুম ভেঙে যায়। প্রথমে মনে হয়েছিল স্বপ্ন দেখছে। কিন্তু সারা ঘরটা তখন ধোঁয়ায় ভর্তি। ধোঁয়ায় দম আটকে আসতে থাকে সিয়ারামের। বুকে চাপ লাগা কাশির দমকে মাথার শিরা উপশিরা বুঝি এবার ছিঁড়ে পড়বে! চোখ জ্বালা করছে!

সিয়ারাম আর মুহূর্ত অপেক্ষা না করে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। সারা বাড়ি জুড়ে আগুনের লেলিহান শিখা! মরি বাঁচি করে সিয়ারাম কোনো রকমে বেরিয়ে এলো স্বপ্ন-ভিলার ভেতর থেকে। কোথায় কোনোদিকে যাবে, সেই জ্ঞানটুকু আর নেই। আগুনের কাছ থেকে শুধু নিরাপদ দূরত্বে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। সিয়ারাম দৌড়ে কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না। কাছেই ছোট একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

যখন অচেতনতা কাটল রাত তখনও শেষ হয়নি। সিয়ারাম উঠে বসতে চেষ্টা করল। মাথায় অসম্ভব যন্ত্রণা, যেন একটা ভারি পাথর চাপানো, শুয়ে পড়ল আবার।

অস্ফুট গলায় বলল, আমি—আমি কোথায়!

একটা চেনাগলা কানে এলো সঙ্গে সঙ্গে, 'সিয়ারাম।'

'কে?' শুয়ে থেকেই পাশের দিকে ঘাড় কাৎ করল সিয়ারাম। সন্ধ্যাদেবী!

দাবার ছক পেতে কিছুটা দূরে বসে রয়েছেন।

সিয়ারাম বলল, 'আমার মনে হয়েছিল, স্বপ্ন-ভিলার ভেতরে আপনারা দু'জনেই পুড়ে মারা যাবেন।'

'আমাদের মধ্যে একজন পুড়ে মারা গেছে সিয়ারাম!'

'আপনি একাই তাহলে পালিয়ে আসতে পেরেছেন?'

'মালতীদি' আগুনে পুড়ে মারা গেল। কী মজার ব্যাপার দেখ, সিয়ারাম। মালতীদিকে হত্যা করার জন্যে আমি দুধে বিষ মিশিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম আজ! আমার দু'হাতে দুটো দুধের গ্লাস ছিল। একটা গ্লাসের দুধে বিষ মেশানো। অন্য গ্লাসের দুধ খাঁটি। ছলে কৌশলে বিষ মেশানো দুধ খেয়ে মালতীদি ঢলে পড়বে ঘরের মেঝেয়। আমি তখন টেবিলটা উল্টে ফেলে দিয়ে তাতে মোমবাতির আগুনটা লাগিয়ে দেব। পরিকল্পনা পাকা! হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম পেয়ে কুমার বাহাদুর তার কেয়ারটেকারকে নিয়ে দিন পাঁচ সাতের জন্যে চলে গেছে কলকাতায়। সারা স্বপ্ন-ভিলার এখানে ওখানে আগে থেকে কিছু কিছু পেট্রোল ছড়িয়ে রেখেছিলাম। কুমার বাহাদুরের গাড়ি থেকে চুরি করা পেট্রোল! তাছাড়া দারুণ খরায় সব কিছু তো বারুদের মতো হয়ে রয়েছেই!

'বিষ মেশানো দুধের গ্লাসটা মালীদির হাতে ধরিয়ে দিয়ে খাঁটি দুধের গ্লাসটাতে আমি বার দুয়েক ছোট করে চুমুক দিলাম। তারপর আমি বললাম মালতীদি, লক্ষীটি, কুমার বাহাদুরের উপযুক্ত পত্নী হতে আমাকে তুমি সাহায্য কর। রাগ কর না, তোমার চেয়ে রূপের জৌলুষ আমারই বেশি, তাই না? সেদিক দিয়ে আমার সম্পর্কে কুমার বাহাদুরের কোনো ক্ষোভ নেই। শুধু এই খেলাটা আমাকে নতুন করে শিখতে হচ্ছে। তুমি কুমার বাহাদুরের যেমন বন্ধু রয়েছ, থাক। তবু, আমি তার বিয়ে করা বউ।

'মালতী তার হাতের গ্লাস টেবিলের ওপরে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। ও হয়ত এবার এই ঘর থেকে পালিয়ে যাবে। বিষটা ওকে আর খাওয়ানো যাবে না। হাতের ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেলে তা আর ফিরে আসে না। সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে।

'আমি আমার দুধের গ্লাসটা টেবিলের ওপরে নামিযে রেখে মালতীদির পিছন গিয়ে দাঁড়ালাম। পিছন থেকে দু'হাত দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে কচি খুকির মতো আবদারের সুরে বললাম, লক্ষ্মীটি, দিদিভাই! আমি অন্যায় করে ফেলেছি! আমার সব অপরাধ তুমি ক্ষমা করে দাও।

'আমি মালতীদির ঘাড়ে চুমো খেলাম।

'হাসতে হাসতে মালতীদি বলল, তোকে নিয়ে আর পারি না। এক্কেবারে ছেলেমানুষ!

টেবিলের ওপরে আমি তখন দাবার ছকটা পেতে ফেলেছি তাড়াতাড়ি। বললাম, আজ একহাত খেলতেই হবে তোমাকে। তা নাহলে তোমাকে এঘর থেকে আমি বেরোতেই দেবো না। বলেই হাসতে হাসতে ঘরের দরজার ভেতর থেকে চাবি লাগিয়ে দিলাম। এই সঙ্গে ঝপ

করে আর এক কাণ্ড করে বসলাম। চাবিটা খোলা জানালা দিয়ে বাইরে বাগানে ফেলে দেবার ভয় দেখাতে গিয়ে সত্যিই সেটা হাত থেকে পড়ে গেল।

মালতীদি বলল, ঠিক আছে। দুধটা তোমার খেয়ে নাও আগে। ঠাণ্ডা হয়ে গেলে ভাল লাগবে না। পরে চাবিটা সিয়ারামকে দিয়ে বাগান থেকে তুলে আনলেই হবে।

দুটো গ্লাসই টেবিলের ওপরে বসানো ছিল। বিষ মেশানো দুধটাই মালতীদি কোনো ফাঁকে পাল্টাপাল্টি করে দিল, আমি বুঝতে পারিনি। তেমন একটা ভয়ও আমার ছিল না। কারণ আমার মনের গোপন কথাটা তো মালতীদি জানে না।

'সিয়ারাম, আমি নিজেই ভুল করে খেয়ে বসলাম সেই বিষ মেশানো দুধ। মালতীদি আমাকে ওইভাবে বিষ খাওয়াল। এবং তারপর...বিধাতার কৌতুকটা এবার দেখ, মালতীদিই টেবিলটা উল্টে ফেলে দিল। জতুগৃহ তৈরি হয়েছিল। মোমবাতির আগুন লেগে অতি অল্প সময়ের ভেতরে কুমারবাহাদুরের স্বপ্ন-ভিলা পুড়ে ভেঙে শেষ।'

সিয়ারাম ধাঁধার জবাব খুঁজছিল মনে মনে। জবাবটা কী? সন্ধ্যাকে শুধলো, 'কিন্তু, আপনি তাহলে—

সন্ধ্যা জবাব দিলেন হেসে, 'তুমি আমার কাছে দাবা খেলা শিখবে, সিয়ারাম? আমি এখন একজন পাকা খেলুড়ে।'

সিয়ারাম দু'চোখ বুজে ঢোক গিলেছিল। তারপর চোখ খুলে আর সন্ধ্যাকে দেখতে পায়নি।...

সিয়ারাম এবাড়ির অদূরে পোড়োবাড়িটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওই সেই স্বপ্ন-ভিলা কুমার বাহাদুরের সুন্দরী বউকে তারপর থেকে মাঝে মাঝে রাত্রে এদিকে ওদিকে দাবা খেলতে দেখা যায়। বুঝলেন?

গল্প বলে সিয়ারাম চলে যেতে জ্যোতি মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'গাঁজা!'

স্বাতী সিরিয়াস গলায় বলল, 'আর দেরি না। জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলতে হবে। হাজারিবাগকে আজকেই আমাদের গুডবাই!'

জ্যোতি অবাক চোখে স্বাতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি ওই কেয়ারটেকারের কথা বিশ্বাস করলে? হ্যাঁ, স্বীকার করছি, ব্যাটা গল্প বলতে পারে! কিন্তু এসব ঝুঠ। নতুন নতুন ভাড়াটে পেলে ওর কিছু আমদানি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ওর ওপরে যাতে পর্যটকরা সম্পূর্ণ নির্ভর করে তার জন্যে এইসব উদ্ভট গল্প বানিয়ে তাদের মনকে দুর্বল করে তোলাই উদ্দেশ্য! আমাদের কাছ থেকে নগদ কিছু পাবার আশা নেই, ও বুঝতে পেরেছে। তাই ভূতের গল্প বলে আমাদের তাড়াতাড়ি এখান থেকে ভাগিয়ে দিতে চায়। ভদ্রমহিলা একেবারে জলজ্যান্ত মানুষ..'

স্বাতী, বলল, 'না। তোমার কথার পিছনে যত যুক্তিই থাকুক, একটা বিষয়ে আমি কিন্তু নিশ্চিত। রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। মাটি নরম। পথে কাদা। তুমি গোড়াতেই আমাকে বলেছ, দাবার ছকঘুঁটি গুটিয়ে নিয়ে সে ঘাড় উঁচু করে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে চলে গেল। তার পায়ে ছিল হাইহিল জুতো। কিন্তু আমি তখন চাঁদের আলোয় এবং এখন সকালে তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেছি, হাইহিল জুতোর ছাপ কোথাও নেই! তুমিও খুঁজে দেখ পাবে না।'

# শাতন

## অনীশ দেব

সত্যি, আজ অসম্ভব গরম পড়েছে। রিপোর্টার ভদ্রালোক পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। জানালাটা খুলে দিলে আপনার আপত্তি আছে?

বিন্দুমাত্রও না। অনাদি শিকদার নির্বিকার মুখে জবাব দিলেন। তারপর চেয়ার ছেড়ে ধীরে, অত্যন্ত ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। সাবধানী পদক্ষেপে এগিয়ে চললেন দেয়াল সংলগ্ন পানীয় আধারেব দিকে। কষ্টকৃত ভঙ্গিমায় গেলাসে পানীয় ঢাললেন, ছোট্ট করে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করলেন।

রিপোর্টারের মুখে অনুকম্পার অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। কারণ অনাদি শিকদারের আড়ষ্ট ভঙ্গিমার কারণ তার অজানা নয়।

তার মুখের ভাব লক্ষ্য করে অনাদি শিকদার হাসলেন, উঁহু, আপনার বিব্রত হওয়ার কোনো কারণ নেই। আরেকটা গ্লাসে অতিথির জন্য পানীয় নিলেন তিনি। শ্লথভাবে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, খুব একটা অসুবিধে যে হয়, তা নয়। এই অবস্থাটাকে আমি একরকম মেনেই নিয়েছি বলতে পাবেন। চেয়াবে এসে বসলেন অনাদি শিকদাব। অতিথির হাতে গেলাস তুলে দিলেন।

এর কোনো প্রয়োজন ছিল না। শুধু শুধু আপনি কষ্ট কবতে গেলেন।

ইটস নাথিং। অনাদি শিকদারের শীর্ণ মুখে হাসির বেখা দু-ঠোঁটেই সীমাবদ্ধ রইল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছিই হবে। মুখে একমাত্র অবিরত যন্ত্রণাভোগের অভিব্যক্তিটুকু ছাড়া আর কোনো গরমিল চোখে পড়ে না। চেহারা দেখে বয়স আরও কম বলেই মনে হয়।

এই একই গল্প আপনাকে হয়ত বহুজনের কাছে বহুবার বলতে হয়েছে, তাই না? রিপোর্টার প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, ঘাড় হেলালেন অনাদি শিকদার।

জানি, ব্যাপারটা একঘেয়ে এবং বিরক্তিকর ; কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি যে আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন, তার জন্যে ধন্যবাদ। আপনার গল্পটা আমি আর একবার শুনতে চাই।

তাতে আমার কোনো অনীহা নেই। তবে ঘটনার আঁচ ঠাণ্ডা হয়ে থিতিয়ে আসায় ইদানীং একটু নিশ্চিন্তেই আছি। প্রথমে যখন ডাকাতিটা হ'ল, তারপর বিচার চলার সময়, প্রচুর কাগজওলা আমার সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে পড়েছিল। তারপর বিচারে যখন অধীপের শাস্তি

হ'ল, ওকে জেলে পাঠানো হ'ল, তখন সবাই ব্যাপারটা একরকম ভুলেই গেল। এটাকে আপনি রবিবারের গল্প প্রবন্ধের সঙ্গে ছাপাবেন, তাই তো বলছিলেন?

সেই রকমই ইচ্ছে আছে। তারপর মালিকের মর্জি। আমি আপনার মুখ থেকে ওই দুর্ঘটনার মানবিক দিকটা সম্পর্কে কিছু জানতে চাই। মানে, ঠিক গতানুগতিক কাহিনী নয়, যেমন অন্য সব কাগজে ছেপেছে। আশা করি আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন?

হুঁ। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অনাদি শিকদার।

যতীশ খান্নার জুয়েলারী দোকানে আমি যখন চাকরি নিই, তখন ভাবিনি, যে কোনোদিন আমার এই অবস্থা হবে। অনাদি শিকদার বলতে শুরু করলেন, যতীশ খান্না ছোটখাটো, বৃদ্ধ লোক। নির্বিরোধী এবং শান্ত স্বভাবের। তার ব্যবসা যে খুব বিরাট তা আমি বলব না। বরং আশপাশের প্রতিবেশী দোকানদারদের চেয়ে তার মূলধন অনেক কমই ছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাও অন্যান্য বড় দোকানের মতো অত জোরদার ছিল না। হয়ত সেই কারণেই অধীপ সান্যাল আমাদের দোকানটাই বেছে নিয়েছিল, ওই দোকান থেকে হীরে জহরত লুঠ করে সটকে পড়াটা তার পক্ষে অনেক সহজ হবে।

মাসখানেক যতীশ খান্নার দোকানে চাকরি করার পর ব্যবসার প্রধান বেচাকেনার দিকটা দেখাশুনার দায়িত্ব তিনি আমার ওপরেই ছেড়ে দিলেন। যদিও বিশেষ বিশেষ পাথরের আর্থিক মূল্যায়নের কাজটা তিনি নিজেই করতেন। বুঝতে পারছেন, বয়স তার প্রায় সত্তরের কাছাকাছি, তাই পরিশ্রমের কাজগুলো তার পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। সপ্তাহে মাত্র দুদিন কি তিনদিন দোকানে আসতেন। অর্থাৎ দোকানের পুরো দায়িত্ব থাকত আমারই ওপর। অধীপ সান্যাল যেদিন আমাদের দোকান লুঠ করার মতলব করেছিল, সেদিন মিস্টার খান্না দোকানে অনুপস্থিত ছিলেন।

দিনটা ছিল মঙ্গলবার। সময়, দশটার কিছু বেশি। সবেমাত্র আমি দোকান খুলেছি। দারোয়ান বাহাদুরকে সামনের একটা দোকানে পাঠিয়েছি চায়ের জন্য। অর্থাৎ গোটা দোকানটায় আমি একা। হঠাৎ দেখলাম, একটা বছর পঁচিশ ছাব্বিশের ছোকরা চকরা বকরা, চোখ টাটান জামা গায়ে দিয়ে দোকানে এসে ঢুকল। আমি তাতে এতটুকুও সন্দিহান হইনি। কারণ এমন অনেক লোকও আমাদের দোকানে আসে, যাদের পোশাক দেখলে রামধনুও লজ্জা পাবে। অথচ তাদের পকেটে থাকে হাজার-হাজার টাকার সৌখিন মণি-মুক্তো। মিস্টার খান্না বেশির ভাগ সময়েই তাদের কাছ থেকে পাথর-টাথর কিনতেন। সুতরাং এই ছেলেটিকে দেখে আমিও কোনো হীরের ব্যবসাদারই ভেবেছিলাম। কিন্তু যখনই সে আমার কাছে এসে কোনো হীরে জহরত কিনবে বলে আমতা-আমতা করতে শুরু করল, তখনই আমি সন্দিহান হয়ে পড়লাম। অনেক আবোল-তাবোল বকবকানির পর সে বলল যে, সে একটা বড়সড় হীরে কিনতে চায়। সেটা দিয়ে আংটি করিয়ে সে তার প্রেমিকাকে উপহার দেবে। আমি একটা ট্রে ড্রয়ার থেকে বের করে এনে কাউন্টারের ওপর রাখলাম। ট্রেতে অসংখ্য ছোট ছোট পাথর তুলোর ওপর সাজানো ছিল। কেন জানি না, একটা আতঙ্ক আমার মনে উঁকি দিল। তাই ট্রেটা আমি রাখলাম বিপদ সংকেতসূচক বোতামের কাছাকাছি। বোতামটা মেঝেতে, ঠিক আমার পায়ের নাগালের মধ্যেই রইল। ছেলেটা বোধহয় টের পেল আমার মতলব। কারণ সামনের আয়নায় চোখ

পড়তেই দেখলাম, সে পকেট থেকে একটা রিভলবার বের করে আনছে। পরমুহূর্তেই সে রিভলবারটা সোজা আমার বুক লক্ষ্য করে উঁচিয়ে ধরল।

সত্যি কথা বলতে কি, ভয়ে আমার বাকশক্তি রহিত হয়ে গেল। শত চেষ্টাতেও মুখ দিয়ে কোনোরকম শব্দ করতে পারলাম না। অবশ্য তা প্রয়োজনও ছিল না। কারণ আমি জানি, মিস্টার খান্নার সমস্ত সম্পত্তিই ইনসিওর করা। তাহলে শুধু শুধু নিজের বিপদ ডেকে এনে লাভ কি? আমার চোখের সামনেই ট্রের সমস্ত পাথরগুলো ছেলেটা মুঠো করে পকেটে ভরে ফেলল। তারপর রিভলবার নাচিয়ে আরও কয়েকটা ট্রে বের করে আনবার জন্য আমাকে আদেশ করল। সে যেন বাঁশ পাতার মতো থরথর করে কাঁপছিল। উৎকণ্ঠা, উত্তেজনায় অথবা ভয়ে, তা বলতে পারি না। তবে আমি ঠক ঠক করে কাঁপছিলাম ভয়েই। আর সেইজন্যই দ্বিতীয় ট্রেটা আমার কাঁপা আঙুলের বাঁধন ফস্কে ঠিকরে পড়ল মেঝেতে, পায়ের কাছে। ছেলেটার নির্দেশেই আমি নিচু হয়ে ছিটকে পড়া পাথরগুলো তুলতে লাগলাম। আমার হাত তখন বিপদ সংকেতসূচক বোতামের খুব কাছাকাছি। ঠিক বলতে পারি না, তবে অধীপ হয়তো ভেবেছিল আমি ওকে ফাঁকি দিয়ে বোতামটা টিপতে যাচ্ছি, কারণ সেই মুহূর্তেই ও আমাকে গুলি করল।

তার পরের ঘটনা আমার খুব স্পষ্ট মনে নেই। শুধু মনে আছে, অধীপ দৌড়ে পালাবার সময় দোকানের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারপর আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি, এরপর চেতনা ফিরে পাই অ্যাম্বুলেন্সে, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য। ঝাপসাভাবে মনে পড়ছে হাসপাতালের টানা বারান্দা। মাথার ওপরে গতিশীল আলোগুলি ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে। আমি স্ট্রেচারে চিৎ হয়ে অসহায়ভাবে শুয়ে আছি। আমাকে অপারেশন থিয়েটারে ঢোকানোর পর আব কিছুই মনে নেই। প্রায় ঘণ্টা তিনেক পর ঘুমের ওষুধের ঘোব কেটে গিয়ে আমার জ্ঞান ফিরল। দেখি পুলিশ অফিসারেরা আমার জবানবন্দী নেবার জন্য বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে। তাদের মুখেই শুনলাম, অধীপ সান্যাল পালাতে পারেনি। রিভলবার শুদ্ধ হাতেনাতে ধরা পড়েছে। কিন্তু অধীপের গুলিটা যে আমার বুকেই রয়ে গেছে, সেটা আমি জানতে পারলাম পরের দিন। ডাক্তাররা অপারেশন করেও সেটা বের কবতে সক্ষম হননি।

এ পর্যন্ত সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা এটাই, অন্তত আমার কাছে। গুলিটা লেগেছিল আমার বুকে, এবং অল্পের জন্য হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসকে রেহাই দিয়ে পাঁজরের হাড়ে আটকে গেছে। কিন্তু এমন জায়গায় ওটা রয়েছে যে, এটাকে বের করার কোনো উপায়ই আর নেই। কারণ তাতে আমার হৃৎপিণ্ড অথবা ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে। ডাক্তাররা আমাকে এক্স-রে ফটোগুলো দেখালেন। তাবপর মানবদেহের গঠন সম্পর্কে সুন্দর দীর্ঘ বক্তৃতা করে গেলেন। তখনই আমি বুঝলাম, গুলিটা যে কোনোদিন আমার বুকের আভ্যন্তরীন বাঁধন খুলে গিয়ে হৃৎপিণ্ড অথবা ফুসফুসকে জখম করতে পারে, অর্থাৎ আমাকে খুন করতে পারে।

ডাকাতি এবং খুনের চেষ্টার অপরাধে অধীপকে যখন অভিযুক্ত করা হ'ল তখনও আমি হাসপাতালে। তখন বহু লোকই আমার কাছে যাতায়াত করত। বিভিন্ন সার্জনরা সময়ে সময়ে এসে এক্স-রে সম্বন্ধে বক্তৃতা করতেন এবং ঘন ঘন মাথা নাড়তেন। রিপোর্টাররা জানতে চাইল, একটা মৃত্যু পরোয়ানাকে বুকের মধ্যে নিয়ে চলে বেড়াতে আমার কি রকম লাগছে। তাছাড়া

আত্মীয়-স্বজন তো যেতই। তারপর একদিন সনাক্তকরণের জন্য অধীপ সান্যালকে আনা হ'ল আমার কাছে। আমি বিনা দ্বিধায় তাকে সনাক্ত করলাম।

অধীপের বিচার যখন শুরু হ'ল, তখন দীর্ঘ চেষ্টার পর হাল ছেড়ে দিয়ে হাসপাতালের ডাক্তাররা আমাকে মুক্তি দিলেন। আমাকে বলা হ'ল, খুব সাবধানে চলাফেরা করতে, পরিশ্রমের সমস্ত রকম কাজ এড়িয়ে চলতে এবং নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতে। যত শান্তভাবে আমি দিন যাপন করব, তত দীর্ঘদিনই আমার বেঁচে থাকবার সম্ভাবনা, একথাও তারা জানাতে ভুললেন না। কিন্তু আমি জানতাম, ও সমস্তই ভুয়ো বুজরুকি, মিথ্যে সান্ত্বনা। ওই গুলিটা যে একদিন না একদিন আমাকে খুন করবে, সেটা উপলব্ধি করতে আমার আর বাকি ছিল না। হয়ত এক সপ্তাহ, হয়ত এক মাস, বড়জোর এক বছর, হয়ত গুলিটা আমাকে রেহাই দেবে ; কিন্তু তারপর? সুতরাং নিজের কাছে আমি আমাকে তখন মৃত বলেই ধরে নিয়েছি।

সরকারি উকিল জানতে চাইলেন, আমি অধীপের মামলার সাক্ষ্য দেবো কি না। আমি মৃদু হেসে সম্মতি জানিয়েছিলাম। কারণ অধীপের শাস্তি হোক তা আমি মনে-প্রাণে চেয়েছি ; এবং সেই শাস্তি যাতে লঘু না হয়, তার জন্য আমার সাক্ষ্য দেবার প্রয়োজন আছে। আমার সাক্ষ্যের পর অধীপ সান্যাল আর রেহাই পাবে না। সে দিনটা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। কোর্টের প্রায় অর্ধেক আসন জুড়ে অধীপের আত্মীয়-স্বজন উপস্থিত, এবং তারা এমনভাবে কান্নাকাটি করছিল, যেন কোনো আদালতে অধীপের বিচার নয়, কোনো শ্মশানে তার শবদাহ দেখতে এসেছে। মনে হয়, কোনো আবেগপ্রবণ, একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান ছিল অধীপ। তাদের কান্নাকাটিতে, গণ্ডগোলে, বিরক্ত হয়ে বিচারপতি তাদের আদালত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ পর্যন্ত দিয়েছিলেন। প্রতিপক্ষের, অর্থাৎ আসামী পক্ষের উকিল অধীপের অল্প বয়েস এবং প্রথম অপরাধের ওপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সে বৃথাই। আমি কাঠগড়ায় ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই অধীপের নিয়তি তার অন্ধকার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করে ফেলেছে!

আদালতের রায় তো আপনি জানেন। অধীপকে বিশ বছরের জেল দেওয়া হয়। আসলে সে একজন খুনী, তার ফাঁসি হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু আইনের মারপ্যাঁচে পড়ে এবং এই অদ্ভুত পরিস্থিতিতে বিচারক তাকে চরমদণ্ড দিতে পারেননি। কারণ আমি এখনও নিজের পায়েই চলে ফিরে বেড়াচ্ছি, দিব্যি শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছি, বুকে গুলিটা থাকা সত্ত্বেও।

কিন্তু অধীপের দণ্ডকে আপনি মোটামুটিভাবে সাময়িক বলতে পারেন না, এত সহজে সে মুক্তি পাবে না। যদি আমার বুকের বিশেষ জায়গায় ওই গুলিটি আটকে না থাকত, তাহলে হয়তো বিশ বছর কষ্টেসৃষ্টে কাটিয়ে বেশ কিছু পারিশ্রমিক নিয়ে অধীপ সান্যাল জেল থেকে বেরিয়ে আসতে পারত। নতুন করে জীবন শুরু করতে পারত! কিন্তু যত গোলমাল বাঁধাল এই গুলিটা। একদিন না একদিন ওটা আমাকে শেষ করবেই। এবং যখন করবে, তখন অধীপ সান্যাল হয়ে পড়বে একজন নৃশংস খুনী। আবার নতুন করে তার বিচার শুরু হবে। হয়তো তাতে চরম দণ্ডই সে মাথা পেতে নেবে।

কি অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না? আলিপুর জেলে বসে তাকে নিশিদিন আমার আয়ু কামনা করতে হচ্ছে। কিন্তু ডাক্তারদের বক্তব্য অনুযায়ী শুধু অধীপ কেন, শত সহস্র লোকের প্রার্থনাতেও আমার কিছু হবার নয়। গুলিটা তার কর্তব্য করবেই। আর—একবার যদি আমি মারা যাই, তাহলে আবার শুরু হবে কোর্ট-কাছারি। সম্পূর্ণ নতুন অপরাধে অধীপের আবার

বিচার হবে। সবকারি উকিল আমাকে বলেছিলেন, এ বিচার একই অপরাধে দ্বিতীয়বার বিচার নয়, ফাস্ট ডিগ্রি খুনের দায়ে সম্পূর্ণ নতুন চার্জে বিচার হবে। মনে হয় না, তখন অধীপ ফাঁসির দড়িকে খুব সহজে ফাঁকি দিতে পারবে।

অনাদি শিকদার কথা বলছিলেন, একই সঙ্গে সাবধানী পদক্ষেপে ধীরে ধীরে পায়চারি করছিলেন। কথা শেষ করে তিনি খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বাইরের পরিবেশে চোখ রাখলেন। সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার তখন ঘনিয়ে এসেছে। গোলাপী আকাশের গায়ে দু একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রের ইশারা। উড়ন্ত পাখির শিল্যুট তার চোখে ছায়া ফেলে যায়। সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অনাদি শিকদার।

আপনাদের পক্ষে সত্যিই এ এক করুণ পরিস্থিতি। গাঢ়স্বরে বললেন রিপোর্টার, আমি সত্যিই দুঃখিত মিস্টার শিকদার। কিন্তু আপনি অধীপ সান্যালের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন তো? আমার তো মনে হয়, আপনার চেয়ে তার অবস্থা আরও শোচনীয়, আরও করুণ।

তাতে আমার বয়ে গেল। ঘৃণায়, ব্যঙ্গে বিকৃত হ'ল অনাদি শিকদারের শীর্ণ মুখ, অধীপের পরিণতির জন্য সে নিজেই দায়ী।

একদিক দিয়ে ভাবতে গেলে আপনার কথাই ঠিক। রিপোর্টার কপট সমর্থনে বলে উঠলেন, সত্যিই তো, অধীপের জন্য আপনি ভাববেন কেন!

রিপোর্টার ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন অনাদি শিকদারের ঠিক পেছনে। তার কনুইয়ে হাত রেখে আবার বললেন, আমি সত্যিই দুঃখিত। এক ধাক্কায় অনাদি শিকদারকে জানালার চৌকাঠের ওপর ঠেলে দিলেন তিনি। ভারসাম্য হারিয়ে অনাদি শিকদার অসহায়ভাবে ঝুলতে লাগলেন। তিনি অবাক হয়ে ফিরে তাকালেন রিপোর্টারের মুখের দিকে। জানালার ওপারেই চোখে পড়ছে কার্নিশটা। তারপরই বহু নিচে ছোট ছোট আলোর বিন্দু, চলমান পথিক, গাড়ি-ঘোড়ার কলগুঞ্জন। অনাদি শিকদার পা ছুঁড়তে গিয়ে টের পেলেন, তিনি এখন শূন্যে। কার্নিশে ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে পড়বার মুহূর্তে, তার মুখ আতঙ্কে বিস্ফারিত হ'ল। দুচোখে বিস্ময় নিয়ে তিনি রিপোর্টারের তরুণ মুখের দিকে তাকালেন। সে কি প্রাণের আশায়, অথবা কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যার আশায়?

আমি রিপোর্টার নই। ভদ্রলোক বললেন, অধীপ সান্যাল আমার ভাই।

এবং শেষ কথাগুলো শোনার জন্য অনাদি শিকদার তখন আর অপেক্ষা করে নেই। তীরবেগে তিনি নিচের পাথর বসানো ফুটপাথ লক্ষ্য করে ছুটে চলেছেন। মাটি স্পর্শ করার মুহূর্তে তার হঠাৎই মনে হ'ল, বুকের গুলিটা যেন বাঁধন মুক্ত হয়ে তার হৃৎপিণ্ড স্পর্শ করেছে। সেটা রিপোর্টারের আচমকা ধাক্কা দেওয়ার জন্য, না তার সবেগ পতনের জন্য সেটা তিনি ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না। তার আগেই ফুটপাথ স্পর্শ করলেন।

# টিয়া রঙের শাড়ি

## অসিত মৈত্র

তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া এবং ভোর-ভোর বিছানা ছাড়া—এটাই হচ্ছে চিরাচরিত স্বাস্থ্যসম্মত বিধি। যদিও সিতাংশু এই সমস্ত বিধি নিষেধের বড় একটা ধার ধারত না। বরাবরই ও একটু বেশি বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে। এটা ওর বহুদিনের বদভ্যাস। তার ওপর গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত একটা কবিতার পেছন পেছন তাড়া করে ফিরেছে। কিন্তু দু-চার ছত্র লেখার পর বাকি লাইনগুলো ঠিকমতো পেনের ডগায় গেঁথে তুলতে পারেনি। শেষকালে হতাশ হয়ে যখন আলো নিভিয়ে বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিল ঘড়িতে তখন রাত দুটো। সেইজন্যেই ঘুম ভাঙতে আজ আবও দেরি হ'ল ওর।

চোখে-মুখে জলেব ঝাপটা দিয়ে ফিরে এসে চায়ের টেবিলে বসতে না বসতেই ধীর পায়ে সুধাংশুশেখর হাজির হলেন। সিতাংশুশেখরের বাবা সুধাংশুশেখর ছিলেন ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসাব। কিছুদিন হ'ল চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। সিতাংশু অবশ্য বাঁধা-ধরা চাকরির তোয়াক্কা কবে না। শখের গোয়েন্দাগিরিকেই ও এখন পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছে। আর নেশা হচ্ছে কবিতা লেখা। যদিও পত্র-পত্রিকার সম্পাদকরা ওব কবিতাকে তেমন একটা পাত্তা দেন না। তবে গোয়েন্দাগিরিতে ইদানীং বেশ নাম করে ফেলেছে। কাগজগুলোও ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

সুধাংশুশেখর সেদিনের দৈনিক পত্রিকাটা ছেলেব দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বিশেষ একটা জায়গার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—এই জায়গাটা পড়ে দেখ।

সিতাংশু হাত বাড়িয়ে কাগজটা টেনে নিল। প্রথম পাতার নিচেব দিকে বড় বড় হেডিংয়ে ফলাও করে ছাপা হয়েছে খবরটা।

### ট্রেনের কামরায় যুবতীর মৃতদেহ

গতকাল রাতে প্রখ্যাত শিল্পপতি রামলাল তেওয়ারি যখন কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেসে আসানসোল থেকে কলকাতায় ফিরছিলেন সেই সময় তাঁর সিটের তলায় অজ্ঞাত পরিচয় এক সুন্দরী মহিলার রক্তাপ্লুত মৃতদেহ দেখতে পাওয়া যায়। মহিলার হৃদপিণ্ডে ছুবিকাঘাতের চিহ্ন আছে। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় নিহত মহিলা খুবই সম্ভ্রান্ত ঘরের। বয়স আন্দাজ তিরিশের কাছাকাছি। এখনও পর্যন্ত পুলিশ এই মৃত মহিলার কোনো পরিচয় খুঁজে বের করতে পারেনি।

সংবাদের শেষ অংশে লেখা ঃ

অধিক রাতে আমাদের স্থানীয় প্রতিনিধি জানাচ্ছেন, কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেসে অজ্ঞাত পরিচয় যুবতীর শনাক্তকরণ সম্ভব হয়েছে। তিনি স্বনামধন্য চিত্র পরিচালক দেবতোষ শিকদারের একমাত্র কন্যা। মহিলার নাম শ্রীমতী নীলিমা ঘটক। বছর পাঁচেক আগে ধনী বস্ত্র ব্যবসায়ী প্রিয়ব্রত ঘটকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তবে ইদানীং স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটায় তিনি নিজের পিত্রালয়েই বাস করতেন। পুলিশ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জোর তদন্ত চালাচ্ছে।

সিতাংশু কাগজ থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুধাংশুশেখরের দিকে ফিরে তাকালো।

তুমি হয়তো জান না—সুধাংশুশেখর ব্যাখ্যা করে বললেন—দেবতোষ আমার ছেলেবেলার বন্ধু। স্কুলজীবনে আমরা ছিলাম সহপাঠী। ফাইনাল পরীক্ষায় পাশ করার পর একই কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম আমরা। ওর বিষয় ছিল আর্টস, আর আমার সায়েন্স। অবশ্য অনেকদিন হতে চলল ওর সঙ্গে আমার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। তবে আমরা পরস্পর পরস্পরের খোঁজ রাখতাম। আধঘণ্টাটাক আগে দেবতোষ আমাকে ফোন করেছিল। একমাত্র মেয়ের এই ধরনের শোচনীয় মৃত্যুতে খুবই মুষড়ে পড়েছে বেচারি। ওর আন্তরিক ইচ্ছে আমি নিজে এই হত্যা রহস্যের তদন্ত করি। আমি যে এখন সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি এবং সায়টিকার সুবাদে প্রায় পঙ্গু হয়ে দিন কাটাচ্ছি সেকথা ওকে জানালাম। ও তখন তোমার নাম করল। আমার নিজেরও মনোগত বাসনা সেইরকমই। এর ফলে আমাদের পুরোনো দিনের বন্ধুত্বটা আবার নতুন করে ঝালিয়ে নেবার সুযোগ পাওয়া যাবে।

সুধাংশুশেখরের নির্দেশ মতোই সিতাংশু শেষ পর্যন্ত দেবতোষ শিকদারের বাড়িতে এসে হাজির হ'ল। গল্‌ফগ্রিনে বিশাল বাড়ি ভদ্রলোকের। প্রথমে গেট, গেট পেরিয়ে সবুজ ঘাসে ঢাকা প্রশস্ত লন। তারপর মূল বাড়ি। আগে থেকে ফোনে খবর দেওয়া ছিল। তাই সিতাংশুর জন্যে একতলায় ড্রয়িংরুমে অপেক্ষা করছিলেন মিঃ শিকদার। বিষাদ ভারাতুর কণ্ঠে দেবতোষবাবু সমগ্র ঘটনার যা বর্ণনা দিলেন তার সারমর্ম মোটের ওপর এই রকম ঃ

তাঁর একমাত্র মেয়ে এই নীলিমা। কোনো এক বান্ধবীর বিয়ে উপলক্ষে সে রাধাকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গাপুর যাচ্ছিল। রাধা হচ্ছে ওর পরিচারিকা। দুজনের মধ্যে বয়সের ফারাকও খুব একটা বেশি নয়। যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেস গতকাল নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে এক-দেড় ঘণ্টা দেরিতে ছাড়ে। সে ছিল সেকেন্ড ক্লাসের যাত্রী, আর নীলিমা ফার্স্ট ক্লাসের। তবে প্রায় প্রতি স্টেশনেই ট্রেন থামার পর রাধা নীলিমার সঙ্গে দেখা করে তার কোনো কিছুর প্রয়োজন আছে কি না জেনে যেত। ট্রেন যখন দুর্গাপুর স্টেশনে এসে থামল তখন রাধা মালপত্র নিয়ে নিজের কামরা থেকে নেমে নীলিমার সঙ্গে দেখা করল। মালপত্র বলতে অবশ্য দুজনের জন্যে দুটো মাত্র স্যুটকেস। নীলিমা রাধাকে জানাল বিশেষ জরুরি একটা কারণে ওকে এখনই একবার আসানসোলে যেতে হচ্ছে। মাঝের গোটা চার-পাঁচ স্টেশনের পরেই আসানসোল। ইতিমধ্যে রাধা যেন সমস্ত মালপত্র লেফট-লাগেজ রুমে জমা দিয়ে নীলিমার জন্যে দুর্গাপুর স্টেশনেই অপেক্ষা করে। মনিব-কন্যার হঠাৎ এই মত পরিবর্তনে রাধা মনে মনে দারুণ বিস্মিত হ'ল। তবে তার ওপর কিছু বলা চলে না। নীলিমার নির্দেশমতো যাবতীয় মালপত্র লাগেজ রুমে গচ্ছিত রেখে স্টেশনের আশেপাশেই ঘুরে বেড়াতে লাগল সে। কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে যাবার পরও নীলিমা ফিরে এলো না। অবশেষে দিনের শেষ ডাউন ট্রেনটাও

যখন দুর্গাপুর স্টেশন ছুঁচে চলে গেল তখন প্রমাদ গুনল রাধা। অচেনা শহর। এখানকার কাউকেই ও জানে না। নীলিমাই বা গেল কোথায়? এই জাতীয় অনেক চিন্তা-ভাবনার পর ঠিক করল, রাতটুকু কাটাবার জন্যে কাছাকাছি কোনো হোটেলে গিয়ে ওঠা সবচেয়ে ভাল। পরের দিন সকালের প্রথম ট্রেনেই কলকাতায় ফিরে আসবে। তারপর দেবতোষবাবুকে সমস্ত ঘটনাটা খুলে জানালে তিনি যা উচিত মনে হয় তাই করবেন। সেই পরিস্থিতিতে ওর পক্ষে এছাড়া অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভবও ছিল না।

সিতাংশু পুরো বৃত্তান্তটা মন দিয়ে শোনার পর দৃশ্যগুলো একবার মানসচক্ষে সাজিয়ে নিল। তারপর মিঃ শিকদারকে প্রশ্ন করল—আপনার মেয়ের সঙ্গে কি দামি-দামি গয়নাগাটি ছিল?

সিতাংশুব প্রশ্ন শুনে দেবতোষবাবুর চোখে-মুখে আরও বেশি করে শোকের ছায়া ঘনিয়ে এলো। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন তিনি। অলঙ্কারই শেষ পর্যন্ত ওর কাল হয়ে দাঁড়াল। কিশোরী বেলা থেকেই গয়নার ওপর প্রবল ঝোঁক ছিল নীলিমার। মা-মরা একমাত্র মেয়ে আমার। যখন যা চেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে এনে দিয়েছি। ওর কোনো সাধই আমি কখনও অপূর্ণ রাখিনি। স্ত্রীর মৃত্যুব পর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর দ্বিতীয়বার বিয়ে পর্যন্ত করিনি। শুধু সোনা কেন, হীরে মুক্তোর গয়নাও ওর কিছু কম ছিল না। সেই সমস্ত গয়না পরে ও বিভিন্ন পার্টিতে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যেত। এবারেও ওর কাছে একটা বহু মূল্যবান হীরের নেকলেস ছিল। সোনার গয়নাও ছিল অনেক। সব মিলিয়ে প্রায় আঠারো-বিশ লাখ টাকা দাম হবে। সেগুলোরও কোনো হদিশ নেই।

আপনার মেয়ে কি এত সব মূল্যবান গয়না তাঁর নিজের হেফাজতেই রাখতেন?

হ্যাঁ। ওর গয়নাগুলো থাকত একটা ছোট অ্যাটাচি কেসের মধ্যে। অন্য মালপত্র রাধার জিম্মায় থাকলেও অ্যাটাচিটা ওর কাছেই ছিল।

দুর্গাপুরে না নেমে তিনি হঠাৎ করে আসানসোল যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? এই বিষয়ে রাধা কি কোনো আভাস দিতে পারে? এ-সম্পর্কে ওকে কি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিলেন মিঃ শিকদার। ভদ্রলোককে যেন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত মনে হ'ল সিতাংশুর। রাধার বক্তব্য, বর্ধমান স্টেশনে ট্রেন থামার পর ও যখন নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যায় তখন আর একজন যাত্রী নাকি সেই কামরায় হাজির ছিলেন। অথচ ওই লোকটিকে ইতিপূর্বে রাধা দেখেনি। তাহলে অনুমান করা যেতে পারে আগের স্টেশনে নীলিমার সঙ্গে দেখা করে ফিরে আসার পর অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তি আমার মেয়ের কামরায় উঠেছিল। কিংবা বর্ধমানে ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গে সে কামরার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, তাই রাধা লোকটিকে আগে দেখতে পায়নি। যদিও রাধার মনে কেমন একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছে, ভদ্রলোক নীলিমার পূর্বপরিচিত এবং লোকটির পরামর্শ মতোই নীলিমা কাল দুর্গাপুরে না নেমে আসানসোল যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কারণ আমার মেয়ে যখন রাধাকে স্যুটকেস দুটো নিয়ে দুর্গাপুর স্টেশনে অপেক্ষা করার কথা বলে, তখন বার কয়েক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল। ভদ্রলোক অবশ্য বেশ খানিকটা তফাতে বসে একটা দৈনিক পত্রিকার আড়ালে মুখটাকে ঢেকে রেখেছিলেন। তাই রাধা তাঁকে ভাল করে দেখতে পায়নি।

সিতাংশু এতক্ষণ ধরে গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে মিঃ শিকদারকে লক্ষ্য করছিল। বলল—অজ্ঞাত পরিচয় সেই ভদ্রলোকের কথাতেই যে নীলিমা দেবী মাঝপথে মত পাল্টে দুর্গাপুরে না নেমে আসানসোল যাচ্ছিলেন, আপনিও কি তাই মনে করেন?

আপাতত সেটাই তো সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ বলে বোধ হচ্ছে!

ট্রেনের ওই ভদ্রলোক কে হতে পারেন সে সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে?

দেবতোষ শিকদার অসহায় ভঙ্গিতে ঘাড় দোলালেন। যদিও তাঁর আচার-আচরণের মধ্যে এক ধরনের ইতস্তত ভাব সহজেই নজরে পড়ে। —না, এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।

মৃতদেহটা সর্বপ্রথম কে আবিষ্কার করেন?

রামলাল তেওয়ারি নামে জনৈক ধনী ব্যবসায়ী তাঁর আসনের নিচে নীলিমার মৃতদেহটা প্রথম দেখতে পান। ভাগ্যক্রমে একজন ডাক্তারও ছিলেন ওই কামরায়। দেহটা পরীক্ষা করে তিনি রায় দিলেন, মৃত্যু ঘটেছে ঘণ্টা পাঁচ-ছয় আগে। তাঁর কথা যদি সত্যি হয় সেক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে, ট্রেনটা দুর্গাপুর ছেড়ে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মেয়েকে খুন করা হয়েছিল।

আর একটা প্রশ্ন। আপনার মেয়ের অবর্তমানে কে বা কারা তাঁর স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হবেন? এ বিষয়ে তিনি কি কোনো উইল করে গিয়েছিলেন?

বিয়ের বছর খানেক পরে নীলিমা ওর স্বামী প্রিয়ব্রতর অনুকূলে একটা উইল করেছিল বটে, কিন্তু ছেলেটা আদতে অতি নীচ ও লম্পট প্রকৃতির। ওর আসল চরিত্র প্রকাশ হয়ে পড়তে বেশি দেরি হ'ল না। জুয়া, মদ, মেয়েছেলে, সবেতেই ও বেশ পাকাপোক্ত। পরিচিত পাঁচজনের সামনে ওকে এখন নিজের জামাই বলে পরিচয় দিতেও লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়! বেশ কিছুদিন হতে চলল ওদের দুজনের মধ্যে আর তেমন বনিবনাও ছিল না। তিন বছর আগে নীলিমা স্বামীর ভিটে ত্যাগ করে আমার কাছে চলে আসে। এমন কী একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদনও জানিয়েছিল। আমারও সায় ছিল তাতে। আমার নিজের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি নীলিমার নামে উইল করা আছে। কিন্তু ওই দুশ্চরিত্র লম্পটটা যাতে ওর কাছ থেকে জোর করে কিছু ছিনিয়ে নিতে না পারে তারও বন্দোবস্ত করে রেখেছিলাম। তবে এখন আর ...

প্রিয়ব্রতবাবু কি কলকাতাতেই থাকেন?

হ্যাঁ, শ্যামবাজারে ওদের পৈতৃক বাড়ি। অবশ্য লোক মারফত খবর পেলাম গতকাল ও এই শহরে ছিল না। আজ ভোরে ফিরেছে। কিন্তু কোথায় গিয়েছিল জানতে পারিনি।

মনে মনে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে নিল সিতাংশু, তারপর বলল—তা হলে বর্তমানে আপনার আর কিছু বলার নেই? ঠিক আছে, আপনি বরং রাধাকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। তার কাছ থেকে হয়তো নতুন কোনো সূত্রের হদিশ পাওয়া যেতে পারে।

পুলিশ অবশ্য ইতিমধ্যেই তাকে অনেকক্ষণ ধরে জেরা করে গেছে। তবু তুমি যখন বলছ—বলতে বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ শিকদার। —আমি ভেতরে গিয়ে রাধাকে ডেকে দিচ্ছি।

মিনিট খানেকের মধ্যেই রাধা ড্রয়িংরুমে হাজির হ'ল। ছিমছাম সুবেশা যুবতী। হাঁটা-চলার

মধ্যে একটা সহজ সপ্রতিভ ভাব। দুচোখে বুদ্ধির দীপ্তি ঝকমক করছে। সারা মুখে একটা করুণ কোমলশ্রী জড়িয়ে আছে। সম্প্রতি তার ওপর বিষাদের ছায়া জমেছে ঘন হয়ে।

আমার নাম রাধা। —সৌজন্যমূলক নমস্কার সেরে সে বলল—আপনি কি আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?

হ্যাঁ...বসো। —সামনের একটা খালি চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল সিতাংশু। —তোমার মুখ থেকে গতকালের সমস্ত ঘটনা আমি আর একবার নতুন করে শুনতে চাই।

রাধা সরাসরি সিতাংশুর দিকে চোখ তুলে তাকাল। —কী জানতে চান, বলুন?

সিতাংশুও এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে লক্ষ্য করছিল। এবারে নড়েচড়ে বসল। —তুমি তো নীলিমা দেবীর সঙ্গে দুর্গাপুর পর্যন্ত গিয়েছিলে। ট্রেনে ওঠার সময় তাঁর মধ্যে কোনো চাঞ্চল্য বা উত্তেজনার ভাব কি তোমার নজরে পড়েছিল?

না। —রাধা ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় নাড়ল। —দিদিমণির নাড়িনক্ষত্র আমি খুব ভাল করেই চিনতাম। সে রকম কিছু ঘটলে এত সহজে আমার নজর এড়িয়ে যেতে পারত না।

কিন্তু দুর্গাপুর স্টেশনে পৌঁছবার পর?

রাধার দুচোখ চকচক করে উঠল। —তখন অবশ্য তাঁকে খুবই বিচলিত দেখাচ্ছিল। মনে হ'ল কোনো অজ্ঞাত কারণে তিনি যেন খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। এমন কী আমার সঙ্গে কথা বলার সময়ও কেমন যেন খেই হারিয়ে ফেলছিলেন। সব কথা ভাল করে গুছিয়ে বলতে পারছিলেন না। তাই বোধহয় বার বার ভদ্রলোকের দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলেন।

তিনি ঠিক কী বলেছিলেন, তোমার স্মরণে আছে?

যতদূর মনে হচ্ছে, দিদিমণি আমাকে ডেকে বললেন...রাধা বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে এখনই একবার আসানসোল যেতে হচ্ছে। ব্যাপারটা খুবই জরুরি। তুই সমস্ত মালপত্র লেফট-লাগেজ রুমে জমা দিয়ে স্টেশনেই আমার জন্য অপেক্ষা করবি। আমার ফিরে আসতে বড় জোর ঘণ্টা দুই-তিন সময় লাগবে। যদি একটু দেরি হয় তাহলেও তুই যেন অন্য কোথাও চলে যাস না। ফিরে এসে তোকে যেন স্টেশনেই দেখতে পাই। এই ফাঁকে দুপুরের লাঞ্চটাও সেরে নিবি। আমার জন্যে তোকে কিছু ভাবতে হবে না।

কথা বলতে বলতে রাধার কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে এলো। অনেক কষ্টে সামলে নিল নিজেকে। —তাঁর কথা শুনে আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। কিন্তু অশোভন কৌতূহল প্রকাশ করা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। তাই এ প্রসঙ্গে আর কোনো উচ্চবাচ্য না করে একা-একা স্টেশনেই অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মাঝ রাস্তায় তোমার দিদিমণি হঠাৎ করে কেন মত পাল্টালেন সে বিষয়ে তুমি কিছু অনুমান করতে পার?

রাধা সামান্য ইতস্তত করল। —আমার বিশ্বাস এ ব্যাপারে সেই অচেনা ভদ্রলোকের কোনো ভূমিকা আছে। আমি যদিও তাঁর মুখটা পরিষ্কার দেখতে পাইনি, তবে আমার সঙ্গে কথা বলার সময় দিদিমণিকে বেশ কয়েকবার লোকটার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ফিরে তাকাতে দেখেছি। কথাগুলো ঠিকমতো বলা হ'ল কি না আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে খুব সম্ভবত সেটাই তিনি বুঝে নিতে চাইছিলেন।

ভদ্রলোকের মুখ না দেখলেও চেহারাটা তো তুমি দেখেছিলে। সেই চেহারার কোনো বর্ণনা দিতে পারো?

রাধা যেন প্রশ্নটার জন্য আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—একটু ছিপছিপে গড়নের। পরনে ছিল কালো প্যান্ট, গায়ে ডোরাকাটা সবুজ শার্ট, তার ওপর ঘি রঙের ফুল-হাতা সোয়েটার। রং ফর্সা। মাথার চুল সামান্য কোঁকড়ানো। এর বেশি কিছু বলতে পারব না।

আচ্ছা, প্রিয়ব্রত ঘটককে তুমি নিশ্চয় মাঝেমধ্যে দেখে থাকবে? ট্রেনের ওই ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে তাঁর কি কোনো সাদৃশ্য আছে?

সিতাংশুর এ-প্রশ্নের ধাক্কায় রাধা এবারে একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর ভেবেচিন্তে বলল—না...মানে, আমার তো সেরকম কিছু মনে হয়নি।

তবে এ বিষয়ে তুমি পুরোপুরি নিশ্চিত নও, এই তো?

তা অবশ্য বলতে পারেন! —রাধার গলায় দ্বিধার সুর। —আসল সমস্যাটা হচ্ছে, দিদিমণির স্বামীকে আমি কোনো দিন চাক্ষুষ দেখিনি। অ্যালবামে তাঁর কয়েকটা ছবি দেখেছি মাত্র। সেগুলো সব বিয়ের সময় তোলা। তাই শুধু ছবি দেখে ...

অচেনা ওই ভদ্রলোকটিকে তুমি প্রথম দুর্গাপুরেই দেখতে পাও?

হ্যাঁ। মনে হয় আগের স্টেশনে আমি যখন দিদিমণির সঙ্গে কথা বলে নিজের কামরায় ফিরে আসি, তারপরেই ভদ্রলোক ওই কামরায় ঢুকেছিলেন।

তাই হয়তো হবে! —গম্ভীর গলায় সায় দিল সিতাংশু। তারপর শূন্য দৃষ্টি মেলে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের বাগানের দিকে তাকিয়ে রইল। মনের গভীরে হাজার রকমের চিন্তা জট পাকিয়ে উঠছে। এই হত্যা-রহস্যটা আগের মতো একই রকম রয়ে গেছে। কোন পথ ধরে এগোলে খুনের একটা কিনারা করতে পারবে কিছুই ওর মাথায় ঢুকছে না। সমস্ত বিষয়টাই যেন নিরেট অন্ধকারে ঢাকা।

এই অস্থির নীরবতা ভঙ্গ করে রাধাই আবার কথা শুরু করল। —ময়ূরকণ্ঠী শাড়িতে কী সুন্দরই না মানিয়েছিল দিদিমণিকে! পুরো দৃশ্যটা মনে পড়লে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত হু হু করে ওঠে! কী পোশাক পরে তিনি কাল দুর্গাপুরে তাঁর বন্ধুর বিয়েতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন, আপনি জানেন?

না। —সিতাংশুর গলার সুরে অন্যমনস্কতার আভাস। —কাগজে যা বেরিয়েছে শুধু সেইটুকুই আমি পড়েছি।

তাঁর পরনে ছিল ময়ূরকণ্ঠী রঙের দামি সিল্কের শাড়ি, সঙ্গে ম্যাচ-করা ব্লাউজ। গায়ে কাজ-করা লাল রঙের কাশ্মীরি আলোয়ান।

বাঃ ... চমৎকার! —স্বগতোক্তির সুরে বিড়বিড় করল সিতাংশু। —কোনো সুন্দরী যুবতীকে এ পোশাকে এক ঝলক দেখলে কেউ আর ভুলতে পারবে না। পোশাকটা এমনই যাতে সহজেই আর পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। —শেষে রাধাকে উদ্দেশ্য করে বলল—তুমি এখন যেতে পার, রাধা! আপাতত তোমার কাছ থেকে আমার আর কিছু জানার নেই। অবশ্য পরে হয়তো তোমাকে আবার আমার দরকার হতে পারে।

রাধা নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় টেনে ভেজিয়ে দিয়ে গেল দরজাটা।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন মিঃ শিকদার। নিশ্চয় আশেপাশেই কোথাও অধীর আগ্রহে এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন—রাধার কাছ থেকে নতুন কোনো সূত্রের সন্ধান পেলেন?

তেমন বিশেষ কিছু নয়। তবে শুনলাম। আপনার মেয়ে নাকি খুব একটা জমকালো পোশাক পরে তাঁর বন্ধুর বিয়েতে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন?

মিঃ শিকদার ম্লান হাসলেন। —হ্যাঁ, গয়নাগাটির মতো সাজপোশাকের দিকেও প্রচণ্ড ঝোঁক ছিল মেয়েটার। অবশ্য ইন্সপেক্টর সোমের ধারণা, এর ফলে খুনটা ঠিক কোন জায়গায় ঘটেছিল তার হদিশ পেতে তাঁদের অনেক সুবিধে হবে। কারণ চোখ ঝলসানো ওই পোশাকের জন্যে ওকে একবার যারা দেখেছে তারা আর সহজে ভুলতে পারবে না।

খুব একটা মিথ্যে বলেনি, সোম। —সিতাংশু ঘাড় দোলাল। তারপর ধীর পায়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। —আমারও আজকের মতো এখানকার কাজ শেষ। কিন্তু মিঃ শিকদার, আপনি যদি আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা না করেন, সব কথা যদি আমাকে অকপটে খুলে না বলেন...

দেবতোষ শিকদার স্থির দৃষ্টিতে সিতাংশুর মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দুচোখে দ্বিধা ও সংকোচের সঙ্গে বিস্ময়ের ভাবও ফুটে উঠল। বললেন—কী করে টের পেলে জানি না, তবে তুমি হয়ত এই চিঠিটার কথাই এখন বলতে চাইছ?

বুক পকেট থেকে এক টুকরো ভাঁজ-করা কাগজ বের করে সিতাংশুর দিকে এগিয়ে দিলেন তিনি। মৃদু হেসে কাগজটা হাতে নিল সিতাংশু। তারপর ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল। সবুজ কালিতে লেখা ছোট্ট চিঠি। চিঠি নয়, যেন আবেগের নির্যাস।

নীলিমা,

সাগরবেলায় স্বপ্নঘেরা সেই সাতটি স্বর্ণালি সন্ধ্যার কথা এ জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারব না। তুমি আমি পাশাপাশি। সামনে অথৈ নীল সাগরের কলোচ্ছ্বাস। ঝোড়ো হাওয়া এসে আমাদের মন দুটোকে নিয়ে যেন লুটোপুটি খেত ভিজে বালির ওপর। সে আজ কতদিনের কথা বল তো! আজ এতদিন বাদে তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে জেনে এত বেশি পুলকিত হয়ে উঠছি, কিছুতেই নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছি না। বিশ্বাস কর, সেই আসন্ন মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় আমার সারা অন্তর উন্মুখ হয়ে আছে।

তোমার অরিন্দম

পড়া হয়ে গেলে সিতাংশু কাগজটা একবার উল্টে-পাল্টে দেখল, তারপর সযত্নে সেটা ভাঁজ করে দেবতোষবাবুকে ফিরিয়ে দিল।

এই অরিন্দম ছেলেটি হচ্ছে আমার জামাই প্রিয়ব্রতর মতোই আর এক হতচ্ছাড়া। —করুণ সুরে মন্তব্য করলেন মিঃ শিকদার। বছর আষ্টেক আগে আমার গোটাকয়েক ছবিতে ওকে হিরোর চান্স দিয়েছিলাম। সেই সূত্রে নীলিমার সঙ্গে আলাপ। কিন্তু ও যখন ক্রমশই আমার মেয়ের সঙ্গে আরও বেশি করে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল, তখন একদিন ওকে ডেকে সতর্ক করে দিলাম। কেননা, এই সমস্ত সিনেমার ছেলেদের মতি-গতি বা স্বভাব-চরিত্র সবকিছুই আমার নখদর্পণে। তারপর থেকে ও অবশ্য আর কোনোদিন নীলিমাকে ঘাঁটায়নি।

বছর চারেক আগে ভাগ্য ফেরাবার সুযোগ খুঁজতে মুম্বাই চলে যায়। তবে সেখানে বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারেনি। ওর সঙ্গে আমার আর কোনো যোগাযোগ ছিল না। ভেবেছিলাম নীলিমার সঙ্গেও ওর আগের সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আজ সকালে ওর টেবিলের ড্রয়ার থেকে এই চিঠিটা খুঁজে পেলাম। সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেল। আমার মাথার ওপর বজ্রাঘাত হলেও বোধহয় এত বেশি শক পেতাম না!

কথা বলতে বলতে মিঃ শিকদার কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। একটু থেমে কোনোরকমে সংযত করলেন নিজেকে। —কিন্তু...কিন্তু তুমি এ-চিঠির হদিশ পেলে কীভাবে?

সিতাংশুর চোখে-মুখে মৃদু কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল। —সজাগ দৃষ্টিতে চারদিকে সমানভাবে নজর রাখলে অনেক সত্যিই আপনা থেকে প্রতিভাত হয়ে ওঠে. তবে তাকে ঠিকমতো উপলব্ধি করা চাই। প্রকৃতপক্ষে এই চিঠির বিন্দুবিসর্গ কিছুই আমি জানতাম না। কিন্তু আপনি যে আপনার গুণধর জামাতার প্রতি আদৌ প্রসন্ন নন একথা চেনা-পরিচিত কারুরই অজানা নয়। গতকাল ট্রেনের কামরায় ওই রহস্যময় আগন্তুক আপনার জামাতাও হতে পারেন। তাছাড়া কোনো অজ্ঞাত কারণে এদিন তিনি কলকাতার বাইরে ছিলেন বলেই খবর পাওয়া গেছে। অথচ লক্ষ্য করলাম, ভদ্রলোকের গতিবিধি সম্পর্কে আপনার আগ্রহের একান্তই অভাব। তাই বুঝতে পারলাম মনে মনে আপনি নিশ্চয় আর কাউকে সন্দেহ করেন। তবু আমার কাছে সে প্রসঙ্গে কিছু ভেঙে বলছেন না। কোনো জরুরী বিষয় গোপন করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

তোমার এই অনুমান পুরোপুরি অভ্রান্ত। চিঠিটা হাতে পড়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি শয়তান প্রিয়ব্রতকেই আমার মেয়ের হত্যাকারী হিসেবে সন্দেহ করতাম। কারণ নীলিমার মৃত্যুতে ও-ই সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে, এ জাতীয় একটা ভ্রান্ত ধারণা ওর মনে জাগা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এখন সব কেমন ওলোটপালোট হয়ে গেল। আমি যে কী নিদারুণ পরিস্থিতির মধ্যে আটকে পড়েছি সেকথা বাইরের কাউকে বলে বোঝানো যাবে না।

শেষদিকে মিঃ শিকদারের দুচোখ সজল হয়ে উঠল। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বুকের পাঁজর ঠেলে। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মোছার অছিলায় চোখ মুছলেন তিনি।

দুপুরবেলা একটু গড়িয়ে নিয়ে সিতাংশু যখন ইন্সপেক্টর সোমের ঘরে গিয়ে হানা দিল তখন বিকেল চারটে। ভদ্রলোক ওঠার উপক্রম করছিলেন, সিতাংশুকে দেখে আবার নিজের চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন।

কী ব্যাপার, আজ দেখছি মেঘ না চাইতেই জল! হঠাৎ পথ ভুলে না কি?

না...না, আমার এখনও তেমন মতিভ্রম হয়নি যে অকারণে তোমাদের গোয়ালঘরে ঢুঁ মারতে আসব। বিশেষ একটা প্রয়োজনেই দিবানিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে তোমার কাছে ধরণা দিতে এসেছি। আমার আজকের এই আবির্ভাবের মূল হেতুটা হচ্ছে, নীলিমা দেবী।

ইন্সপেক্টর সোম মুচকি হাসলেন। —মিঃ শিকদার দেখছি অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন! অবশ্য একমাত্র মেয়ের এই করুণ পরিণতিতে পৃথিবীর কোনো বাবাই স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন না। তা এ ব্যাপারে তোমাকে আমরা কীভাবে সাহায্য করতে পারি বল তো? আমাদের

ধরা-বাঁধা কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তোমার তো আবার মতে মেলে না। তুমি তোমার অন্তর্নিহিত কল্পনাশক্তি আর মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ধূষর কোষবিন্দুগুলোর ওপরই বেশি নির্ভরশীল।

কেন মিথ্যে চেষ্টা করছ...বন্ধু! —সিতাংশুর কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সুর। —আমার সহজাত কল্পনাশক্তি আর মাথার ভেতরের এই ধূসর কোষবিন্দুগুলোর সঠিক মূল্যায়ন করা তোমার মতো সাধারণ একজন পুলিশ ইন্সপেক্টরের সাধ্যের বাইরে। কারণ তোমাদের চিন্তাশক্তি খুবই সীমিত। ধরা-বাঁধা ছকের বাইরে কিছুতেই পা ফেলতে চাও না। তার চেয়ে যা জানতে চাইছি সরাসরি উত্তর দাও। অবশ্য আইনগত দিক থেকে যদি কোনো অসুবিধে থাকে সেক্ষেত্রে আমি তোমায় বিরক্ত করব না। ...আমার এই প্রশ্নগুলো হচ্ছে, নীলিমা দেবীর খুনের ব্যাপারে তোমরা কী ভাবছ? কী ব্যবস্থা নিয়েছ? কোন পথে এগোচ্ছ? নতুন কোনো সূত্রের হদিশ পেয়েছ কি না?

এটা শ্রীমান প্রিয়ব্রত ঘটকের কীর্তি, না অন্য কোনো খুনে ডাকাতের কাজ—সে সম্পর্কে এখনও কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারা যায়নি। তবে মিঃ ঘটকের ওপর আমরা সজাগ নজর রেখেছি। জামাই বাবাজির গতদিনের গতিবিধির হদিশ নেবার চেষ্টা চালাচ্ছি। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে। তাছাড়া এর পেছনে অন্য কোনো খুনে-ডাকাতের হাত থাকলে সে নিশ্চয় এত সব দামি-দামি হীরে-জহরত নিজের বাড়িতে সাজিয়ে রাখবে না। আর কোথাও পাচার করে দেবার ফিকির খুঁজবে। চোরাই মাল পাচারের সমস্ত আড্ডাগুলোতে আমরা আমাদের অভিজ্ঞ কিছু লোককে নিযুক্ত করে রেখেছি। তাদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়।

হ্যাঁ, বেশ আটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছ...মনে হচ্ছে! একটা মাছিও তোমাদের জালের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে পারবে না।

ইন্সপেক্টর সোম সিতাংশুর ঠাট্টা গায়ে মাখলেন না। নিজের কথার জের টেনে বললেন—তার ওপর পাঁচটার গাড়িতে আমি নিজে রওনা হচ্ছি। দুর্গাপুর থেকে আসানসোল পর্যন্ত একবারে চষে ফেলব, ইচ্ছে করলে তুমিও আমার সঙ্গী হতে পার।

না...ভাই, এত ছোটাছুটি আমার ধাতে পোষাবে না। —সিতাংশু আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। —তার চেয়ে তুমি ফিরে এসে আমাদের বাড়িতে বরং একবার পায়ের ধুলো দিও। তোমার মুখ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পর না-হয় সমগ্র পরিস্থিতিটা আর একবার নতুন করে বিচার-বিবেচনা করা যাবে।

পরের দিন বিকেলে সিতাংশু একটা আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে এজরা পাউন্ডের কবিতা পড়ছিল। ভেজানো দরজা ঠেলে সুধাংশুশেখর ভেতরে ঢুকলেন।

ওদিককার খবর কী? রহস্যটার কোনো হদিশ করতে পারলে?

এখনও পর্যন্ত কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। তবে হাল ছেড়ে দিইনি।

সোমের সঙ্গে দেখা করেছিলে? সরকারিভাবে ওই তো এখন কেসটার দেখভাল করছে।

হ্যাঁ, করেছিলাম। —মাথা নেড়ে জবাব দিল সিতাংশু। —সরেজমিন তদন্ত করতে গতকালই শুভঙ্কর দুর্গাপুর রওনা হয়েছে। আজ হয়ত আমাদের এখানে আসতে পারে।

আর অরিন্দম? তার কোনো সন্ধান পেলে?

ভদ্রলোক হপ্তাখানেক আগে মুম্বাই থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে কলকাতায় এসে আস্তানা গেড়েছেন। আপাতত পার্ক স্ট্রীটের একটা হোটেলে থাকেন। কিন্তু গত পরশু সকাল থেকে তাঁর কোনো খবর নেই। ঘরটা অবশ্য ছাড়েননি। ম্যানেজারকে জানিয়ে গেছেন, ফিরতে দিন দু-তিন দেরি হতে পারে। তাঁর সমস্ত মাল্‌পত্র হোটেলেই রাখা আছে।

গত পরশু? অর্থাৎ দেবতোষের মেয়ে যেদিন খুন হয়, সেইদিন?

হ্যাঁ।

তা হলে তো বিষয়টা রীতিমতো ঘোরালো মনে হচ্ছে! লোকটাকে বেশিদিন বাইরে ছেড়ে রাখাটা কিছুতেই উচিত হবে না!

ভদ্রলোককে গ্রেপ্তার করা হয়ত তেমন কিছু কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়, কিন্তু এত তড়িঘড়ি করে কোনো গুরুতর সিদ্ধান্ত না নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। সামগ্রিক পরিস্থিতিটা আর একটু বিশদভাবে খুঁটিয়ে দেখতে ক্ষতি কী?

সুধাংশুশেখর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ছেলের দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

প্রত্যেক খুনের পেছনেই কোনো একটা সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে. কিন্তু এক্ষেত্রে...

কেন? আঠারো-বিশ লাখ টাকার হীরে-জহরতকে তুমি কি খুবই তুচ্ছ জিনিস বলে মনে কর?

না, তা আমি করি না। তবে তার জন্যে খুনেব মতো এত বড় একটু ঝুঁকি নেবার কী দরকার! ভদ্রলোক তো অনায়াসে ব্যাগটা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দিতে পারতেন! নীলিমা দেবী নিশ্চয় তার জন্যে আদালতে মামলা দায়ের করতে যেতেন না!

কেন?

কারণ তিনি একজন বিত্তবান সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা। সমাজে তাঁব একটা মান-সম্মান আছে, পরিচিতি আছে। বিশ লাখ টাকার অলঙ্কারের চেয়ে নিজের সুনামের দাম তাঁর কাছে অনেক বেশি। তিনি কখনোই এই ধরনের কেলেঙ্কারির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে রাজি হতেন না। অরিন্দম নিজেও একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। মহিলাদের এই জাতীয় দুর্বলতার ব্যাপারটা তাঁরও অজানা থাকার কথা নয়। এবং এই পরিস্থিতিতে মিঃ শিকদারও নিশ্চয় কিল খেয়ে কিল হজম করতে বাধ্য হতেন। তাই ঘটনাটার সমস্ত দিক ভাল করে খতিয়ে না দেখে...

তুমি হয়তো ঠিকই বলছ! সুধাংশুশেখরকে এবারে কিছুটা চিন্তিত মনে হ'ল। ধীর মন্থর পায়ে ঘর ছেড়ে বিদায় নিলেন তিনি।

মিনিট দশেক পরেই বাইরের সিঁড়ির ওপর ধুপধাপ পায়ের শব্দ শোনা গেল। বীরদর্পে ইন্সপেক্টর শুভঙ্কর সোম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

ট্রেন থেকে নেমে অফিসে একবার হাজিরা দিয়েই সোজা তোমার এখানে ছুটে আসছি। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সবার আগে তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চায়ের ব্যবস্থা কর।

সিতাংশু মুচকি হেসে হরিহরকে ডেকে চায়ের অর্ডার দিল।

ব্যাপারটা কী? তোমার এখনকার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন মস্তবড় একটা রাজ্য জয় করে ফিরছ?

সেসব বৃত্তান্ত পরে শোনাচ্ছি। কিন্তু দিনভর একা একা ঘরে বসে তুমি কী এমন মহাকার্য সমাধা করলে শুনি?

আমি? ...আমি সারাদিন এই চেয়ারে স্থির হয়ে বসে আমার ধারণাগুলোকে সংঘবদ্ধ করে একটা সুনির্দিষ্ট রূপ দেবার চেষ্টা করছিলাম।

ইন্সপেক্টর সোম ঈষৎ ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর কণ্ঠস্বরেও সেই ঝাঁঝের আভাস ফুটে উঠল। —আমি হচ্ছি পুরোপুরি বাস্তববাদী মানুষ। তোমাদের ওই সমস্ত বায়বীয় ধ্যান-ধারণার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করি না। আর তাতে করে আমাদের পেটও ভরবে না। এই খুনের ব্যাপারে একে একে অনেকগুলো সূত্রের সন্ধান জোগাড় করেছি। মন দিয়ে শোন।

বোকা-বোকা মুখ করে সিতাংশু বলল—দুর্গাপুর আর আসানসোলের মাঝামাঝি রেল লাইনের ধারে কোনো ঝোপঝাড়ের মধ্যে থেকে রক্তমাখা ছোরাটা খুঁজে পেয়েছ, এই তো? ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে সেই বুড়ো ফিরিওয়ালাটারও হয়ত সাক্ষাৎ পেয়ে থাকবে।

না...বুড়ো নয়, এখন তার ছেলেটাই স্টলে বসে কাগজ বিক্রি করে। কিন্তু তুমি ম্যাজিক জান নাকি? —ইন্সপেক্টর সোমের চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। —ঘরে বসে এতসব খবর সংগ্রহ করলে কোত্থেকে?

আমার ধ্যান-ধারণার কথা শুনলে তুমি তো আবার চটে উঠবে! —সিতাংশুর ঠোঁটের ফাঁকে রহস্যময় হাসি। —তার চেয়ে তোমার কেরামতির বৃত্তান্তটাই বিশদভাবে শোনা যাক।

ধাতস্থ হয়ে অল্প সময় নিলেন সোম। ইতিমধ্যে হরিহর চা দিয়ে গিয়েছিল। গরম চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তাঁর বিস্ময়ের ঘোর কাটল। তারপর শান্ত কণ্ঠে নিজের কাহিনী শুরু করলেন।

দুর্গাপুর আর আসানসোলের মাঝখানে কয়েকটা স্টেশন থাকলেও মোটামুটি বড় স্টেশন বলতে রানীগঞ্জকেই বোঝায়। এই রানীগঞ্জ স্টেশন থেকে মাইল খানেক দূরে রেল লাইনের ধারে ঝোপের মধ্যে থেকে আমি একটা রক্তমাখা ছোরা খুঁজে পেয়েছি। সম্ভবত এই ধারালো অস্ত্র দিয়েই নীলিমা দেবীকে খুন করা হয়েছে। ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর এ বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া যাবে। রানীগঞ্জ স্টেশনে যে ছোকরা খবরের কাগজ আর নানা ধরনের পত্র-পত্রিকা বিক্রি করে তার কাছে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম, ঘটনার দিন দুপুরে কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেস যখন রানীগঞ্জে এসে পৌঁছয় তখন এ সুন্দরী যুবতী তার কাছ থেকে একটা ইংরেজি সিনেমার ম্যাগাজিন কেনেন। ভদ্রমহিলা প্রথম শ্রেণীর কামরার জানালার ধারে একলা বসেছিলেন। তাঁর পরনে ছিল ময়ূরকণ্ঠী রঙের সিল্কের শাড়ি। গায়ে গাঢ় লাল রঙের কাজ-করা পশমের শাল। তিনি ব্যাগ থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বের করে ছেলেটার হাতে দেন! পত্রিকাটার দাম মাত্র কুড়ি টাকা। ছেলেটার কাছে বাকি টাকার চেঞ্জ ছিল না। তখন ভদ্রমহিলা মৃদু হেসে বললেন, থাকগে ... তুমি স্টল থেকে উঠে এসে আমাকে পত্রিকাটা দিলে, তাই বাকিটা তোমার বকশিস। কুড়ি টাকার ম্যাগাজিনে তিরিশ টাকা বকশিস ছেলেটা কোনোদিন ভাবতে পারেনি। তাই একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিল. ওই দিনটার কথা ও জীবনে ভুলবে না। স্টেশনের আরও কয়েকজন ওই ভদ্রমহিলাকে দেখেছেন বলে জানা গেছে।

ইন্সপেক্টর সোম অল্প থামলেন। এদিকে কলকাতায় ফিরে আর এক নতুন খবর শুনলাম। হেমেন দাস বলে একজন ছোকরা বামাল ধরা পড়েছে। নীলিমা দেবীর দু-চারখানা গয়নাও উদ্ধার করা হয়েছে তার কাছ থেকে। ছোকরা এগুলো পাচার করার ধান্দায় ছিল। অলঙ্কার-চোর হিসেবে বাজারে বেশ নামডাক আছে। তবে কোনো খুনখারাপির মধ্যে ওকে কখনও জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়নি। হাজার চেষ্টা করেও লোকটার পেট থেকে সত্যি কথাটা বের

করা যাচ্ছে না। বলছে, কুড়িয়ে পেয়েছি। মাঝেমধ্যে ওর সঙ্গে অলকা নামে একটা মেয়েকে দেখা যেত। ইদানীং সেই মেয়েটারও কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। যেন কর্পূরের মতো উবে গেছে পৃথিবী থেকে।

তোমার ওই হেমেন ছোকরাটি দেখতে কেমন?

একটু বেঁটেখাটো, গাঁট্টাগোট্টা চেহারার। সারা দেহে মেদের কোনো বালাই নেই। কিন্তু আমাদের আসল সমস্যাটা হচ্ছে ট্রেনের কামরায় সেই অচেনা ভদ্রলোককে নিয়ে। লোকটির হদিশ না করতে পারলে এই খুনের মামলার নিষ্পত্তি করা দস্তুর মতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কীভাবে যে এই দুরূহ সমস্যার সমাধান করব অনেক ভেবেও তার কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছি না!

সিতাংশুর চোখের কোণে দুষ্টুমির হাসি চিকচিক করে উঠল। —ভদ্রলোকেব কোনো সন্ধান জানাতে না পারলেও হেমেনের সহচরী শ্রীমতী অলকা দেবীর হদিশ আমি হয়ত তোমাদের দিতে পারি। এই খুনের মামলায় সেই মহীয়সী মহিলার ভূমিকাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

শুভঙ্কর সোম চকিত দৃষ্টিতে সিতাংশুর দিকে ফিরে তাকালেন। তাঁর সারা মুখে আপনা থেকেই একটা গোমড়া ভাব ফুটে উঠল। আবার তুমি ওই ভুতুড়ে ধ্যান-ধারণার গল্প ফেঁদে বসলে? কিন্তু তোমার এই ধারণাগুলো কী করে যে অভ্রান্তভাবে মিলে যায়...। সত্যিই বরাত বলতে হবে!

সোমকে সঙ্গে নিয়ে নিজের ছোট অস্টিনে উঠে বসল সিতাংশু। গল্‌ফগ্রিনে দেবতোষ শিকদারের বিশাল বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামাল। তকমা-আঁটা দারোয়ান ওদের দেখে এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে সেলাম ঠুকল। সিতাংশু তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে কী যেন বলল তার কানে কানে। দারোয়ানও সবিনয় ওর কথায় সায় দিল মাথা নেড়ে। তারপর তার পেছন পেছন দুজনে ভেতরে ঢুকল।

একতলার কোণের দিকে একটা ঘর দেখিয়ে দিল দারোয়ান। নীলিমা দেবীর পরিচারিকা রাধা এই ঘরেই থাকে। তবে সে এখন ঘরে নেই। ঘণ্টাখানেক আগে নিজের কোনো কাজে বাইরে বেরিয়েছে।

ঠিক আছে, তুমি একবার মিঃ শিকদারকে খবর দাও। তাঁকে বলো, ইন্সপেক্টর সোমও আমার সঙ্গে আছেন। গম্ভীর গলায় দারোয়ানকে নির্দেশ দিল সিতাংশু।

দারোয়ান দৃষ্টিপথের বাইরে যেতেই সিতাংশু দ্রুতগতিতে তার কাজ শুরু করে দিল। পকেট থেকে একটা সরু লোহার শিক বের করে বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। এসব ব্যাপারে ওর জুড়ি মেলা ভার। সরু শিকটার সাহায্যে দরজার লক খুলতে মিনিট খানেকের বেশি সময় লাগল না। ভেতরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। মাঝারি সাইজের সাজানো-গোছানো ঘর। জানালার কাছ বরাবর একটা সিঙ্গল খাট। তার ওপরে পরিষ্কারভাবে বিছানা পাতা। খাটের পাশে কাঠের তৈরি সুদৃশ্য ড্রেসিং টেবিল। দেওয়াল ঘেঁষে পোশাক রাখার আলনা। গোটা দুটোক রঙিন শাড়ি ঝুলছে তার ওপর। খাটের নিচে বেশ মজবুত গড়নের একটা বড় চামড়ার স্যুটকেস। সিতাংশু চোখ তুলে একবার চারধারে নজর বুলিয়ে নিল। শেষে হেঁট হয়ে খাটের তলা থেকে স্যুটকেসটা টেনে বের করল। সেটাও লক করা ছিল। আগের

মতোই অনায়াস দক্ষতায় শিকের সাহায্যে লক খুলল ও। ইন্সপেক্টর সোম ওর রকম সকম দেখে থ হয়ে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে হাঁপাতে হাঁপাতে মিঃ শিকদার সেখানে এসে দাঁড়ালেন।

কী হয়েছে? এখানে আপনারা কী করছেন? রাধাই বা গেল কোথায়?

সিতাংশুর মধ্যে কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। ধীরেসুস্থে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর হাতে ময়ূরকণ্ঠী রঙের সিল্কের শাড়ি আর টকটকে লাল একটা পশমের আলোয়ান। নির্বিকার গলায় বলল—এতক্ষণ ধরে এই দুটোরই সন্ধান করছিলাম। এখানে খুঁজে না পেলে খুবই অবাক হয়ে যেতাম। এই হত্যা বহস্যের কিনারা করা এত সহজে সম্ভব হ'ত কি না সন্দেহ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছুটতে ছুটতে রাধা এসে হাজির হ'ল। প্রচণ্ড উত্তেজনায় তার কপালের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। —এখানে কী চাই আপনাদের? না বলে আপনারা আমার স্যুটকেস খুলেছেন কেন?

পরমুহূর্তে সিতাংশুর হাতে-ধরা জিনিস দুটো দেখে তার চোখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কথা হারিয়ে স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে রইল সে।

নমস্কার...অলকা দেবী। —সিতাংশু হাসিমুখে স্বাগত জানাল তাকে। —বেচারি হেমেন দাস একা একা জেল হাজতে বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। তোমাকে সঙ্গী হিসেবে পেলে মনে মনে দারুণ খুশি হবে ও।

সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়েই সিতাংশু মন্থর পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

রাতে ডিনার টেবিলে সুধাংশুশেখরের সঙ্গে দেবতোষ শিকদার এবং ইন্সপেক্টর সোমও উপস্থিত ছিলেন। তিনজনেরই কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি সিতাংশুশেখরের মুখের ওপর নিবদ্ধ। ওই যেন আজকের এই ভোজ-সভার মধ্যমণি।

রাধার মুখের একটা কথায় আমার মনের মধ্যে প্রথম সন্দেহ দানা বাধতে শুরু করল। —সিতাংশু বলল। সেদিনের ট্রেন যাত্রা সম্পর্কে যখন ওর কাছ থেকে খোঁজ খবব নিচ্ছিলাম তখন ও অযাচিতভাবে একটা প্রসঙ্গের অবতারণা করল। কোন ধরনের পোশাক পরে নীলিমা দেবী তাঁর বন্ধুর বিয়েতে যাচ্ছিলেন তারই বিশদ বর্ণনা দিল আমাকে। অথচ এ বিষয় আমি ওকে কোনো প্রশ্নই করিনি। তখনই আমার কেমন খটকা লাগল। এই তুচ্ছ ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন ওর? এর পেছনে কি অন্য কোনো নিগূঢ় কারণ আছে? মনের অতলে ডুবুরি নামিয়ে বারবার এই প্রশ্নটার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করলাম।

একটু থেমে একে একে প্রত্যেকের উদগ্রীব মুখের দিকে ফিরে তাকাল সিতাংশু। এই সূত্র ধরে এগোতে এগোতে একসময় আমার মাথার মধ্যে কতকগুলো ধারণার উদয় হ'ল। ট্রেনেব কামরায় অজ্ঞাত পরিচয় যে আগন্তুকের খবর পাই একমাত্র রাধা ছাড়া তাঁকে আর কেউ দেখেছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ঘটনাটা যদি সত্যি না হয়? রাধা যদি মিথ্যে বিবৃতি দিয়ে থাকে? তাছাড়া ডাক্তারের রিপোর্টে মৃত্যুর যে আনুমানিক সময় নির্দেশ করা আছে তার সাহায্যেও সুনির্দিষ্ট কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। দুর্গাপুরে পৌঁছবার দশ-পনের মিনিট আগেও নীলিমা দেবী আততায়ীর হাতে খুন হতে পারেন। সেক্ষেত্রে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে শ্রীমতী রাধারও মস্তবড় একটা ভূমিকা থাকতে বাধ্য।

*দেবতোষ শিকদারের পাঁজর ঠেলে গভীর দীর্ঘশ্বাস উঠে এলো। মেয়েটার মুখ দেখে একথা আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝে উঠতে পারিনি। সবসময় এমন একটা ভালমানুষির মুখোশ পরে থাকত...*

নিজের কথার খেই ধরে সিতাংশু বলে চলল—নীলিমা দেবী সেদিন যে পোশাক পরে দুর্গাপুর রওনা হয়েছিলেন সেটা সহজেই আর পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভেবে দেখলাম, বন্ধুর বিয়েতে যোগ দিতে যাবার জন্যে মনিব-কন্যা কী ধরনের পোশাক পরবেন সে বিষয় রাধাও তাকে প্ররোচিত করতে পারে। এসব ক্ষেত্রে পরিচারিকার মতামতেরও একটা গুরুত্ব থাকে। বিশেষ করে সে যদি আবার সমবয়সী হয়। রাধা খুঁজে পেতে এমন দুটো রং পছন্দ করল যা একবার দেখলেই চোখে লেগে থাকে। কারণ, ভেবেচিন্তে মতলব এঁটে ওই রঙের শাড়ি ও আলোয়ান সে আগেভাগেই জোগাড় করে রেখেছিল। এখন দুর্গাপুরের আগেই নীলিমা দেবীকে খুন করে রাধা ওইরকম ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি পরে আর টকটকে লাল আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে জানালার ধারে বসে থাকে, তবে বাইরের লোক কেবলমাত্র চোখ ধাঁধানো ওই রং দুটোর কথাই বেশি করে মনে রাখবে। মুখের দিকে তেমনভাবে লক্ষ্য করবে না। আর রাধাও যে দস্তুর মতো সুশ্রী, সেকথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সেই সুযোগটারই পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছে মেয়েটা। রানীগঞ্জে ওর একজন জবরদস্ত সাক্ষীর প্রয়োজন ছিল। সেইজন্যেই পত্রিকা-বিক্রেতাকে ডেকে অযাচিতভাবে তিরিশ টাকা বকশিস দিল। তারফলে ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি পরা, আর গায়ে উজ্জ্বল লাল আলোয়ান জড়ানো তরুণীটিকে সে জীবনে কোনোদিনও ভুলতে পারবে না। তারপর আসানসোলে নেমে রাধা পোশাক পাল্টে পরের ট্রেনে দুর্গাপুর ফিরে এলো। কোল্ডফিল্ড এক্সপ্রেসে ততক্ষণে তার শেষ গন্তব্যস্থল ধানবাদের দিকে রওনা হয়ে গেছে। রাধার সঙ্গী হেমেন দাস নীলিমার সমস্ত মালপত্র নিয়ে দুর্গাপুর স্টেশনেই অপেক্ষা করছিল। রাধা নিজে সেগুলো ক্লোকরুমে জমা দিয়ে রসিদ সংগ্রহ করে। তারপর হেমেন গয়নাভর্তি অ্যাটাচি নিয়ে কলকাতায় চলে আসে। রাধাও তার নির্দিষ্ট ভূমিকা অনুযায়ী রাতটুকুর জন্যে কাছাকাছি কোনো হোটেলে গিয়ে উঠল।

ব্যাপারটা অবশ্য প্রথম দিকে আমিও ঠিকমতো আন্দাজ করতে পারিনি, শুধু কতকগুলো খাপছাড়া কল্পনা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। সোমের মুখেব দিকে তাকিয়ে সিতাংশু মুচকি হাসল। —কিন্তু শুভঙ্কর ফিরে আসার পর ওর মুখ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে ছড়ানো-ছেটানো ধারণাগুলো স্বচ্ছ রূপ নিতে শুরু করল। ট্রেনের কামরায় সেই অচেনা আগন্তুক হেমেন দাস ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। তবে খুন খারাপি হেমেনের স্বভাবের বাইরে। সম্ভবত এই অপ্রিয় কাজটা রাধাকে নিজের হাতেই হাসিল করতে হয়েছে। জেরাতেই সব ফাঁস হয়ে যাবে।

এই হচ্ছে নারী চরিত্র! একটু থেমে ব্যথাহত ম্লান কণ্ঠে মন্তব্য করল সিতাংশু। একদিকে তারা যেমন স্নেহ-করুণা মায়া-মমতার আধার, স্বার্থের তাগিদে তারাই আবার কখনও কখনও ক্রূর কালনাগিনীর রূপ ধারণ করতে দ্বিধা করে না।

মিঃ শিকদার কোনো মন্তব্য করলেন না। তাঁর চোখের কোল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

# স্বখাত-সলিলে

## সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস স্টেশনে এসে থামল বোম্বে মেল। সঙ্গে সঙ্গেই ঝিমিয়ে পড়া স্টেশনটায় অদ্ভুত একটা প্রাণচাঞ্চল্য আলাদ্দিনের যাদুর ছোঁয়াতেই যেন জেগে উঠল।

লোকটা সুপুরুষ। অনেকটা সিনেমার নায়কের মতোই চেহারা। টকেটকে ফর্সা গায়ের রঙ, ঢেউ খেলানো একমাথা ঘন কালো চুল। পরনে ঢোলা পাজামা আর বুশ সার্ট। বেশ হাল্কা চালে কোনো দিকে না তাকিয়েই লোকটা স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

লোকটার পরিচয় আমাদের জানা দরকার, কারণ, তাকে অবলম্বন করেই আমাদের আজকের এই কাহিনী। এই রকম নায়কোচিত, রমণীমোহন চেহারা সত্ত্বেও লোকটা কিন্তু এ লাইনের মোটেও নয়—সে একজন অত্যন্ত চতুর আর সাপের মতো পিচ্ছিল মানুষ।

হ্যাঁ, লোকটা অপরাধ জগতেরই একজন। সে একজন আন্তর্জাতিক চোরাচালানে দক্ষ অপরাধী। পুলিশ ওকে চেনে। বার দুই সে জেলও খেটে এসে দাগী অপরাধী বলেও চিহ্নিত।

তবে মজার কথা খুব বেশিদিন ওকে জেল কোনোবারেই খাটতে হয়নি।

আসলে এবারও ও যে বোম্বে শহরে এসে পৌঁছেছে সেটাও কলকাতার জেল থেকে ছাড়া পেয়েই। মাদক চালানের ব্যাপারে ধরা পড়েই সে ছ'মাসের জন্য জেল খেটে দু'দিন আগে ছাড়া পায়। ছাড়া পাওয়ার পরেই সে ওর আদি ও অকৃত্রিম কর্মক্ষেত্র বোম্বাই শহরটায় এসে পৌঁছেছে।

এ হেন পুরুষটির পরিচয় জানার জন্য আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। লোকটার নাম রাকেশ শর্মা।

রাকেশ শর্মার গুণ অঢেল। প্রথমতঃ সে অত্যন্ত সুপুরুষ। আর আশ্চর্যের কথা শিক্ষাগত যোগ্যতাও তার কম নয়। বংশ-পরিচয় ঘাঁটলেও দেখা যাবে সেটাও কম মর্যাদা বহন করছে না।

কিন্তু একটা বিষয়ে ওর সঙ্গে সাধারণ মার্জিত রুচির শিক্ষিত যুবকের বিবাট তফাত—রাকেশ শর্মা স্বভাবতই অপরাধ জগতের প্রতি আকৃষ্ট। সে জন্ম-অপরাধী, এটাই বলা চলে। যে কোনো অপরাধেই সে সিদ্ধহস্ত।

রোজগারও রাকেশ কম করে না। আর কাজ জোগাড়েও ওর দেরী হয় না। নিজের উপর ওর বিশ্বাস অত্যন্ত বেশি। সমাজের নানা মহল, বিশেষ করে উঁচু মহলেও সে ঘোরাফেরা করে।

নিজের স্ট্যাটাস সম্পর্কে সে অত্যন্ত সজাগ। আর তাই ফার্স্ট ক্লাস ছাড়া যাতায়াত করে না। অপরাধী জগৎ ওর পরিচয় জানে আর কাজেও লাগায়। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক চোরাচালানে ওর দক্ষতা অসীম।

রাকেশ শর্মার গতিবিধি এবার তাহলে একটু লক্ষ্য করা যাক।

রাকেশ পায়ে পায়ে হালকা চালে স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল। ওর ইচ্ছে একটা ট্যাক্সি ধরা। রাকেশ শর্মা শুধু একটা কথাই জানত না। আর তা হ'ল, দু'জন লোক ওকে ট্রেন থেকেই অনুসরণ করে আসছে। লোক দু'জন বেশ ফিটফাট পোশাক পরিহিত। তারা কলকাতায় রাকেশ ট্রেনে চড়ার পর থেকেই তাকে চোখে চোখে রেখেছে।

রাকেশ একটা ট্যাক্সি ডেকে তাতে উঠে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোক দু'জন ওর ট্যাক্সির দুপাশের দুটো দরজা খুলে দু'পাশ থেকে দ্রুত উঠে পড়ল।

রাকেশ কিছু বলতে যেতেই দুটো ঠাণ্ডা ইস্পাতের নল ওর গায়ে খোঁচা মারল। অভিজ্ঞ রাকেশ কোনো কথাই বলল না। ট্যাক্সিচালকও যে ওদেরই দলের তাতেও সন্দেহ ছিল না. কারণ সে ততক্ষণে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছিল। লোক দু'জন রাকেশের মুখের অদ্ভুত একটা অস্পষ্ট হাসি লক্ষ্য করল না।

'তারপর?' রাকেশ প্রশ্ন করল।

'চুপচাপ বসে থাকলে ভয় নেই,' একজন বলল পিস্তলটা চেপে রেখেই।

'আপনার নাম রাকেশ শর্মা?' অন্যজন প্রশ্ন করল।

'অধীনের ওই নামই বটে,' রাকেশ জবাব দিল। 'কিন্তু কোথায় যাচ্ছি জানতে পারব কি?'

'দেখতেই পাবেন। তবে ভয় নেই, এটা আপনার পক্ষে লাভজনকই হতে পারে,' একজন জানাল।

'পরের উপকার করাই তাহলে আপনাদের পেশা?' রাকেশ শুধোল।

'কিছুটা তাই। সঙ্গে নিজেদেরও, জবাব এলো।

'বাঃ আপনারা দেখছি রসিক ব্যক্তি। তা আমি যদি বলি আমার আপাততঃ কোনো লাভজনক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ার বাসনা নেই?'

'আপাততঃ আপনার নিজের ইচ্ছেটা মুলতবী রাখাই ভাল,' একজন জবাব দিল।

বোম্বাই শহরের পশ্চিম প্রান্তে মালাবার হিলসের কাছাকাছি একটা বিরাট বাগানবাড়ির সামনে এসে থামল ট্যাক্সিটা। লোক দু'জন রাকেশকে নামতে ইঙ্গিত করতেই নীরবে ও নেমে পড়তেই লোক দুজনও নেমে পড়ল।

তখনও বিকেলের রোদে চারিদিক ঝলমল করছে। একজন রাকেশের পিছনে আর একজন সামনে চলল, দুজনেরই হাতে পিস্তল ধরা।

প্রকাণ্ড একটা বাড়ির সামনে এসে কলিং বেল টিপল লোকটা।

একটু পরেই দরজাটা খুলে গেল। সুবেশধারী একজন লোক দরজা খুলে দিল।

প্রথম লোকটা বলল, 'কর্তাকে খবর পাঠাও। রাকেশ শর্মাকে এনেছি।'

'ভিতরে নিয়ে এসো। কর্তা অপেক্ষা করছেন,' সুবেশধারী বলল।

রাকেশ পায়ে পায়ে ঢুকে পড়তেই দরজা বন্ধ করল দ্বিতীয়জন।

রাকেশ এবার চারদিকটা জরিপ করে নিল। চমৎকার সাজানো একটা ড্রয়িংরুম। দামী আসবাবপত্রে ঠাসা। কোচ আর সোফা অনেকগুলো।

'চলুন উপরে,' প্রথমজন বলল।

রাকেশ দুজনের সঙ্গে ড্রয়িংরুমের মধ্য দিয়ে বারান্দায় পৌছতেই সামনের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলল।

দোতলায় যে ঘরটায় রাকেশকে ঢুকতে ইঙ্গিত করল দুজনে, সেটা নিচের মতোই সাজানো একটা ড্রয়িংরুম। রাকেশ লক্ষ্য করল একটা সোফায় মধ্যবয়সী একজন সুবেশধারী উপবিষ্ট।

রাকেশ ঢুকতেই সে বলে উঠল, 'তুমিই রাকেশ শর্মা? বসো, বসো।'

'আপনার অভ্যর্থনায় প্রীত হলাম,' রাকেশ জবাব দিয়ে বলল। 'তবে আপনার নিমন্ত্রণ করে আনার পদ্ধতিটা বেশ অভিনব বলতে হবে।'

'ও, অভিমান হয়েছে,' হো হো করে হেসে উঠল লোকটা, তবে পুষিয়ে যাবে। 'পিস্তল সরাও' লোকটা সঙ্গীদের বলল। রাকেশ একটা সোফায় বসে চারদিকে তাকাল।

'আমাকে এভাবে ধরে আনার কারণটা এবার জানতে পারি?' সে বলল।

'অবশ্যই। তোমার সম্পর্কে আমাদের কোনো কিছুই অজানা নেই, রাকেশ শর্মা!' লোকটা বলল। 'সোজা কথা আমরা তোমার সাহায্য চাই।'

'সাহায্য?'

'হ্যাঁ। তুমি স্মাগলিং-এ হাত পাকিয়েছ তা আমবা জানি। আসলে আমরাও একই পথের পথিক। তবে সামনে থেকে নয়—আর এই জন্যই তোমাকে দলে নিতে চাই। যথেষ্ট অর্থ পাবে এর জন্য।'

'ঠিক কি করতে হবে?' বাকেশ প্রশ্ন কবল।

'সময় মত জানতে পারবে। তুমি বাজী?'

'সে রকম পযসা থাকলে কোনো কাজেই আমার আপত্তি নেই। জেল থেকে বেবিয়ে অবশ্য কাজের কথা এখনও ভাবিনি। মনের মতো হলে—'

'না হওয়ার কারণ নেই। তবে একটা কথা, বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কঠিন মৃত্যু।'

'স্বাভাবিক, এ লাইনের এটাই দস্তুর।'

'তুমি বুদ্ধিমান, রাকেশ শর্মা। বেশ, প্রথমেই তোমাকে একটা হালকা কাজ দেবো। শোনো, কালই 'ক্রিস্টিনা' নামে একটা জাহাজে দু-বাক্স 'হেরোইন' আসছে। মালয়ে চালান করতে হবে কলকাতা পোর্ট দিয়ে। এর দায়িত্ব তোমার।' লোকটি বলল। 'সব কথা আমার লোক বুঝিয়ে দেবে। কাজটা নির্বিঘ্নে শেষ করতে পারলে পাঁচ হাজার টাকা পাবে।'

'একটু কম হয়ে যাচ্ছে না?' রাকেশ বলল।

'এটা তোমার প্রথম পরীক্ষা। পবে ডবল পাবে।'

'বেশ, আমি রাজি। কিন্তু আপনার পরিচয় দিতে আপত্তি আছে?'

'আমাকে হীরালালজি বলে ডাকতে পার। আর এই দুজন ব্রিজলাল আর মুকুল। এরা আমার নিজের লোক। আমি এখানে বিখ্যাত লোক, সবাই আমায় চেনে, অতএব কোনো ব্যাপারে আমাকে জড়াতে চাইলে মৃত্যু।'

'ঠিক আছে। রাকেশ শর্মা প্রভুর অমর্যাদা করে না।' রাকেশ জবাব দিল।

'চমৎকার! এবার তোমাকে তালিম দেবে ব্রিজলাল। পাশের ঘরে যাও। তোমার এখানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে আর একটু দূরে একটা বাড়িতে।' হীরালালজি জানাল।

রাকেশকে নিয়ে পাশের কামরায় ঢুকল ব্রিজলাল নামে ওর সঙ্গী সেই প্রথম লোকটা।

নতুন কাজে হাতেখড়ি হ'ল রাকেশ শর্মার। জেল ছেড়ে বেরোবার পর তিনটে দিনও তাকে বসে কাটাতে হ'ল না।

প্রথমেই হেরোইন পাচারের কাজ। অবশ্য রাকেশের পক্ষে আদৌ কঠিন নয় ওটা সে জানত। বাড়িতে বসে সে আগাগোড়া ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে নিল। হীরালাল নামের লোকটাই আন্তর্জাতিক স্মাগলিংয়ের একজন কর্তাব্যক্তি। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল সে বোম্বাই শহরের একজন ক্ষমতাবান মানুষ। ব্রিজলালের কাছে ও যতটুকু জেনেছে তাতে ও বুঝেছে সাংঘাতিক মানুষ হীরালাল, কত যে খুন করিয়েছে তার হিসেব নেই। তবে সে পাঁকাল মাছ, কোনোকালেই কেউ তার নাগাল পাবে না।

খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ল রাকেশ শর্মা। কাল বেলা এগারোটায় জাহাজ আসছে। জাহাজ থেকে মাল এসে পৌঁছবে ওর কাছে এই বাড়িতে। ওকে ব্যবস্থা করতে হবে কলকাতা থেকে সেটা মালয়ে পাচার করতে।

পরদিন বেলা একটায় ব্রিজলালের সঙ্গে একজন গোয়ানীজ এসে পৌঁছল রাকেশ শর্মার কাছে। তার কাছে দুটো প্রাচীন মূর্তি। ওই মূর্তির মধ্যেই রাখা আছে 'হেরোইন'।

গোয়ানীজ লোকটার নাম গঞ্জালেস। সে রাকেশের হাতে মূর্তি দুটো তুলে দিল ব্রিজলালের ইঙ্গিতে।

কিছুক্ষণ পরে ব্রিজলালের সঙ্গেই চলে গেল গঞ্জালেস। এরপরেই তৈরি হতে লাগল রাকেশ। ওকে কলকাতায় রওনা হতে হবে আগামীকাল।

সারারাত ভেবে নিজের কর্মপন্থা ঠিক করে নিল রাকেশ শর্মা। কলকাতায় পৌঁছে মূর্তি দুটো এক ব্যবসায়ী হনুমান আগরওয়ালার হাতে তুলে দিতে হবে ওকে। সে জাহাজে মালয় রওনা হবে। শুল্ক বিভাগকে ফাঁকি দেবার দায়িত্ব রাকেশের।

মনে মনে হাসল রাকেশ। এ কাজ আদৌ কঠিন হবে না ওর অভিজ্ঞতায় সে এটা দেখেছে। ও শুধু ভাবছিল হীরালালজির কথাটাই। লোকটা যে দারুণ সব খবর রাখে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই—ওকে তো ঠিক বের করে এনেছে।

পরদিন মাল নিয়ে যথারীতি রওনা হ'ল রাকেশ শর্মা। ওর জন্য টিকিটের ব্যবস্থা আগেই করা ছিল।

ট্রেনে উঠতেই রাকেশ লক্ষ্য করল একজন শিখ ওর পাশের কামরায় উঠেছে। লোকটা ওকে যে অনুসরণ করছে ভেবেই হাসি পেল রাকেশের। হীরালালজি কোনো সুযোগ নিতে চায় না দেখা যাচ্ছে।

কলকাতায় পৌঁছে হিসেব মতো কাজ শেষ করতে একটুও বেগ পেতে হ'ল না রাকেশ শর্মাকে। মূর্তি দুটো ও সেই ব্যবসায়ী হনুমান আগরওয়ালার হাতে যথারীতি জাহাজেই পৌঁছে দিল। কিভাবে সেটা রাকেশের কৌশল।

কলকাতায় আরও দুটো দিন, কাজ শেষ হলে, কাটালো রাকেশ। ও লক্ষ্য করে বুঝল এখন আর কেউ ওকে অনুসরণ করছে না।

শেষ পর্যন্ত আবার বোম্বে শহরে ফিরল রাকেশ। হীরালালজি ওর হাতে পাঁচ হাজার টাকা নোটও তুলে দিল।

এদিকে সারা ভারতে সব রাজ্যের পুলিশই অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠল। চোরাচালান সাংঘাতিক রকম বেড়ে উঠেছে, কিছুতেই আসল চক্রের হদিশ মিলছে না। প্রচুর হেরোইন, হ্যাসহিস আর কোকেন ঢুকছে চোরাপথে। গোয়েন্দা দপ্তর হন্যে হয়ে ঘুরছে। ইন্টারপোলও সতর্ক। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তবে আসল ঘাঁটি যে বোম্বে শহরে এতে কোনোই সন্দেহ ছিল না।

ভালই সময় কাটছিল রাকেশ শর্মার। সে ইতিমধ্যে হীরালালজির একজন বিশ্বস্ত অনুচরেই পরিণত হয়েছিল। ইতিমধ্যে একমাস অতিক্রান্ত। রাকেশ শর্মার হাত দিয়ে তিন চারটে বড় কাজও হয়ে গেছে।

সেদিন হীরালালজি আর একটা জরুরী কাজের জন্যই বোধহয় রাকেশ শর্মাকে ডেকে পাঠাল।

রাকেশ জানাল এক ঘণ্টার মধ্যেই সে আসছে।

কথা রাখতেই এক ঘণ্টার মাথায় রাকেশ পৌঁছে গেল হীরালালজির মালাবার হিলসের বাড়িতে। সময় সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা।

কলিং বেল টিপতেই দরজা খুলল মুকুল।

রাকেশ সোজা উপরে উঠে হীরালালজির ঘরে ঢুকল।

ঘরে হীরালালজি ছাড়াও আরও চারজন ছিল—ব্রিজলাল, মুকুল, গঞ্জালেস আর একজন নতুন লোক।

রাকেশ ঘরে ঢুকতেই হীরালালজি বলল, 'দাঁড়াও, রাকেশ।' রাকেশ থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই ব্রিজলাল আর গঞ্জালেস দ্রুত দুটো পিস্তল তুলল।

'রাকেশ শর্মা! তুমি বিশ্বাসঘাতক,' হীরালালজি বলে উঠল। 'তোমাকে গুলি করে মারা হবে। তোমাকে বিশ্বাস করে সব কথা জানিয়েছি। গত সাতদিনে আমার বহু মাল পুলিশ আটক করে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। আমরা জেনেছি তুমিই এজন্য দায়ী। তোমার কিছু বলার আছে?'

'আছে। প্রথমতঃ কে রাকেশ শর্মা জানতে পারি কি?

'তার মানে?'

'মানে হ'ল এই, আমিই মোটেই রাকেশ শর্মা নই। অতএব আমি অপরাধীও নই,' রাকেশ জবাব দিল।

'তাহলে তুমি কে?' হীরালাল গর্জে উঠল।

'অধমের নাম প্রশান্ত লাহিড়ী। কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর।'

'তাহলে রাকেশ শর্মা কোথায়?'

'যথারীতি জেলে পচছে। তার জায়গা আমিই নিয়েছি, আপনাদের গোটা দলটাকে পাকড়াও করব বলে। আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে আপনার যত কথাবার্তা হয়েছে তার সবই টেপে ধরা আছে। অতএব এবার আর আপনার রেহাই নেই, হীরালালজি,' রাকেশ শর্মা ওরফে প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন।

'মূর্খ! হীরালালকে অত সহজে ফাঁসানো যায় না,' গর্জে উঠল আবার হীরালালজি।

'যায় না নাকি? এ বাড়ি পুলিশ ঘিরে রেখেছে, হীরালালজি, বাইরে একবার তাকিয়ে দেখুন। পালাবার আর কোনো পথই নেই।'

ব্রিজলাল দ্রুত জানালার কাছে গিয়ে উঁকি মেরেই বলে উঠল, 'পুলিশ!'

'শয়তান, তবে মর,' গঞ্জালেস পিস্তল তুলতে যেতেই প্রচণ্ড গুলির শব্দে ওর হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে গেল আর সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর ট্যান্ডন তাঁর দলবলসহ।

'ধন্যবাদ, মিঃ লাহিড়ী,' ইন্সপেক্টর ট্যান্ডন বললেন।' আপনি দারুণ ঝুঁকি নিয়ে এ কাজ করেছেন। আমাদের পুলিশবাহিনী তার জন্য কৃতজ্ঞ।'

'একাজ করে দারুণ আনন্দ আমিও পেয়েছি, ইন্সপেক্টর। এ সুযোগ দেবার জন্য আপনাদেরও ধন্যবাদ,' প্রশান্ত লাহিড়ী বললেন।

# লাভার্স লেনে অন্ধকার

## ভাস্কর রাহা

সুমন চমকে উঠলো। টেলিফোনটা আবার বেজে উঠেছে। সুমনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠলো, রক্ত চলাচল দ্রুত হলো। কাঁপা কাঁপা হাতে টেলিফোনটা তুললো সে ক্রেডেল থেকে। জিব দিয়ে ঠোঁট দু'টোকে চেটে নিয়ে শুকনো গলায় উচ্চারণ করলো, "হ্যালো!"

চুপচাপ। কোন সাড়াশব্দ নেই কিছুক্ষণ। তারপর প্রান্তে ভেসে উঠলো সেই অতি পরিচিত অথচ ছদ্মবেশ-জড়ানো কণ্ঠস্বর; নিশ্চয়ই তার কোন ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী কিন্তু অজ্ঞাত পরিচয়।

সুমন, তোমার স্ত্রী সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করেছিল কাল রাতে। অবশ্য তার তেমন দোষ নেই, ঐ লোকটার স্বাভাবই হচ্ছে পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করে বেড়ানো।

আপনি কে কথা বলছেন? সুমন জিগ্যেস করলো।

তোমার একজন প্রতিবেশী। বক্তার গলায় চাপা হাসি।

কিন্তু আমি তো চিনতে পারছি না।

তার কি কোনো প্রয়োজন আছে? ভালো কথা তোমার স্ত্রীর প্রেমিক পুরুষটিও তোমার প্রতিবেশী।

কে সে?

তুমি তাকে তোমার একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলেই জানো।

আপনি এত সব জানলেন কেমন করে?

কারণ, আমার মাথার ওপর দুটো চোখ আছে, যা সব দেখতে পায়। আমি জানি, প্রতি শনিবার তুমি অনেক রাত করে বাড়ী ফেরো। তোমার তথা কথিত বন্ধুটিরও এ তথ্য অজানা নয়। তাই সেই সুযোগে সে তোমার বাড়ীতে এসে তোমার স্ত্রীকে সঙ্গদান করে যায়।

সুমন প্রাণপণ শক্তিতে টেলিফোনটা চেপে ধরে দু'হাতের মুঠোর। মিথ্যে, সব মিথ্যে কুৎসা রটনা। সুমন এর এক বিন্দুও বিশ্বাস করে না। দেখুন আপনি আমাকে এ সব কথা বলছেন কেন?

কারণ, আমিও তো তোমার একজন বন্ধু।

সত্যিই যদি তাই হতেন, তাহলে নিজের পরিচয়টা গোপন করতেন না কখনো।

তাতে তোমার কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হতো না। তাছাড়া বিশেষ কারণে নিজেকে আমি জড়াতে চাইছি না এ ব্যাপারে। তোমাকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি, এটাই তো যথেষ্ট। আসলে

সত্যের মুখোমুখি হতে তুমি ভয় পাচ্ছো। কিন্তু কতদিন আর চোখ বন্ধ করে থাকতে পারবে?

সুমন কোনো জবাব দিল না। আস্তে আস্ত ফোনটা নামিয়ে রাখলো সে । শুন্য চোখে জানালা দিয়ে তাকালো বাইরের দিকে। রাস্তার দুধারে সারি সারি বাড়ী তার সজ্জন প্রতিবেশীদের বাসগৃহ। এরই একটির মধ্যে রয়েছে তার অবাঞ্ছিত শুভানুধ্যায়ী এক বন্ধু, আর অন্য একটিতে একজন প্রেমিক যে...

শনিবার। অফিস ছুটির পর সুমন সোজা ফিরে এলো তাদের পাড়াতে। নিজের বাড়ীর ঠিক উল্টো দিকে ফুটপাথ ঘেঁসে গাড়ী থামিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো সে। আজ যেমন করেই হোক তার স্ত্রীর প্রেমিকের পরিচয় আবিষ্কার করতে চায় সে। তার চেতনা যেন অসাড় হয়ে গেছে রক্ত চলাচল যেন বন্ধ। সিগারেট ধরাতেও ভুলে গেছে সে। শুধু দুচোখ মেলে তাকিয়ে আছে তার বাড়ীর দিকে। এক একটি মিনিট যেন অন্তহীন কাল। হঠাৎ তড়িতাহতের মতো চমকে উঠলো সুমন। সোজা হয়ে বসলো সে। ঠিক তার বাড়ী থেকেই বেরিয়ে আসছে একটা পুরুষ মূর্তি। ধীর মন্থর গতি তার। রাস্তা পেরিয়ে কাছাকাছি আসতেই তাকে চিনতে পারলো সুমন।

শঙ্কর! সুমন নীচু গলায় ডাকলো।

লোকটি থমকে দাড়ালো। সামনের দিকে তাকাতেই সুমনকে দেখতে পেলো সে। কিছুটা ইতঃস্তত করে কাছে এগিয়ে এলো।

আরে সুমন, তুমি! এখানে বসে আছো কেন?

গাড়ীতে ওঠো, কথা আছে। সুমন প্রায় আদেশের সুরে বললো।

কী ব্যাপার বলতো? শঙ্করের কথা আটকে যায়। ততক্ষণে সুমনের হাতের রিভালবারটা তার চোখে পড়েছে।

কিছু না, সুমন গাড়ীর দরজা খুলে ধরে, গাড়ীতে উঠে পড়ো। না, না ওখানে নয় হুইলের সামনে। হ্যাঁ এবার চালাও।

কোথায়?

জানিনা। সামনের দিকে চলো। নিঃশব্দে গাড়ীটা ছুটে চলে। কারো মুখেই কোনো কথা নেই। সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড পেরিয়ে গাড়ীটা ততক্ষণে রেডরোড ধরে এগোচ্ছে। গলফ ক্লাবের সামনে আসতেই থামতে বললো সুমন।

এখানে আমরা নামবো।

কেন? শঙ্করের কণ্ঠে ভয়ের আভাষ।

প্রশ্ন করোনা, যা বলছি তাই করো। সুমন ধমকে ওঠে।

অগত্যা দুজনেই গাড়ী থেকে নেমে হাঁটতে থাকে। সামনেই লাভার্স লেন। প্রেমিক প্রেমিকার নিভৃত মিলনের মধুকুঞ্জ। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় এসে থামলো তারা। আকাশে চাঁদ নেই। জমাট অন্ধকার ঘিরে আছে চারিদিকে। যেন এক অন্তহীন অন্ধকার সমুদ্রে ডুবে আছে তারা। শঙ্কর কী যেন একটা বলার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার মুখ থেকে কোনো শব্দ বেরোবার অগেই সুমনের হাতের রিভলবার গর্জে উঠলো।

সুমন যখন বাড়ীতে ফিরলো তখন এগারোটা বাজতে মিনিট কয়েকমাত্র বাকী। দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়লো তার স্ত্রী সুলেখা আর শঙ্করের স্ত্রী শোভনা কফির টেবিলে বসে আছে। দু'জনের সামনেই কফির পেয়ালা।

আরে আজ এত সকাল সকাল ফিরলেন যে, ব্যাপার কী? শোভনা তাকে ঠাট্টা করে।

সুমন কিছুই বুঝতে পারে না। বোকার মতো চেয়ে থাকে তাদের দিকে।

সুলেখা বলে ওঠে, শঙ্কর বাবু অনেকক্ষণ হলো বাইরে গেছেন হিংয়ের কচুরী কিনতে। এখনো ফিরছেন না কেন বুঝতে পারছি না। তুমি একটু দেখবে?

বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামে সুমন।

সে খুনী। ভুল করে সে নির্দোষ এক বন্ধুকে খুন করেছে। কিন্তু এখন কি করবে সে। পুলিশে খবর দেবে? না, এতখানি সৎ সাহস তার নেই। তারাই তদন্ত করে তাকে দোষী সাব্যস্ত করুক। সে নিজের মুখে কিছু প্রকাশ করবে না কোনোদিন না। এবং যতদিন পর্য্যন্ত সে মুখ না খুলছে, তার কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই। সে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

টেলিফোনটাকে সামনে নিয়ে বসে আছে সুমন। কখন টেলিফোনটা বেজে উঠবে এই আশায়। শুনতে পাবে সেই অজ্ঞাত পরিচয় বন্ধুর কণ্ঠস্বর কিন্তু না টেলিফোনটা আজ আর বাজছে না। কোনোদিনই আর তার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে না। সুমন জানে না, সেই কণ্ঠস্বর চিরদিনের জন্য মুক হয়ে গেছে। তার শরীর এতক্ষণে লাভার্স লেনের অন্ধকারে কাঠের মতো শক্ত আর হিমের মতো ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে আছে এক কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়।

# অনুসন্ধান

## অরুণচন্দ্র ভট্টাচার্য

কর্ণপুর। রাজস্থানের ছোট ছোট নানা দেশীয় রাজ্যের ভীড়ে এই ছোট রাজ্যটি ইংরেজ আমলেই কেমন অচেনা অচেনা মনে হ'ত। ভারতভুক্তির পরে এই রাজ্য আরও লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যায়। রাজস্থানের মানচিত্রে এখন আর একে আলাদা করে চেনা যাবে না। অথচ কর্ণপুর জায়গাটির অবস্থান খুব গোলমেলে নয়। এর কাছে পিঠেই বিকানীর, একটু দূরে জয়পুর আর মাত্র একশ মাইল দূরেই বালিময়, ধুলিময় রাজস্থানের মরুভূমির সীমানা। এই মরুভূমি যদি অপ্রতিহতভাবে এগিয়ে আসতে পারত, তাহলে কোনো না কোনো একদিন গোটা অঞ্চলটিই গ্রাস করে নেওয়া অসম্ভব না।

কর্ণপুরের ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে যাদের সঠিক ধারণা আছে তাদের মনে এমনি একটা ধারণা না হওয়াই অস্বাভাবিক। কর্ণপুরে সদ্যাগত প্রণবেশ সান্যালকেও এ ভাবনাটি পেয়ে বসেছিল। কোনো একটি কথার পিঠে উনি মহারাজকুমার রজতদেওকেও এ আশঙ্কার কথা বলে ফেলেন।

অথচ মহারাজকুমার ব্যাপারটিকে হেসেই উড়িয়ে দিতে চাইলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, মশাই প্রণবেশবাবু, আপনার যত আজগুবি ভাবনা। গোটা দেশটাই মরুভূমি হয়ে যাবে, সরকারী কর্তাবা আছেন কি কবতে।

ওঁর আবার সরকারের উপর একটু বেশি আস্থা। প্রিভি পার্স বিলুপ নিয়ে অন্য রাজা মহারাজাদেব মতো ওর তেমন অসন্তুষ্টিও হচ্ছে। উনি এ প্রসঙ্গ উঠলে সোজাসুজিই বলেন, রাজ্যই যখন গেছে, ও কটাকে খোরপোষ দিয়েই বা কি হবে?

তবু প্রণবেশবাবু হাল ছাড়েন না। এ্যাফরেস্টেশন, ডিপরেস্টেশন ইত্যাদি টেকনিক্যাল টার্মগুলি উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে জিওলজিস্টদের আশঙ্কা আর একটু বিশদভাবে বর্ণনা কবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু মহারাজকুমার একটুও বিচলিত না হয়ে বলেন, আরে রাখুন মশাই বৈজ্ঞানিকদের অমন লম্বা চওড়া কথাবার্তা। অমন প্রলয়ঙ্করী শতদ্রু নদীই ভিজে বেড়াল হযে গেল, আর প্রণবেশ উৎসুক দৃষ্টির দিকে তাকিযে তিনি বলেন আরে মশাই, সেই ভাকরা নাঙাল।

প্রণবেশবাবুর মনে পড়ে ভাকরা নাঙালের বাঁধ গড়ে ওঠার আগের কথা। সিন্ধুর শাখাগুলি শতদ্রুর জলোচ্ছ্বাসে দেখা দিত একদিকে বন্যা আর এক দিকে মরুভূমির রুক্ষতা।

ভাকবা নাঙাল বাঁধের কল্যাণে পূর্ব পাঞ্জাব আর হরিয়ানা আজ সুজলা সুফলা, ভারতের সমৃদ্ধতম প্রদেশগুলির অন্যতম।

ভাকরা নাঙালের কথা ভাবতে ভাবতে প্রণবেশ একটু অন্যমনস্ক হয়ে যান।

হঠাৎ মহারাজকুমারের কথায় ওঁর অন্যমনস্কতা কেটে যায়। মহারাজকুমার জিজ্ঞাসা করেন, কেমন লাগছে আমাদের জায়গা?

প্রণবেশ হাসতে হাসতে বলেন, শুধু ভাল বললে কমিয়ে বলা হবে। নাটক করব না বলেও না বলে পারছি না মনে হচ্ছে এক ছবির দেশে এসে গেছি। যেমন সাজানো গোছানো পাহাড় নদী বন, তেমনই সুচারু সুশোভন শহব।

তারপর যদি বলি মানুষের বলা আর চলায়ও নয়নাভিরাম শোভাব বিস্তাব। কিন্তু—

মহারাজকুমার একটু প্রাণখোলা হাসি হেসে বলেন, বাঙালী আছে কি না জিজ্ঞাসা করছেন তো?

প্রণবেশ মহারাজকুমারের চোখের দিকে তাকিয়ে বলেন না, বাঙালী বলে কারুর সঙ্গে বেশি আত্মীয়তা করা আমার স্বভাব না। আমি মানুষকে মানুষ হিসেবেই ভালবাসতে উৎসুক। বলতে চাইছিলাম, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? অতদূর কলকাতায় বসে আপনার চিঠি পেয়ে আমি তো অবাক! হাজার হলেও দেশ দেখে বেড়াতে নেহাৎ মন্দ লাগে না, তাই চলেই এলাম। এক আধবার যে মনে হয় নি ঝুঁকি নিচ্ছি, তা নয়। তবে আপনাদের রাজ্য সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু পড়েছি। আপনাব নামও অজানা নয়, সাগর ইউনিভার্সিটি থেকে রেকর্ড মার্কস পেয়ে আপনিই তো গতবাব সেসিমওলজীতে এম. এ. পাশ করেছেন। আপনি দুই এক মাসের মধ্যে আমেরিকা যাচ্ছেন, এমন খবরও তো দেখেছিলাম।

মহারাজকুমার প্রশংসার হাসি হেসে বলেন, সাধে কি আপনার এত নাম? আমাব মতো নগন্য লোকেবও এত খবর আপনার জানা।

প্রণবেশ বলেন, আসলে ব্যাপার কি জানেন, খবরের কাগজে বেরুনো খবরগুলো একটু ভাল করে পড়াই আমার অভ্যাস। তাই তা—

মহারাজকুমার হাসতে হাসতে বলেন, আপনার তাড়া বয়েছে বুঝেছি। ব্যাপারটা একটু ডেলিকেট, আমার বাবা গত মাসে মারা যান।

মৃত্যু নিয়ে আমাদের কিছুটা সন্দেহ থেকে গেছে। পুলিশের কাছে ভরসা করে যাই নি, খবর ছড়িয়ে পড়বে। এতে পরিবারের উপর দুর্নাম আসতে পারে। এই ভেবে কাছে পিঠের আজেবাজে লোককেও ডাকতে সাহস হ'ল না। আর ব্যাপারটি যখন সন্দেহমাত্র।

আপনার কি ধারণা মহারাজা অর্থাৎ আপনার বাবা মার্ডারড হয়েছেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মহারাজকুমার বলেন না তেমন কিছু না। তবে আমাদের অবশ্য বলার চেয়ে আমার মায়ের বলাই ভাল, অনুমান বাবা আত্মহত্যা করেছেন।

ঘটনার আগের দিন মায়ের সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া হয়, তারপবই বাবা মারা যান। তাই মা বলেছেন বাবা আত্মহত্যা করেছেন।

পোস্টমর্টেম করা হয় নি। পারিবারিক চিকিৎক বলেছেন, এ্যাপারেন্টলী সব কিছুই নর্মাল এ সিম্পল কেস অব হার্ট ফেলিওর। আমরা অবশ্য তাঁকে পুরোপুরি আমাদের মনোভাব বুঝতে দিই নি।

প্রণবেশ বলেন, ঘটনার দিন কি আপনার বাবা কোথাও গিয়েছিলেন?

না তবে আমাদের পাতাল প্রকোষ্ঠে কিছুটা সময় কাটিয়েছিলেন। হ্যাঁ আপনাকে পাতাল

প্রকোষ্ঠ নিয়ে কিছু বলি নি বুঝি? আগেকার রাজারা আত্মরক্ষার জন্য প্রাসাদের নীচেও কিছু গুপ্তকক্ষ নির্মাণ করতেন। গুরুত্ব বুঝে সেখানে আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষা করতেন। কোনো কোনো রাজা আবার এগুলোকে মুর্শিদকুলী খাঁর বৈকুণ্ঠ কিংবা ফরাসী রাজ্যের ব্যাষ্টিল দুর্গের ক্ষুদ্র সংস্করণ হিসাবে ব্যবহার করতেন। অগনিত বন্দী বিনা বিচারে, কিংবা নামমাত্র বিচারে সেই শাস্তিময় শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করত। আমাদের এই গুপ্ত প্রাসাদ অবশ্য এমনভাবে ব্যবহার হয়েছে শুনি নি।

প্রণবেশ বলেন, মহারাণীমা'র সঙ্গে একটু দেখা করা দরকার।

প্রাসাদে গিয়ে সামান্য (অবশ্য সেই সামান্যেই প্রণবেশ সান্যাল অস্থির) জলযোগের পর প্রণবেশ মহারাণীমা'র কাছে উপস্থিত হলেন।

রাণীমা'র বয়স ষাট ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু এখনও শরীরের কোথাও ভাঁজ পড়েনি।

প্রণবেশের উৎসুক মুখেব দিকে তাকিয়ে বললেন, বল বাবা, কি বলবে, তুমি তো আমার ঘরের পাশের লোক। তারপর হেসে বলেন আমি দ্বার ভাঙার মহারাজার মেয়ে।

প্রণবেশের মনে পড়ল, বাঙলা, বিহার তো একে অন্যের প্রতিবেশীই। প্রণবেশ আস্তে করে বলে আচ্ছা মা, মহারাজা মারা যাওয়ার আগের দিন আপনাদের কি নিয়ে কথা হয়েছিল?

মহারাণী হাসতে হাসতে বলেন, সামান্য কথা বাবা, আমি বাপের বাড়ি নিয়ে একটু গর্ব করতেই উনি ক্ষেপে যান। হাজার হলেও মেয়েমানুষের মন বাপের বাড়ির দিকে কিছুটা টান না থেকে পারে না।

আমি বলেছিলাম আমার বাপ-পিতামহের আয় কম হলেও তোমার পূর্বপুরুষদের মতো এমন অত্যাচার করেন নি।

উনি ক্ষেপে গিয়ে বললেন, কি করে জানলে? বলেছিলাম তোমাদের রাজবংশের ইতিহাস ভাল করে পড়ে দেখ তাঁরা কি করে এত বড হলেন! তাতেই উনি রেগে বলেন, তুমি মহারাণী হয়ে আমায় সেই সঙ্গে আমার পূর্বপুরুষদের অপমান করলে?

তারপরই উনি মারা যান।

প্রাণবেশ এবার মহারাজকুমারকে বলেন, চলুন, আপনাদের নীচের প্রকোষ্টে যাওয়া যাক।

উনি যেতে যেতে বলেন, আমরা বড় এখানে আসি না।

তিন চাবখানা ঘর। পাশে একটা উঠোন, উঠোন কংক্রিট করা। উঠোনের মধ্যে নীচে নেমে একটা গোলাকৃতি পাইপ। এর বেড় দুই আড়াই হাতের মতো।

প্রণবেশ জিজ্ঞাস করল, এটা কি?

মহারাজকুমার বলেন, এককালে এই সুড়ঙ্গ দিয়ে নিরাপদে ত্রিস্রোতা নদীতে নেমে পড়া যেত। এটার ভেতরে সিড়ি দিয়ে নীচে নামে হ'ত, তারপর পায়ে চলা পথ দিয়ে ত্রিস্রোতা নদীর পাড়ে পৌঁছোতে কোনো অসুবিধা হ'ত না। এখন সব ভেঙে গেছে সে পথও বন্ধ হয়ে গেছে।

তাই এটার মুখ বন্ধ কবে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটার মুখ খুলল কি করে?

প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করল, মুখ হালে খোলা হয়েছে নাকি?

তাই তো দেখছি।

প্রণবেশ নিচু হয়ে ওঁর বাইনোকুলার দিয়ে কি যেন দেখল। তারপর বললো, চলুন আপনার বাবার লাইব্রেরীতে যাওয়া যাক।

লাইব্রেরীতে নানা ধরনের বইয়ের সমারোহ।

প্রণবেশ বলল আমি আপনাদের কিছু পুরোনো দলিল ঘেঁটে দেখছি।

মহারাজকুমার বললেন দেখুন।

কিছুক্ষণ পরে প্রণবেশ বলল, মহারাজকুমার, আপনার বাবা হার্টের রুগী ছিলেন?

কেন বলুন তো?

উনি বোধহয় হার্ট ডিজিজে মারা গেছেন।

কি করে বুঝলেন?

এই কাগজটা দেখুন। একটা বই থেকে প্রণবেশ কাগজটা বের করে দেয়।

মহারাণী কাঞ্চনের কথাই ঠিক। আপনার পূর্বপুরুষেরা অনেক নরহত্যা করেছেন।

গুপ্তকক্ষের চিমনীর পাইপের মধ্যে দিয়ে মৃত দেহগুলি ফেলে দেওয়া হ'ত। চিমনীর ঢাকনা খুলে দেখলাম সেখানে গাদা গাদা কঙ্কাল। কত ত্রিস্রোতা ভাসিয়ে নিয়ে গেছে, তবু এত? পূর্বপুরুষের এ কলঙ্কের চিহ্ন রাখা চলবে না। সব কঙ্কাল ভাসিয়ে দিতে হবে নদীতে। এই দলিল পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ওঃ কি সাংঘাতিক বংশে আমি জন্মেছি, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা, তবু পূর্বপুরুষের কলঙ্কের চিহ্ন মুছে ফেলাই হবে আমার কাজ।

চিঠিটা পড়তে পড়তে মহারাজকুমার প্রণবেশের মুখের দিকে তাকাল।

প্রণবেশ ধীর গম্ভীর গলায় বলে, ঘরের মেঝেতে পোড়া কাগজ তো পেয়েছিলেন সেগুলো এই সব দলিলের ধ্বংসাবশেষ। আগেই উত্তেজিত হয়েছিলেন। এই দলিলগুলি পুড়িয়ে উনি আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। আর তখনই হার্ট অ্যাটাক হয়, তারপরই উনি মারা যান।

তবে ওঁকে যখন ফিরে পাবেন না, মহারাণীমাকে এসব কথা নাই বা বললেন। উনি স্বাভাবিক ভাবে মারা গেছেন, মহারাণীমা এটুকুই জানুন। আর আপনার সেটাও বোধহয় পাচ্ছেন না। আমি খুব ভুল না করলে পাইপটা সোনার সঙ্গে কোনো একটা এ্যালয় মিশিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। যে কারণেই হোক, এই পাইপ তৈরী করতে গিয়ে খুব সম্ভব সোনার ভেতরকার প্রোটন নিউট্রনের কোনো একটা বিচ্যুতি ঘটে আর তখনই গোটা ধাতু তার স্বাভাবিক ধর্ম হারায়, অর্থাৎ সোনা আর সোনা থাকে না, অল্প মূল্যের কোনো বস্তুতে পরিণত হয়। আমি সংস্কৃত ভাষা ভাল বুঝি না, তবু মনে হয় এতেই আমার এই যুক্তির স্বপক্ষে কিছু বক্তব্য পাবেন। প্রণবেশ একটা পুরোনো দলিল বের করে দেয়। মহারাজকুমার দলিলের দিকে একটু চোখ বুলিয়ে বলেন, অদ্ভুত আপনার অনুমান।

এখানে অনেক কিছুর সঙ্গে একটা স্পষ্ট লেখা আছে, কারিগরের দোষ নেই, ও মানা করেছিল। সুড়ঙ্গ করতে গিয়ে গোটা সোনাই নষ্ট করে ফেললাম। আমার বংশধরেরা হয়তো খুনী হবে না। না হোক, তাদের জন্য তো রাজ্যই রেখে গেলাম, মহারাজকুমার শেষ করেন।

প্রণবেশ বলল, আমি কিন্তু আজকেই যাচ্ছি।

মহারাজকুমার হেসে বললেন, কাজের মানুষকে আটকে রাখছি না। সামান্য এই, উনি একটা চেক বাড়িয়ে দেন।

# চক্রান্ত

## নির্মলেন্দু গৌতম

নিউজটা নিজের হাতে লিখতে গিয়ে ভারি অস্বস্তিবোধ করলো অমল। অথচ লিখতেই হলো।

গতকাল শুভঙ্কর মিত্র খুন হয়েছে। খুন হয়েছে নিজের ঘরের মধ্যেই। হাতুড়ি জাতীয় কিছু একটা দিয়ে মাথায় আঘাত ক'রে খুন করা হয়েছে। আর সন্দেহ করে পুলিশ অ্যারেষ্ট করেছে দীপায়নকে।

কলেজে পড়বার সময় শুভঙ্কর মোটামুটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল অমলের, শুধু অমলের নয়, আরো অনেকের সঙ্গেই ঘনিষ্টতা ছিল শুভঙ্করের। দীপায়নের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ছিল।

কলেজে অসম্ভব সহজ অথচ দুবন্ত ছিল দীপায়ন। দীপায়ন যে কখনও খুন করতে পারে একথা এখনও ভাবতেই পারছে না অমল।

শুভঙ্কর তার ব্যক্তিগত কিছু কিছু ব্যাপারে অসম্ভব সতর্ক ছিল। শক্ত একটা দেয়াল তুলে রাখতো তার সেই ব্যক্তিগত ব্যাপার গুলোয়। কলেজের কাছাকাছি একটা মেসে থাকতো—থাকতো মানে ঘুমোতো, রাত বারোটার আগে সেখানে যেত না। সকাল ন'টার মধ্যেই আবার বেরিয়ে পড়তো সেখান থেকে।

অথচ মেসের সবার সঙ্গে শুভঙ্করের রীতিমতো গাঢ় ঘনিষ্ঠতা ছিল। দু' একদিন গিয়ে ব্যাপারটা অনুভবও করেছে অমল। না হ'লে প্রত্যেক দিন রাত বারোটায় মেসে ঢোকা সম্ভব হতো না শুভঙ্করের।

দীর্ঘ, স্বাস্থ্যবান এবং উজ্জ্বল চেহারা ছিল শুভঙ্করের। চোখে থাকতো মোটা ফ্রেমের চশমা। পাজামা পাঞ্জাবীটাই বেশী পরতো শুভঙ্কর। মানাতোও শুভঙ্করকে।

কোনো ছুটিতেই বাড়ি যাবার নাম করতো না শুভঙ্কর।

'বাড়ি যাবি না?' হঠাৎ করে হয়তো জিজ্ঞেস করতো কেউ।

শুভঙ্কর বলতো, 'বাড়ি মানেই নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয় তো? মেসই আমার সেই নিশ্চিন্ত আশ্রয়।'

'ক্ষেপেছিস, মেস মানেই সাতভূতের আড্ডা খানা। সেটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় হতে পারে না কারো।

'পৃথিবীতে সবাই ভূত।' অবলীলায় বলেই প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলতো শুভঙ্কর।

এমনি করেই বাড়ি, মা, বাবা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো একটা রহস্যের আবরণে ঢেকে রাখতো। সেটা ওর সুখ না দুঃখ অমলদের বোঝা দুঃসাধ্য ছিল।

তবে থার্ড ইয়ার থেকে শুভঙ্করের বান্ধবীদের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। তখন শুভঙ্করের সময় ফুরোতো বান্ধবীদের পেছনেই। তবে সে সব ব্যাপারে ও যেন অধৈর্য, অসহিষ্ণু ছিল খুব। বানিয়ে বানিয়ে গল্প অথবা উদাসভাবে কোনো বান্ধবীর সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ছায়াচ্ছন্ন প্রাঙ্গণে অথবা ময়দানের সন্ধ্যার নির্জনতায় সময় কাটাবার ব্যাপারে শুভঙ্করের কোনো আগ্রহ ছিল না।

মেয়েরা বোধহয় ওর অসহিষ্ণু এবং অধৈর্য ভাবটাকেই পছন্দ করতো। অন্ততঃ অমলদের মনে হতো সেকথা।

শুভঙ্কর অমলদের সঙ্গেই বি. এ. পাশ করেছিল। তারপরই ছেড়ে দিয়েছিল সেই মেস। কিছু একটা কাজ যোগাড় ক'রে ছোট খাটো একটা বাড়ি ভাড়া করে ফেলেছিল স্কুল রো তে।

একদিন বাসে দেখা হতে জোর করেই বাস থেকে নামিয়ে শুভঙ্কর অমলকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। অমল তখন ইউনিভার্সিটিতে জার্নালিজম পড়ছে।

'বেশ বাড়ি পেয়েছিস।' বাড়িতে ঢুকেই বলেছিল অমল।

'সব লাক! না হ'লে যে চাকরীটা পেয়েছি, তার জন্য বড় বড় লোকের রেকমেণ্ডেশন দরকার হয়। আমি বোল্ডলি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

'বিয়ে টিয়ে ক'রে ফেল এবার—এত বান্ধবী তোর!' অমল বলেছিল।

হেসেছিল। বলেছিল, 'বান্ধবী-টান্ধবী আর বেশী নেই। তখন ওটা পড়াশুনোয় মন বসাবার জন্য দরকার হতো।'

এখন একটা মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে। আশ্চর্য মেয়ে। অনেক নাম করা লোকের যাওয়া আসা তার কাছে।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে বলেছিল অমল।

'মেয়েটার মধ্যে দুর্লভ কিছু গুণ আছে। অসম্ভব ভালো গাইতে পারে। দেখতেও অসম্ভব সুন্দর। অজস্র পয়সা রোজগার করে। কিন্তু আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক একেবারে অন্যরকম।' অমলের কথার উত্তর না দিয়ে বললো শুভঙ্কর।

'ওদের বিশ্বাস করা ঠিক নয়।, অমল বলেছিল।

'বিশ্বাস কথাটারই কোনো মানে নেই। একেবারে ফাঁকা শব্দ।'

একটু থেমে বললো, 'সুপ্রিয়া এ বাড়িতে মাঝে মাঝেই আসে। নির্দ্বিধায় আমরা ড্রিংক করি ব'সে ব'সে।,

'তুই ড্রিংক করিস আজকাল?'

'আজকাল কিরে? অনেক দিন থেকেই ড্রিংক করছি। যদি তোর কখনও ইচ্ছে হয় চলে আসবি। সব জিনিসই থাকে এখানে।'

অমল কিছু বলেনি।

শুভঙ্কর সেদিন কফি-টফি খাইয়ে ছেড়েছিল অমলেকে।

আশ্চর্য ছেলে শুভঙ্কর।

কী আশ্চর্যভাবে শুভঙ্কর নিজেকে নিয়ে খেলা ক'রে চলেছে। শুভঙ্কর নিজেও জানে না তার জন্য জয় না পরাজয় অপেক্ষা করছে। অবশ্য তার জন্য শুভঙ্কর ভাবে না। বাড়িতে ফিরতে ফিরতে মনে হয়েছিল অমলের।

এরপর দীর্ঘকাল আর দেখা হয় নি।

এর মধ্যে অমল জার্নালিজম পাশ ক'রে নামকরা একটা কাগজে ঢুকেছে। রহস্য-রোমাঞ্চের উত্তেজনার মাঝেই দ্রুত সময় ফুরোয় অমলের।

হঠাৎ একদিন একটা টেলিফোন পেয়ে মনে পড়েছিল শুভঙ্করকে।

বিয়ে করেছে শুভঙ্কর। সেই বাড়িতেই পার্টি দিচ্ছে একটা। অমলকে যেতেই হবে।

না, সুপ্রিয়াকে বিয়ে করেনি শুভঙ্কর। বান্ধবীকে স্ত্রী হিসেবে পেতেও চায়না। কথাটা টেলিফোনেই বলেছিল শুভঙ্কর।

পার্টিতে অমল গিয়েছিল। কলেজের বন্ধুরা প্রায় সবাই গিয়েছিল পার্টিতে।

অনেক রাত পর্যন্ত হৈ হৈ হয়েছিল সেদিন। তারপরই প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ঠিকানা টুকে নিয়েছিল। কথা হয়েছিল, সবাই সবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।

এখনও সে সব ঠিকানা লেখা আছে অমলের পুরোনো ডায়েরীতে।

দীপায়নের ঠিকানাটাও সেই ডাইরিতে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। অমল কখনও তার পুরোনো ডায়েরী নষ্ট করে না।

বিয়ের পুর শুভঙ্করের সঙ্গে দু'তিনবার দেখা হয়েছিল। মাতালের ছাপ পড়েছিল ওর চোখেমুখে। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল খানিকটা।

স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, 'বিয়ে মানে একটা ক্লান্তিকর ব্যাপার। দিব্যি ছিলাম।

অমল বলেছিল, 'তুই ক্লান্ত হতে পারিস, একথা ভাবিইনি।'

'আমি নিজেই ভাবিনি।' বলেছিল শুভঙ্কর।

'তোর সেই বান্ধবী সুপ্রিয়ার খবর কি?'

'ওর জন্যেই তো বেঁচে আছি।' বলেছিল শুভঙ্কর।

ব্যাপারটা নিয়ে আর ভাবেনি অমল। শুধু, সেই মুহূর্তে, শুভঙ্করের জন্য করুণা হয়েছিল। ওর সঙ্গে কলেজের পর আর দেখা না হলেই বুঝি ভালো হতো। দিব্যি গল্প হয়ে থাকতো শুভঙ্কর।

আজ এই মুহূর্তে শুভঙ্করের খুনের সংবাদ লিখতে লিখতে সে কথাই ভাবলো অমল।

কিন্তু দীপায়ন কেন খুন করবে শুভঙ্করকে। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো গোলমাল আছে।

সেদিন দীপায়নকে দেখেও অমলের মনে হয় নি, দীপায়ন একটুও অন্যরকম হয়েছে। ঠিক সেই কলেজের দীপায়নই ছিল সে। তেমনি সহজ এবং দুরন্ত দীপায়ন। শুভঙ্করের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতাটুকু শুধু গাঢ় হয়ে উঠেছিল আরো।

নাঃ, ব্যাপারটা নিয়ে তার মাথা ঘামাতেই হবে।

রিপোর্টটা অনেকবার পড়ে কম্পোজিং সেকশনে পাঠিয়ে দিয়ে উঠে পড়লো অমল। এখুনি একবার দীপায়নের খোঁজ নিতে হবে। দীপায়নের মুখ থেকে ঘটনার অনেকখানিই ঠিক মতো শোনা যাবে। তারপর ভেবেচিন্তে একটা পথ খুঁজে বের করতেই হবে অমলকে।

## চক্রান্ত

যতক্ষণ না দীপায়নের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ততক্ষণ কিছুতেই স্বস্তি নেই অমলের।

নিউজ এডিটর সুনীল চৌধুরীকে বলে অমল একটু ব্যস্ত ভাবেই বেরিয়ে পড়লো অফিস থেকে।

দীপায়ন বাড়িতেই ছিল।

অমলকে দেখে অবাক হয়ে গেল দীপায়ন।

'তুই হঠাৎ!' দীপায়ন বললো অবাক গালায়।

'খুনীর খবর নিতে এলাম।' অমল বললো।

মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল দীপায়নের।

অমল তীক্ষ্ম চোখে দীপায়নের বিবর্ণ মুখখানা দেখলো। তারপর বললো, 'জামিনে ছাড়লো তাহলে?'

মৃদুগলায় দীপায়ন বললো, 'তার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে।'

তুই হঠাৎ ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে গেলি কি করে?' অমল শুধালো সরাসরি।

'ভাগ্যটা খারাপ বলে।'

'ভাগ্য-টাগ্য বুঝি না। সমস্ত ব্যাপারটা আমায় খুলে বল।'

দীপায়ন নিঃশব্দে একটা সিগারেট ধরালো। একমুখ ধোঁয়া উড়িয়ে দিল, ছাদের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বোধ হয় গুছিয়ে নিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা বলে ফেললো।

গত পরশু সন্ধ্যেবেলা শুভঙ্করের কাছে গিয়েছিল দীপায়ন। ইদানীং অসম্ভব মদ খেত শুভঙ্কর। রেসও খেলতো। খানিকটা বীতস্পৃহ হয়েছিল জীবনের প্রতি। বেঁচে থাকাটা যেন একটা অভ্যেস হয়ে উঠেছিল। সে কথা দীপায়নকে বলতো মাঝে মাঝে।

সুপ্রিয়া এলে দীপায়নকে খবর দিত। তখন সহজ হয়ে উঠতো শুভঙ্কর। এবং দীপায়নও চাইতো, সুপ্রিয়ার মতো একজন বান্ধবী থাকুক শুভঙ্করের। অন্ততঃ বেঁচে থাকবার শক্তি শুভঙ্করকে দেবে সে।

শুভঙ্করের স্ত্রী রীতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা নেই দীপায়নের।—আলাপ আছে। শুভঙ্করের জন্য গেলে দু'একটা কথা হতো কেবল।

অবশ্য শুভঙ্করও চাইতো না, দীপায়ন তার স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করুক। কারণ শুভঙ্করও বলতো, রীতাকে বিয়ে করা তার চূড়ান্ত একটা ভুল। রীতাকে দেখলেও যেন দীপায়নের মনে হয় সেকথা। অসম্ভব উগ্র এবং জেদী রীতা। শুভঙ্করকে সে সহ্য করতে পারতো না। . র ব্যবহারে প্রায় সময়ই স্পষ্ট হয়ে উঠতো তা।

শুভঙ্কর মাঝে মাঝেই টাকা ধার নিত দীপায়নের কাছে, হঠাৎ একদিন শোধও করে দিত। কখনও ধারটা রাখতে চাইতো না। অবশ্য দীপায়ন কখনও টাকা ফিরে চাইতো না। শুভঙ্করের জীবনটা দুঃখীর মতো হয়ে উঠেছিল বলে দীপায়ন অসহায়বোধ করতো।

গত পরশু শুভঙ্করই ডেকেছিল তাকে। না, টাকার জন্য নয়, বরং ধার শোধ দেবার জন্য।

শুভঙ্কর তখন মদ খাচ্ছিল।

রীতা তখন কোথায় যেন বেরুচ্ছিল সেজেগুজে। দীপায়নকে দেখে কেবল বলেছিল, 'যান, আপনার মাতাল বন্ধু আপনার জন্য বসে আছে।'

রীতা বোধহয় জানতো দীপায়নের আসবার কথা! অন্তত দীপায়নের সে কথাই মনে হয়।

শুভঙ্কর দীপায়নকে দেখে বলেছিল, 'ঐ যে পেপারওয়েটের তলায় খামটা আছে, ওটা নিয়ে নে। ওতে তোর টাকাগুলো আছে।'

টাকার খামটা তুলে নিয়ে পেপার ওয়েটটা নাড়াতে নাড়াতে দীপায়ন গল্প করেছিল কিছু সময়। তার মধ্যেই হঠাৎ হাত ফসকে পেপাব ওয়েটটা গড়িয়ে টেবিলের এক কোণায় গিয়ে পড়েছিল। দীপায়নের পক্ষে সেটা তুলে আ া অসুবিধের বলে শুভঙ্করই সেটা তুলে আনতে দেয় নি।

দীপায়ন আর বেশী বসে নি। শুভঙ্কর ক্রমশঃ মাতাল হয়ে উঠলো। ফলে ওর কাছে আব ব'সে থাকা সম্ভবপরও ছিল না।

মনটা অসম্ভব খারাপ হয়ে গিয়েছিল দীপায়নের। তাই শুভঙ্করের কাছ থেকে সোজা ফিরে এসেছিল বাড়িতে। বাড়িতে ফিরে আসবার ঘন্টা খানেকের মধ্যে হঠাৎ কলিংবেল বেজে উঠেছিল দরজায়। দীপায়নের ইচ্ছে হচ্ছিল না কারো সঙ্গে কথা বলতে। তবু উঠে এসে দরজা খুলেছিল। আর দরজা খুলেই দেখতে পেয়েছিল রীতাকে।

'ভেতরে আসুন—' দীপায়ান ভেতরে নিয়ে এসেছিল রীতাকে।

'আপনার বন্ধু বোধহয় মদ খেয়ে খুব বাড়াবাড়ি করছিল—' টেবিলের সামনে বসে রীতা বলেছিল।

'শুভঙ্করের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ।,

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা।' খানিকটা অস্বস্তিকর ভাবেই বলেছিল দীপায়ন।

'বাইরে থেকে ঘরটা তালা বন্ধ দেখেই বুঝতে পেরেছি ও মদ খেয়ে বাড়ি বাড়ি করছিল বলে আপনি তালাবন্ধ করে এসেছেন ঘবটা। যাক্‌গে, চাবিটা দিন আমায়।'

'উহুঁ, ও কিছু বাডাবাড়ি করেনি, আমিও তালাবন্ধ করিনি ঘর—'

'তাহলে?'

'তাহলে কি ব্যাপার আমি জানিনা।'

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গিয়েছিল রীতা।

দীপায়নের ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হয় ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও একটা রহস্য আছে, আর সেই রহস্যের মধ্যে অজান্তেই সে জাড়িযে পড়েছে।

ভয়ে শিউরে উঠেছিল দীপায়ন। কিন্তু কি করবে অথবা কি করা উচিত ঠিক তখুনি তা ভেবে উঠতে পারেনি।

ঠিক এক ঘন্টা পর শুভঙ্করের খুনী নিসেবে অ্যারেস্ট হয়েছিল দীপায়ন।

আজ টেবিলেব কোনা থেকে কুড়িয়ে নেওয়া পেপার ওয়েটে দীপায়নের হাতের ছাপ পেয়েছে পুলিশ। এবং পোস্টমর্টেম রিপোর্টে বলা হয়েছে, খুব শক্ত একটা কিছু দিয়ে মাথার বাঁদিকে মারাত্মক একটি আঘাত করাব ফলে মৃত্যু হয়েছে শুভঙ্করের। সুতরাং কেসটা দীপায়নের বিরুদ্ধে সাজানোর অসুবিধে নেই কিছু। তেমন শক্ত কেউ পেছনে না থাকলে জামিনও সম্ভবপর ছিল না কিছুতেই।

দাপায়ন অ্যারেস্ট হবার পর থানায় এসে ক্রোধে, ঘৃণায় পুলিশের সামনেই উন্মত্তের মতো দীপায়নের গায়ে যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল রীতা।

কিছু বলতে পারেনি দীপায়ন। মৃত্যুর মতো যন্ত্রণাময় একটা অসহায়তা তাকে অবশ করে ফেলেছিল।

সব চাইতে দুঃখ জনক কথা; শুভঙ্করের সঙ্গে বসে বসে নাকি সে মদ খেয়েছিল। কারণ দুটো গ্লাস সাজানো ছিল টেবিলে।

এ টুকু বলবার পর দীপায়ন থামলো।

'আচ্ছা, এ ব্যাপারে তোর কাউকে সন্দেহ হয়?'

সন্দেহ করবার মতো কাউকে খুঁজে পাচ্ছিনা—

সুপ্রিয়ার ঠিকানা জানা আছে?

না। পার্ক স্ট্রীটে থাকে, এ টুকু শুধু জানি।

শুভঙ্কর কখনও কোনো শত্রুর কথা বলেছে?

না, সে সব কখনও বলেনি।

আচ্ছা, পুলিশ ঘব থেকে সন্দেহ কিছু পায়নি?

ঐতো বললুম, পেপার ওয়েটটা পেয়েছে। তাছাড়া সঙ্গে নিয়েছে সামান্য রক্ত লাগা টেবিল ক্লথটা। মাথাটা কেবল ক্লথের ওপর নামিয়েছিল মৃত্যুর মুহূর্তে। তখুনি রক্ত লেগেছে টেবিল ক্লথে। তবে হাতের ছাপ পাওয়া যায়নি। সম্ভবতঃ রুমাল দিয়ে ধরে কেউ মদ খেয়েছে শুভঙ্কবেব সঙ্গে।

আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করি, আর কে শুভঙ্করের সঙ্গে মদ খেত?

তা বলতে পারবো না। তবে দু একজন রেসুড়ে বন্ধু মাঝে মাঝে আসতো তা জানি। এবং তারা যে সুখ্যাত নয়, তাও আমার জানা। শুভঙ্কর মাঝে মাঝে তাদের কথা উল্লেখ করতো। তবে স্পষ্ট হতো না সে ব্যাপারে।

রোববার সন্ধ্যায় তোর টাকা দিয়েছে। নিশ্চয়ই শনিবার মাঠে কিছু পেয়েছিল—সে সব নিয়ে গোলমাল হওয়াও বিচিত্র নয়। অমল একটু ভেবে বললো।

দীপায়নের মুখ যেন উজ্জ্বল হলো কিছুটা। কিন্তু পর মুহূর্তেই ম্লান হলো। বললো, তাতে আমার লাভ কি? প্রমাণ সবই তো আমার বিরুদ্ধে।

তবু একবার চেষ্টা করতে দোষ কি?

তাদেব ঠিকানা কে বলবে? নামও তো কারো জানা নেই।

সেটাই খুঁজে দেখতে হবে।

হতাশ গলায় দীপায়ন বললো, মনে হয় খুঁজেও লাভ নেই কিছু।

তবে দ্বিতীয় গ্লাসটাতে কে মদ খেয়েছিল শুভঙ্করের সঙ্গে একটু খুঁজে বের করবার চেষ্টা তুইও করবি। যদি তাকে পাওয়া যায়, সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়তো করা যাবে।

বলে উঠে পড়লো অমল। বললো, এর মধ্যে কিছু ঘটলে আমায় একটা টেলিফোন করে দিবি। তবে আগামীকাল কাগজে রিপোর্টটা বেরুচ্ছে। অন্ততঃ কাটিংটা রেখে দিস—

শেষ কথা হেসে বললো অমল।

চলে যাচ্ছিস এখুনি?

হ্যাঁ দরকার হলেই আবার আসবো।

বেরিয়ে পড়লো অমল। এবার একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে, না হ'লে দীপায়নকে নির্দোষ প্রমাণ করে বের করে আনা যাবে না। কারণ চক্রান্তটা দাপায়নকে ঘিরে। এমন ভাবে সেটা হয়েছে যে দীপায়নের বেরিয়ে আসবার কোনো পথই নেই।

ট্রামে বাসে উঠবার মতো মন নেই আর। অমল একটা ট্যাক্‌সি ডেকে উঠে পড়লো।

রীতাকে নিজের পরিচয় দিতেই অমলকে চিনলো রীতা।

ক্রোধে এবং ঘৃণায় কুঁচকে বললো, আপনাদের আর বিশ্বাস করতে পারি না যারা বন্ধুকে মদ খাইয়ে হত্যা করে—

অমল ঠিক এমনই একটা বক্তব্যের মুখোমুখি হবে, বুঝতে পারেনি। সুতরাং প্রথমটা বিপন্ন বোধ করলো। তারপর খুব দ্রুত সোজা হয়ে উঠলো ভেতরে ভেতরে। তারপর বললো, দীপায়ন শুভঙ্করকে ভালোবাসতো। কখনও সে শুভঙ্করকে খুন করেনি। করতে পারে না।

সমস্ত প্রমাণ কিন্তু দীপায়নের বিরুদ্ধে! চাপা ক্রোধে বললো রীতা।

সেটা ওর কপাল। না হলে শুভঙ্করের সঙ্গে ওর এমন কোনো স্বার্থের সম্পর্ক নেই যার জন্য ওকে এমন নৃশংসভাবে খুন করতে পারে।

আপনি বোধ হয় জানেন না, শনিবার রেসে অনেক টাকা পেয়েছিল শুভঙ্কর। এবং সে টাকাটা নিজের কাছে ড্রয়ারে রেখেছিল। সে টাকাটা আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। পুলিশকে টাকাটা সম্পর্কে ইচ্ছে করেই বলিনি আমি। সবগুণ ছিল শুভঙ্করের। রেসের কথাটা আর নাই বা জানলো তারা।

দীপায়নের সম্পর্কে টাকার ব্যাপারে কেউ কিছু বলতে পারবে না—অন্তত আমার বিশ্বাস তাই।'

'আপনার বিশ্বাসের মূল্য আমি দেব, একথা ভাবলেন কি করে?'

অমল হঠাৎ খানিকটা অসহায় বোধ করলো। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দ রইলো। তারপর মৃদুস্বরে বললো, আমি বুঝতে পারছি, শুভঙ্করের মৃত্যু আপনাকে আঘাত দিয়েছে।'

রীতা কিছু বললো না।

এবার সুপ্রিয়ার প্রসঙ্গ তোলা উচিত। মনে মনে ভাবলো অমল। কিন্তু কীভাবে তোলা যায়?

না, কোনো আড়ালের প্রয়োজন নেই। সরাসরিই জিজ্ঞেস করলো অমল, 'সুপ্রিয়া এসেছিল একবারও?'

'সুপ্রিয়া!' জ্বলে উঠলো রীতা।

'ওর নিশ্চয়ই আসা উচিত ছিল।'

রীতা লাফিয়ে উঠলো যেন। বললো 'আমার সমস্ত শান্তি সুপ্রিয়াই নষ্ট করেছে। খুনের ব্যাপারে দীপায়নের সঙ্গে ওর যোগ থাকাও সম্ভব। আমি নিশ্চয়ই শেষপর্যন্ত পুলিশকে সুপ্রিয়ার কথা বলবো।

'সুপ্রিয়া তো শুভঙ্করের দীর্ঘ দিনের বান্ধবী।' অমল বললো এবার।

'পথে দাঁড়ানো মেয়ে সুপ্রিয়া। ওরা যা খুশী তাই করতে পারে। ইদানীং দীপায়ন আসতো ও এলেই। জানি না কি উদ্দেশ্য ছিল। এক সঙ্গে বেরিয়েও যেত ওরা দু'জন।'

'শুভঙ্করের বান্ধবী দীপায়নেরও বান্ধবী হতে পারে নিশ্চয়ই।'

'সুপ্রিয়ার মতো মেয়েরা পয়সা পেলে সমস্ত পুরুষেরই বন্ধু হতে পারে।

অমল চুপ করে রইলো।

আমি আর ওদের কথা শুনতে চাই না। সরাসরি জানিয়ে দিল রীতা।

'কিন্তু শুভঙ্করের মৃত্যু রহস্য উদ্ধার হোক আমি চাই।'

চমকে উছলো রীতা। বললো, 'তার জন্য পুলিশ আছে।'

'পুলিশ আছে, কিন্তু তাদের যদি কেউ সাহায্য করে তাহলে আরো সুবিধে হয় তাদের।'

'আমি শুভঙ্করের কোনো বন্ধুকে বিশ্বাস করি না—'

আর কিছু বলবার নেই। অমল অপমানে অস্বস্তিবোধ করলো। তবু ভাবলো, ঘটনার গতিই রীতাকে এমনই কথা বলতে বাধ্য করেছে।

কিন্তু এই মুহূর্তে আর কিছু না বলে বেরিয়ে পড়া উচিত।

'তাহলে আমি উঠছি।'

'আচ্ছা, আসুন—'

অমল বেরিয়ে এলো।

না, কোনো লাভই হলো না। শুধু নতুন একটা খবর পাওয়া গেল, শনিবার দিন বেশ কিছু টাকা পেয়েছিল শুভঙ্কর এবং টাকা ছিল ড্র'য়ারের মধ্যে।

যে মদ খেয়েছিল শুভঙ্করের সঙ্গে নিশ্চয়ই সে টাকার খবরটা জানতো, এবং এসে সুযোগ বুঝে কাজ সেরে চলে গেছে। দীপায়ন তো বলেইছে, অনেক কু-খ্যাত লোকও আসতো শুভঙ্করের কাছে। এবং, অমলের ধারণা দু'দশ টাকার জন্যেও তারা খুন করতে পারে।

কিন্তু সেই লোকটি কে?

শুভঙ্করের মৃত্যুটা সত্যিই রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

টেলিফোন এলো পরদিন অফিসে ঢুকতেই।

দীপায়ন টেলিফোন করেছে।

'কি ব্যাপার?'

'রীতা আজ সকালে এসে যা-তা বলে গেছে আমায়।'

'কি বলেছে?' কৌতূহলী হয়ে উঠলো অমল।

'বলেছে, আমি নাকি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্য তোকে পাঠিয়েছি।'

'তারপর?'

'বলেছে, এবার সে সুপ্রিয়ার সঙ্গে আমাদের কথা পুলিশকে জানিয়ে অরো স্ক্যাণ্ডাল করবে। সুপ্রিয়ার ঠিকানা ওর জানা। এবং তার ঠিকানা পুলিশকে দেবে।'

শুভঙ্করের মৃত্যুতে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে রীতা। সুপ্রিয়ার জন্যই কাণ্ডটা ঘটেছে। মেয়েরা স্বামীর মেয়ে বান্ধবী কখনও সহ্য করতে পারে? যাক্‌গে, তুই কি বলেছিস?'

'কিছু বলবার সুযোগ পাই নি।'

'রীতা যাতে কেসটাকে আরো গোলমেলে না করে, তার জন্য আজ সন্ধ্যেবেলায় একবার যাবো।

'কিন্তু যা দেখলাম, ভারি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে রীতা।

'কাগজে কাজ করে যারা, তারা বিপদকে ভয় পায় না। সুতরাং আমিও আইনত ভয় পেতে পারি না।'

'যাক্‌গে, খুব সাবধানে এগোবি কিন্তু।'

'সে তোকে ভাবতে হবে না।'

আর দু'চারটে কথা বলে ফোন রেখে দিল অমল।

রীতার কাছে গিয়ে আজ আরো বিনীত হতে হবে। যদি বা রহস্যটাকে সমাধান করবার সুযোগ করতে পারে, দীপায়নকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে পারে, রীতার অধৈর্য আক্রোশ বাড়িয়ে দিলে হয়তো তা আর সম্ভব হবে না। দীপায়ন যে নিরপরাধ, কেবল ঘটনার আকস্মিকতায় বন্দী হয়েছে, তা বুঝতে পেরেছে অমল। অথচ যা সব প্রমাণ ওর বিরুদ্ধে তাতে শাস্তি ওর হবেই।

'আমি আর এ সবের মধ্যে নেই' অথবা 'দীপায়নের কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে' এমনই কিছু একটা রীতাকে বলতেই হবে। এবং যা করবার রীতাকে এড়িয়ে করতে হবে তারপর।

ব্যাপারটা নিয়ে যত ভাবতে থাকলো, তত উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকলো অমল।

শেষ পর্যন্ত মনটাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য টেলিফোন তুলে রাজশ্রীর নম্বরে ডায়াল করলো।

ঠিক সন্ধ্যেবেলায় শুভঙ্করের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো অমল। বাড়ির ভেতর আলো জ্বলছিল। রীতা বাড়িতেই আছে তাহলে। সুতরাং খানিকটা নিশ্চিন্তভাবেই কলিংবেলের পুশে আঙুল রাখলো অমল।

বেশ কিছুক্ষণ পর দরজা খুলে গেল।

না, রীতা নয়, বলিষ্ঠ চেহারার একজন ভদ্রলোক। দরজা খুললেন।

'কাকে চাই?'

'রীতা দেবীকে।'

'তিনি কারো সঙ্গে দেখা করছেন না আপাতত।'

'বলুন, অমলবাবু এসেছে, শুভঙ্করের বন্ধু।'

'অন্তত একবার যদি আমার নামটা গিয়ে বলেন—'

'প্লীজ, আপনি বিরক্ত করবেন না।'

বলেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন ভদ্রলোক।

অমল খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেল। ঠিক যেন বোঝা গেল না ব্যাপারটা। লোকটি কে? কেন 'শুভঙ্করের বাবা' এলেও রীতা এখন দেখা করবে না?

না, এ সমস্যার সমাধান করা আপাততঃ অমলের পক্ষে সম্ভব হয়। শুধু তাই নয়, এ সমস্যা সমাধান করতে চেষ্টা করলে কেসটাকে আরো জটিল করে তোলা হবে। দীপায়নের পক্ষে তখন আর নির্দোষ হিসেবে বেরিয়ে আসা কিছুতেই সম্ভব হবে না হয়তো। অথচ দীপায়নকে যে করেই হোক বের করে আনতে হবে।

গোটা ব্যাপারটাকে গুছিয়ে ভাবতে শুরু করে অমল পথে নামলো।

রীতা হেঁটে ফিরছে। একটু যেন ব্যস্ত। তাহলে রীতা বাড়িতে ছিল না?

ভদ্রলোক তাহলে কে? কেনই বা এমন কথা বললেন ভদ্রলোক!

অমল রীতার সামনে এসে দাঁড়ালো।

'আপনি? কি ব্যাপার?' রীতা অবাক হয়ে বললো।

'আমিও সেই প্রশ্নটাই করতে চাইছি।'

'তার মানে?' অবাক হয়ে কিছুক্ষণ অমলের মুখের দিকে তাকিয়ে রীতা বললো।

'আপনার বাড়িতে এক ভদ্রলোক দরজা খুলে বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা হবে না কিছুতেই। অথচ আপনি বাড়িতেই ছিলেন না।'

'আমার বাড়িতে—একজন ভদ্রলোক দরজা খুললেন! প্লীজ, আপনি পুলিশে একটা খবব দিন। আমি দেখছি গিয়ে ব্যাপারটা কি হলো—'

কথাটা বলে আর থামলো না রীতা। ছুটতে ছুটতে চলে গেল।

অবাক হয়ে কয়েকটা মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রইলো অমল।

না, আর দেরী ঠিক নয়। থানায় পৌঁছে পুলিশ নিয়ে ফিরে আসতে আধঘন্টা লাগবে নিশ্চয়ই। অথচ তাড়াতাড়ি ফিরলে একটা রহস্য উদ্ধার হবেই।

অমল ঘুরে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের একটা জীপ চোখে পডলো। টহল দিতে বেরিয়েছে বুঝি।

হাত তুলে জীপটাকে থামালো অমল। তারপর দ্রুত পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ডখানা বের করে জীপের সামনে সীটে বসা এস. আই-এব সামনে বাড়িয়ে ধরে বললো, আপনারা আমাকে একটু সাহায্য করবেন?

কি ব্যাপার বলুনতো?

যেতে যেতে বলবো—দেরী হলে কাজটা হবে না কিছুতেই। বিপন্নভাবে বললো অমল।

এক মুহূর্তে কি ভেবে এস. আই বললেন, উঠে পড়ুন।

অমল মুহূর্তে উঠে বসলো জীপে। বিদ্যুৎবেগে জীপ ছুটলো।

দ্রুত এস. আই-কে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল অমল। এবং বোঝানো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুভঙ্করের বাড়ির সামনে, দ্রুত ছুটে বেরিয়ে আসা সেই ভদ্রলোকের মুখোমুখি সশব্দে এসে দাঁড়ালো জীপ। পুলিশের জীপ থামতে দেখেই ভদ্রলোক দ্রুত উল্টোদিকে ফিরে পালাতে চেষ্টা করলেন।

অমল চেঁচিয়ে উঠলো, এই যে সেই ভদ্রলোক। ধরে ফেলুন—

মুহূর্তে তিনজন কনস্টেবল লাফিয়ে গিয়ে ঘিরে ধরে ফেললো তাকে।

অমল উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিল। তবু ছুটে এসে ভদ্রলোকের হাত থেকে ছিনিয়ে নিল একটা ব্যাগ। ছিনিয়ে নিয়েই খুলে দেখলো, তার মধ্যে মাঝারি ধরণের হাতুড়ি। এটা দিয়েই তাহলে খুন হয়েছিল শুভঙ্কর। বেদনার্ত একটা অনুভবে দ্রুত ব্যাগটা বন্ধ করলো অমল।

শুভঙ্করের খুনের ব্যাপারে আপনাকে পুলিশের সঙ্গে থানায় যেতে হবে—হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বললো অমল।

কে শুভঙ্কর! চটতে চেষ্টা করলেন ভদ্রলোক।

পরে আপনাকে চিনিয়ে দেওয়া হবে। এস. আই. মৃদু সুরে বললেন।

অমল এস. আই-এর দিকে ফিরলো, এক্ষুণি রীতা দেবীকে ডাকতে হবে যে। না হলে সবটুকু পরিস্কার হবে না।

চলুন।

প্রায় ছুটেই ঘরের দরজায় এলো দু'জন।

অমল উত্তেজিতভাবে 'পুশ' টিপলো; কিন্তু দরজা খুললো না।

চেঁচিয়ে ডাকলো রীতাকে। দরজা খুললো না।

দরজার ওপর সজোরে লাথি মারলো, তাও খুললো না দরজা।

শেষ পর্যন্ত জানালার খড়খড়ি খুলে তাকালেন এস. আই। তারপর দ্রুত খড়খড়ি নামিয়ে বললেন, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন রীতা দেবী। ছাদ থেকে তার শরীরটা দড়িতে ঝুলছে। উঃ ভয়াবহ দৃশ্য!

অমলের সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। দেয়াল ধরে দাঁড়ালো কিছুক্ষণ। তারপর মৃদুস্বরে বললো, আপনি সব ব্যবস্থা করুন এবার। কারণ আপাততঃ আমার আর কিছু করবার নেই।

সে কি! অবাক হয়ে বললেন এস. আই।

আমি কাল থানায় যাবো। ব্যাগের ভেতর যা আছে, তার ওপরের ফিংগার প্রিন্টের সঙ্গে রীতা দেবীর আর ভদ্রলোকের ফিংগার প্রিন্ট মিলিয়ে রিপোর্টটা যত দ্রুত সম্ভব আনবার চেষ্টা করবেন—

খুনী তাহলে কে বলবেন না?

সে আর আমার বলে দিতে হবে না। আপনারাই বুঝে ফেলবেন আগামীকাল।

সম্ভবতঃ ভদ্রলোকের ইচ্ছে ছিল রীতাকে বিয়ে করবেন। খুনের কারণ মূলতঃ তাই। তারপর সেখানে ইন্ধন জুগিয়েছিল সুপ্রিয়া নামে একটি মেয়ে। ঘরে বাইরের পরিচয় দেহোপজীবিণী হিসেবে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে সত্যিকারের বন্ধুত্বের কাঙাল ছিল। আর তাই শুভঙ্করের শেষ দিন পর্যন্ত বন্ধু ছিল সে। ভদ্রলোক সম্ভবতঃ তার কথা বলেই খুনের ব্যাপারটাকে বাস্তব করে তুলতে পেরেছেন। শুভঙ্করের খুন হবার আগে এই ভদ্রলোকটি রুমালে গ্লাস ধরে মদ খেয়েছিলেন শুভঙ্করের সঙ্গে। তাই গ্লাসে কোনো অঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি।...যাক্ গে, সব আপনি ভদ্রলোকের কাছ থেকে জেনে নেবেন। রীতার আত্মহত্যার খবর পেলে সব স্বীকার করবেন ভদ্রলোক।

বলে অমল আর দাঁড়ালো না। ব্যাগটা এস. আই-এর হাতে দিয়ে ঝড়ের মতো ছুটে এসে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা চলে এলো বাড়িতে।

ঘটনার অকস্মিকতা সত্যিই আশ্চর্যরকম ক্লান্ত করে ফেলেছে অমলকে। অমল যেন আর দাঁড়াতেও পারছিল না।

পরদিন ঠিক বারোটা দশে থানা থেকে টেলিফোন এলো।

অসহ্য উত্তেজনায় ছট্ফট্ করছিল অমল। কিন্তু টেলিফোন করতে ভরসা পাচ্ছিল না। ঠিক যেন পরীক্ষার রেজাল্ট শোনা।

অমল নিজের নামটা বলেই উত্তেজিত গলায় বললো, বলুন—

আপনি যা-যা বলেছেন সব ঠিক। ভদ্রলোক রীতা দেবীর আত্মহত্যার খবর পেয়ে ভেঙে পড়ে সব স্বীকার করেছেন। রীতাদেবীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন তিনি, মদ খেয়েছেন রুমালে গ্লাস ধরে সুপ্রিয়াকে ব্যবহার করেছেন রীতাকে উত্তেজিত করার জন্য। আর দীপায়ন বাবুর ওপর শুভঙ্করের বন্ধু এবং সুপ্রিয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে রাগ ছিল বলে তাকে সুযোগ মতো খুনী হিসেবে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। তবে জানতেন না, পেপার ওয়েটে আঙুলের ছাপ তাকে আরো জড়িয়ে ফেলবে। রীতার রাগটুকু কেবল সবার চোখে ধুলো দেবার জন্য। সেও ভদ্রলোকের নির্দেশেই। গতকাল হঠাৎ আপনি যাওয়াতে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। রীতাও পুলিশ ডাকতে বলে বোকামী করে ফেলেছিল। হাতুড়িটা বাড়িতেই ছিল সেটা নিয়েই ভদ্রলোক পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, প্রমাণটা লোপ করে ফেলতে চেয়েছিলেন। রীতা কিছু একটা অভিনয় করতো পুলিশ এলে।

কিন্তু খুনী কে?

রীতা দেবী।

রীতা!

হ্যাঁ। ব্যাগে যে হাতুড়িটা ছিল তার মাথায় রক্তের দাগ ছিল। টেবিল ক্লথে লেগে থাকা শুভঙ্করের রক্তের সঙ্গে তা মিলে গেছে। আর হাতুড়ির হাতলে রীতা দেবীর আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে। সব শুনে ভদ্রলোকও স্বীকার করেছেন মদে বেহুঁশ হয়ে যাওয়া শুভঙ্করকে উত্তেজিতভাবে হাতুড়ির আঘাত দিয়ে খুন করেছে রীতা। এবং সে ব্যাপারে তিনি তাকে উৎসাহিত করে তুলেছিলেন।

অমল কিছু বলতে পারলো না।

এস. আই. ফের বললেন শিগগীর আপনি চলে আসুন। আপনাকে মুখোমুখি অভিনন্দন না জানিয়ে আনন্দ পাচ্ছি না। আপনার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করছি কিন্তু?

টেলিফোন নামাবার শব্দ হলো ওদিকে।

অমল কিন্তু অনেকক্ষণ টেলিফোন নামাতে পারলো না।

# লাশ

## রবীন্দ্রনাথ দস্তিদার

— দেখুন, মশাই, 'পাপ' আর 'পারা' কখনো কখনো যে চাপা থাকে না, এ আপ্তবাক্য অপর কেউ বিশ্বাস করুক, চাই নাই করুক, আমি কিন্তু খুবই বিশ্বাস করি। নইলে খুন করার তিরিশ বছর পরে খুনীই কেন আবার ধরা পড়ে ? এই তিরিশটা বছরে স্থান-কাল-পাত্রের কতই না বদল ঘটলো। অথচ নেপাল নাগকে খুনের প্রায় কোনো প্রমাণই লোপ পেল না এই তিন যুগের ভেতর।'

গল্পের গন্ধ পেয়ে আমি নড়ে-চড়ে বসলুম। প্যাকেট থেকে দুটো সিগারেট বার করে একটা যতীন বাবুকে দিয়ে, আর একটা নিজে ধরিয়ে, উৎসুক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলুম, ঘটনাটা কী, যতীনবাবু? আপনি জানেন পুরোটা?

— জানি, এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন তিনি, 'শুনবেন?'

—হ্যাঁ।

যতীনবাবু নন্দনপুরের প্রাচীন পুলিশ-প্রধান আর আমি কলকাতার কোনো এক প্রথম শ্রেণীর খবরের কাগজের নবীন সংবাদদাতা। এসেছিলুম এই নতুন গড়ে-ওঠা শিল্প-নগরীটির ওপরে একটি সচিত্র প্রবন্ধ লেখার আদেশ নিয়ে। সেই সূত্রে পুলিশ দপ্তরে আগমন। এবং কথায় কথায় এ হেন রোমাঞ্চকর প্রসঙ্গের অবতারণা।

যতীনবাবু প্রশ্ন করলেন, নন্দনপুরের ইলেকট্রনিক ফ্যাক্টরিটা দেখেছেন?

—দেখেছি।

—তিরিশ বছর আগে ওখানে ছিল প্রকাণ্ড এক দীঘি, আর আশেপাশে কিছু বন। ধারে কাছে লোক বসতি ছিল না। কাউকে খুন করে, তার লাশ গুম করে ফেলার পক্ষে সে এক আদর্শ জায়গা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই দীঘিটাকে ভবাট করার সময়েই নেপাল নাগকে খুন কবার মতলব জেগে উঠে ছিল শচীন সামন্তের মাথায়।

—এই খুন-খারাপির উদ্দেশ্য?

—ব্ল্যাকমেলিং। শচীনকে ব্ল্যাকমেল করছিল নেপাল।

—তাই বুঝি? কিন্তু কেন?

—শচীনেব এক বিধবা যুবতী বোন ভ্রষ্টা আর নষ্ট হয়ে কলকাতার চিহ্নিত পল্লীতে গিয়ে যৌবন বিক্রির ব্যবসা খুলেছিল। সবাই জানত মেয়েটি কাশীতে কোনো আশ্রমে আছে. কিন্তু কী ভাবে যেন নেপাল আসল ব্যাপার জানতে পেরে যায়। বিবাহযোগ্যা আরো দুটি বোন ছিল

শচীনের। পারিবারিক কলঙ্কের কথা চাউর হয়ে পড়লে তাদের বিয়ে দেওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়াবে ভেবে, নেপালের মুখ বন্ধ রাখতে প্রাথমে কিছু টাকা খাওয়াতে হয়েছিল শচীনকে। পরে সেটাই দাঁড়িয়ে যায় মাসিক বরাদ্দে।

সরকারের বাস্তুবিভাগের মাথায় হঠাৎ খেয়াল চাপল এরিয়াটাকে ডেভেলপ করার আর তারই পরিপ্রেক্ষিতে দরকার পড়ল ঐ দীঘিটাকে ভরাট করার। আশেপাশের কল-কারখানা আর ফার্মগুলোর কাছে অনুরোধ গেল—এবার থেকে তারা যেন তাদের রাবিশ ঐ দীঘির বুকে এনে ফেলে। যাবতীয় খরচ গভর্ণমেন্টের। প্রকাণ্ড দীঘি তো, টন টন রাবিশের দরকার।

শচীন সামন্ত ছিল একজন ঠিকাদার। ঠিকে নিয়ে সে এলো নন্দনপুরের দীঘিতে রাবিশ ফেলতে। এলো আরো অনেকে। দেখতে দেখতে বহুদিনকার শান্ত সমাহিত জায়গাটা ভারী ভারী লরীর আনাগোনায় আর চাকার চাপে পিস্ট—তছনছ হয়ে গেল।

যাই হোক, আমি তখন সবে লোকাল পুলিশ আউটপোস্টে রাইটার কনস্টেবল হয়ে জয়েন করেছি। থানায় থাকি আর প্রায় রোজই বেড়াতে যাই দীঘির ধারে। লক্ষ্য করি রাবিশ ফেলার কাজকর্ম। দীঘির চারপাশের পাড় ক্রমশঃ ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছিল নীচে। ফলে রাবিশ ফেললে তা প্রথমে পাড়ের কাছেই পড়ত, তারপর তিন-চার খেপ পরে ওপর থেকে ফেলা অন্য রাবিশের চাপ পেয়ে, শেষ পর্যন্ত গড়িয়ে যেত দীঘিব বুকে।

এই বিশেষত্বটুকু কাজে লাগিয়ে ছিল শচীন। প্রথম ঝুঁকিটুকু কাটিয়ে উঠতে পাবলে, পরে লাশের ওপর রাবিশের পাহাড়েব পর পাহাড় জমা হয়ে. তাকে যে কোনো গহ্বরের মধ্যে হারিয়ে নিয়ে যাবে, তা কল্পনা করা কঠিন।

"সব দোষটাই শচীনের নয়। মানুষের খাঁই বড় মারাত্মক জিনিস। কিছুতেই মিটতে চায় না। যত দাও তত নেবে। নিয়ে আরো চাইবে। শচীনও লক্ষ্য করল, নেপালের চাহিদা ক্রমেই বাড়ছে। নির্লজ্জ আকার নিচ্ছে। ঠিকেদারীর কাজে এমন কিছু লাখ টাকার আমদানী হয় না যে, সংসারের খরচ জুগিয়ে আবার নেপালের পেট ভরানো যায়। তারপর বোনেদের নিয়ে আর নিজের ভবিষ্যৎ রয়েছে।

কিন্তু পথের কাঁটা—ঐ নেপাল নাগের জন্য কোনো দিকে একাগ্র হয়ে লাগতে পারছে না শচীন। তারপর অনেক বিনিদ্র রজনী উত্তপ্ত চিন্তা আর অস্থিরতা কাটিয়ে, শচীন শেষ পর্যন্ত চরম পন্থা অবলম্বন করতেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলো। স্থির করলো ওকে জন্মের মতো সরিয়ে দেবে এই পৃথিবী থেকে।

কাজের সুবিধের জন্য শচীন সেই বনের ধারে—তখন অবশ্য মানুষের ঠেলায় বন বলে আর কিছু ছিল না—অস্থায়ী একটা অফিস গোছের তৈরি করেছিল। পরিকল্পনা ফাঁদা হয়ে গেল, টাকা দেবার অছিলায় সেই অফিসে নেপালকে ডেকে আনল সে। পথে দেখা হতে নিজেই তাকে বলল, অমুকদিন রাত আটটার মধ্যে যেতে।

সন্দেহ করল না নেপাল। কারণ এর আগেও বার দুই তিন শচীনের অফিস থেকে ঐভাবে টাকা নিয়ে এসেছে সে। তাই এবারেও নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে গেল নেপাল। আর সেই যাওয়াই হলো তার শেষ যাওয়া। শচীন ঠাণ্ডা মাথায় খুন করল তাকে।

তারপর সনাক্ত করার সব রকম উপায় থেকে তাকে বঞ্চিত করবার জন্য টানতে টানতে নিয়ে এলো বাইরে। মতলব আগেই ফাঁদা ছিল ঃ নেপালকে খুনের পর কী কী করবে শচীন।

তারই প্রথম কিস্তি হিসেবে গরু-মোষের জাবনা-খাওয়া কাঠের তৈরী বিরাট একটা পাত্রে চটপট প্লাস্টার অফ প্যারিস গুলে, নেপালকে তার ভেতরে ঢুকিয়ে দিলে। খুনের অস্ত্রটা, মানে হাতখানেক লম্বা লোহার একটা ভারী রড— সেটাও সেই সঙ্গে পাত্রের ভেতর দিতে ভুল করলে না।

কুইক লাইম অথবা সিমেন্টের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি জমে ওঠে প্লাস্টার ওদের চেয়ে ঘনও হয় আবার হালকাও হয় যথেষ্ট। চাঁইটা জমে যাবার পর পাত্রটা ভেঙে সেটাকে বার করে নিল শচীন। তারপর পরিকল্পনা মতো, তার অফিস ঘরের আশে পাশে জড় নানান আকারের, নানান ওজনের সিমেন্ট আর প্লাস্টারের ভাঙা টুকরোর সঙ্গে এটাকেও রেখে দিলে। তার আগে অবশ্য লোকের সন্দেহ এড়াবার জন্যে হাতুড়ির ঘায়ে চারপাশে ক্ষতচিহ্ন এঁকে রাখতে কসুর করলো না। যেন কোনো কাজের জন্য ব্যবহৃত হবার পরে পরিত্যক্ত একটি চাঁই। তাছাড়া জাবনা-পাত্রের আকৃতির আভাসটাকেও মুছে দেওয়া দরকার ছিল তার। কেউ যাতে না বুঝতে পারে, কী ধরনের আধারে প্লাস্টারটাকে জমানো হয়েছে। লরী ড্রাইভারকে বলাই ছিল সে এসে পরদিন সকালে এখানকার এই রাবিশগুলোকে নিয়ে যাবে।

দম নেবার জন্য যতীনবাবু একটু থামতেই আমি জিজ্ঞেস করলুম, আচ্ছা যতীনবাবু, শচীন সামন্ত এটা ভেবে দেখলে না যে, নেপাল নাগকে সময় মতো বাড়ি ফিরতে না দেখলে, তার বাড়ির লোকেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে? অস্বাভাবিক রকমের দেরী দেখলে পুলিশেও রিপোর্ট করতে পারে?

---ভেবেছিল নিশ্চয়ই। এবং ভেবেই সে খুন করেছিল নেপালকে। প্রস্তুতি তো তার একদিনের ছিল না। তাছাড়া পেশায় নেপাল ছিল টুরিং সেলসম্যান। এ কোম্পানীর মাল বি কোম্পানীকে আর বি কোম্পানীর মাল সি কোম্পানীকে বেচবার জন্য হিল্লী-দিল্লী ঘুরে বেড়াতে হ'ত তাকে। ক'দিন আর বাড়িতে থাকতো সে? আর বাড়ির লোক বলতে একমাত্র স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না তার সংসারে। কাজেই নেপালের নিরুদ্দেশ নিয়ে যে খুব একটা হৈ চৈ উঠবে না কোথাও, এটা শচীন গোড়া থেকেই ধরে নিয়েছিল। স্বতঃসিদ্ধ ভাবে। প্র্যাকটিক্যাল ঘটেও ছিল তাই। মাস দুই পরে স্ত্রী অবশ্য স্বামীর নিরুদ্দেশের কথা জানিয়েছিল পুলিশকে। কিন্তু নেপাল সম্পর্কে অনেক কথা...অনেক ঘটনা.. অনেক স্মৃতিই তখন ফিকে হয়ে গেছে মন থেকে। সুতরাং রিপোর্ট ফাইল বন্ধ হয়েই রইল।

দেখতে দেখতে দিন-মাস-বছর গড়িয়ে গড়িয়ে মানুষের হিসেবে দু-যুগের ওপর কেটে গেল। সারা ভারতবর্ষের চেহারায় আর জীবনে অনেক ওলট-পালট ঘটে গেল।

নন্দনপুরও নব রূপে নবীন কলেবরে মাথা তুলে দাঁড়াল একটু একটু করে। স্কুল-কলেজ হাসপাতাল মন্দির-মসজিদ-গীর্জা গড়ে উঠল তার বুকে।

সরকারী কেষ্ট-কিষ্টুরা স্থির করলেন ঃ নন্দনপুরকে একটা লাইট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটে ট্রান্সফার করতে হবে। এর প্রসপেক্ট নাকি অনেক। আর এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ তাঁরা নিলেন একটা বিরাট ইলেকট্রনিক ফ্যাক্টরি তৈরির কাজে হাত দিয়ে। স্থান নির্বাচন করা হলো ভরাট করা সেই দীঘির বুকের জমিটা।

শচীন এখন নন্দনপুরের একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিক। বিল্ডিংস মেটিরিয়ালসের ব্যবসায় গাড়ি-বাড়ি আর সম্পত্তি হয়েছে। সুখেই সংসার করছে।

যতীনবাবু এবার নিজে পকেট থেকে সিগারেট বার করে একটা তিনি ধরিয়ে, আর একটা আমায় অফার করে, টানতে টানতে বললেন, আই ওন্ট গো ইন টু অল দি ইন্ট্রিকেসিস। কেবল একটা কথাই বলি—পাইল-ড্রাইভিং কাকে বলে জানেন?

—জানি। জবাব দিলুম আমি। —বড় বড় অট্টালিকা...প্রাসাদ...ইমারৎ গড়বার সময়ে ভিৎ যাতে নড়বড়ে আর অ-মজবুত না হয়, তার জন্যে অনেকগুলো কংক্রিটের খুঁটি পুঁতে দেওয়া হয় ভিতের বুকে যত্রতত্র। তার কথাই বলছেন তো?

—হ্যাঁ। ড্রিলিংয়ের সময়ে দেখা গেল, দীঘির বুকে ফেলা রাবিশের স্তূপ এই তিরিশ বছরে যতই শুকিয়ে উঠুক ঠিক মতো সলিড হয়ে উঠতে পারে নি, মাঝে মধ্যে একটু আধটু ফাঁক-ফোকর থেকেই গেছে। আর এরই জন্যে সেদিন ঘটে গেল অঘটন। নিউম্যাটিক ড্রিলটা আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে একটু একটু করে প্রবেশ করছিল মাটির বুকে। যেন কেউ একটা পাকা কলার গায়ে ছুঁচ ফোটাচ্ছে। হঠাৎই তার বাকি ছন্দ নষ্ট হলো, তাল কেটে গেল। ড্রিলিং মেশিনটা থর থর করে কেঁপে উঠল লজ্জাবতী লতার মতো।

ভুরু কুঁচকে উঠল ড্রিলারের। নিশ্চয়ই বেশ শক্ত কিছু পড়েছে যন্ত্রের সূচীমুখ অগ্রভাগে। পাথর-টাথর বোধ হয়। জিনিষটাকে তুলে ফেলে দিতে না পারলে ড্রিলের তীক্ষ্ণ তুরপুনটা ভোঁতা হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে।

ডাক পড়ল কুলীদের। গাঁইতি-শাবল-কোদাল নিয়ে ছুটে এলো তারা। ঘন্টা কয়েক পরিশ্রম করতেই বেরিয়ে পড়লো প্লাস্টারের সেই চাঁই।

সবাই অবাক—সবাই হতভম্ব।

কিন্তু পুরোপুরি হতভম্ব হওয়ার তখনও যেন বাকিই ছিল কিছুটা। প্লাস্টারের চাঁই ভাঙতেই অবিশ্বাস.. ভয়...বিস্ময় উত্তেজনায় ফেটে পড়লেও সেখানকার সবাই।

প্লাস্টারের খোলে মানুষের একটা লাশ! একটা মমি!

দেখা গেল, গোটা দেহটা শুকিয়ে কুঁচকে ছোট হয়ে গেলেও তখনো চমৎকার অবস্থায় আছে। প্লাস্টার অফ প্যারিসের নিশ্ছিদ্র বায়ুশূন্য খোলে থাকায় একটুও পচন ধরেনি নেপালের! অন দি হোল অবিকৃতই ছিল মৃতদেহটা। এমন কি পরণের কাপড়-চোপড়...লোম-চুল-দাঁত-নখ সবই ইনট্যাক্ট ছিল স্বাভাবিকের মতো।

ব্যাপারটা যে রীতিমতো অস্বাভাবিক; সেটা আরো প্রকট হলো—লাশের পাশে হাতখানেক লম্বা লোহার তৈরী ভারী একটা রড পড়ে থাকায়।

সকলেই বুঝলে, ব্যাপারটা খুন ছাড়া আর কিছু নয়।

কে এই হতভাগ্য? তাকে এমন করে এয়ার-টাইট কেসিংয়ে পুরে এভাবে কবরই বা দিলে কে? এ তো ইদানীং কালের কোনো ঘটনা নয়। এখন একাজ একেবারেই অসম্ভব। দিনে হোক, রাত্তিরে হোক কিছুতেই লোকের নজর এড়ানো যাবে না। তাহলে এ কীর্তি নিশ্চয়ই সেই দীঘি ভরাটের সময়কার।

পুলিশে খবর গেল। আমরা এলুম তদন্তে। লাশের ফটো তোলা হলো। আরও একটা চমকপ্রদ দৃশ্য দেখা গেল : বর্তমানে লাশটা আনুপাতিকভাব শ্রিংক করে গেলেও কেসিংয়ে পোরবার সময় প্লাস্টার নরম থাকায় তার গোটা দেহের—বিশেষ করে মুখের একটা চমৎকার

ন্যাচারাল ছাঁচ গড়ে উঠেছিল তাব মধ্যে। ফলে লাশের আসল আর অকৃত্রিম বডি ফরমেশানের আঁচ পেয়ে গেলুম আমরা।

ডেথ-ওয়েপনটার গায়ে আঙুলের কোনো ছাপ আছে কিনা, পরীক্ষা করতেই প্রাথমিক অবস্থায় সামান্য কিছু চিহ্ন আমবা পেলুম বটে, তবে তা নিয়ে উৎসাহ বোধ করার কোনো কিছু ছিল না।

তদন্তের মুখে আরো জানা গেল, গোটা দীঘিটাকে ভরাট করে তুলতে ঠিক চার বছর সময় লেগেছিল। তখনকার পি. ডব্লউ. ডি-রা দীঘিটা ওরিজিনাল যেখানে ছিল, সেখান থেকে এই প্লাস্টার-কফিনেব দূরত্ব মেপে, অনেক অঙ্ক কষে—ক্যালকুলেশান করে, পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলে যে, কাজ দেওয়ার এই ঘটনা ১৯৪৪ সালের কোনো সময়েই ঘটা সম্ভব।

অবশ্য গোয়েন্দা-দপ্তর খুব ডেফিনিট ছিল না এই হিসেবে। তবে তখনকার পুলিশের মিশিং-পারসনস্ ফাইল ঘেঁটে যদি নিরুদ্দেশের কোনো খবর পাওয়া যায়, তবে নিঃসন্দেহে সেটা তাদের কাছে একটা স্ট্রং ক্লু হয়ে দাঁড়াবে।

খোঁজাখুঁজি করতেই বেরোলো এমনি একটা রিপোর্ট। নেপাল নাগ নিরুদ্দেশ হবার দু'মাস পরে তার স্ত্রী যেটা লিপিবদ্ধ করিয়ে ছিল পুলিশের কাছে।

গোটা জিনিষটা এবারে খানিকটা এগিয়ে এলো। পুলিশ নেপাল নাগের খুনীর হদিশ বার করাব জন্যে তৎপর হয়ে উঠল। নেপালেব যে বর্ণনা আপাততঃ আমারা পেলুম, তা হচ্ছে—বয়স ৩৬–মাঝারি পাতলা গড়ন, সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভের কাজ কবত। নন্দপুরে শেষ দেখা গেছে ১৯৪৪ সালের জুন মাস নাগাৎ। মাথাব খুলিতে লোহাব ভারী রড মেবে খুন করা হয়েছে। বডটি দেখে খুনীব অকুপেশানেরও একটা ক্লু পেলুম আমরা। এই রড দেখে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছলুম—খুনী নিশ্চয়ই কোনো বিল্ডার বা বিল্ডিং মেটিরিয়ালস নিয়ে ব্যবসায় নিযুক্ত ছিল এমন কেউ। নইলে পাইপের ঐ টুকরো আর একটা গোটা মানুষকে ঢাকা দেবার মতো অত প্লাস্টার অফ প্যারিস সে পেলে কোথায়? তাবপর তার হাতের নাগালে হেভী ট্রান্সপোর্ট চালাবাব উপযুক্ত কর্তৃত্ব না থাকলে, অত বড় প্লাস্টারের চাঁইটাকে এভাবে দীঘিব বুকে অন্যান্য রাবিশের সঙ্গে ফেলা অন্যের পক্ষে আদৌ সম্ভবপর ছিল না।

যাই হোক পাওয়া সূত্র আর সিদ্ধান্ত বাড়িয়ে একটা জিনিষই বার বার সব দিক থেকে মাথা তুলেছিল। সেটা হলো, এতবড় একটা প্লাস্টারের চাঁই নিশ্চয়ই সে খোলাখুলিভাবে কোনো খোলা জায়গায় জমাতে যায় নি। কাজটা করেছে সংগোপনে—সকলের অলক্ষ্যে। যেখানে সে নিরুদ্বেগে কাজ সেরেছে তারপর কাউকে সন্দেহ করতে না দিয়ে নির্বিবাদে তুলে এনে ফেলেছে দীঘির বুকে। কোনো মাস্টার বিল্ডার ছাড়া এ কাজ আর কার পক্ষেই বা সম্ভব?

কিন্তু এটাও অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতন হয়ে দাঁড়াল। তৎকালীন পি. ডব্লিউ ডি'র রেকর্ডে পাঁচটি বিল্ডিং ফার্মের নাম লেখা ছিল—যারা সে সময় দীঘিটাকে ভরাট করতে রাবিশ ফেলে সক্রিয় সহযোগিতা করেছিল সরকারকে। খবর নিতে গিয়ে দেখলুম, পাঁচটি ফার্মের দুটি ফার্ম ইতিমধ্যেই তাদের কারবার বন্ধ করে দিয়েছে।

পুলিশ তা বলে মোটেই পিছিয়ে এলো না। তারা ঐ তিনটে ফার্মের সম্বন্ধেই খোঁজ-খবর

নিতে লাগল। আর তারই ফলে তিনটি ফার্মের অন্যতম একটি ফার্ম 'সামন্ত বিল্ডার্স' তার বেনামী প্রোপ্রাইটর শচীন সামন্তের ওপর গিয়ে তাদের অনুসন্ধানের স্পটলাইট ফোকাস হয়ে ধীরে ধীরে তাকে টেনে আনল আলোর বৃত্তে। জানা গেল নেপাল নাগকে চিনত শচীন সামন্ত।

বর্তমানের প্রভাবশালী আর ধনী ব্যবসায়ী...এবং নন্দনপুরের একজন সম্ভ্রান্ত ও দায়িত্বশীল নাগরিক শচীন সামন্তের পক্ষে তিরিশ বছর আগে এক অখ্যাত অবজ্ঞাত সাধারণ সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ নেপাল নাগকে হত্যা করার পেছনে কী মোটিভ থাকতে পারে, পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের বড় বড় মাথা ভেবেও কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পেলেন না। ভাবাটাই যেন হাস্যকর।

ফরেনসিক ল্যাবরেটরিজ লোকেরা ইতিমধ্যে প্লাস্টার কফিন আর লোহার রড নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে, আরো একটা সূত্র আবিস্কার করে ফেলেছিল। এক টুকরো হলদে কার্ড। ইট ওয়াজ সিমপ্লি এ বিট অফ এ টাইম-শীট অথবা ওয়ার্কস ডাটা। এ থেকে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো— প্লাস্টার করবার সময়ে কার্ডটা খুনীর পকেট থেকে হয়তো দৈবাৎ পড়ে গিয়ে থাকবে তা খুনী জানতে পারেনি।

শচীন সামন্তের মুখোমুখি হওয়ার আগে পুলিশ নিজেদের পায়ের তলায় মাটি শক্ত করে পেতে চাইল। কেননা যার বিরুদ্ধে তাদের অভিযান সে এখন শহরের মহা মানী গুনী লোক। চালের একটু এদিক ওদিক হলে ফ্যাসাদে পড়তে হবে পুলিশকে। ভেবে চিন্তে একটা রাস্তা বার করল তারা। এ ট্র্যাপ অফ সাম সর্ট।

নেপাল নাগের সম্বন্ধে শচীন সামন্তের জ্ঞান আর ধারণা কতখানি তাই আগে যাচাই করে দেখতে চাইল পুলিশ। কারণ দুজনেই সমসাময়িক। নেপালকে শচীন চেনে, কিন্তু এখন সেটা স্বীকার করে কি না তাই জানবার জন্য আগ্রহী হলো তারা।

প্রথমে গেলুম নেপালের স্ত্রীর কাছে। তাকে খুঁজেপেতে বার করেছিলাম আমরা। তাকে বলা হলো, স্মৃতির সমুদ্রে ডুব দিয়ে তিরিশ বছর আগেকার যতগুলি সম্ভব শুক্তি তুলে আনতে। মিসেস নাগ তা অবশ্য পারল না। তবে এটুকু জানাল, প্রত্যেক মাসেই মাইনের টাকাগুলো ছাড়াও আরো বেশ কিছু বাড়তি টাকা আনতেন তার স্বামী। কোত্থেকে পেয়েছে জিজ্ঞেস করলে, মুচকে মুচকে হাসতেন। একদিন কেবল রহস্য করে বলে ছিলেন, তিনি নাকি একটা কামধেনু পুষেছেন।

পুলিশ বুঝল এবার খুনের মোটিভ কী। নেপাল ব্ল্যাকমেইল করছিল খুনীকে। তারা আরো চাপ দিল মিসেস নাগকে, এ বিষয়ে আরো কিছু স্মরণ করে বলতে।

অ—নে—ক অনেকক্ষণ ভেবে মিসেস নাগ জবাব দিল, তার স্বামী একবার তাকে কিছু টাকা আনতে পাঠিয়েছিলেন একজনের কাছে। নিজে তিনি অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। বলেছিলেন, আমার এই চিঠি নিয়ে তার কাছে গেলেই সে টাকা দেবে, না বলবে না। গিয়েছিলুম এবং টাকাও পেয়েছিলুম। নগদ পাঁচশো টাকা। তখনি আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল। এক কথায় লোকটা এত টাকা কেন দিচ্ছে আমার স্বামীকে?

লোকটির নাম মনে আছে?

হ্যাঁ। শচীন সামন্ত।

একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে বুকটা হালকা হয়ে গেল আমাদের।

ইন দি মিন টাইম সেই হলুদ রঙের টাইম এ্যাড করা কার্ড নিয়ে আর এক ধাপ এগিয়ে ছিল পুলিশ। সৌভাগ্যবশতঃ প্রিন্টার্সের যে নাম ঠিকানা ছাপা ছিল সেই কার্ডে সেটা নষ্ট হয়নি। খোঁজ করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল সেই প্রেস। তিরিশ বছর আগেকার চেহারা আর নেই। প্রিন্টার্স বেঁচে ছিল না। কিন্তু তার ছেলে বর্তমানের প্রেস মালিক কার্ড দেখে খাতাপত্র আর ফাইল ঘেঁটে জানালো এই কার্ড তারা ছেপে দিয়েছিল জনৈক শচীন সামন্ত বলে এক কাস্টমারকে। পাঁচশো কার্ড ছাপানো হয়েছিল।

সব দিক দিয়ে তৈরী হয়ে এইবার প্রথম শচীন সামন্তের সঙ্গে মুখোমুখি হলো পুলিশ।

স্বাভাবিক ভাবেই নেপাল নাগের বিষয়ে প্রত্যেকটি প্রশ্নই অস্বীকার করল এমন কি তাকে যে চিনত তাও স্বীকার গেল না। পুলিশ আর কিছু না বলে ক্ষমা চেয়ে চলে এলো সেবারকার মতো।

জীন হোয়াইট, ফরেনসিক ল্যাব আর পুলিশের লোকেরা সমবেত ভাবে মিলে নেপাল নাগের লাশের একটা মোমের ছাঁচ তৈরী করে ফেললো। খুবই কঠিন কাজ নিঃসন্দেহে। বলাবাহুল্য মিসেস নাগ এ ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছিল পুলিশকে। মোমের মডেল তৈরী শেষ হলে শচীন সামন্তকে একদিন ইনভাইট করা হলো হেডকোয়ার্টার্সে।

তারপর নেপাল নাগের সেই লাইফ ডামির সামনে বসিয়ে চোখের সামনেই লোহার সেই ভাঙ্গা রডটা রেখে পুলিশ তাকে অবিরাম আর অনর্গল প্রশ্ন করে চলল।

এবার ভেঙ্গে পড়ল শচীন। তিরিশ বছর ধরে রুদ্ধদ্বারে বন্দী ছিলেন এতদিনে মুক্ত হলো। খুনের কথাটা সে স্বীকার করল। আসলে লোকটা তো জন্ম-অপরাধী ছিল না। পরিস্থিতিই তাকে ক্রিমিন্যাল সাজতে বাধ্য করেছিল।

দি রেষ্ট ওয়ান ইজি। তিরিশ বছর আগের এক খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হলো শচীন সামন্তকে। সিগারেটের শেষাংশটুকু আশট্রেতে ফেলতে ফেলতে যতীনবাবু বললেন হেসে, কেসটাতে খেটেছিলুম খুব। অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়েছিল আমাকে। সরকার তার পুরস্কার থেকে বঞ্চিত করেন নি আমায়। ও. সি. থেকে একলাফে উঠে এলুম এই কমিশনারের পোস্টে। এই সঙ্গে এও অভিজ্ঞতা হলো, পাপ আর পারা কখনো একেবারে চাপা থাকে না। সুযোগ সুবিধে পেলে ফুটে বেরোবেই।

# ভালবাসার বিষ

## অভিজিৎ দত্ত

শীতের বিকেলে মার্বেলের থামগুলোয় জ্বলে-ওঠা শেষবেলার রোদ, কেয়ারি-করা ফুলের বাগান, পরিচ্ছন্ন সবুজ ঘাসের লন ছুঁয়ে কমলেশ মজুমদারের চোখ দুটো যেখানে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে শিরীষের ছায়ায় ঘাসের ওপরে রুমাল পেতে বসেছে একজোড়া যুবক-যুবতী। দু'পাশে চীনেবাদামের খোসা ছড়ানো ছেটানো। পরনে ইট রঙের পুলওভার, উলের কালো ট্রাউজার থেকে বাদামের খোসা ঝেড়ে ফেলে দীর্ঘ, সুপুরুষ, শ্যামল রঙের ছটফটে তরুণ। তরুণীর কপালে কুমকুমের টিপ রোদের শেষ আলোয় ঝলসে ওঠে, কমলা রঙের শাড়ির রূপোর আঁচল উত্তরের হাওয়ায় ওড়ে। তরুণের কানে কানে সে কি যেন বলে, ওরা দুজনেই হেসে ওঠে।

তার বুকের ভেতরে ওদের সুখের কাঁটা বিঁধছে, সে টের পায়। সুখ কমলেশের জন্যে নয়, সে জানে। বুকের মধ্যে যতই বিকালবেলার তিতির ডানা মেলতে চেয়ে ছটপট করুক' কমলেশের বুক এখন ভর দুপুরের নক্‌শীকাঁথার মাঠ, সেখানে যে জলের ফোঁটা হয়ে ঝরতে পারত, বুকের জমিতে ফসল ফলাতে পারত সে এখন একশ মাইল দূরে উৎপল চৌধুরীর বৌ সেজে ঘর আলো করে বসে আছে। ভালবাসা নয়, বিষ, ভালবাসার বিষ! সেই বিষের জ্বালায় কমলেশের মাথার উস্কোখুস্কো চুলে পাক ধরেছে, কপালের চামড়াটা কুঁচকে গেছে, পুরু ঠোঁটের কোণটা হামেশাই বেঁকে থাকে, ঝিলের জলে নিজের ছায়া দেখতে দেখতে কমলেশ ভাবে। ওই সবের জন্যে মনে মনে সে সুলতাকেই দোষ দেয়।

এক বছর আগে এমন একটা চমৎকার বিকেলে ভিক্টোরিয়ার সামনে কেয়ারি-করা ফুল, ঝিল-জল কিংবা নিভে যাওয়া রোদে ঘাসের গালিচা দেখতে সে নিশ্চয়ই একা আসত না। সুলতা সান্যালের সঙ্গে তার বয়সের তফাৎ যদিও নিদেনপক্ষে দশ বারো বছর, যদিও কলেজে সে বোটানির লেকচারার, সুলতা তার ছাত্রী, তবু দু'জনের ভাব-ভালবাসা দিনদিন যেমন জমে উঠছিল, বিয়েটাও হয়তো হয়ে যেত। বেচারা কমলেশ বয়স কালে পড়াশুনো আর রিসার্চ নিয়ে এত মেতেছিল, সমবয়সী মেয়েদেব কেউ তখন পুতুলনাচ নাচাতে পারেনি। প্ল্যান্ট-বায়োকেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট পেয়েছে কমলেশ, শহরের সেরা সরকারি কলেজে চাকরি পেয়েছে। মা-বাবা অনেককাল মারা গেছেন, ভাই-বোনেরা সংসার পেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে কে কোথায় সরে গেছে। প্রেম-ট্রেম নিয়ে জীবনে মাথা ঘামায়নি কমলেশ, সুলতার সঙ্গে দেখা না হলে ওসব আজেবাজে চিন্তা-ভাবনা তার মাথায় আসত কিনা সন্দেহ। সুলতার বাবা-মা নেই, মামার

বাড়িতে মানুষ। কমলেশের মতো সুপাত্র পেলে মামা এককথায় রাজি হয়ে যেত। সব যখন প্রায় ঠিকঠাক, গোলমাল বাঁধালো সুলতা নিজে।

ফুল যতই মনমাতানো গন্ধ বিলাক, ফুলের আশেপাশে কীট থাকবে, থাকতে বাধ্য, কমলেশ জানে। সুলতা ওদের ক্লাসের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে, দু'চারটে চ্যাংড়া ছেলে ওর কাছে ঘুরঘুর করছে দেখলে সে বিচলিত হ'ত না। কিন্তু ওদের মধ্যে উৎপল ছোকরাকেই যে বেছে নেবে সুলতা, দুজনেই পড়াশুনোর বারোটা বাজিয়ে হঠাৎ বিয়ে করে বসবে, কমলেশ আন্দাজ করতে পারেনি। ধীরস্থির মানুষ কমলেশ, সুলতা অনার্স নিয়ে পাশ করবে, তারপর এম. এস-সি. পড়বে, তারপর ওকে চাকরিতে ঢোকাতে হবে, তারপর কিংবা তারও কিছুদিন পরে চাকরি করে কিছু টাকা জমলে বিয়ের প্রস্তাব করবে কমলেশ। কিন্তু রাবণের সিঁড়ির মতো কমলেশ মজুমদারের আকাশছোঁয়া প্ল্যানগুলো শেষ হ'ল না, তার আগেই দু'দিনের পরিচয়ে উৎপলকে বিয়ে করে বসল সুলতা। উৎপল দেখতে দারুণ স্মার্ট, রাঙামুলোর মতো চোখ কেড়ে নেয়। যদিও পড়াশুনোয় ভাল নয়, স্বভাবে বিশ্ব-বখাটে, রাজগাঁর জমিদার-নন্দন। পড়ার নামে কলেজ হোস্টেলে থাকতে ইয়ার-বন্ধুদের সঙ্গে দুহাতে পয়সা ওড়াত, খাঁটি আর মেকি সোনার তফাৎ বুঝল না সুলতা। কমলেশের বন্ধুরা এখনও হায় হায় করে। পড়াশুনোয় কোনকালেই মন ছিল না সুলতার, কমলেশ ওকে নিয়ে যতই স্বপ্নের বেলুন ওড়াক। উৎপলকে গেঁথে ফেলেই ও কলেজ থেকে নাম কাটাল, উৎপল তো কলেজ ছাড়তে পারলে বাঁচে, ওরা দু'জনেই এখন রাজগাঁয়ে সুখের ঘরকন্না পেতেছে।

অন্তত আজ সকাল অবধি কমলেশের তাই ধারণা ছিল। ইতিমধ্যে কমলেশ আরও রোগা হয়েছে, চেহারাটা আরও বুড়োটে মেরে যাচ্ছে। আজ সকালে সুলতার হাতে-লেখা খামটা পেয়ে ও চমকে উঠেছিল।

সুলতা লিখেছে, কমল, জানি তুমি আমার ওপর রাগ করেছ। এই শয়তানটার পাল্লায় পড়ে আমি তোমাকে ঠকিয়েছি। শয়তান নিঃসন্দেহে উৎপল, ওই ব্যাপারে কমলেশের দ্বিমত নেই। দ্বিগুণ উৎসাহে চিঠি পড়েছে কমলেশ, এক বছর ধরে তোমাকে চিঠি লেখার কথা অনেকবার ভেবেছি, লিখব লিখব করতে করতে লেখা হয়ে ওঠেনি। হুঁ, তা তো বটেই, কমলেশের ঠোঁটের কোণটা আবার কুঁচকে যায়, তুমি প্রথম প্রথম উৎপল চৌধুরীর লাল্টু মার্কা চেহারা দেখে, ওদের সাবেকি বাড়ির বউ হয়ে ভেবেছিলে, দারুণ দাঁও মেরেছ, তখন বেচারা কমলেশকে তোমার মনে পড়বে কেন? কলেজের বান্ধবী শ্রীলেখাকে সেই আমলে চিঠি লিখেছিলে তুমি, হয়তো আমাকে নিয়ে মজা করবে বলেই শ্রীলেখা চিঠিটা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। রাজগাঁ জায়গাটা যদিও গ্রাম, এখানে ইলেকট্রিক আছে। তুমি গদগদ হয়ে লিখেছিলে ওদের বাড়িতে ফ্রিজ, হটপ্লেট, প্রেসার কুকার সবই আছে, রান্না-বান্নার ঝামেলা কম। বীরাই নদীতে চমৎকার মাছ পাওয়া যায়, তোরা যদি কখনও আসিস... তোমার সেই চিঠিটা পড়তে পড়তে আমি চোখ বন্ধ করেও দেখতে পেয়েছি, সুলতা নামের যে মেয়েটিকে নিয়ে আমার অনেক আশা ভরসা ছিল, সে এখন রাজগাঁর জমিদার গিন্নি সেজে রান্নাঘরে ফ্রাইংপ্যানে মাছ ভাজছে, শাড়ির আঁচলে হলুদ লেগেছে, কপালে ঘামের ফোঁটা, কমলেশের কথা তার একটুও মনে পড়ে না। আজ এতদিন পরে ভালবাসার রঙ একটু ফিকে হয়েছে বলে, না উৎপল ছোকরার সঙ্গে

ঝগড়া-ঝাটি হয়েছে বলে পুরোনো প্রেমিককে মনে পড়েছে সুলতার, কে জানে। অবশ্য এসব কথা ভেবে লাভ নেই, বেচারা কমলেশ জানে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চিঠিটা আবার পড়তে শুরু করে কমলেশ। তোমাকে দুঃখ দিয়েছিলাম বলে উচিত শাস্তি পেয়েছি। উৎপল একটা পশু, মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে আমাকে বিয়ে করে আমার সর্বনাশ করেছে। ওর বাবা মারা যাওয়ার পরে যখন ওর হাতে অনেক টাকা পয়সা এলো, তখন থেকেই ওর আসল রূপটা দেখতে পাচ্ছি। প্রায় দিনই মদ গিলে বাউরি মেয়েদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করতে ছোটে, বেশী রাতে বাড়ি ফিরে আমাকে মেজাজ দেখায়। আমার বাবা-মা নেই, বিয়ে দিতে পেরে মামা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে, ওর কথায় ভুলে কলেজের পড়াও শেষ করলাম না। মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া আমার কোনো উপায় নেই বুঝেই ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।

এতক্ষণে কমলেশের মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটেছে। জমিদারি খতম হয়ে জমিদার না হয় জোতদার হয়েছে, তাবলে পারিবারিক ঐতিহ্য একটা আছে তো! রাজগাঁর জমিদার-নন্দন যদি গরিব মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সুলতাকে বিয়ে করে বিলকুল স্ত্রৈণ বনে যায়, উৎপল চৌধুরীর পূর্ব পুরুষের উত্তরাধিকার কে নেবে তাহলে? ওইসব বেলেল্লাপনা হোস্টেলে থাকতেও কম করেনি উৎপল, সুলতা নেহাৎ বোকা না হলে আগেই টের পেত। সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে প্রথম প্রথম একটু বোধহয় সামলে চলেছিল ছোকরা, এখন টাকা পয়সা হাতে পেয়ে খোলামকুচির মতো ওড়াচ্ছে।

ওইসবের একটা বিহিত করা দরকার। সুলতা লিখেছে, সোমবার সন্ধ্যেবেলা তোমার কাছে ট্রাঙ্ককল কবব বলে ঠিক করেছি, ফোনে সব কথা বলব।

চিঠিটা সোমবারই পেয়েছে কমলেশ। এই জায়গাটা তার বড় প্রিয়। সুলতার সঙ্গে ভাব-সাব হবার পরে ওরা দু'জনে ভিক্টোরিয়ার আশেপাশে ঘাসে রুমাল পেতে চিনেবাদাম, সাড়ে বত্রিশ ভাজা চিবিয়েছে অনেক বিকেলে। সুলতা চলে যাওয়ার পরেও এখানে প্রায়ই আসে কমলেশ। এখন ও একা, আশেপাশে কোনো প্রেমিক-যুগল দেখলে ও আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের হাব-ভাব দেখে, কথা শোনে।

গাছের আড়ালে চাঁপার কলির মতো আঙুল বাড়ায় যুবতী, হাত ধরতে গিয়ে যুবকের বুকে ফোটে তাজা গোলাপ। দেখা এবং না-দেখা ফুল শুধু কমলেশই দেখতে পায়। ওরা হঠাৎ হেসে উঠছে, ওরা বেসুরে গান গাইছে। শোনা এবং না-শোনা গান শুধু কমলেশই শুনতে পায়। তার গাড়ি নেই, বাড়ি নেই, হয়তো মনের বয়সের গাছ-পাথর নেই। সে বুড়ো বটের আড়ালে একলা দাঁড়িয়ে ওদের দেখে।

আজ তার তাড়তাড়ি ঘরে ফেরার পালা। বাগবাজারে গত পনেরো বছর ধরে ভাড়াবাড়িতে আছে কমলেশ। এক ঘরের ফ্ল্যাট, ব্যাচেলার মানুষের ঘর যেমন হয়, তেমনি অগোছালো। ওর সম্পত্তি বলতে ব্যাগ-ভর্তি অজস্র বই, ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস। স্যুটকেসে জামাকাপড়ের নিচে সুলতার একটা ফটো, কিছু চিঠি। ছিঁড়বে বলেও ছিঁড়তে পারেনি কমলেশ। ওই বাড়িতে কস্মিনকালেও আসেনি সুলতা, কমলেশই আসতে দেয়নি। আসলে কমলেশ নিতান্ত নীতিবাগীশ, পিউরিট্যান টাইপের মানুষ, বিয়ের আগে সুলতার সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে কয়েকটা নিষেধের গণ্ডি ও নিজেই টেনে দিয়েছিল। বাড়িটায় ফোন আছে, অ্যাটাচড বাথরুম আছে, দশ বছরে ভাড়া সামান্যই বেড়েছে। তাছাড়া ট্রামে-বাসে কলেজ যেতে বেশি সময় লাগে না। এক এক সময়

একঘেয়ে লাগলেও বাসাবদলের কথা কখনও ভাবেনি কমলেশ। সত্যি কথা বলতে কি, কমলেশের মতো মানুষেরা সহজে কিছু বদলায় না, না তার বাসা না তার দূরে-যাওয়া হারিয়ে-যাওয়া প্রেমিকা।

• ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সন্ধ্যে সাতটা বাজতেই ফোন বেজে উঠল। কমল, দূরভাষিণীর গলাটা কেমন অচেনা লাগে, চিঠি পেয়েছিলে?

হুঁ, ঢোক গিলে জবাব দেয় কমলেশ, আমার বলার কিছু নেই। উৎপল চৌধুরী কেমন ধরনের ছেলে, কলেজে সবাই জানত। তুমি যে না বুঝে স্রেফ ঝোঁকের মাথায়—

বলছি তো, আমার ঘাট হয়েছিল, সুলতা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, তখন মানুষ চিনতাম না, নইলে তোমাকে মিছিমিছি কষ্ট দিয়ে ওই রকম একটা হাড়বজ্জাৎ লোকের সঙ্গে—

তা এখন কি ভাবছ? কমলেশ সোজাসুজিই বলে, আমি তোমার জন্যে সারা জীবন অপেক্ষা করতে পারি। তুমি যদি উৎপলকে ডিভোর্স করতে চাও—

না, সুলতার চুল মেঘের মতো কালো, তার ধূসর চোখ দেখলে ধূপছায়ার সন্ধ্যাবেলার নদীর কথা মনে পড়ে। তার মোমের মতো সাদা নরম মুখে কখনও রুক্ষ্মতার ছাপ দেখেনি কমলেশ। অথচ ফোনে ওর গলাটা আশ্চর্য কঠিন মনে হয়, না, সবাই জানে, উৎপলকে আমি ভালবেসে বিয়ে করেছি। এখন ডিভোর্স করতে চাইলে লোকে হাসবে, টিটকিরি দেবে তাছাড়া—একটু থেমে সুলতা বলে, উৎপল বড়লোকের ছেলে, মফঃস্বলে ওদের বাড়ি, জমি, অঢেল সম্পত্তি, বিয়ের আগে হাজারবার শুনেছি। মফঃস্বল বলতে যে রাজগাঁর বাঁশবন, আশশ্যাওড়ার জঙ্গল আর চাষাদের আস্তানা তখন বুঝিনি। কলকাতা থেকে এখানে এসে প্রথম প্রথম কত কষ্ট করে এই পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছি, সে তুমি বুঝবে না। এখন আমাকে এখান থেকে তাড়িয়ে উৎপল আর ওই লেডি ডাক্তার লাখ টাকার সম্পত্তি ভোগ করবে, সে আমি হতে দেব না—

অর্থাৎ শ্বশুরের ছেলেকে অসহ্য লাগলেও শ্বশুরেব সম্পত্তি বেহাৎ হতে দিতে চায় না সুলতা। কিন্তু এর মধ্যে লেডি ডাক্তার এলো কোথা থেকে? বাউরি মেয়েদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে উৎপল, চিঠিতে জানিয়েছে সুলতা! কিন্তু লেডি ডাক্তারের ব্যাপারে কিছু লেখেনি। সাত-পাঁচ ভেবে কমলেশ বলে বসে, লেডি ডাক্তার আবার কে?

উৎপলেব নতুন বান্ধবী, সুলতার গলার ঝাঁঝে টেলিফোনের তারটাই বোধহয় পুড়ে যাবে, এখানকার সবকারি হাসপাতালের ডাক্তার, মেয়েদের ডাক্তারের সঙ্গে পুরুষ মানুষের এত কি ঘন ঘন দরকার জানতে চাইলে কি বলে জান? বলে, মিস সোম নাকি আগে কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টে হাউস-ফিজিসিয়ান ছিল। উৎপলের হার্ট নাকি খুব খারাপ, লেডি ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা না করালে সারবে না—

সুলতার কথা বলাব ভঙ্গি শুনে জোরে হেসে ওঠে কমলেশ।

তুমি হাসছ? সুলতা ককিয়ে ওঠে, লোকটাকে দেখলে আমার গা ঘিনঘিন করে ওঠে আজকাল। সকাল-বিকেল ডাক্তারনির সঙ্গে আড্ডা, ওর কথামতো রোজ ইঞ্জেকশন নিচ্ছে উৎপল, বোধহয় শরীরের তাগদ বাড়াবে বলে। এদিকে রোজ রাত্রিবেলা মদ গিলে টলতে টলতে বাড়ি ফিরবে, সকালে উঠে ব্রেকফাস্টে গোটা চারেক সেদ্ধ ডিম না পেলে প্যাঁচার মতো

মুখ হয়ে যায় ওনার, ডাক্তার সোম নাকি হাই প্রোটিন ডায়েট খেতে বলেছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি মুখ ফুটে বিয়েটা ভেঙে দিতে চাইলে হাসিমুখে রাজি হয়ে যাবে উৎপল, দু'দিন পরে ওই মিস রাজরানী হয়ে এ বাড়িতে আসবে। আমি তা হতে দেবো না কমল, আমি সব কিছুর শোধ নেবো। দরকার হলে নিজের হাতে উৎপলকে খুন করে ফাঁসিতে চড়ব, সেও ভাল—

না, তার বোধহয় দরকার হবে না, ধীর স্থির মানুষ কমলেশ, বেশ ভেবেচিন্তে কথা বলে, রাজগাঁয় তোমাদের বাড়ির আশেপাশে অনেক বাঁশবন, তাই না?

হুঁ, বিরক্ত, হয়তো একটু অবাকও হয়েছে সুলতা।

সদ্য বর্ষা শেষ হয়েছে, একটু একটু শীত পড়েছে। বাঁশের সরু সরু কচি ডগাগুলো, বর্ষাকালে যেগুলো ভিজে মাটির ওপরে উঁকি দেয়, এতদিনে নিশ্চয়ই কিছুটা বড় হয়েছে—

কমল, ভাল হচ্ছে না কিন্তু, রাগে ফুঁসে ওঠে সুলতা, আমি কি করব তাই বলো। ওসব বাঁশ-টাশ নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার সময় নেই—

এই তো তোমার দোষ, কমলেশ অনুযোগ করে, একটুতেই ধৈর্য হারাও। বাঁশের ওই কচি ডগাগুলোতে কি আছে জান?

না, কোনোমতে মেজাজ সামলায় সুলতা, বোটানি পড়তে আমার বিচ্ছিরি লাগত, কেমিস্ট্রির নাম শুনলে জ্বর আসত। বাঁশের ডগায় কি আছে?

ধুররিন। এক রকম গ্লাইকোসাইড, বোটানির লেকচারার বিদ্যে ফলায়, গ্লাইকোসাইড কাকে বলে মনে আছে?

হ্যাঁ স্যার, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে কমলেশকে স্যার বলে প্রাক্তন ছাত্রী, গাছ থেকে পাওয়া যায় সাদা, খেতে তিত, ভেতরে গ্লুকোজ অ্যালকোহল মেন্থল আরও কিসব হাবিজাবি পাওয়া যায়। আপনার ওই সাবজেক্টে থিসিস আছে আমার খেয়াল আছে, বছরখানেক আগে গ্লাইকোসাইডের বদলে আমার ওপরে একটু বেশি নেকনজর দিলে আমি এই শয়তানটার পাল্লায় পড়তাম না—

বাঁশের কচি ডগায় পাওয়া যায় এইরকম একটা গ্লাইকোসাইড, নাম ধুররিন, বিদ্রূপগুলো বেমালুম হজম করে নির্বিকার গলায় বলে কমলেশ, ওর ভেতরে আছে বিপজ্জনক পরিমাণে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড, মারাত্মক বিষ!

বিষ! এবার সুলতাও চমকে ওঠে, তাই নাকি?

ধর তুমি কোনো অজুহাতে মামার বাড়ি চলে এলে, হাল্কা গলায় কমলেশ বলে, ধর, আসার আগে সুযোগ বুঝে বাড়ির আশপাশ থেকে বাঁশের ওই কচি ডগাগুলো জোগাড় করলে। এবার তোমার খানিকটা ইথার দরকার, ওষুধের দোকানে নিশ্চয়ই পাবে—

বাড়িতেই আছে, সোৎসাহে বলে সুলতা, উৎপল রোজ ইঞ্জেকশন নেয়, কম্পাউন্ডার ইঞ্জেকশন দেওয়ার আগে চামড়ায় ইথার বুলোয়—

বেশ, তাহলে বাঁশের কচি ডগাগুলো কুচি কুচি কেটে কাঁচের বন্ধ শিশিতে ইথারে ভিজিয়ে রাখ এক ঘণ্টা। তারপর ইথারটা সিরিঞ্জে ভরে ফেল—

অসম্ভব, সুলতা প্রতিবাদ জানায়, আমি ইঞ্জেকশন দিতে গেলে উৎপল নেবে কেন?

না, না, আমি তা বলছি না, কমলেশ আশ্বাস দেয়। উৎপল সকালবেলা সেদ্ধ ডিম খেতে ভালবাসে বলছিলে না? ব্রেকফাস্টে ডিম আমারও পছন্দ, তবে সেদ্ধ নয় ওমলেট হলেই ভাল হয়...

ঠিক আছে, এই শয়তানটার হাত থেকে মুক্তি পেলে সারাজীবন তোমায় ওমলেট ভেজে খাওয়াব। ট্রাঙ্ককলের সময়ের মেয়াদ পেরিয়ে গেছে বলে দু'দুবার ওয়ার্নিং দিয়েছে অপারেটর, হু হু করে চার্জ উঠছে, এ সময় ডিম নিয়ে কমলেশের ফক্কিকারী অসহ্য লাগে সুলতার। কি করতে হবে তাই বলে ফেল—

ডিম একটা অদ্ভুত জিনিস, জান সুলতা, কমলেশ কিন্তু এখনও ডিমের প্রসঙ্গ ছাড়ে না, হাঁস বা মুরগীর ডিম, যদি খোলাটা আস্ত থাকে, লোকে ভাবে, ওর ভেতরে বিষ-টিষ কিছু ঢুকবে না। অথচ দেখ, ল্যাবরেটরিতে আমরা হামেশা ডিমের খোলার ভেতরে সরু ছুঁচ ঢুকিয়ে এগ এম্ব্রিয়ো'র ওপরে নানারকম কেমিকেল বা ড্রাগের কাজ পরীক্ষা করি।

ইউরেকা! গল্পকাহিনী আর্কিমিডিসের মতো চেঁচিয়ে ওঠে সুলতা, তাহলে ইথারটা একটা ডিমের ভেতরে সরু নিডল দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেই চলবে। তারপর ডিমটা ফ্রিজে রেখে—

একটা নয়, এক ডজন, কমলেশ ভেবেচিন্তে বলে, শুধু একটা ডিমের ভেতরে হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড থাকবে। এমনিতেই হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড পয়জনিং, সহজে বোঝা যায় না। ধর যদি নেহাতই কারও সন্দেহ হয়, অন্য ডিমগুলো পরীক্ষা করে দেখা যাবে, কোনটাতেই বিষ নেই—

নিতান্ত রিসার্চের প্রয়োজনে ছাড়া জীবনে প্রাণী হত্যা করেনি কমলেশ। অথচ উৎপলকে খুন করার নিপুণ উপায়টা ও এমন অনায়াসে বাতলে দিল যেন উৎপল ওর বায়োকেমিস্ট্রির ল্যাবরেটারির একটা গিনিপিগ, যাকে ওর ছাত্রী বিজ্ঞানের প্রয়োজনে অবলীলায় মেরে ফেলতে পারে।

দিন তিনেক পরে কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতেই সিঁড়ির গোড়ায় বাড়িওলার বৌ সুনন্দা ওকে পাকড়াও করল। বেশ লোক আপনি যাহোক, ভদ্রমহিলা হাসি চেপে বললেন, বিয়ে করলেন চুপিচুপি, আমাদের একবার জানালেন না পর্যন্ত—

বিয়ে? মানে? কমলেশ প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায় না।

থাক, আর ভান করতে হবে না, সুনন্দা ধমক দেয়, বৌদি সব আমাকে বলেছে। দিব্যি তো ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন মশায়, বৌ সারাদিন ট্রেনজার্নি করে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে, সে খেয়ালটুকু নেই। ভাগ্যিস লতা বৌদি বুদ্ধি করে আমায় ডাকল—

লতা অর্থাৎ সুলতা মামার বাড়ি না গিয়ে যে সোজা এখানেই চলে আসবে স্বপ্নেও ভাবেনি কমলেশ। এক বছর নয়, যেন এক যুগ পরে দেখা। সুলতা একটু মোটা হয়েছে, রঙের আরও জেল্লা খুলেছে, স্থানুর মতো দেখে কমলেশ।

তোমার ফোন নম্বরটা আমি ওর ডাইরিতে লিখে রেখে এসেছি। বলেছি, ওটা মামার পাশের ফ্ল্যাটের ফোন নম্বর, দরজা বন্ধ করে সুলতা হাসে, সুখবরটা এখানেই পাব—

অগোছালো ঘরটা সুলতার হাতের ছোঁয়ায় দেখতে দেখতে বদলে যায়। ধুলোর স্তূপ সরে

যায়, আলনায় কমলেশের শার্ট-ট্রাউজার ছুঁয়ে থাকে সুলতার শাড়ি ব্লাউজ। কমলেশ যেন স্বপ্নের ভেতরে দেখে।

কিন্তু সুলতা, তুমি এখানে, এই ঘরে একা—একসময় সে বলে ওঠে।

একা নয়, দুজন, সুলতা ওর শরীর ঘেঁষে দাঁড়ায়, বুকে মাথা রাখে, তুমি ভীষণ বোকা কমল। তুমি আমাকে কেন কাছে আসতে দাওনি, কেন জোর করে ঘরে টেনে আননি, আমি কি এমন দামী যে তুমি ছুঁলে ভেঙে যেতাম, নষ্ট হয়ে যেতাম?

কমলেশ জবাব খুঁজে পাওয়ার আগেই দুটো লোভী হাতের বাঁধনে সে ধরা পড়ে। তার রোগা বুকের আড়ালে রক্তের নদী দুলে ওঠে।

আজও ফোন এলো না, রোজ রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে সুলতা বলে।

অপেক্ষা কর, কাল নিশ্চয়ই খবর পাবে।

ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে ওঠে। ট্রাঙ্ককল! রিসিভার ধরে থমথমে গলায় বলে সুলতা। কমলেশ লাফিয়ে উঠতে গিয়ে কফিটা চল্কে ওর জামায় পড়ে। আমি রাজগাঁর থানার ও. সি. বলছি, টেলিফোনে দুঃখিত স্বর ভেসে আসে, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আপনার স্বামী উৎপলবাবু হঠাৎ মারা গেছেন। ডাক্তার যদিও হার্ট অ্যাটাক বলে সন্দেহ করছেন, ডেডবডি পোস্টমর্টেমের জন্যে পাঠানো হয়েছে। আপনি ফিরে এলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব—

তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে, রাতের ট্রেনেই রাজগাঁয়ে ফিরবে বলে স্যুটকেস গোছাতে গোছাতে সুলতা বলে।

বেশ! কমলেশ কেমন যেন অন্যমনস্ক। উৎপলের সুস্থ সবল পুরুষালি চেহারাটা ওর চোখের সামনে ভাসে। সুখ চেয়েছিল কমলেশ, সে কি কারও মৃত্যুর মূল্যে?

রাতের ট্রেনে বাঙ্কে শুয়ে আরামে ঘুমোচ্ছে সুলতা! কমলেশের চোখে ঘুম নেই। যদি কোনো দিন সুলতা আমাকে সহ্য করতে না পারে, কমলেশ ভাবে, ভালাবাসা যদি ঘৃণায় বদলে যায়, ও কি উৎপলের মতো আমাকেও পথের কাঁটা ভেবে সরিয়ে দিতে চাইবে না?

বাজগাঁয়ে উৎপলের প্রকাণ্ড বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। উৎপলের অপঘাত মৃত্যুটা দত্যি-দানো বা অপদেবতার কারসাজি ভেবে ঝি-চাকরেরা পালিয়েছে, তিন মহলা বাড়িটা এখন একেবারে ফাঁকা।

বসবার ঘরে উৎপলের প্রকাণ্ড বড় একটা অয়েলপেন্টিং-এর সামনে চেয়ারে নির্বাক বসে আছে কমলেশ। মুখ চোখ শুকনো, সারা শরীরে রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি। ফ্রিজ খুলে সুলতা দেখে, এখনও দুটো ডিম আছে, একটা মাখনের প্যাকেটও রয়েছে। হঠাৎ কমলেশের দিকে চোখ পড়তে ও চমকে ওঠে। বেচারার শরীর এক রাতেই কাহিল হয়ে পড়েছে, রাতে কিছুই খায়নি কমল, বোধ হয় খুব ক্ষিধেও পেয়েছে ওর।

কিটব্যাগে শুধু পাঁউরুটি আছে, কুণ্ঠিত হয়ে বলে সুলতা, ফ্রিজে মাখন আছে, আর পরের কথাটা যেন ওর গলায় জড়িয়ে যায়, আর ডিম—

ডিমের কথা মুখে আনতেই ভয় লাগছে বুঝি? এতক্ষণে কমলেশের মুখে হাসি ফোটে, আমাকে সারাজীবন ব্রেকফাস্টে ওমলেট ভেজে খাওয়াবে, ঠাট্টা করেছিলে, মনে আছে?

সুলতাও মুচকে হেসে ডিম দুটো আর মাখনের প্যাকেটটা বার করে রান্নাঘরের দিকে যায়। গরম গরম টোস্ট, ওমলেট আর চা, দশ মিনিটেই খাবার তৈরি। কমলেশের সামনে প্লেটে খাবার সাজিয়ে দেয় সুলতা, নিজে শুধু এক কাপ চা নেয়। কমলেশ আপত্তি করলে ও হাসে, বলে, কাল রাত থেকে না খেয়ে আছ। কি হয়েছে তোমার বল তো?

না, কিছু না, কথা বাড়াতে চায় না কমলেশ। উস্কোখুস্কো চুল, চোখ দুটো কেমন যেন ঘোলাটে, ও টোস্টে কামড় দেয়।

পাশের ঘরে ফোনের শব্দ। খাওয়া বন্ধ করে উঠতে যায় কমলেশ। তুমি খাও, আমি দেখছি, বাধা দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সুলতা।

আমি থানা থেকে বলছি, ও. সি'র গলা কানে আসে, ডি. এম-ও জানিয়েছেন, পোস্টমর্টেম হয়ে গেছে। আজ দুপুরে সদর থেকে বডি পাঠানো হবে।

পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট? সুলতা কৌতূহলী হয়ে বলে।

রিউমেটিক কারডাইটিস ছিল। মাইট্রাল ভ্যাল্ভ রাপচার হয়েছে, ও. সি. জানান, আপনি তো জানেন, হার্টের অসুখের জন্যে মিস সোম ওঁকে অনেক চিকিৎসা করেছেন—

হার্টের অসুখ! চমকে ফোনটা ছেড়ে দিয়ে পাশের ঘরে ছোটে সুলতা।

টেবিলে প্লেটের ওপরে টোস্ট বা ওমলেটের একটি টুকরোও নেই। আর টেবিলের ওপরে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছে কমলেশ, তার মুখ অস্বাভাবিক রকমের লাল, যেন শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে এসে ফেটে পড়েছে।

কমল, শোন! তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগাতে চায় সুলতা, বিষে নয়, হার্টের অসুখে মারা গেছে উৎপল—

কিন্তু কমলেশ শুনতে পায় না। ভালবাসার বিষ তার শিরায়, ধমনীতে অবিরাম বয়ে চলেছে।

# জবানবন্দী

## উৎপল ভট্টাচার্য

এক মুহূর্তে পৃথিবীটা যেন আমার কাছে মিথ্যে হয়ে গেল। চলছিল অনেকদিন ধরেই মামলাটা। আজ রায় বেরিয়ে গেল। বাবা রাত্রে বাড়ি ফিরলেন ফিল্মের নামজাদা হিরোইনকে নিয়ে। আর ঠিক সেই সময়েই চিত্রজগতের হিরোর গাড়ি এসে আমার মাকে তুলে নিয়ে গেল। যাবার সময় বাবা মাকে শেষ চুমু খেলেন। শ্রীমান হিরো আমার হিরোইন নতুন মাকে জড়িয়ে ধরে শেষ আদর করলেন। একটু পরেই বাড়িটা কেমন ঝিম্ মেরে গেল।

রাত অনেক হয়েছে নিশ্চয়ই। মাঝে মাঝে এক আধটা মোটব হলস্‌স্ করে চলে যাচ্ছে। এলাকাটা অবশ্য এমনিতেই নির্জন। নির্জন আমার বুকের মধ্যেটাও। মনে পড়ল আগামী পরশুদিন আমার ল'পরীক্ষা শুরু। কিন্তু .....নাঃ, এ বাড়িতে আর নয়। এক্ষুনি চলে যেতে হবে। এক্ষুনি।

কিন্তু কোথায় যাব? কার কাছেই বা যাব? আমার যাবার জায়গাই বা কোথায়? যে ক'টি জায়গা জানি সবখানেই তো এই অবস্থা! অবশ্য রমেন, লিলি, সুভাষ—সবাই—সবাইয়েরই আমার মতোই অবস্থা। তফাতের মধ্যে ওদের মা-বাবাদের এখনও বিচ্ছেদ হয় নি। হবেও না বোধ হয়। ওদের মা-বাবারা সুন্দর এ্যাডজাষ্ট করে নিয়েছে নিজেদের ভেতর। ওদের ছেলেমেয়েরাও যা খুশি তাই করছে। ওঁরাও করছেন। ইংরেজের উচ্ছিষ্টভোজী আমাদের এই সমাজই তো আজও দেশে সার্থকতার প্রতিভূ! আমরাই তো ঈশ্বরের নির্বাচিত সমাজ। আমাদের নকল করেই তো আপনারা—বাকী সমাজের বৃহত্তর অংশরা বাঁচেন। থাক এ সব তত্ত্ব কথা। আমার এই একুশ বছরের জীবনে কম তো আর দেখলাম না। যাক্। এখন কোথায় যাই! হ্যাঁ, অংশুদের বাড়িতেই যাই। ওখানে লিলি আছে। অংশুর বোন। ওর প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে। ওর বাবা আমার ব্যারিষ্টার বাবার চেয়ে অনেক বড়লোক। বিজনেস্ ম্যাগনেট যাকে বলে। ওর কাছেই যাই।

গেটের কাছে আসতেই দারোয়ান (আমাকে চেনে) সেলাম ঠুকলো। হলঘরে বোধ হয় পার্টি চলছে। ওদের বাড়িতে তো পার্টি লেগেই আছে। আজকে আবার কিসের পার্টি।

ভেতরে হৈ-হল্লা বাজনা চলছে। আর জোড়ায় জোড়ায় নাচ। উঁকি মারতেই একেবারে অংশুর মায়ের মুখোমুখি। আমাকে দেখেই উনি বললেন, হ্যাল্লো, কাবুল। এসো! তুমি বরং ওপরে অংশুর ঘরে চলে যাও! ওরা সবাই আছে। আমি মাথা নেড়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে

গেলাম। অংশুর ঘর আমার চেনা। ঘরের ভেতরটা ধোঁয়ায় অন্ধকার। কি উগ্র গন্ধ! কে যেন ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে টলায়মান অবস্থায় এগিয়ে এলো। লিলি, ওর পরনে একটি লুঙ্গি। কিন্তু ওপরে ব্রেসিয়ার ছাড়া আর কিছু নেই। আমাকে দেখেই লিলি দু'হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ে আমাকে একটা চুমু খেল। তারপর বলল, উই আর সেলিব্রেটিং আওয়ার মাদার্স টোয়েন্টি-নাইনথ্ বার্থ ডে! হাউ নাইস অফ্ ইউ টু কাম। এসো, ভেতরে এসো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ওদের সঙ্গে মিশে গেলাম। কোথা দিয়ে ক'টা যেন মাস না বছর কেটে গেল। নিজের দিকে তাকিয়ে এখন আমি নিজেকেই চিনতে পারি না। পুরোপুরি হিপ্পি একেবারে।

কিন্তু একদিন একটি ঘটনা ঘটল। অংশুদের ঘরেই। আমরা পাঁচজন ছেলে তিনজন মেয়ে। গাঁজার কল্কেয় সিদ্ধির সঙ্গে মৌজ করে টানছি। হঠাৎ রমেন লিলির হাত ধরে টানল। লিলি গা এলিয়ে দিল। রমেন লিলির লুঙ্গিটা খুলতে যেতেই আমি বাধা দিলাম। রমেন আমাকে সরিয়ে দিয়ে বলল, হোয়াই আর ইউ বিইং সো হিপোক্রিটিক্যাল? বী অনেস্ট! কিন্তু আমি ততক্ষণে রমেনকে এক ঘুষি মেরে শুইয়ে দিয়েছি। লিলি উঠে পড়ে আমাকে আঁচড়াতে খামচাতে লাগল আর বলতে লাগল, ইউ ব্রুট্, সোয়াইন্, গেট আউট—গেট আউট ! আর সকলে আমার অবস্থা দেখে হাসতে লাগল খ্যা-খ্যা করে!

আমি রাগে দুঃখে মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলাম। আবার পালাতে হবে আমাকে , এখান থেকে। কোথায়? হঠাৎ মনে পড়ল কাঠমাণ্ডুতে খুব বিদেশী হিপ্পিদের সমাবেশ হয়। হ্যাঁ, সেখানেই চলে যাই। পরদিনই দার্জিলিং মেলে চেপে বসলাম।

কাঠমাণ্ডু ছোট জায়গা। একটি হিপ্পি বস্তির মধ্যে আস্তানা জুটে গেল। কিন্তু ও ব্যাটারা আমার চাইতেও হাড়-হাভাতে। তিনটে ছেলে চারটে মেয়ে। আমি জুটে গিয়ে সমান সংখ্যা হ'ল। কিন্তু কারো কাছেই পয়সা নেই। আমার কাছে যা ছিল তাই দিয়ে ক'দিন হোটেলে খুব ফুর্তি করা গেল। এর মধ্যে একটি ফরাসী মেয়ে ন্যান্সির সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। ভয় করত কি কিউরিওর দোকানে ঢুকে দাম দস্তুরের অছিলায় চুরি করত। তারপর সেগুলো বড়লোক আমেরিকান ট্যুরিস্টদের কাছে বিক্রি করত। বাকী মেয়ে তিনটে সোজা বেশ্যাবৃত্তি করত। ও এমন কি পাঁচ ছ' টাকায় দেহ বেচত। বেশীদিন আমার এই সব ভাল লাগল না। ভাবলাম এবার একটি মোটা রকম দাঁও মেরে পালাতে হবে। কাজ আমি শুরু করে দিলাম। আমরা যে হোটেলে খানাপিনা করতাম তার উল্টো দিকে একটি ব্যাঙ্ক। আমি লক্ষ্য রাখছিলাম। আর সব নোট করে নিচ্ছিলাম। ম্যানেজার শর্মা সব চেয়ে আগে আসেন। তখনই দু'জন জমাদার এসে সব পরিষ্কার করে দিয়ে চলে যায়। ঠিক পৌনে ন'টার সময় আসে দু'জন মেয়ে ক্লার্ক—তারপরেই দরজা বন্ধ হ'য়ে যায়। বোধ হয় ক্যাশ গোনার পর্ব চলে। তারপর পৌনে দশটার সময় অবার দরজা খোলে। তখন বাকী কর্মচারীরা আসতে আরম্ভ করে।

প্ল্যান ঠিক করতে লাগলাম মনে মনে। কি ভাবে কি করব এই সব। অসুবিধা দেখা দিল যে আমি নিরস্ত্র। একটি অস্ত্র না থাকলে—এই সব ভাবতে ভাবতে রোজকার মতো ডেরায় ফিরলাম সন্ধ্যের পর।

ছোট্ট ঘরটায় জোর হৈ-হল্লা চলছে। একজন নতুন বিদেশী দেখলাম। বোধ হয় জার্মান। ন্যান্সিকে কোলের ওপর নিয়ে বসে খুব গাঁজায় দম দিচ্ছে। আমি গিয়ে এক কোণে বসলাম। গাঁজার কলকে ঘুরে ঘুরে আমার হাতেও এলো। এক লম্বা টান মেরে পাশের মেয়েটার হাতে দিলাম। ধোঁয়াটা চেপে রেখে টান হয়ে শুতে যেতেই মাথায় একটা ঠোক্কর খেলাম। স্যুটকেশ! নিশ্চয়ই ওই জার্মানটার। হাত বুলোতে বুলোতে হঠাৎ ক্লিক্ করে একটা শব্দ হ'ল। ঘরে দেখি স্যুটকেশটার পেছনে একটা ছোট্ট লম্বা খোপের মতো খুলে গেছে। ভেতরে এটি কি? একটি শর্টগান! এক প্যাকেট গুলি! আমি একবার ওদের দিকে তাকালাম সবাই গাঁজা টানায় মত্ত। আমি আস্তে আস্তে শর্টগান আর বুলেটের প্যাকেটটি নিয়ে নিজের আলখাল্লার ভেতর লুকিয়ে ফেললাম। তারপর স্যুটকেসের বোতাম টিপে খোপটা বন্ধ করে দিলাম।

এক ফাঁকে ঘরের বাইরে বেরিয়ে পায়খানার পেছনে একটি পাথরের নীচে ওগুলো রেখে ঘরে এসে বসলাম। কতক্ষণ কেটে গেল। চারদিক নিস্তব্ধ। আমার ঝিমুনি আসছিল। পেটটা চোঁ চোঁ করছিল ক্ষিদেয়। পয়সা নেই খাব কি? হঠাৎ একটি শব্দে চমকে উঠলাম। দেখি ন্যান্সি সেই জার্মানটার বুকের ওপর চেপে বসে দু'হাতে তার গলা টিপে ধরেছে। জার্মানটি বিনা প্রতিবাদে খুন হ'ল। ততক্ষণে বাকী সবাই উঠে বসেছে। বুঝলাম সব মটকা মেরে পড়েছিল। জার্মানটি মরেছে বুঝতে পেরেই সবাই স্যুটকেসটার ওপর হামলে পড়ল। পাওয়া গেল প্রচুর ভারতীয় টাকা। সবাই যে যাকে পারে জড়িয়ে ধরে চুমোচুমি করতে লাগল। বুঝলাম আমি, ইণ্ডিয়ান এখনই এখান থেকে সরে না পড়লে বিপদ আমারও। তাছাড়া এই অল্প টাকা নিয়ে কামড়া-কামড়ি কি দরকার। আমার কাছে এ টাকা তো অল্পই। ব্যাঙ্কের ভলটে তার চেয়ে—

ওদের উচ্ছ্বাসের ফাঁকে আমি ঘর ছেড়ে বেরোলাম। তখন ভোর হয়ে আসছে। সেপ্টেম্বর মাস। তবু শীত বেশ। শর্টগানটি আর বুলেটগুলো আলখাল্লার নীচে নিয়ে রেড়িয়ে পড়লাম। এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরতে ঘুরতে রোদ্দুর উঠল। আটটা বাজল। আমি গুটি গুটি পায়ে ব্যাঙ্কের উল্টো দিকের হোটেলের সামনে দাঁড়ালাম। এদিকটা বেশ নির্জন। হোটেলের কারও ঘুম ভেঙেছে মনে হ'ল না। সওয়া আটটা।

ম্যানেজার শর্মার গাড়ি এসে ব্যাঙ্কের গেটে থামল। শর্মা নিজেই ড্রাইভ করে। শর্মা ভেতরে ঢুকল। সময় বয়ে যাচ্ছে। জমাদার দু'জন কাজ করে চলে গেল পৌনে ন'টায়। দুটো মেয়ের গলা পেলাম। ক্লার্ক দুজন ঢুকছে। এবার আমাকেও ঢুকতে হবে। এখনই এক ঘন্টার জন্যে দরজা বন্ধ হবে। তার আগেই কাজ সারতে হবে। সন্তর্পণে পিছু নিলাম মেয়ে দুটোর। ওরা ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করার আগেই অমি ঢুকে পড়লাম। ওবা হক্‌চকিয়ে প্রতিবাদ করতে যেতেই আমার শর্টগানের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। ম্যানেজার শর্মাও এগিয়ে এসে চুপ করে গেল। আমি শর্মাকে ইংরেজীতে বললাম, ভল্টের চাবিটা দাও। শর্মা পকেট থেকে মেঝেয় ফেলল। আমি একটা মেয়ে ক্লার্ককে বললাম এটা তুলে নিতে। আরেকটি মেয়ে নিঃশব্দে কাঁদছে তখন। চাবি হাতে মেয়েটাকে বললাম, ভল্ট খুলে বড় নোট একটি থলেতে ভরবার জন্য। মেয়েটা ভয়ে ভয়ে তাই করতে লাগল। শর্মা ওর টেবিলের কাছে চেয়ারটায় বসে পড়ল। আমি দাঁত কড়-মড়িয়ে বললাম, কোনো রকম বজ্জাতি করতে গেলে মরবে। চুপচাপ বসে থাক।

তাড়াতাড়ি, মেয়েটিকে তাড়া লাগালাম। মেয়েটি থলে টেনে এনে পায়ের কাছে রেখে দিল। আমি নিচু হ'য়ে টাকাগুলো পরীক্ষা করতে গেলাম। এক মুহূর্তেরও ভগ্নাংশ! মনে হ'ল কে যেন একটি একশ'টন হাতুড়ি দিয়ে আমার মাথায় মারল।

সাঁ করে ঘুরেই দেখলাম শর্মার হাতে একটি ৪৫ রিভলবার। প্রথমে বুঝতেই পারলাম না গুলিটা আমার কোথায় লেগেছে! তারপর মনে হ'ল যে বাঁ হাতে আমি টাকার ব্যাগটি তুলতে যাচ্ছিলাম সেটা আর নড়াতে পারছি না। চোখে চোখে পড়তেই শর্মা ফের ট্রিগার টিপতে গেল। কিন্তু তার আগেই আমার শর্টগান থেকে গুলি বেরিয়ে গেছে। আর ম্যানেজার শর্মা লুটিয়ে পড়েছে। এই সমস্ত ঘটতে দশ বারো সেকেণ্ডের বেশী লাগে নি। আমি শর্টগানটি কোমরে গুঁজে টাকার থলেটা ডান হাত দিয়ে কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এলাম ব্যাঙ্ক থেকে । মেয়ে ক্লার্ক দুটো পাথুরে মুর্তির মতো তখনও দাঁড়িয়ে।

সোজা শর্মার গাড়িতে উঠে বসলাম। বাঁ হাতটা নাড়াতে পারছি না। মাথাটা মাঝে মাঝে ঘুরে যাচ্ছে। হোটেলের দোতলার বারান্দায় দু'চারজন আমাকে দেখছে। দুটো বুড়ি রাস্তায় চলতে চলতে থেমে পড়ে অবাক হয়ে আমার দিকে দেখছে। আমার বাঁ দিকটা রক্তাক্ত। গাড়িতে স্টার্ট দিলাম।

হয়তো পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথে কিছু দূর গেছি, পিছনে শুনলাম সাইরেন বাজিয়ে ক'টা গাড়িই বুঝি আসছে।

# শেষ বিস্ময়

## বসুমিত্র দত্ত

নীহারিকা সোম বললেন—মিঃ সামন্ত, এই আমার মেয়ে আরতি; আপনি অবশ্য ইচ্ছে করলে ওকে রতি বলেও ডাকতে পারেন।

হ্যাঁ, তাই ডাকবো আমি। ভারী সুন্দর মেয়ে তোমার নীহার। একে আরো আগে আননি কেন তুমি।

আপনিই তো বলেছিলেন স্কুলের পড়া শেষ করে তারপর।

বলেছিলাম বুঝি? অন্যমনস্কভাবে বললেন অবিনাশ সামন্ত। নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরালেন আবার। একমুখ কটুগন্ধ ধোঁয়া ছুঁড়ে ভারী করে তুললেন বাতাস।

আরতি মুখ নীচু করে বসেছিল। ওর দৃষ্টি ছিল মেঝের দিকে। এবার মুখ তুলে তাকাল সে। সামনেই অবিনাশ সামন্তর কঠিন, ভারী মুখের প্রোফাইল। যৌবনে নিশ্চয় সুপুরুষ ছিলেন অবিনাশ সামন্ত। গ্রীসীয়ান কাটের মুখ। একমাথা ব্যাকব্রাশ করা চুল এখন সামান্য পাতলা হতে শুরু করেছে। চওড়া কপাল। ভুরুর নীচে উজ্জ্বল একজোড়া চোখের দৃষ্টিতে প্রখর ব্যক্তিত্ব। দৃঢ়বদ্ধ চাপা ঠোঁটের নীচে ধারোলো চিবুক। মনে হয় এ পুরুষ জীবনে পরাজয় স্বীকার করতে শেখেনি। নিজের সংকল্প থেকে বিচ্যুত হবার মানসিকতা স্বপ্নেও হানা দেয়নি ওকে। আরো ভাবলো—এই সেই মানুষ, যিনি বাবা মারা যাবার পর স্বেচ্ছায় বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, স্বচ্ছলতার আবরণে মুড়ে দিয়েছেন ওদের জীবন। না হলে কত কিই যে হতে পারতো ভাবতেও ভয় পায় আরতি। মা'র মুখে শুনেছে এসব কথা। অথচ আশ্চর্য্য। বাবা নাকি এঁকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। কেন?

আমাকে কেন ডেকেছেন কিছুই তো বললেন না কাকু।

কাকু! যেন চমকে উঠলেন অবিনাশ সামন্ত। দৃষ্টি ফেরালেন নীহারিকা সোমের দিকে— মেয়েকে শিখিয়ে পড়িয়েই এনেছো নাকি নীহার?

না, মোটেই না। জিজ্ঞেস করুন ওকে। যেন সমর্থনের আশাতেই নীহারিকা সোম আরতির দিকে তাকালেন।

বেশ বেশ। বুদ্ধিমতী মেয়ে তোমার নীহার। এই রকম মেয়েই তো দরকার আজকের যুগে। যে মেয়ে জীবনের পথে চলতে হোঁচট খায় না অকারণ, পিছিয়ে পড়ে না দ্বিধায়। তুমি কি বলো আরতি, স্যরি রতি।

আপনি ঠিকই বলেছেন কাকু। সায় দিল আরতি। এতক্ষণে কিছুটা সহজ হয়েছে ও। —এখনো কিন্তু বলেননি কেন ডেকেছেন আমাকে।

বলছি। অত ব্যস্ত হয়ো না। জোরে, গলা কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন অবিনাশ সামন্ত। —তার আগে বলতো কি-কি আজ তুমি জানো, কোন্ কাজ করতে পারবে তুমি?

আমি..... আমি টাইপ শিখছি।

টাইপ? আবার হেসে উঠলেন অবিনাশ সামন্ত। এবার আরো জোরে। না-না, ওসবের কোনো দরকার নেই। আজ একটা ছোট্ট কাজ দেবো তোমাকে। সহজ কিন্তু খুব কঠিন, সুন্দর কিন্তু অতি ভয়ংকর। পারবে তো? কথা শেষ করে আরতির চোখের দিকে অকৌতুকে চাইলেন অবিনাশ সামন্ত।

চোখ নামিয়ে নিল আরতি। কেমন ভয় ভয় করছিল ওর। একবার আড়চোখে চাইল মা'র দিকে। কিন্তু অন্য দিকে তাকিয়ে আছেন নীহারিকা সোম।

এবার সত্যি ভয় পেল আরতি। পরিবেশটা ঘোলাটে হয়ে উঠছে ক্রমে। কেমন যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে অবিনাশ সামন্ত নামের মানুষটিকে।

আবিনাশ সামন্ত আবার বললেন—ভয় পেলে নাকি রতি।

ডাইনে বাঁয়ে মাথা হেলালো আরতি। না, ভয় ও পায়নি। তবু চেষ্টা করেও মনের অস্বাচ্ছন্দ্যটুকু কিছুতেই দূর করতে পারছিল না ও। কি এমন কাজ যার জন্য এত ভূমিকা দরকার হয়? তার মা-ই বা কেন এমন চুপচাপ? কেন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে অন্যমনস্কতার ভান করতে চাইছেন প্রাণপণে।

সাব, কফি।

চমকে মুখ ঘোরালো আরতি। হিলহিলে চেহারার লোকটা কফির ট্রে নামিয়ে রাখছে টেবিলের ওপর। বসন্ত লাঞ্ছিত মুখ। করাল ব্যাধি নিষ্ঠুর থাবায় ছিনিয়ে নিয়েছে এক চোখের দৃষ্টি। তার জন্য আরো কুৎসিত, আরো ভয়াবহ দেখাচ্ছে মুখটা। একবার দেখেই মুখ ফিরিয়ে নিল আরতি।

কফির ট্রে টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দেই আবার ফিরে গেল লোকটা।

হাত বাড়িয়ে কফির একটা কাপ তুলে নিলেন অবিনাশ সামন্ত। বললেন—কানা লতিফ। আমার বিজনেসের একজন কর্মী। প্রায় একযুগ রয়েছে আমার কাছে। বড় বিশ্বাসী। বার তিনেক প্রাণ বাঁচিয়েছে আমার।

আপনার বিজনেসে প্রাণের ভয়ও আছে নাকি? বেপরোয়াভাবে জিজ্ঞেস করলো আরতি।

আছে বইকি। লম্বা একটা চুমুক দিয়ে কফির কাপটা প্লেটের ওপর নামিয়ে রাখলেন অবিনাশ সামন্ত। জানালা দিয়ে উদাস দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলেন বাইরে। —সব বড় কাজের ভয় থাকে। তার জন্য পেছিয়ে পড়লে তো চলবে না। অবশ্য তোমার যদি কোনো দ্বিধা থাকে তো বলো। স্টিল ইউ হ্যাড় টাইম টু থিংক ওভার দি ম্যাটার। তবে মনে রেখো, আজকের এই ছোট্ট কাজটা করতে পারলেই কিন্তু তোমার মায়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হাজার টাকার চেক জমা পড়বে।

না-না আমি মোটেই ভয় পাইনি। তাড়াতাড়ি বললো আরতি।—আপনি বলুন কি কাজ।

এইতো লক্ষ্মী মেয়ের মতো কথা। মৃদু হাসলেন অবিনাশ সামন্ত। —তোমার ভ্যানিটি ব্যাগটা তো বেশ বড়ই দেখছি। হ্যাঁ, ওতেই হবে। শোনো, ওই ব্যাগে করে কিছু জিনিষ নিয়ে আজ রাত ঠিক সাড়ে নটায় তুমি যাবে হাজরা পার্কের পাশের সুরু গলিটায়। সেখানে বড় বাদামগাছের নীচে ওভারকোট পরে একজন অপেক্ষা করবে তোমার জন্য। লোকটার মাথায় থাকবে ফেল্ট ক্যাপ। তুমি তার কাছে গিয়ে নীচু গলায় বলবে—হরতনের বিবি। সে বলবে—রুইতনের সাহেব। ব্যস্, অমনি তুমি ব্যাগ থেকে জিনিষগুলো বার করে ওর হাতে

দেবে। তারপর ফিরে যাবে বাড়িতে। গলিটা এমনিতেই অন্ধকার। তারপর লাইট পোস্টের দুটো বাল্‌ব্ ফিউজ হয়ে গেছে। কোনো অসুবিধে হবে না।

সাড়ে ন'টায়? চিন্তার রেখা ফুটলো আরতির কপালে। ঠিক সাড়ে আটটায় যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে প্রবালের সঙ্গে গড়িয়াহাটের মোড়ে। তার কি হবে? কত কথা, কত স্বপ্ন! এক ঘন্টার মধ্যেই শেষ করা যাবে কি সব?

অবিনাশ সামন্ত বুঝি পড়তে পারলেন ওর মনের কথা। বললেন—কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে বুঝি? ক্যানসেল করে দাও। তারপর নীহারিকার দিকে তাকিয়ে বললেন—নীহার, পাশের ঘরের আলমারী খুলে জিনিষগুলো বের করে তোমার মেয়ের ভ্যানিটিব্যাগে ভরে দাও। রতি, আজ থেকে তুমিও আমার ব্যবসার একজন হলে। এখন বাড়ি যাও। কিন্তু মনে রেখো, ঠিক সাড়ে ন'টায়। আর আড়াইঘন্টা পর। কব্জি ঘড়িতে সময় দেখলেন অবিনাশ সামন্ত।

সিঁড়ি দিয়ে নামছিল আরতি। পাশে নীহারিকা সোম। ওর মা। ব্যাগটা অসম্ভব ভারী লাগছে। কি আছে এতে? মাকে জিজ্ঞেস করতে ভরসা হচ্ছে না। থাক, বাড়ি গিয়ে জানতে চাইবে। সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দেবার আগের মুহূর্তে হঠাৎ কানে এলো অস্পষ্ট পদশব্দ। কেউ যেন লঘুপায়ে সতর্ক ভঙ্গীতে পেছনে আসছে। কে? চকিতে মুখ ফেরালো আরতি। বাঁকের মুখে কানা লতিফের হিলহিলে দেহটা। একটা আর্ত চীৎকার বেরিয়ে আসতে চাইল আরতির গলা দিয়ে—মা!

চুপ! চাপা স্বরে ওকে থামিয়ে দিলেন নীহারিকা। —লতিফ আমাদের পাহারা দেবার জন্য যাচ্ছে। বাড়ী পর্যন্ত আমাদের পেছনে থাকবে।

বাড়ীতে পৌছে কিন্তু আর চুপ করে থাকলো না আরতি। এতক্ষণের অবরুদ্ধ কৌতুহল ফেটে পড়তে চাইলো যেন—মা, বলো কিসের বিজনেস মিঃ সামন্তর? এই ব্যাগের মধ্যে কি আছে? কি আমাকে পৌছে দিতে হবে আর রাত সাড়ে ন'টার সময়? কি-কি? দুহাতে নীহারিকা সোমের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগলো আরতি।

কয়েক মুহূর্তে স্থির চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন নীহারিকা। তারপর প্রায় শোনা যায় না এমন গলায় বললেন—মিঃ সামন্তর বিজনেসের কোনো সাইনবোর্ড নেই রতি, নেই কোনো রেজিস্ট্রেশন নাম্বার; কারণ তার দরকার হয় না। আর ব্যাগের মধ্যে কি আছে জিজ্ঞেস করছিস্? কি আছে আমিও ঠিক জানি না। হয়তো কাগজেব প্যাকেটের মধ্যে রয়েছে কোকেন, হয়তো হেরোইন অথবা ম্যানড্রেক্স্ কিংবা অন্য কোনো নারকোটিক ড্রাগ। এগুলো সব...

এগুলো সব? চুপ করে থেকোনা মা। বলো এগুলো কি?

এগুলো সব স্মাগলড্ জিনিষ। যেন কোনো পাথরের মূর্তি কথা বলে উঠলো নীহারকি সোমের গলার মধ্য দিয়ে।

তার মানে... তার মানে আমি তুমি আমরা স্মাগলার! ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো আরতি।

হ্যাঁ, রতি। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো নীহারিকা সোমের। —তুই বোস রতি, আমি তোর জন্য এককাপ গরম দুগ্ধ নিয়ে আসি। ধীর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন নীহারিকা সোম। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা বন্ধ করে দিল আরতি।

ছিঃ ছিঃ প্রবাল যখন শুনবে, কি ভাববে ও? একদিন না একদিন নিশ্চয়ই জানতে পারবে সব। তখন? একটা স্মাগলারের সঙ্গে এতদিন মেলা-মেশা, ঘনিষ্ঠতা করেছে বলে মনে কি ধিক্কার আসবে না প্রবালের? নিশ্চয় আসবে। তার থেকে আরতি নিজেই সরে আসবে

প্রবালের জীবন থেকে। আজ তো দেখা হবেই না। কাল ও দেখা করবে না আরতি। কাল না, পরশু না, কোনোদিন না। প্রবালের জীবন থেকে সরে যাবে আরতি। মুক্তি দেবে প্রবালকে।

এলোমেলো এইসব চিন্তা যখন আরতির মনটা তোলপাড় করে তুলছে তখনই বেজে উঠলো ফোনটা।

তাড়াতাড়ি ফোন ধরলো আরতি।

হ্যালো, কে, প্রবাল?

দূরভাষণ যন্ত্রের ভেতর থেকে প্রবালের গলা ভেসে এলো—স্যরি রতি, আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারছি না। ভীষণ একটা জরুরী কাজে আটকে গেছি। কাল নিশ্চয় দেখা হবে। থেকো কিন্তু। ছাড়ছি, বাই।

রিসিভারটা ক্রেডেলের ওপর রাখতে রাখতে আরতি মনে মনে বললো—স্যরি প্রবাল, আজ কেন, আর কোনোদিনই তোমার সঙ্গে দেখা হবে না আমার, কোনোদিনও না। ম্লান, বিষন্ন একটুকরো হাসি ফুটে উঠলো ওর ঠোঁটের কোনে।

গলিটা অন্ধকার। শুধু আশপাশের বাড়ীগুলোর ঘরের বিজলিবাতির দু-এক চিলতে আলো জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে কৃপণের মতো উঁকি মারছে। সেই অস্পষ্ট আলো আঁধারীর মধ্যে আরতি দেখলো, ঝাঁকড়া বাদাম গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ওভারকোটের কলার তুলে দেওয়া, ফেল্ট ক্যাপটা মাথার একদিকে হেলানো। ওর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা।

ধীর পায়ে এগোতে লাগল আরতি। লোকটার পাশে এসে চাপা গলায় বললো—হরতনের বিবি।

রুইতনের সাহেব। লোকটা ঘুরে দাঁড়াল।

রতি!

প্রবাল!

কয়েক সেকেণ্ড মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল দুজনে। অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না ভালো করে। কতক্ষণ পর আরতি বলল—তাহলে আজই দেখা হলো আমাদের। হ্যাঁ আমাদের।

হ্যাঁ, প্রবালের দীর্ঘশ্বাস পড়ে একটা। —এ পথে কেন এলে?

আগে বলো তুমি কেন এলে?

জানি না।

আমিও না।

কতক্ষণ চুপ করে থাকে প্রবাল। তারপর বলে—কালও হয়তো দেখা হবে আমাদের।

হ্যাঁ। কাল, পরশু, হয়তো প্রতিদিন। হাসে আরতি। —বলে জিনিসগুলো নেবে না?

হ্যাঁ, দাও। ক্লান্ত হাত বাড়ায় প্রবাল। কাগজের বড়োসড়ো ভারী প্যাকেটটা নিজের কিটব্যাগে বন্দী করে এক পা একপা করে অস্পস্ট আলো-আঁধারীর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় প্রবাল। ক্রমে ওর গতি দ্রুত হয়।

যতদূর দৃষ্টি যায় আরতি তাকিয়ে থাকে প্রবালের দিকে—না না, প্রবাল নয়, স্মাগলিং বিজনেসের ওর এক সহকর্মীর দিকে।

# অথ মার্জার মূষিক কথা

## মঞ্জিল সেন

বিমলা দেবী কি একটা কাজে একতলায় লাইব্রেরী ঘরে ঢুকেছিলেন। তিনি নিঃসন্তান বিধবা। স্বামী মিলিটারিতে ডাক্তার ছিলেন, ব্রিগেডিয়ারের পদমর্যাদায় উঠেছিলেন। রিটায়ার করার পর পৈতৃক ভিটের অকর্ষণে এই অজ পাড়াগাঁয়ে ফিরে এসেছিলেন। ভিটে বলতে জমিটুকু ছাড়া আর কিছুই ছিল না, বাড়ি যা ছিল তা অনেকদিন আগেই মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সেই জমির ওপর দোতলা পাকাবাড়ি তিনি তুলেছিলেন। সারা জীবন তিনি প্রচুর উপার্জন করেছিলেন তাই বাড়ির পেছনে টাকা ঢালতে তিনি কার্পণ্য করেন নি। বাড়ি ভোগ করা কিন্তু তাঁর ভাগ্যে ছিল না। ওটা শেষ হবার ঠিক এক বছরের মাথায় তাঁর পরপারের ডাক এলো। চোখ বোজবার আগে তিনি তাঁর অন্তিম ইচ্ছে বিমলা দেবীকে জানিয়ে গিয়েছিলেন। সেই ইচ্ছে বা নির্দেশ অনুসারেই বিমলা দেবী তাঁর দেওরের একমাত্র সন্তান অলকেশকে তাঁর কাছে এনেছেন। অলকেশের নব পরিণীতা বধূ বিপাশাও অবশ্য সঙ্গে এসেছে। অলকেশই যে ভবিষ্যতে তার জ্যেঠাইমা'র বিষয় সম্পত্তির মালিক হবে তা আর গোপন কথা নয়।

বিমলা দেবীর বয়স পঞ্চাশ পেরোলেও তিনি বেশ শক্ত সমর্থ। স্বামীর সঙ্গে চিরটাকাল দিল্লী, সিমলা, পুণায় কাটিয়েছেন। তাই আর পাঁচজন বাঙালী মেয়ের মতো নরম নন। তিনি শুধু হুকুম দিতেই অভ্যস্ত নন, হুকুম পালন করাতেও অদ্বিতীয়া।

বিমলা দেবী টেবিলের একটা দেরাজ খুলেই চেঁচিয়ে উঠলেন। বেশ জোরেই চেঁচিয়েছিলেন, কারণ দোতলায় তাঁর শোবার ঘরে অলকেশের কানে সেই চিৎকার পৌঁছুলো। খোঁড়া পায়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে সে নিচে নেমে এলো। খোঁড়া অবশ্য অলকেশ জন্ম থেকে নয়। সেও আর্মিতে ছিল। কাশ্মীর ফ্রন্টে থাকার সময় পাক সৈন্যদের এক অতর্কিত গুলি তাকে চিরকালের মতো খোঁড়া করে দেয়। আর্মির অ্যাকটিভ সার্ভিসেও সেই সঙ্গে যবনিকা নামে। অলকেশ এমনিতে কিন্তু সুপুরুষ, মা-বাপ হারা সাতাশ বছরের যুবক। একমাস হ'ল সে সস্ত্রীক এখানে বাস করছে।

কি হয়েছে জ্যেঠিমা? অলকেশ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

দেরাজের মধ্যে একটা রিভলবার, বিমলা দেবী আতঙ্কে আঙুল দিয়ে দেরাজটা দেখানেল।

অলকেশ বিমলা দেবীর পাশে এসে দাঁড়াল। দেরাজের দিকে তাকিয়ে সে বলল, কার এটা? কোথা থেকে এলো?

সেটাতো আমিও জানতে চাই। তুমি রাখ নি?

না। আমি এটা আগে চোখেই দেখি নি।

ওটার তো আর পাখা নেই যে উড়ে আসবে। হয়তো তোমার বউ রেখেছে। বিমলা দেবীর ঠোঁটের কুঞ্চন স্পষ্টই বুঝিয়ে দেয় যে, তিনি অলকেশের বউকে মোটেই পছন্দ করেন না।

বিমলা দেবীর কথায় অলকেশের মুখ লাল হয়ে উঠল। সে বলল, তোমার সামনেই ওকে আমি জিজ্ঞেস করছি। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সে হাঁক দিল, বিপাশা, বিপাশা।

কেন? মিষ্টি নারী কণ্ঠ ভেসে এলো।

একবার নিচে এসো তো।

দোতলায় সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে বাইশ তেইশ বছরের যে যুবতীকে দেখা গেল, তাকে সুন্দরী বললে বোধহয় সঠিক বর্ণনা হবে না। নিখুঁত ফর্সা মুখ, দু'গালে সামান্য লালা ছোপ। রাঙা ঠোঁট একটু ছড়ানো, যেন প্রলুব্ধ করতে চায়। বড় বড় আয়ত দু'চোখের দৃষ্টিতে যেন নিবিড় মায়া। ঘন কালো চুল শ্রাবণ মেঘের কথা মনে করিয়ে দেয়। সবচেয়ে সুন্দর হ'ল তার সুঠাম তনু। একটা নীল রঙের শাড়িতে তাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল।

বিপাশা ঘাসের চটি পায়ে তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো। অলকেশের মুখ স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে গেল। বিপাশার একটা হাত ধরে সে লাইব্রেরীর ঘরের দিকে এগিয়ে গেল, কোনো কথা বলল না।

বিমলা দেবী ওদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। বিপাশাকে দেখা মাত্র তিনি বলে উঠলেন, এই দেরাজের রিভলবারটা কি তোমার?

হ্যাঁ।

তোমার! অলকেশ সবিস্ময়ে বলে উঠল, তোমার রিভলবার ছিল জানতাম না তো!

আগে ছিল না, বিপাশা তার দিকে ফিরে বলল, মাত্র কালই আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে একজনের কাছ থেকে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড কিনেছি।

কিন্তু কেন? অলকেশের বিস্ময় তখনও কাটে নি।

বিপাশা যেন একটু সঙ্কোচ বোধ করল, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, এ বাড়িতে আসার পর থেকে কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব আমাকে পেয়ে বসেছে। বাড়িতে এত সব দামী জিনিসপত্র আর নগদ টাকা, আমার সব সময় ভয় হয়, এই বুঝি চোর ডাকাত এসে পড়বে। তোমাকে তো আমার ভয়ের কথা বলেছি। তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে চোর ডাকাতের হাতে আমাদের নিজেদের বিপদের সম্ভাবনাকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে আমি ওটা কিনে ফেলেছি, আমাদের আত্মরক্ষার জন্য বাড়িতে কিছু একটা থাকা ভাল।

বিপাশা অলকেশের দিকে তাকিয়ে এমন মোহিনী হাসি হাসল যে অলকেশ জল হয়ে গেল। বিমলা দেবীর দিকে ফিরে সে বলল, শুনলে তো জ্যেঠিমা।

বিমলা দেবী অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে বিপাশার দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছিলেন। অলকেশের কথার জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ শুনলাম। তারপরই তিনি চেঁচিয়ে চাকর রঘুকে ডাকলেন। তাকে বললেন, থানায় গিয়ে দারোগাবাবুকে বলতে যে, একটা বিশেষ দরকারে তিনি যেন এখুনি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। রঘু চলে গেল।

থানা তাঁর বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক পা। দারোগাবাবুর সঙ্গে বিমলা দেবীর এখানে আসার

পর থেকেই পরিচয়। তাঁর স্বামী আর্মির ডাক্তার ছিলেন, ব্রিগেডিয়ার পর্যন্ত হয়েছিলেন, তার ওপর প্রচুর টাকা পয়সার মালিক। মফঃস্বলের একজন দারোগার সম্ভ্রম জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট।

রঘু চলে গেলে বিপাশা অলকেশেব দিকে তাকাল, তার দৃষ্টিতে শঙ্কার সঙ্গে আহত নাগিনীর দৃষ্টি। অলকেশও ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে। সে বলল, এই ঘরোয়া ব্যাপারে থানায় খবর দেবার কি দরকার ছিল জ্যেঠিমা?

বিমলা দেবীর শীতল দৃষ্টি তাকে চুপ করিয়ে দিল।

দারোগা ঘনশ্যাম দাস খুব তাড়াতাড়িই এসে পড়লেন।

মিঃ দাস, বিমলা দেবী তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, আপনাকে এমন করে ডেকে আনার জন্য প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অলকেশদের দেখিয়ে বললেন, এদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। অলকেশ, আমার দেওরের ছেলে আর বিপাশা, অলকেশের বউ।

ঘনশ্যাম দাস তার ভরাট মুখে হাসি টেনে দু'হাত কপালে ঠেকালেন।

মিঃ দাস, আপনার সঙ্গে আমি বেশ কয়েকবারই এ বাড়িতে টাকা-পয়সা বা দামী জিনিসপত্র রাখার ব্যাপারে আলোচনা করেছি। আমাব দেওরপো বিয়ে করেছে মাত্র দু'মাস। আমার এখানে ওরা এসেছে গত মাসে। বিপাশা, মানে আমার দেওরপো'র বউ, বাড়িতে এসব জিনিস থাকায় বড়ই চিন্তায় পড়েছে। আপনি এদের সামনে আমাকে বলুন তো, আপনারা আমার বাড়ি চোর ডাকাতের হাত থেকে রক্ষার ব্যাপারে সজাগ কি না?

দারোগা একটু, অহঙ্কারের সঙ্গেই জবাব দিলেন, অবশ্যই। আপনার বাড়িতে কোনোদিন চুরি হয়েছে কি?

না, বিমলা দেবী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন। মিঃ দাস, আমি খানিক আগে এই দেরাজে কি আবিষ্কার করেছি দেখুন। দারোগাকে তিনি খোলা দেরাজের দিকে নিয়ে গেলেন।

দারোগা দেরাজের মধ্যে রিভলবারটার দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন তারপর বললেন, কার এটা?

এটা আমার দেওরপো'র বউয়ের। বিমলা দেবী আঙুল দিয়ে বিপাশাকে দেখিয়ে বললেন। থামলেন তিনি। একটু পরে আবার শুরু করলেন, আপনি বসুন মিঃ দাস, কেন আপনাকে খবর দিয়েছি তা এবার বলছি। তোমরাও বসো।

সবাই বসল। বিমলা দেবীর অনুরোধ প্রায় আজ্ঞারই সামিল আর তা পালন করতেই যেন সবাই অভ্যস্ত।

ও বলছে, বিপাশাকে দেখিয়ে তিনি বলতে শুরু করলেন, এ বাড়ির টাকা পয়সা বা দামী জিনিসপত্র চোর ডাকাতের হাত থেকে বাঁচাবাব জন্যই নাকি রিভলবারটা কিনেছে। মনে রাখবেন মিঃ দাস, এ বাড়ির কিছুই কিন্তু মেয়েটির নয়, যার জন্য তার দুশ্চিন্তা হতে পারে। তবু ও স্বেচ্ছায় বাড়ি পাহারা দেবার ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। আচ্ছা মিঃ দাস, সত্যি বলুন তো, রিভলবাব রাখার পক্ষে যুক্তিটা তেমন জোরালো বলা চলে কি?

বিপাশার গলা থেকে গাল পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। সে বলল, স্বীকার করছি আমার কাজটা হয়তো একটু বাড়াবাড়িই হয়ে গেছে।

বিমলা দেবী নাক কুঁচকোলেন। মিঃ দাস, আমার মনে হয় 'একটু' বাড়াবাড়ি নয়, কাজটা উদ্দেশ্যমুলক এবং একটা গভীর ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

জ্যেঠিমা, তুমি কি বলতে চাইছ? অলকেশ এবার বলে উঠল।

আমি বলতে চাইছি তোমার বউ আমাকে খুন করার জন্যই ওই রিভলবারটা এনেছে।

বিপাশা উঠে দাঁড়ালো। তার দু'চোখ থেকে যেন আগুন ঝরছে। ঠোঁট থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল, কিন্তু কোনো শব্দ বার হ'ল না। অলকেশও উঠে দাঁড়িয়েছে। সে যেন তার জ্যেঠিমার কথা শুনে হতবাক হয়ে গেছে।

দারোগাবাবুই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, মিমেস গাঙ্গুলী, এ যে গুরুতর অভিযোগ। তা ছাড়া তেমন কোনো সত্যিকার প্রমাণ নেই।

কিন্তু বিমলা দেবী তাঁর যুক্তিতে অটল। তিনি বললেন, আমার কথা এখনও শেষ হয় নি। বিপাশার রিভলবার রাখার অজুহাত যে ভিত্তিহীন তা আশাকরি আপনি স্বীকার করবেন। আমার উইলে আমি অলকেশকে সমস্ত বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করেছি। অলকেশ আগে আর্মিতে ছিল, কিন্তু আহত হওয়ায় অবসর নিয়েছে। দু'মাস আগে দিল্লীতে বিপাশার সঙ্গে ওর দেখা হয়, তারপরই বিয়ে। বিপাশার পারিবারিক ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। আমার ধারণা বিপাশা জানতে পেরেছিল, অলকেশ আমার বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী এবং সেই টাকা পয়সার লোভেই ও অলকেশকে বিয়ে করেছে। অলকেশের কথা ভেবেই আমি বিপাশাকে গ্রহণ করেছি। আমি কিন্তু স্বপ্নেও ভাবতে পারি নি যে, বিপাশা আমার বিষয় সম্পত্তির জন্য অধৈর্য হয়ে উঠবে। আমি ওদের পথের কাঁটা, তাই আমাকে সরাবার জন্য বিপাশার এই ব্যস্ততা, রিভলবারটা তাই সে কিনেছে।

দারোগার মুখ চিন্তাকুটিল হয়ে ওঠে। তিনি যে বিমলা দেবীর কথায় ও যুক্তিতে বেশ প্রভাবান্বিত হয়েছেন তা বোঝা যায়। কপাল কুঁচকে তিনি বললেন, আপনি যে সম্ভাবনার কথা বলছেন তা একেবার উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তবু একটা অপরাধ ঘটতে পারে এমন নির্দিষ্ট প্রমাণ নেই।

বিমলা দেবীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। দারোগার মনে তিনি সন্দেহের বীজ বপন করে দিয়েছেন।

আমাকে ভুল বুঝবেন না মিঃ দাস, তিনি মৃদু হেসে বললেন, আমি হত্যার চেষ্টার এমন কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ আনছি না। সম্ভাবনার কথাই বলছি। অলকেশও যদি এই ব্যাপারে বউয়ের পরামর্শ মতো চলে তবে আমি অবাক হ'ব না। আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, বিপাশা দেখতে ভাল, অলকেশের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো রূপ তার আছে।

অলকেশ এত আশ্চর্য হয়ে গেছে যে নিজের স্বপক্ষে কিছু বলার মতো ভাষা যেন সে খুঁজে পাচ্ছে না।

আমি আপনার কাছে আর একটা সাহায্য চাই। আগে একবার এই বাড়ির ওপর নজর রাখার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম। আপনিও আমাকে অনুগ্রহ করেছিলেন। এবার আমি আমার ওপর নজর রাখার জন্য আপনাকে অনুরোধ করব। যদি আমার কিছু হয়, হঠাৎ যদি আমি মারা যাই, তবে আজকের কথাগুলো আপনি দয়া করে মনে রাখবেন। যদি

ওরা কিছু করা মনস্থই করে, তবে সহজে যেন পার না পায় এটাই আপনার কাছে আমার অনুরোধ।

দারোগাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তার মুখে একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ ফুটে উঠেছে।

সে বিষয়ে আপনি নিশ্চন্ত থাকতে পারেন, তিনি বললেন।

ধন্যবাদ, আমার কিছু বলার নেই।

দারোগাবাবু যেন ইচ্ছে করেই তরুণ দম্পতির দিক থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। তিনি বেরিয়ে যাবার পরই অ লকেশের যেন সম্বিত ফিরে এলো। বিপাশার একটা হাত ধরে সে প্রায় ছুটেই বেরিয়ে গেল।

দারোগাবাবু তখনও রাস্তায় নামেন নি। বাইরের ঘরের দরজার ঠিক মুখে অলকেশ তাকে ধরে ফেলল।

দারোগাবাবু, সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, আপনি নিশ্চয় জ্যোঠিমাব কথা বিশ্বাস করেন নি।

দারোগাবাবু মাথা চুলকোলেন, তারপর বললেন, পুলিশের চাকরিতে সন্দেহ করাটা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে, অন্য কোনো উপায় নেই।

আপনি কি বলতে চান আমি কিংবা আমার বউ সত্যিই জ্যোঠিমাকে খুন করতে পারি?

না, তার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। আপনারা যদি ওঁকে হত্যার কোনো পরিকল্পনা না করেন তবে খুনের প্রশ্নই উঠে না। সে ক্ষেত্রে আপনার, আমার কিংবা আপনার স্ত্রীর কোনো সমস্যাই দেখা দেবে না।

অলকেশ প্রথম ধাক্কা সামলে উঠেছিল। দাবোগার জবাব শুনে সে মনে মনে রেগে উঠল।

ভাল কথা, মিসেস গাঙ্গুলী, বিপাশার দিকে তাকিয়ে দারোগাবাবু বললেন, রিভলবারের লাইসেন্স আছে আপনার?

না। বিপাশা স্বীকার করল।

সে ক্ষেত্রে আমার মনে হয় রিভলবারটা আমাকে দিয়ে দেওয়াই সব দিক থেকে নিরাপদ।

ওটা আপনি নিয়ে যেতে পারেন, অলকেশ যেন ফেটে পড়ল।

সে ক্রুদ্ধভাবে লাইব্রেরী ঘরের দিকে চলে গেল। রিভলবারটা দেরাজ থেকে তুলে নিয়ে সে ফিরে এলো. তারপর দারোগার হাতে একটু জোরেই গুঁজে দিয়ে বলে উঠল, এবার আপনি যেতে পারেন।

তার আচরণের মধ্যে যে রূঢ়ভাব ফুটে উঠেছিল, তা লক্ষ্য করে দারোগাবাবুর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি বললেন, আপনি বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। মনে রাখবেন, পুলিশ ঘটনা দিয়েই সব কিছু বিচার করে।

নিজেদের ঘরে ওরা ফিরে এলো। বিপাশার দু'চোখে জল। সে বলল, তোমার জ্যোঠিমা প্রথম দিন থেকেই আমাকে ভাল নজরে দেখেন নি। আমাদের বিবাহিত জীবন উনি ধ্বংস করে দিতে চাইছেনে। মনে মনে উনি বিশ্বাস করেন না যে, আমি ওঁকে খুন করতে চেয়েছিলাম। যা ঘটে গেল সব কিছুই ওঁর মনগড়া।

অলকেশ অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল। এমন একটা ঘটনা ঘটে যাবে তা সে ভাবতেই পারে নি।

আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল, বিপাশা অনুনয়ের কণ্ঠে বলল, তোমার জ্যেঠিমার টাকা পয়সা আমি চাই না।

কিন্তু আমি চাই, অলকেশ জবাব দিল, আমার এমন কিছু যোগ্যতা নেই যে, ভাল মাইনের একটা চাকরি পেতে পারি। তোমাকে দুঃখ কষ্ট দেব বলে আমি বিয়ে করি নি। জ্যেঠিমার আমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী সেটা মনে রেখেই তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলাম। তোমাকে একজন কেরাণীর বউ হিসেবে মানায় না বিপাশা, তা হতেও দেব না।

বিপাশার মুখে এতক্ষণে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। স্বামীর গভীর ভালবাসায় কোনো স্ত্রীর না আনন্দ হয়।

কিছুক্ষণ চুপচাপের পর বিপাশাই বলে উঠল, আচ্ছা, সত্যিই যদি তোমার জ্যেঠিমার কিছু হয়, আমি যদির কথা বলছি।

অলকেশ পায়চারি থামিয়ে বোঁ করে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর বলল, তুমি বলছ কি?তার কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠার সুর, মুখও যেন একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

বিপাশা তার মনের ভাব বুঝতে পেরে বলল, তুমি কি ভাবছ আমি বলছি আমরাই কিছু ঘটবার জন্য দায়ী হ'ব? কেমন করে তুমি এ কথা—

অলকেশ অপরাধীর মতো বিপাশার পাশে বসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, লক্ষ্মীটি কিছু মনে করো না, আজকের এই ব্যাপারে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি যেন লোপ পেয়ে গেছে।

তা আমি বুঝতে পেরেছি, বিপাশা শান্ত হয়ে বলে আমি বলতে চাইছিলাম তোমার জ্যেঠিমা দারোগাবাবুর মনে এই বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর কিছু হলেই সেটা অপরাধের পর্যায়ে পড়বে। ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না? তেমন কিছু হলে আমাদের ওপরই দোষ আসবে, আমরা কিছু করি আর না করি।

অলকেশ হতবুদ্ধির মতো বলল, তেমন কিছু ঘটলে আমাদের নির্দোষিতা প্রমাণিত হবে।

নির্দোষ লোক আগেও শাস্তি পেয়েছে। বিপাশার দু'চোখে যেন মেঘ জমেছে। বিনা দোষে অনেকেরই সুনামে কালি পড়েছে, আমি এমন একটা ঘটনা জানি। অলকেশের কাঁধে মাথা রেখে সে বলল, কিছু ঘটাবার আগেই চল আমরা এখান থেকেই চলে যাই, লক্ষ্মীটি।

বিপাশার ঘন কালো চুলে হাত বুলোতে বুলোতে অলকেশ জবাব দিল, তাই যদি সমস্যা হয় তবে আমাদের সাবধান হতে হবে, যেন জ্যেঠিমার তেমন কিছু না ঘটে। যতক্ষণ পর্যন্ত উনি নিরাপদ, আমাদেরও ভয় পাবার কিছু নেই।

অলকেশকে এই সাবধানতার ব্যাপারে পুরোনো ঝি আন্নাকালীর ওপর নির্ভর করতে হ'ল। মাঝ থেকে সে বেচারির কাজ অনেক বেড়ে গেল। সে বুঝতে পারল না কেন একবার ঘর মোছার পর আবার শুকনো করে মোছা দরকার। অলকেশ তাকে বোঝাল, পেছল মেঝেতে পা হড়কে দুর্ঘটনা ঘটা মোটেই বিচিত্র নয়।

শুধু এতেই সে ক্ষান্ত হ'ল না। কোথাও কোনো দাহ্য পদার্থ বা জঞ্জাল থাকলে তা সে পরিষ্কার করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। বলা যায় না তো হঠাৎ আগুন ধরে যেতে পারে। সারা বাড়ি চষে যেসব ওষুধের শিশির গায়ে 'বিষ' লেখা ছিল, তা সে নষ্ট করল। আরশোলা বা ইঁদুর মারার বিষ বাড়িতে রাখা চলবে না, এটা সে পরিষ্কার করে সকলকে জানিয়ে দিল।

একদিন যখন সে সিঁড়ির কার্পেটটা ভাল করে পরীক্ষা করে টেনেটুনে ঠিক করছে, বিপাশা নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়াল, তারপর জিজ্ঞেস করল কি করছ?

অলকেশ ধরা পড়ে যাওয়ার মতো একটু অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল, কার্পেট আলগা থাকলে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই দেখে নিচ্ছি।

বিপাশা অবশ্য কারণটা সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলল। সে একটু ঠাট্টার সুরেই বলল, তুমি দেখছি তোমাব জ্যেঠিমার যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছ।

এক সপ্তাহ পরে ওরা দু'জন বসবার ঘরে বসেছিল, হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদে চমকে উঠল। শব্দটা এসেছিল বিমলা দেবীর শোবার ঘর থেকে। অলকেশ পাগলের মতো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল, বিপাশা তার পেছন পেছন।

আন্নাকালী শোবার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল, তার মুখ শুকিয়ে গেছে। তার কাছ থেকে ওরা জানতে পারল গিন্নীমা বলেছিলেন তার পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে, সে যেন মাঝে মাঝে এসে দেখে যায়। আগেও দুবার আন্নাকালী এসেছিল, কিন্তু এবার এসে দেখে গিন্নীমা যেন কেমন হয়ে গেছে, জ্ঞান নেই।

শীগগির ডাক্তারবাবুকে ডেকে আন, অলকেশেব হাত-পা যেন পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছে।

আন্নাকালী সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতেই ওরা ঘরে ঢুকল। বিমলা দেবী চোখ বন্ধ করে মড়ার মতো পড়ে আছেন, শরীর যেন শক্ত হয়ে গেছে।

মারা গেছেন? বিপাশা ফিস ফিস করে বলল।

বলা যায় না, অলকেশ ভয়ের সুরে জবাব দিল।

সে বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে তার জ্যেঠিমার মুখের দিকে তাকালো। তারপর ডান হাতটা নাকের কাছে ধরে বলে উঠল, নিঃশ্বাস পড়ছে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচার মতো সে বলল।

বিপাশা যেন একটু হতাশাই হ'ল।

অলকেশ তার জ্যেঠিমার একটা হাত তুলে নাড়ি পরীক্ষা করতে লাগল। বেঁচে আছেন, তবে নাড়ির গতি খুব ভাল নয় বলে মনে হচ্ছে।

ওরা পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর যেন মৌন সম্মতিতে তৎপর হয়ে উঠল। বিপাশা একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে বিমলা দেবীর কপালে বুলোতে লাগল আর অলকেশ তাঁর হাত টিপতে লাগল।

দরজা থেকে দারোগাবাবু তাদের ওই অবস্থায় দেখে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার?

ওরা দুজন চমকে উঠল, যেন অন্যায় কিছু করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে।

আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, সদর দরজা হাঁ কবে খোলা দেখে ঢুকে পড়েছি। দারোগাবাবু বললেন।

নিশ্চয়ই আন্নাকালী ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে যাবার সময় দরজা খুলে রেখে গেছে, অলকেশ তাড়াতাড়ি বলল।

ডাক্তারবাবু? দারোগাবাবুর কণ্ঠস্বরে একটু সন্দেহের সুর।

জ্যেঠিমা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কি ব্যাপার বুঝতে পারছি না—

বুঝতে পারছেন না?

অলকেশ রাগতভাবে জবাব দিল, না, বুঝতে পারছি না।

দারোগাবাবুর কোনো ভাবান্তর ঘটল না। তিনি বললেন, ডাক্তারবাবু এলেই বোঝা যাবে। আপনারা বরং ওঁকে একা থাকতে দিন।

আমরা ওঁর সেবা করছি।

হ্যাঁ, তাতো দেখতেই পাচ্ছি।

অলকেশ বিপাশাকে নিয়ে চলে যাবার সময় একবার পেছন ফিরে তাকিয়ে ছিল। তার স্পষ্ট মনে হ'ল, যেন জ্যেঠিমার ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

ডাক্তারবাবু এসে পড়লেন। তিনি কিন্তু রোগিনীর আসল ব্যামোটা যে কি তা ধরতে পারলেন না। বিমলা দেবী খুব তাড়াতাড়িই সেরে উঠলেন। তিনি কোনো অভিযোগ না করলেও দারোগাবাবুর এ বাড়িতে আসাটা হঠাৎ যেন বেড়ে গেল।

একটার পর একটা মাস কেটে যেতে লাগল। বিমলা দেবীর হঠাৎ নৌকোয় বেড়াবার শখ জাগল, যদিও চিরকাল তাঁর জলাতঙ্ক ছিল। একটা ছোট নৌকা তিনি কিনেই ফেললেন। তাঁর বাড়ির সামান্য দুরেই ছিল নদী, জল অবশ্য বেশি ছিল না, তবে যারা সাঁতার জানে না, তাদের পক্ষে নিরাপদ নয়।

অলকেশ আর বিপাশাকে বাধ্য হয়ে তার এই নৌ-বিহারে সঙ্গী হতে হ'ল। বলা যায় না, যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তখন হয়তো দারোগা ভাববে তারাই ষড়যন্ত্র করে জ্যেঠিমাকে ডুবিয়ে মেরেছে। অলকেশই দাঁড় বাইতো।

একদিন বিকেলে যখন তারা নদীতে বেড়াচ্ছে, ওদের দুজনেরই মনে হ'ল যেন জ্যেঠিমা ইচ্ছে করে নৌকোটা দোলাচ্ছেন। নৌকোটা ঠিক যখন মাঝখানে, হঠাৎ বিমলা দেবী উঠে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে মিঃ দাস যে? তিনি হাত নাড়তে লাগলেন আর যা অবশ্যম্ভাবী তাই ঘটল। নৌকা উল্টে গেল।

অলকেশ ভাল সাঁতর জানত। বিমলা দেবীকে সে টানতে টানতে তীরে নিয়ে উপস্থিত হ'ল আর তখুনি বিপাশার কথা তার মনে পড়ল। সে তখন জলে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। অলকেশ আবার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দারোগাবাবুই কৃত্রিম উপায়ে তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস সহজ করে আনলেন।

বাড়ি ফিরে বিপাশা বারবার বলতে লাগল, আমি ডুবে যাচ্ছিলাম সেটা কিছু হ'ল না, তুমি তোমার জ্যেঠিমাকে বাঁচাবার জন্যই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলে।

তুমিতো ডুবে যাও নি, অলকেশ যুক্তিসঙ্গতভাবে জবাব দেয়, তা ছাড়া ভেবে দেখ দারোগাবাবুর নাকের ডগার ওপর জ্যেঠিমা ডুবে গেলে কি কাণ্ড হ'ত!

আমার চাইতে জ্যেঠিমা'র বিষয় সম্পত্তির ওপরই তোমার নজর বেশী।

তার কারণ হ'ল জ্যেঠিমাই আমাদের ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতেও। উপোস করে মরার চাইতে আমরা অনেক ভাল আছি।

এমনভাবে বেঁচে থাকার চাইতে উপোস করা আত্মসম্মানের বলেই আমি মনে করি। বিপাশা রাগত কণ্ঠে জবাব দিল।

আমি তা মনে করি না, তোমাকেও উপোস করে মরতে দিতে পারি না।

তুমি তবে তোমার জ্যেঠিমার দেহরক্ষী হয়েই জীবন কাটিয়ে দেবে?

সত্যি কথা বলতে কি, শুধু অলকেশই নয়, বিপাশাও নিজের অজান্তে বিমলা দেবীর দেহরক্ষীর কাজই করছিল। বিমলাদেবী মুখে কিছু না বললেও মনে মনে ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছিলেন। তিনি নতুন নতুন বিপদের সৃষ্টি করতে লাগলেন আর ওরা দুজন সতর্ক প্রহরীর মতো তাঁকে আগলে রাখতে লাগল। বিমলাদেবীর কাছে এটা একটা মজার খেলা হয়ে দাঁড়ালো।

শেষ পর্যন্ত বিপাশা ধৈর্যের সীমারেখায় পৌঁছলো। একদিন ঘরে ঢুকে অলকেশ দেখল সে বাক্স গুছোচ্ছে।

কোথায় যাচ্ছ? সে বিমূঢ়ের মতো প্রশ্ন করল।

যে দিকে দু চোখ যায়।

অলকেশ এগিয়ে বিপাশার কাঁধে হাত রাখল। এক ঝটকায় হাতটা সরিয়ে বিপাশা তার স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়াল। এ বাড়িতে প্রথম আসা বিপাশার সঙ্গে তার যেন অনেক প্রভেদ। তার সুন্দর চেহারার যে সুষমা ছিল তা যেন অনেক ঝরে গেছে। চোখের সেই মন ভোলানো দৃষ্টি আর নেই।

এভাবে আমি আর জীবন কাটাতে পারছি না। তোমার জ্যেঠিমা একটা ডাইনী বুড়ি, বুঝলে? মনে মনে তার মৃত্যু কামনা করছি অথচ বুড়ির মরবার নাম নেই। বিপাশার দুচোখ ঠিকরে আগুন বেরোচ্ছে, নাক অস্বাভাবিক ফুলে উঠেছে।

বিপাশা! অলকেশ যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

অত অবাক হবার ভান করো না। তোমারও কি মনের ইচ্ছে তাই নয়? বুকে হাত দিয়ে বলো তো?

অলকেশ মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ, আমিও মনে প্রাণে তাই চাই।

তবে? বিপাশা বিজয়িনীর কণ্ঠে বলল।

দুজনে দুজনের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

ওটাই একমাত্র উপায়, তাই না? বিপাশা শেষ পর্যন্ত বলল।

অলকেশ মৃদু ঘাড় দোলালো। কিন্তু দারোগাবাবু?

এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে দারোগাবাবু পর্যন্ত সন্দেহ না করে।

একটা দুর্ঘটনা---

হ্যাঁ, দুর্ঘটনা—ওই একমাত্র উপায়।

বিমলাদেবীর বাড়ি থেকে মাইল খানেক দূরে একটা পোড়ো কালী মন্দির ছিল। প্রতি শনিবার বিমলা দেবী সকালে স্নান সেরে ওখানে পুজো দিতে যেতেন। পুরোহিত কেউ ছিল না, নিজেই মন্ত্র আউড়িয়ে ফুল বেলপাতা দিতেন। জায়গাটা একটু নির্জন, চারপাশে ঝোপ-ঝাড়। বিমলাদেবীর এই অভ্যেসের কথা সবাই জানত, এমন কি দারোগাবাবু পর্যন্ত।

আগে তিনি একাই যেতেন। অলকেশ বউ নিয়ে আসার পর থেকে তিনি ওদের নিয়ে যাওয়া শুরু করেছিলেন। একটা হাতল লাগানো মাঝারি ঝুড়িতে ফুল ছাড়াও ফলমূল ও কিছু খাবার নিয়ে যাওয়া হ'ত। সারা সকাল ওখানে কাটিয়ে বেলা করে তিনি ফিরতেন।

এক শনিবার তিনি যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে অলকেশকে ডাক দিলেন। অলকেশ বলল, আজ আর আমরা যাব না জ্যেঠিমা। আমার পায়ের ব্যথাটা বেড়েছে আর বিপাশারও শরীর তেমন ভাল নেই।

তবে কি আমি একা একা যাব?

কেন আগে তো তুমি একাই যেতে।

তা যেতাম তখন তোমরা ছিলে না তাই। আজকাল আমার ভয় করে, সাপ-খোপ বেরোতে পারে তো।

সাপ! অলকেশ যেন আকাশ থেকে পড়ল। ওখানে আবার সাপ কোথায়?

বিমলাদেবী খুঁত্ খুঁত্ করছেন দেখে সে বলল, আজ না হয় নাইবা গেলে।

এ কথায় কাজ হ'ল। অলকেশ যা বলবে তার উল্টোটা তার করা চাই। অলকেশও তা জানত, তাই ওই টোপ ফেলেছিল।

বিপাশা আমার খাবার ঠিক করে রেখেছে না তাও করে নি? বিমলাদেবী জিজ্ঞেস করলেন।

সে ব্যাপারে কোনো ত্রুটি পাবে না, আমি বাসকেটটা আনছি।

অলকেশ দ্রুতপায়ে ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলে গেল। বিপাশা উৎকণ্ঠিত, ভাবে তারই অপেক্ষা করছিল, তাকে দেখেই বলে উঠল, কি, যাবে তো?

হ্যাঁ, তুমি সব ঠিক করে দিয়েছ তো? ওটাও?

সে সব তোমাকে ভাবতে হবে না।

দিন দুয়েক আগে বাথরুমের দরজার ফাটলে একটা বেশ প্রকাণ্ড কাঁকড়া বিছে বিপাশার চোখে পড়েছিল। প্রথমে সে নিজেই আঁতকে উঠেছিল, পরে তার মাথাতেই বুদ্ধিটা আসে।

ফাটলে অল্প একটু কীট-নাশক স্প্রে করতেই বিছেটা বেরিয়ে আসে, সামান্য নিস্তেজ ভাব। দুটো শক্ত কাঠি দিয়ে অনেকটা সাঁড়াশির মতো অলকেশ ওটাকে বন্দী করে একটা বড় শিশিতে ভরে তাদের শোবার ঘরে লুকিয়ে রেখে ছিল। মস্ত বড় বিছে, চ্যাপ্টা মোটা, একবার কামড়ালে আর রক্ষে নেই। আজ ফুল ও ফল মুলে ভরা ঝুড়ির ওপর শিশিটা উপুড় করে ধরতেই বিছেটা কিলবিল করে ঝুড়ির মধ্যে আত্মগোপন করেছে।

আজ ওরা যাবে না তা আগে থেকেই ঠিক করেছিল। কোনো দুর্ঘটনার সময় সেখানে না থাকাই নিরাপদ। ঝুড়িতে হাত ঢুকিয়ে জিনিসপত্র বার করার সময় বিছেটার গায়ে হাত পড়বে, বিছের কামড় জ্যেঠিমা'র মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। শেষ পর্যন্ত তাদের পরিকল্পনা যদি কেঁচেও যায়, তবু তাদের দায়ী করা সহজ হবে না। জ্যেঠিমা ঝুড়িটা মাটিতে নামিয়ে রেখে মন্দির কয়েকবার প্রদক্ষিণ করেন, তারপর ফুল বেলপাতা দিতে যান। জায়গাটা একটু স্যাঁত্ সেঁতে, ভাঙা মন্দিরের ইট পাথরের ফাঁকে কাঁকড়া বিছে থাকাই স্বাভাবিক। কোনো সুযোগে একটা বিছে ঝুড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল তার জন্য তারা দায়ী হবে কেন? নিখুঁত পরিকল্পনা।

ঝুড়ির হাতল সন্তর্পণে ধরে অলকেশ তার জ্যেঠিমাকে দিতে চলল, বিপাশাও তার পিছু নিল। বিমলা দেবী সদর দরজায় অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে দুজনেই ভয়ানক চমকে

উঠল। দরজার ঠিক বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন দারোগাবাবু। তাকে দেখে বিমলা দেবী বলে উঠলেন, বাসকেটটা দাও। তোমরা ভেবেছিলে বুড়ি জ্যেঠিকে একা একা পাঠাবে আর সেখানে আমি সাপের কামড় খেয়ে মরলে, তোমরা নিষ্কন্টক হবে। কিন্তু তোমাদের সে আশা আর পূর্ণ হ'ল না। মিঃ দাস আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, এক কথাতেই উনি রাজী হয়ে গেছেন। আমরা আজ পিকনিক করব। অলকেশ, তুমি বাসকেটটা মিঃ দাসের হাতে দাও। আমাদের আর দেরী করা উচিত হবে না।

ওদের অবস্থার কথা না বলাই ভাল। অলকেশ কিছু একটা বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুল না। তার মুখ পাংশু হয়ে গেছে, চোখ যেন ঘোলাটে হয়ে আসছে। দারোগাবাবু তার ভাবভঙ্গী দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন। বাসকেটটা হাতে নেবার জন্য তিনি এক পা বাড়ালেন।

বিপাশাই কথা বলল, মিঃ দাস আপনি সঙ্গে যাচ্ছেন, ভালই হ'ল। আমরা আজ যেতে না পারায় জ্যেঠিমা'রও একটু ভয় ভয় করছিল, আমাদেরও অস্বস্তি হচ্ছিল। অলকেশের দিকে ফিরে সে বলল, ভাঁড়ার ঘরে মীট সেফে মাংসের স্যাণ্ডউইচ আছে। খানকয়েক তুমি কৌটোয় ভরে দাও। যাও। আপনি নিশ্চয় স্যাণ্ডউইচ ভালবাসেন? শেষের প্রশ্নটা দারোগাবাবুকে লক্ষ্য করেই সে করল।

অলকেশ অবশ্য দারোগাবাবুর উত্তরের জন্য আব অপেক্ষা করল না। প্রায় ছুটেই সে বাসকেট হাতে ভেতর দিকে চলে গেল। মিনিট পাঁচেক বাদে যখন সে ফিরে এলো তখন তার মুখে অনেকটা স্বাভাবিক ভাব ফিরে এসেছে।

ঘরের ভেতর এসে অলকেশ ধপ্ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

বিছেটা কি কবলে? বিপাশা জানতে চাইল।

ঝুড়িটা মাটিতে উপুড় করতেই ওটা বেরিয়ে এলো, আমাকেই কামড়ায় আর কি। পায়ে জুতো ছিল তাই রক্ষে, চেপে মেরে ফেলেছি।

একটু থেমে সে আবার বলে, আমাদের কপালই মন্দ।

আমাদেব আবার চেষ্টা করতে হবে, কঠিন মুখে বিপাশা বলল, নইলে আমরা পাগল হয়ে যাব।

মাস গড়িয়ে যায়।

বিমলা দেবীর স্বামী বাড়ি তৈরি করার সময় সব রকম সুব্যবস্থাই করে ছিলেন, শুধু ইলেকট্রিক আনতে পারেন নি। তার কারণও অবশ্য ছিল। কাছকাছি ইলেকট্রিক পোস্ট না থাকায়, সেটাই প্রধান অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বেঁচে থাকলে একটা ব্যবস্থা হয়তো তিনি করতেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বিমলা দেবী ও নিয়ে মাথা ঘামান নি।

কিছুদিন ধরে তাঁর শরীর ভাল যাচ্ছিল না, বাতে ভুগছিলেন। খাটের পাশেই টেবিলে ছোট একটা চিমনি লণ্ঠন (কাঁচের চোঙা মতো মুখ খোলা) তিনি রাখতে আরম্ভ করেছিলেন। আন্নাকালী বার বার তাঁকে সাবধান করেছিল। বসেছিল, ঘুমের মধ্যে হাত লেগে চিমনিটা পড়ে গেলে বিছানায় আগুন ধরে যেতে কতক্ষণ। বিমলা দেবী কিন্তু তার কথায় কান দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নি।

এই সুযোগ, বিপাশা একদিন অলকেশকে বলেল। আন্নাকালীই পুলিশের কাছে বলবে সে জ্যেঠিমাকে অনেকবার চিমনি জ্বালিয়ে শুতে না করেছিল।

অলকেশেরও কথাটা মনে ধরল। জ্যেঠিমার বাড়াবাড়ি দিন দিন বেড়ে চলেছে। ওরা তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এবং কোনো অনর্থ যাতে না ঘটে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছে দেখে তিনি নতুন নতুন বিপদ আবিষ্কার করছিলেন আর তারা নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তাঁকে আগলে রাখছিল। তাঁর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা একটা মজার খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তারা মনস্থির করে ফেলল। সেই রাত্রেই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে, বলা যায় না, জ্যেঠিমা যদি আবার মত পালটে ফেলেন।

বিমলা দেবী আজকাল রাত্রে তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়তেন। ওরা ঠিক করল রাত এগারোটাই হবে নিরাপদ সময়।

ওরা পা টিপে টিপে বিমলা দেবীর ঘরে ঢুকল। বিমলা দেবী রাত্রে দরজা খুলেই শুতেন, যদি হঠাৎ কিছু হয়, তাই এই ব্যবস্থা। আন্নাকালীও নিচে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওরা আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। বিমলা দেবী চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। গভীর ঘুমে তাঁর বুক ওঠা নামা করছে, জোরে জোরে নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ওরা চূড়ান্ত আলোচনার জন্য আবার বেরিয়ে এলো।

যদি উনি জেগে উঠে চিৎকার শুরু করেন? বিপাশা হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে গেছে। আন্নাকালী সেই চিৎকার শুনে ওপরে ছুটে আসবে। হয়তো ভয়ে সেও চিৎকার শুরু করে দেবে।

তাই যদি হয় আমরাও এমন একটা গোলমালের সৃষ্টি করব যাতে সময় নষ্ট হয়। তাতেই কাজ হবে, একবার বিছানায় আগুন ধরে গেলে আর বেরুতে হবে না।

ওরা আবার নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। অলকেশ পায়ে পায়ে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। চিমনিটা সে হাতে তুলে নিল। মাশারির একটা প্রান্ত সে সন্তর্পনে টেনে বার করল, ওটা চিমনির ভেতর ঢুকিয়ে দেবে।

এতদিনে ধরা পড়েছ, বিমলা দেবীর কণ্ঠস্বরে অলকেশ বাধা পেল। তিনি বিছানায় উঠে বসেছেন।

ওরা দুজনে এত চমকে উঠেছিল যে একটা শব্দ পর্যন্ত ওদের গলা থেকে রেরুল না।

প্রথম যেদিন আমি রিভলবারটা দেখেছিলাম, সেদিনই তোমাদের মতলব ধরে ফেলেছিলাম বিমলা দেবী বিজয়িনীর মতো বলে উঠলেন। সেদিন থেকে রাত্রে তোমরা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছ কি না জানি না, কিন্তু আমি চোখের পাতা এক করি না।

আমার অনুমান ভুল হয় নি, তোমরা কি বলো? তিনি হেসে উঠলেন। হাসতে থাকলেন বেশ কিছু সময় নিয়ে।

বিপাশাই প্রথম কথা বলল। আমরা আমাদের ঘরে যাচ্ছি, দারোগাবাবু এলে আপনি তাকে তাই বলবেন। তার কণ্ঠস্বর তেতো শোনাল।

মিঃ দাসকে খবর দেবার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না, বিমলা দেবী দ্বিতীয় বোমা ফাটালেন।

করেন না? বিপাশা যেন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে।

দরকার নেই। কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আমার স্নেহের দেওরপো আর তার মিষ্টি বউ আমার শরীর, স্বাস্থ্য কিংবা দুর্ঘটনার ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ। নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তোমাদের এ ছাড়া গতি নেই। আর আমাকে মেরে ফেলে একটা দুর্ঘটনার রূপ দেওয়া, বিমলা দেবী কৌতুকের হাসি হেসে বললেন, সেখানেও নিজের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর আমার পুরো আস্থা আছে। আমি মনে মনে ঠিকই করেছিলাম, যদি বুদ্ধির খেলায় তোমাদের কাছে আমি হেরে যাই তবে মরতে আমার আপত্তি নেই, তোমরাও নিশ্চিন্ত মনে আমার বিষয় সম্পত্তি ভোগ করবে। তবে আমার মনে হয় না, এই খেলায় তোমরা জিততে পারবে। আমি অবশ্য এই বয়সেও বেশ আনন্দ পাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে এই মজার খেলায়। আচ্ছা অনেক রাত হয়েছে, এবার তোমরা যেতে পার। কথা শেষ করে বিমলা দেবী ঘুমোবার চেষ্টায় চোখ বুজলেন।

ঘরে ফিরে বিপাশা বলল, এর পরেও কি তুমি এ বাড়িতে থাকতে চাও? তার সমস্ত শরীর কাঁপছে, গলার স্বরও কেমন যেন বিকৃত হয়ে গেছে। উনি আমাদের সারাজীবন বোকা বানিয়ে আনন্দ পাবেন, তাই কি তোমার ইচ্ছে?

অলকেশ বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়েছিল। ক্লান্ত কণ্ঠে সে জবাব দিল, আমরা বোকা নই, আমাদের কপালই মন্দ।

সে সব আমি শুনতে চাই না। তোমার জ্যেঠিমাকে মেরে ফেলা আমাদের কম্ম নয়। তুমি যদি না যাও তবে আমি একাই কাল চলে যাব। আজ রাত্রের মধ্যেই তোমাকে মত ঠিক করতে হবে।

অলকেশ মৃদু কণ্ঠে বলল, আমরা চলে গেলে জ্যেঠিমা কি করবেন জান? বিষটিষ কিছু খাবেন আর মারা যাবার আগে দারোগাবাবুর কাছে বলে যাবেন যে আমরাই খাবারের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে নিজেদের নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য ঘটনার সময় বাইরে থাকার ভান করেছি। দারোগাবাবু আমাদের শুধু ফিরিয়েই আনবেন না, খুনের দায়ে আমাদের হাজতে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। আর বিষ না খেলেও অন্য কিছু তিনি করবেনই। বিশ্বাস কর বিপাশা, আমাদের মুক্তি নেই।

বিপাশা খাটে বসে পড়ল। তবে আমরা কি করব?

সে কাঁদো কাঁদো গলায় প্রশ্ন করল।

কি করব? অলকেশ চোখ বুজল। আমরা যা করছি, তাই করে যাব। জ্যেঠিমাকে আগলে আগলে চলব। এমন কিছু দুর্ঘটনা ঘটতে দেবে না, যা খুন বলে মনে হতে পারে। আর সেই সঙ্গে একটা উপায় খুঁজে বার করবার চেষ্টা করব, যাতে খুনটাতে দুর্ঘটনা বলে সবাই ধরে নেবে। একদিন না একদিন আমাদের চেষ্টা সফল হতে বাধ্য।

ওরা নিচে বসবার ঘরে চুপ চাপ বসেছিল। এই কয় বছরে অলকেশ যেন বুড়িয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু নেমে এসে বললেন, বিমলা দেবী মারা গেছেন। দারোগাবাবুও খবরটা পেয়ে এসেছিলেন। তিনিও নিচে নেমে এলেন। ডাক্তারবাবু ততক্ষণে চলে গেছেন।

তাহলে আপনার জ্যেঠিমা মারাই গেলেন। অলকেশের দিকে তাকিয়ে চোখ দুটো ছোট করে তিনি বললেন।

হ্যাঁ, অলকেশ জবাব দিল।

আপনি কোনো বিবৃতি দিতে চান?

বিবৃতি? কিসের বিবৃতি?

আপনার জ্যেঠিমা'র মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে।

তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আসল কারণটা ডাক্তারবাবুই বলতে পারেন, তাই না মিঃ দাস?

তা বটে। তবে প্রয়োজন মনে করলে আমরা পোস্টমর্টেম করব, আপনাদের অবশ্য জানানো হবে।

অলকেশ আর ধৈর্য রাখতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে রাগত কণ্ঠে বলল, দারোগাবাবু, আমার জ্যেঠিমা'র বয়স ষাটের বেশী হয়েছিল। বয়সেই তিনি মারা গেছেন। অন্য কিছু আপনি কেন ভাবছেন?

দারোগাবাবু কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, ফলেন পরিচিয়তে। তিনি বেরিয়ে গেলেন।

অলকেশ বিপাশার দিকে চোখ ফেরাল। তার সেই রূপ আর নেই। মুখে রেখা পড়েছে, কমনীয়তাব বদলে একটা রুক্ষ ভাব এসেছে। বেচারি! তারপরই সে খেয়াল করল বিপাশা তার দুচোখ দিয়ে তাকে যেন প্রশ্ন করছে।

তুমি কি জ্যেঠিমাকে কিছু খাইয়েছিলে? বিপাশা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

না তো।

আমিও না।

যাক, বাঁচা গেল।

তাই কি?

তার মানে?

তোমার জ্যেঠিমা নিজে যদি কিছু খেয়ে থাকেন?

কি বলছ তুমি। অলকেশ যেন হতভম্ব হয়ে যায়।

তোমার জ্যেঠিমা সারাজীবন আমাদেব যন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ পেয়েছেন। আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্য যদি নিজেই কিছু খেয়ে থাকেন?

অলকেশ পাথরের মতো বসে থাকে।

# ছায়া পূর্বগামী

## অমরজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

'মে আই হেল্প ইউ' প্রাইভেট ডিটেকটিভ সংস্থার মালিক অনির্বান চৌধুরীকে ভীতু লোক বললে একদম ভুল করা হবে। তিনি দুঃসাহসী, প্রয়োজনের চেয়েও বেশী দুঃসাহসী। এই অনির্বান চৌধুরীই আজ কয়েকদিন হ'ল এক অজানা আতঙ্কে ভুগছেন। রাতে ঘুমোলে দেখছেন সারি সারি কালো ছায়া, রাস্তায় মোটরে চেপে যাতায়াত করবার সময় অনুভব কবছেন কে বা কারা যেন তার আশেপাশে ফিসফিস করছে। অথচ চোখ খুললে কাউকে দেখতে পাচ্ছেন না। এক গোপন অস্বস্তিতে জমাট ভরে আছে সারাক্ষণ। কোথায় যেন একটা শিরশিরে ভয়।

আজ আকাশে আগুন ঝরছে। জুনের প্রথম সপ্তাহ, বৃষ্টি নেই। রাস্তার পিচ গলছে। যানবাহন সামান্য। পথিকও তাই, নেহাত তার প্রযোজনে সেই বেরিয়েছে।

অফিসে অন্যান্য দিনের মতো লোকজন নেই। সবাই কাজে কর্মে বাইরে। শুধু পাশেব ঘরে রয়েছে সহদেব চক্রবর্তী। সহকারী। আজ বেরোয়নি সে, একটা রিপোর্ট টাইপ করছে।

ইলোপমেন্ট সংক্রান্ত একটা ফাইল সামনে ঠেলে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন অনির্বান চৌধুরী। একটা সিগারেট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন। আড়চোখে একবার তাকালেন স্তব্ধ হয়ে থাকা টেলিফোনটার দিকে, যে কোনো মুহূর্তে বেজে উঠতে পারে। কোনো কর্মচারী কোনো খবর দিতে বা নির্দেশ চাইতে পারে। না, আজ সেরকম কেউ ফোন করে নি। কোনো সাহায্য প্রার্থীরও অনুরোধ আসেনি।

ঘুম ঘুম পাচ্ছিল অনির্বান চৌধুরীর। একটা হাই তুললেন। চোখ বন্ধ করতেই দেখলেন সেইসব কালো ছায়ার দল, কিসব চেঁচামিচি করছে। কারা এরা? গোপন অপরাধবোধ যেন তাকে পীড়িত করে তুলল।

নিজের মনেব সঙ্গেই কথা বলা শুরু করলেন তিনি। আমি অনির্বান চৌধুরী। 'মে আই হেল্প ইউ' সংস্থার একমাত্র মালিক। এই সংস্থা আমার বুদ্ধি, সাহস কূটনীতির সাফল্যের নিদর্শন। আমি পীড়িত জনগনের দীনসেবক, জগৎসংসারে ব্যাধি আছে। আছে মহামারী, অভাব অঘটন। সেই সঙ্গে রয়েছে ষড় রিপুর আক্রমন। নিরাকার ব্রহ্মের মতোই এরা আমাদের দেহের কোষে মিশে রয়েছে। প্রতিনিয়ত এরা আমাদের বিব্রত করছে। ধ্বংস করছে। কারণ, আমরা কেউই বুদ্ধত্ব বা জৈনত্ব লাভ করতে পারিনি। পারব না। অদৃশ্য এইসব শত্রুদের কাছে আমরা অসহায় ক্রিড়নক। তাই আমরা অপরাধ করি। আবার কেউ কেউ সেই অপরাধীকে শাস্তি দিয়ে মনের জ্বালা নেভাতে চাই। আর এসব কাজের সাহায্যের জন্যেই তো

আমি আছি। আছে আমার সংস্থা। প্রভু যীশুর মতোই তো রিপুগ্রস্ত মানুষদের অহং শান্ত করার জন্যে অনির্বান চৌধুরীর আবির্ভাব।

বিনিময়ে আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই—শুধু টাকা ছাড়া। টাকাই জীবনের সাফল্যের মাপকাঠি। বিবেক, মনুষ্যত্ব ওসব কেতাবী কথা, যদি ঐসব কেতাবী কথাই জীবনের সার বলে গ্রহণ করতাম, তাহলে আজ আপনি আমার কূটনীতিক সূত্রে পাওয়া ইম্পালা গাড়ীটাকে দেখে বা নিউ আলিপুরে ফরাসী স্থপতি দিয়ে তৈরী করা বাড়ীটাকে দেখে হিংসে করতেন না। ক'টা বছরই বা মাত্র? ৭৪ থেকে ৭৯; এই পাঁচ সালের ভেতরই আমি সব করেছি। অবিশ্বাস্য লাগছে? লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু যদি জানতেন রিপু আক্রান্ত রুগীর সংখ্যা কত—তাদের পকেটে কালো টাকা কত লুকোনো আছে। তাহলে এ প্রশ্ন করতেন না। কিন্তু আমার সব কাজ কর্মই কি অইনানুগ? সত্যি কথা বলছি , না। আইনের পথে আমি চলিনা সব সময়ে। আইনকে কলা দেখিয়ে বেআইনী কাজ কর্ম আমাকে নিত্যই করতে হয়। খুন বাদ যায়না প্রয়োজন পড়লে। এতে আমার দুঃখ নেই, কারণ মানুষ মরনশীল, তাকে একদিন মরতেই হবে। সুতরাং সে মরার আগে আমার যদি কিছু উপকাব সে করে যায় তবে আর কি ক্ষতি? তাছাড়া, এজগতে সারভাইভ্যাল অফ দি ফিটেস্টই—একমাত্র সত্য নীতি। নইলে কলকাতার ৭০-৭১-এর সেই উন্মত্ততার দিনে কবে আমি শহীদ বেদীতে রূপান্তরিত হয়ে যেতাম। আপনারা কেউ করুণা করতেন, কেউ বা আড়ালে গালাগালি দিতেন। কিন্তু আজকের মতো হিংসে নিশ্চয় করতেন না।

৭০-৭১ সালের সেই সব উন্মত্ততার দিনে নিরপেক্ষতা মানেই যখন ছিল শত্রু পক্ষের চর হওয়া আব নিজের জীবন বিপন্ন করে তোলা—সেই সময় আমার কূটনীতি জ্ঞানই আমায় বাঁচিয়েছিল। আমি রাজনীতিব লোক নই। ফলে এলাকা হস্তান্তরের সময় দলও পালটিয়েছি—এবং প্রতিবারই নতুন দলের কাছে অপরিহার্য বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে পেরেছি। রাজনৈতিক সততা নিয়ে মাথা ঘামাইনি—তাহলে পরিজন সমেত ধনে প্রাণে আমায় মারা পড়তে হতো—ব্যাপারটা আপনাদের কাছে কিছু না হলেও—আমার কাছে অনেক কিছু হ'ত। 'মে আই হেল্প ইউ' সংস্থার মালিক হয়ে বসাব সুযোগ আমাব ভাগ্যে আসত না। বা নিজের সংগঠন ক্ষমতার ওপর নিজের বিশ্বাসও জন্মাত না। অতীতের সেই রক্তঝরার দিনগুলোই আমার জীবনের অনুশীলনের সময়। সাফল্যের সোপান।

সহদের চক্রবর্তী হঠাৎ সুইং ডোর ঠেলে ঢুকল, চমকে উঠলেন অনির্বান চৌধুরী, কি ব্যাপার সহদেব?

অপহরণের কেসটার সম্পর্কে কিছু চিন্তা করলেন? ফাইলটা তো দেখছি পড়া হয়নি। শরীর ভাল নয় কি?

ইঙ্গিতে বসতে বললেন সহদেবকে—না । শরীরটা ভাল নয় সহদেব। দুঃস্বপ্নের কথা চেপে গেলেন, এ কাজ আমি ছেড়ে দেবো।

জানতাম ছেড়ে দেবেন বা ছাড়তে বাধ্য হবেন একদিন। কিন্তু আমাদের কি হবে? হালকা মেজাজেই বলল সহদেব।

তাব প্রথম কথায় চমকে উঠলেন অনির্বান। ভ্রূ কুঁচকিয়ে তাকালেন তার দিকে—জানতে মানে? কি বলতে চাও তুমি?

সহদেব একটু ইতস্ততঃ করল—না, মানে, লাইনটা তো ভাল নয়। জীবনে প্রতিষ্ঠা যখন পেয়ে গেছেন—অহেতুক জীবন বিপন্ন করবেন কেন?

জীবন বিপন্ন! কেন? নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন অনির্বান।

বস্, চিন্তা করুন। নামে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হলেও—আমরা আসলে তা নই। অন্য অর্থে আমরা হচ্ছি একটা অরগানাইজড মস্তান বাহিনী। যে আমাদের ভাড়া করে তার হয়েই আমরা কাজ করি।

তা করি। একথা তুমি আমি—আমাদের সকলেরই জানা। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্যেই আমরা একত্রিত হয়েছিলাম। আমার নেতৃত্ব তোমরা মেনে নিয়েছিলে।

মৃদু হাসি দেখা গেল সহদেবের ঠোঁটে। আমি সে সম্বন্ধে কোনো কথা বলিনি বস্। আমি বলছি শত্রুর কথা। প্রতিদিন কি আমরা নতুন নতুন শত্রুর জন্ম দিচ্ছিনা? জগতে আমরাই একমাত্র চালাক আর দুঃসাহসী সেরকম ব্যাপার তো নয়।

চুপ করে গেলেন অনির্বান চৌধুরী। তারপর বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ সহদেব। নিত্য নতুন শত্রুর জন্ম দিচ্ছি আমরা। আমি ক'দিন ধরে লক্ষ্য করছি আমার চারপাশে কারা যেন ফিসফিস করছে। আমার ভাল লাগছে না। একটা বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।

হাসল সহদেব—জীবনের পাপ কি ধুয়ে মুছে ফেলা যায়? যায়না বস্। মূল্য তাকে দিতেই হয়। মৃতেরা প্রতিশোধের জন্যে কাঁদে। গুঞ্জন করে চার পাশে। শেষ বিচারের দিন ঘনিয়ে আসে। চুপ করে গিয়ে দু এক মুহূর্ত সে তাকাল অনির্বান চৌধুরীর দিকে—আমার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে বস্। সেই ডামাডোলের বাজারে আমি যে ক'টা হত্যা করেছিলাম বা করিয়েছিলাম—তার মধ্যে একটা নিছক হত্যাই ছিল। তার মধ্যে রাজনীতির 'র' ছিল না। আমি একজন পরিস্ত্রীকে কামনা করতাম। সুন্দরী সে। ষড়যন্ত্র রচনা করলাম। পুলিশের স্পাই বলে তার স্বামীকে খুন করালাম। নিজে করলাম না। চক্ষুলজ্জা হ'ল। কিন্তু বিধবাটিকে পেলাম না। একটি কুখ্যাত স্মাগলারের সঙ্গে আমায় বোকা বানিয়ে পালাল। কূটনীতিতে মেয়েটির কাছে আমি হেরে গেলাম। আর ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস—যাকে দিয়ে হত্যা করালাম রাজনীতির আবর্তে সেই আমার ভাইকে হত্যা করল পরবর্তীকালে! অপরাধ আর প্রতিশোধ স্পৃহায় আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে বস্।

অনির্বান চৌধুরী একটু যেন হাল্কা বোধ করলেন সহদেবের দুর্ভাগ্যের জন্যে। না! তার জীবনে এমন ঘটনা ঘটেনি। তিনি খুন করেছেন সত্যি, তা অবশ্যই ব্যক্তিগত প্রতিশোধের জন্যে নয়। নিজের জীবন রক্ষায় দলের আজ্ঞাপালন করেছেন মাত্র। দোষী নির্দোষী বিচারের ভার তার ওপর ছিল না। তিনি ছিলেন হ্যাংম্যান। মরণের সময় কোনো আকুতি কুকতীতে কান দেন নি। কঠোরভাবে পালন করে গেছেন দলের বিচারপতির আজ্ঞা। এবার হারলেন অনির্বান চৌধুরী, সহদেব তাহলে তো তোমারই ভয় পাওয়া উচিত। ও রকম কাজ তো আমি কোনোদিন করিনি।

সহদেব ব্যঙ্গ করল প্রচ্ছন্নভাবে, বস্, আমার তবু একটা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আপনার তো কিছুই ছিল না।

এ যেন নিরপেক্ষতা মানেই প্রতিক্রিয়াশীল বা শত্রুপক্ষের চরের মতো যুক্ত হয়ে গেলনা সহদেব? হো হো করে হাসলেন অনির্বান। মেজাজটা একটু ভাল হচ্ছে তার। না। এ সংস্থা

আমি ছাড়ছিনা। ভয় নেই। বেকার হবেনা তোমরা। আমি কিছুতেই ভয় পাই না।

কিন্তু বস্! আপনার চারপাশের ছায়ারা? কি দরকার, এভাবে জীবন বিপন্ন করে?এসব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে জীবনে ভোগ করুন না কেন।

হাসলেন অনির্বান। ছাড়ব। তবে ভয় পেয়ে নয়। বিতৃষ্ণায়। এসব কাজ সত্যিই আমার আর ভাল লাগছে না।

কিন্তু একটা কথা চিন্তা করার আছে। এই সংস্থা উঠে গেলে আমরা যাব কোথায়? খাব কি?

ভয় নেই। এই সংস্থা তোমাকেই দিয়ে যাব সহদেব। তুমি ছাড়া যোগ্য আব কে আছে। একটা গোপন কথা শোন, কাউকে বলো না। আমি ভিত তৈরী করিয়েছি। আমার অবর্তমানে তুমিই হবে এখানকার মালিক।

কাঁটার মুকুটের বন্দোবস্ত করছেন বস্। ভাল কথা।

সহদেব বোধহয় আরও কিছু বলত। কিন্তু ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। যাই কাজটা শেষ করে ফেলি।

হ্যালো। অনির্বান চৌধুরী স্পিকিং।

অপর প্রান্ত থেকে সুবেলা এক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, আমি আমিনা খাতুন বলছি। বিশেষ প্রয়োজন। সময় হবে আপানার?

কোথা থেকে বলছেন?

কাছাকাছি একটা পাবলিক বুথ থেকে।

চলে আসুন।

ধন্যবাদ। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমি আসছি।

ফোন রেখে দিয়ে কিছু চিন্তা করলেন অনির্বান চৌধুরী। মনেব মধ্যে তখনও তার উত্তেজনা রয়েছে। উত্তেজনা পুষে রাখতে তার ভাল লাগে না। তাছাড়া হাজার হোক সহদেব বিশ্বস্ত কর্মচারী। ওকে ওভারে বলাটা ঠিক হয়নি। ওরাই তার বল ভরসা।

ওঘরে তখন স্তব্ধতা। অনুতপ্ত হলেন অনির্বান চৌধুরী। ডাকলেন, সহদেব।

সহদেব চক্রবর্তী নীরবে এসে ঘরে ঢুকল, বলুন।

কিছু মনে কবো না, উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম।

না। আমি কিছু মনে করিনি, হাসল সহদেব। জানি আপনার মন খারাপ।

আবার ভ্রূ-কুঁচকোতে গিয়ে সরল করে নিলেন তিনি ওকে। দেখ, একজন মুসলিম মহিলা আসছেন! পাঠিয়ে দিও আমার ঘরে।

ঠিক আছে বস্, কিন্তু মুসলিম মহিলা? মহিলারা তো এমনিতেই কম আসে। তার ওপর মুসলিম! এই বোধহয় প্রথম।

ঠিক তাই।

সহদেব চক্রবর্তী বেরিয়ে গেল।

আমি কি আসতে পারি মিঃ চৌধুরী? মিনিট দশ পরেই সুইং ডোরের কাছে একটা সুরেলা আওয়াজ ভেসে এলো।

# ছায়া পূর্বগামী

আসুন মিস...বোরখা পরিহিত মহিলাটিকে আহ্বান জানালেন অনির্বান চৌধুরী।

মিসেস আমিনা খাতুন। সামনা সামনি একটা চেয়ারে বসতে বসতে মিসেস খাতুন বললেন। অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়? এটা আমার সংস্কার না বলে অভ্যাসও বলতে পারেন। আমি বাইরে মুখ দেখাই না।

অনির্বান চৌধুরী তার ফর্সা হাতের গড়ন দেখে অনুমান করলেন, ভদ্রমহিলা রূপসী। রূপো ছেড়ে রূপসীদের ওপর তার দুর্বলতা না থাকলেও কেমন যেন চঞ্চলতা অনুভব করলেন। গলার স্বরটাও যেন কেমন বেশ চেনা ঠেকল। নিজের দুর্বলতা ধরা পড়তে দিলেন না অনির্বান চৌধুরী। বললেন, বলুন কি এমন প্রয়োজন যে আপনার মতো রক্ষণশীলাকেও আমার কাছে ছুটে আসতে হ'ল।

আমিনা খাতুন একটু দম নিয়ে বললেন, বলছি। কিন্তু তার আগে আপনার কাছে কয়েকটা প্রশ্ন আছে।

বেশ বলুন।

আপনার সংস্থা ঠিক কি ধরনের কাজ করে থাকে?

নিশ্চয় জেনে শুনেই এসেছেন।

দেখুন, প্রয়োজন আমার এত গভীর যে আমি ঠিক অপরের কথার ওপর বিশ্বাস করে আমার প্রয়োজনের কথা বলতে পারি না। সেক্ষেত্রে বোকা বনার সম্ভাবনা থাকে। তাই নয় কি?

হাসলেন অনির্বান চৌধুবী, বুঝলাম, আপনি শুধু সম্ভ্রান্তই নন, বুদ্ধিও রাখেন যথেষ্ঠ। বেশ প্রশ্ন করুন। আমি সম্ভব হলে উত্তর দেবো।

আপনারা কি ধরণের সাহায্য করে থাকেন?

টাকা পযসা দেওয়া ছাড়া সব রকমেরই সাহায্য করে থাকি শরণার্থীকে, হাসলেন অনির্বান চৌধুরী।

কূটনীতিক সুলভ উত্তরটা হ'ল না কি? হাসলেন আমিনা খাতুন।

একটু সোজা সরল ভাষায় বলুন।

বেশ, আমবা প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাজ করে থাকি।

শুধুই কি ডিটেকটিভদের কাজ। অন্য কিছু নয়?

মানে? আপনিই পরিষ্কার করে বলুন না। কি চান?

আপনারা কি কোনো লোককে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিতে সাহায্য করেন? কথা শেষ করে স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন আমিনা খাতুন।

সজাগ হলেন আনির্বান চৌধুরী। দু-এক মুহূর্ত বোরখায় ঢাকা মুখের দিকে তাকালেন। তারপর নড়েচড়ে বসে শান্তস্বরে বললেন, হ্যাঁ, এরকম সাহায্যও আমরা করতে পারি, সেক্ষেত্রে প্রতিশোধের রকমভেদের ওপর আমাদের ফি নির্ভর করে, আর শর্ত হচ্ছে ব্যবস্থা বা পরিবেশ আমরা করে দেবো, বিশেষ করে চরম প্রতিশোধের বেলায়, সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্টকে নিজের হাতে প্রতিশোধটা নিতে হবে। গোপনীয়তা রক্ষা অবশ্য করব, আর যদি না পারেন, আমরা বাইরের লোকেদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবো, সেক্ষেত্রে আমাদের দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

বোরখার জালির ভেতর দিয়ে আমিনা খাতুন তাকিয়ে রইলেন অনির্বান চৌধুরীর দিকে। তারপর বললেন, বেশ, আপনার প্রথম শর্তেই আমি রাজি।

সজাগ অনির্বান চৌধুরী অভ্যাসমত এই মুহূর্তে চেয়ারে হেলে পড়লেন, তার প্রসারিত বাঁহাত স্পর্শ করল টেবিলের সঙ্গে লাগানো একটা গুপ্ত বোতামের ওপর। আঙুলের সামান্য চাপ দিয়েই আবার হাত সরিয়ে নিলেন, এবার তাহলে আমি আপনাকে প্রশ্ন করি আগে, আপনি জবাব দিন।

করুন।

নাম?

আমিনা খাতুন।

স্বামীর নাম?

আহমেদ।

ঠিকানা?

পার্ক সার্কাস।

বলুন, কি চান আপনি? কেন চান?

একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন অনির্বান চৌধুরী।

প্রথম আমার স্বামী হত্যার প্রতিশোধ। আমি নিজের হাতে খুন করতে চাই শয়তানটাকে।

খুব ভাল কথা। সেই শয়তান কোথায় থাকে? তার পরিচয় বা ঠিকানা কি?

আপনার খুব প্রিয়জন। আপনি ভাল করেই চেনেন।

কে সে? বিস্মিত হলেন অনির্বান চৌধুরী।

সে আপনি নিজে।

মুহূর্তের মধ্যে অনির্বান চৌধুরী দেখলেন আমিনা খাতুনের মুখ থেকে রোরখা খসে গেছে। হাতে ঝকঝকে এক ছোট্ট পিস্তল।

'মেড ইন জার্মানী' এটা। লেডিজ মেক। না-না। হাতটা ওখানেই থাকুক। নড়াবেন না।

টেবিলের ড্রয়ারে রাখা পিস্তল ছুঁতে গেলেন অনির্বান চৌধুরী। পারলেন না। তার আগেই অসহ্য এক যন্ত্রণায় হাত দুটো বুকের কাছে জড় হয়ে এলো। কালো কালো ছায়াগুলো তার চোখের সামনে এবার সজীব হ'ল। শেষবারের মতো চোখ বোজার আগে দেখতে পেলেন এক ক্ষতবিক্ষত যুবকের মৃতদেহের ওপর এক রূপসী যুবতীর আছড়ে পড়ে কান্না।

সহদেব চক্রবর্ত্তী ঘরে ঢুকল। ঘুরতে থাকা টেপের বোতামটা বন্ধ করতে গিয়েও থেমে গেল। না। থাক। শেষ হলে আপনা থেকেই ওটা বন্ধ হবে। আপন মনে হাসল সহদেব। নমিতা ওরফে আমিনা খাতুন জানল না যে তার মৃত্যুবান নিজেই ফেলে গেছে—এক্ষুনি পুলিশ এসে কুড়িয়ে নেবে। তার চোখে এখন বিচিত্র হাসির সমারোহ।

# মিরাক্‌ল অপারেশন

## কনিষ্ঠ পাণ্ডব

বন্দর এলাকা এখন সদা সতর্ক। সিকিউরিটি ফোর্স সদা সতর্ক। দেশী বিদেশী নাগবিকদের বন্দরে প্রবেশের আইন কানুনে নিষেধাজ্ঞা আরও দৃঢ় করা হয়েছে। প্রহরীর বহুবিধ চেকিং-এর পরে তবে বন্দরের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। অথচ বন্দরের চারপাশে মানুষের আসা যাওয়া, ধর্না দেওয়া অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে নিয়মিত কয়েকজন মতলব বাজ, ধান্ধাবাজ তৎপর হয়ে উঠেছে! নিশিদিন সমানে চলেছে তাদের দৌরাত্ম্য গোপনে কি এক যোগাযোগ চলেছে। নতুন কোনো ইঙ্গিত।

পর পর তিনবার ভারতীয় সদর পুলিশের নিরাপত্তার জাল ছিঁড়ে তিনটি বহুমূল্য হীরে পাচার হয়ে গেছে। সদা সতর্ক থেকেও পুলিশ সেই পাচারকারীকে ধরতে পারেনি। সম্পূর্ণ নতুন কৌশলে গুপ্তচর চক্র তাদের কাজ হাসিল করেছে। পুলিশকে করেছে হতভম্ব। তাই এবার এই বিশেষ সতর্কতা। বিশাল জাল বিস্তার করা। পুলিশ এখন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যেমন করেই হোক সেই গুপ্তচর চক্রকে ধরতে হবে। কিভাবে পাচার হচ্ছে। কিভাবে বিভিন্ন বিভাগীয় শাখায় চেকিং হচ্ছে দেখতে হবে। প্রয়োজন হলে প্রতিটি মানুষকে তন্নতন্ন করে সার্চ করা হবে। কারোকে সন্দেহ হলে বিশেষ সেলে পাঠানো হবে। নতুন কৌশলে চেকিং হবে। সন্দেহজনক হলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হবে। বিশেষ করে আমেরিকানদের ক্ষেত্রে বেশ সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। সকল আয়োজন এখন সম্পূর্ণ।

বন্দরে নতুন একটা জাহাজ এসেছে। খবরে প্রকাশ একটা বিশেষ আকারে কালো হীরে জাহাজে এসেছে। গুপ্তচর চক্র যথারীতি তৎপর। তাদের মধ্যে এখন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রত্যেক মহল সজাগ। কোনোমতে কুক্ষীগত করার নেশায় মশগুল। পুলিশও প্রস্তুত। তারা সতর্ক। শুধু কৌশলে বিস্তৃতভাবে জানার জন্য অপেক্ষা। কাদের হাত আছে। কিভাবে আছে।

আমেরিকানদের এই জাহাজটার চারপাশে আশ্চর্যজনক ভাবে জটলা বৃদ্ধি পেয়েছে। নানা ধরনের মানুষের ভীড়। তাদের সন্ধানী দৃষ্টি সদা সতর্ক। নিজেরা কল-গুঞ্জনে মুখর।

সন্ধ্যে হলেই বন্দরের মানুষের চেহারা যায় পাল্টে।

দীর্ঘদিন জলে থেকে জাহাজী মানুষগুলো ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো অস্থির হয়ে উঠে। তাই জাহাজ বন্দরে ভেড়া মাত্র তারা পাগল হয়ে উঠে। সন্ধ্যের জন্য অপেক্ষা। সন্ধ্যের অন্ধকার একটু বাড়লেই মানুষগুলো একে একে জাহাজ থেকে নেমে আসে। শহরের ধারে মেয়ে মানুষের আস্তানার সন্ধানে। অথবা পর পর গাড়ি এসে ঢোকে। সঙ্গে নিয়ে এসে তোলে সেই

সব মেয়ে মানুষদের। তারপর সারা রাত কেবিনে চলে বন্য অস্থিরতা। মেয়ে মানুষের শরীর ছিঁড়ে কুটে খায় বন্য মানুষগুলো। ভোরের আলো ওঠার আগে একে একে নেমে যায় রাতের দেহ বিকিনী মেয়েমানুষরা।

একদিকে যখন এই ধারাবাহিকতা অন্যদিকে তখন অন্য তৎপরতা। জাহাজের চালানী মাল গুপ্তভাবে যথাস্থানে উপযুক্ত চক্রের হাতে তুলে দেওয়ার কৌশল। বিপত্তি সিকিউরিটি নিয়ে। সিকিউরিটি ফোর্সকে ফাঁকি দেওয়ার সুপরিকল্পিত ছকটুকু বিস্তার না করা পর্যন্ত সাবধানে মাল রক্ষা করার দায়িত্ব অপর চক্রের।

শুনুন, মিঃ আচারিয়া, জাহাজের নাম 'ক্যাপ্টেন জনী'। আমেরিকান জাহাজ। বলতে বলতে একটা ম্যাপ খুলে দেখাচ্ছিলেন অফিসার মিঃ রুদ্র। এই হচ্ছে জাহাজের পজিশন। পেন্সিল দিয়ে দেখাচ্ছিলেন ক'টা কেবিন ও অন্যান্য সবকিছু। মিঃ রুদ্র বললেন, জাহাজটা নিয়ে এসেছে ওষুধ। এর সঙ্গে গুপ্তচর চক্রের কাছে বিশেষভাবে রক্ষিত আছে সেই কালো হীরে। এখন শুরু করুন আপনার কাজ। বাট রিমেমবার, আফটার থ্রি টাইমস ফেইলইয়োর ইট উইল ভেরী ইমপরট্যান্ট টু আস। বলতে বলতে মিঃ রুদ্র বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিলেন।

ভেরী সিন্‌সিয়ার মাই ফ্রেন্ড, এভরী টাইম ট্রাই টু বী সিনসিয়ার। ট্রাই অ্যাট ইয়োর বেস্ট।

একটু থেমে মিঃ রুদ্র বললেন, আমার শুভেচ্ছা রইল। তোমার উপর আমার অনেক আস্থা। তুমি আমার শেষ ভরসা। আশা করি নিশ্চয়ই পারবে। আচারিয়ার পিঠ চাপড়ে আশ্বাসের সুরে বললেন মিঃ রুদ্র।

মিঃ রুদ্র ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আচারিয়া তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। নিজের মনে সব কিছু পরিকল্পনা ঠিকঠাক করে নিতে চাইল।

এর তিন দিন পরে :

সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ একটা প্রাইভেট কার বন্দরে এসে থামল। ভিতরে ছিল একজন যুবক ও একটি সুন্দরী যুবতী। যুবতীর বয়স আনুমানিক বছর কুড়ি হবে। তার নিটোল কমনীয় স্বাস্থ্য। টানা-টানা এক জোড়া চোখ। বঙ্কিম ভুরু। নিটোল গাল। রক্তিম ঠোঁট। টাইট কস্টুয়্যুমে উজ্জ্বল উদ্ধত যৌবন। ঘাড় পর্যন্ত রিবনে বাঁধা শ্যাম্পু করা চুল। পায়ে হাই হিল জুতা। পা থেকে পাছা পর্যন্ত টাইট লাল মোজা।

সিকিউরিটি পুলিশ যথারীতি গেট পারমিট পাস চেক করে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দিল। তরুণীকে দেখে অনুমান করল রাতের সঙ্গিনী। সন্দেহের চোখে চেয়ে এক পলক কৃত্রিম হাসি পুলিশটির মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

গাড়ি সোজা এসে জাহাজের সামনে কোয়ে ল্যান্ডে থামল। যুবকটি নামল। সঙ্গে নামল সেই যুবতী। ধীরে ধীরে জাহাজের সঙ্গে লাগোয়া সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল। যুবকটি মহিলাটির হাত ধরে আগে উঠছিল। যুবতী উঠছিল খুব ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে। জাহাজে উঠে বেশ ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে চলল যুবকটি। তাকে অনুসরণ করল সেই তরুণী।

রাত তখন তিনটে। বন্দরের ভিতর নিঃশব্দ নীরবতা ছড়াচ্ছে। প্রায় ফাঁকা। অতি সন্তর্পণে সেই যুবতী জাহাজ থেকে নামল। সন্ধ্যের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশবাশ, অবয়ব এখন অবিন্যস্ত।

চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। খুব ধীরে ধীরে বন্দরের কোয়ে ল্যান্ড ধরে এগিয়ে আসছিল সেই যুবতী। বার বার ঘুরে ফিরে চারপাশ দেখছিল।

গেটে এসে পারমিটটা সিকিউরিটি পুলিশের হাতে জমা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ফাঁকা রাস্তা ধরে হাঁটছিল। বেশ কিছুটা এসে সাদা একটা গাড়িতে এসে উঠল, গাড়ির চালক খুব তাড়াতাড়ি দরজা ভিতর থেকে টেনে বন্ধ করে দিল। মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল গাড়ি, এদিকে ওদিকে আরও কয়েকটি গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সেগুলো এক সঙ্গে স্টার্ট দিল। গাড়িটিকে অনুসরণ করে ছুটল তীব্র গতিতে।

হোটেল হরাইজেন্টাল। রাত তখন চারটে। প্রথমে সেই সাদা গাড়ি থামল। গাড়ি থেকে নামল সেই তরুণী। পরে এক যুবক। তারপর পর পর অনেকগুলো গাড়ি এসে থামল।

দ্রুতগতিতে গাড়ি থেকে নেমে তরুণী উপরে উঠে গেল। প্রায় ছুটতে ছুটতে এসে ঢুকলো ২০৪ নম্বর রুমে। দরজা পুশ করে ভিতরে ঢুকতে গিয়ে চমকে উঠল। বেশ কয়েক পা ততক্ষণে পেছিয়ে গেছে সে। বুকটা কেঁপে উঠল। খুব দ্রুত ওঠা নামা করছিল তরুণীর বুকের উপত্যকা। চোখে আতঙ্ক। অপরিচিত লোকটি মুখে কুটিল হিংস্র হাসি ফুটিয়ে বলল, আর ইউ লুসি?

মুখ দিয়ে কোনো স্বর বেরুল না তরুণীর। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্ট্যাচুর মতো।

ক্ষিপ্রগতিতে এক ঝাপটায় হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। তরুণী চিৎকার করতে গেল। যুবক সতর্কসূচক ইঙ্গিত করে বলল, ডোন্ট ট্রাই টু ক্রাই। হোটেল তখন নিস্তব্ধ। তরুণীকে জাপটে ধরে জোর করে নিয়ে গিয়ে তুলল তার গাড়িতে। গাড়ির দরজায় চাবি দিয়ে হিংস্র লোকটা নিজেই গাড়ি ছুটিয়ে চলল।

তরুণী কাঠ হয়ে বসে রইল। লোকটার দেহে যেন লোহার মতো শক্তি। সাঁড়াশির মতো জাপটে ধরে অবশ করে দিয়েছে তার শরীর। তরুণীর দু'হাতে কোনো শক্তি নেই। পা জোড়া এক ফোঁটাও নড়ে না। অগত্যা মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে বসে রইল সে। গলাটা তৃষ্ণায় যেন শুকিয়ে আসছিল।

লোকটা গাড়ি চালানোর ফাঁকে ফাঁকে তরুণীর দিকে হিংস্র চোখে ফিরে তাকাচ্ছিল এক সময় হিংস্র হাসিতে হেসে উঠল।

তরুণীর শরীর ক্রমশ ভয়ে হিম হয়ে আসছিল। হাসির শব্দ তার কানে বিঁধছিল।

তখন ভোর হয়ে আসছে। গাড়ি এসে থামল শহরতলীর ধারে এক নির্জন পরিত্যক্ত বাগান বাড়িতে। যুবকটি তরুণীটিকে টেনে নিয়ে চলল সেই বাগানবাড়ির অন্দর মহলে। এক কক্ষে তখন চলছিল নাচ গান। একটা দৈত্যকার মানুষ মাঝে বসে তা উপভোগ করছিল। লোকটি তরুণীটিকে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, এই নিন বামাল ক্যাচ।

লোকটির বুকে গিয়ে পড়ল সেই তরুণী। লোকটি হাতের তালু দিয়ে তরুণীর মুখ তুলে দেখে বলল, ইয়েস, দিস ইজ অরিজিনাল। সী ইজ লুসি। লুসির গালে সপাটে এক চড় মেরে বলল, মাল কোথায়? দূরে ছিটকে পড়ল লুসি। পুনরায় তুলে নিয়ে এসে বলল, হোয়ার ইজ দ্য ডায়মন্ড?

হঠাৎ লোকটি চিৎকার করে ডাকল ডেভিড।

যে যুবক লুসিকে ধরে নিয়ে এসেছিল সেই-ই ডেভিড।

তরুণীকে দেখিয়ে বলল, লুসির মোজার ভিতর সেটা আছে। খোলো।

ইতস্তত করতেই ডেভিড বলপূর্বক তরুণীর পায়ের মোজা টেনে খুলে দিচ্ছিল। সম্পূর্ণ মোজা খোলার পর ডেভিড বলল, কোথায় স্যার? নেই।

ওর কাছে নেই।

অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল ডেভিড ও সেই লোকটি। ততক্ষণে মিঃ আচারিয়া সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে সেই কালো হীরে। জাহাজেই ওর হাত থেকে আমার কাছে এসেছে। কিন্তু তোমাদের এবং অন্য গুপ্তচর চক্রকে ধরবার জন্য আমি ওর সাহায্য চেয়েছিলাম। দীর্ঘদিন সে আমাকে সাহায্য করেছে। অনেক কষ্ট পেয়েছে। তবু বলব, ও দেশের কাজ করেছে। তোমাদের ধরবার জন্য আমাদের এই বিরাট কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে।

এখন আমি নিশ্চিন্ত। আমার কৌশলে তোমরা সকলে একসঙ্গে ধরা দিয়েছ। মিঃ আচারিয়া ডেভিড ও সেই কদাকার লোকটির হাতে হাত কড়া পরিয়ে দিল।

তরুণীকে উদ্দেশ্য করে বলল, চলো অরুণা তোমার কর্তব্য শেষ।

ডেভিড ও সেই লোকটি বাগানের বাইরে এসে দেখল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আগেই ধরা পড়েছে।

বিস্ময়ে তারা সেই তরুণী ও মিঃ আচারিয়ার দিকে তাকালো। তরুণীর ঠোঁটে বিজয়িনীর হাসি। তারা যা শুনেছিল তা কি সম্পূর্ণ মিথ্যে? এই তরুণী পুলিশের স্পাই কি করে হয়!

—ঃ—